প্রকাশক :

ধীরেন্দ্রমোহন রায়
২১৭ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :

লিপি মালি	সেঞ্চুরী প্রেস	রামকৃষ্ণ প্রেস	লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
কলিকাতা-২	কলিকাতা-৯	কলিকাতা-৬	কলিকাতা-৬

নিবেদন

স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পরিবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ঐচ্ছিক বাংলা বোধিনী—১ম পত্র প্রকাশিত হল। এর চারটি (১। বৈষ্ণব পদাবলী ২। মেঘনাদবধ কাব্য ৩। সোনার তরী ৪। ছন্দ) অংশ—তার মধ্যে দুটি (মেঘনাদবধ কাব্য এবং সোনার তরী) স্বনামখ্যাত অধ্যাপক বি, চৌধুরী মহাশয়ের রচিত। এগুলিকে বর্তমান পরীক্ষার রীতি-অনুযায়ী বিন্যস্ত করা এবং অপর দু'টি অংশ প্রস্তুতিতে সুপণ্ডিত ও কৃতী অধ্যাপক ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। বলা প্রয়োজন যে, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, নিপুণ তত্ত্বাবধান ও অমায়িক ব্যবহার এই গ্রন্থপ্রকাশ কর্মে আমাদের সাহস ও উৎসাহ সঞ্চার করেছে। তাঁর এই অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, আর ধন্যবাদ জানাই শ্রীগোকুল বিশ্বাস (অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ) ও শ্রীঅনিল চৌধুরী (অধ্যাপক, বঙ্গুলা কলেজ) মহাশয়কে—যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া প্রকাশন কার্য সময়মতো সম্পন্ন হ'ত না। প্রবীণ অধ্যাপক ও দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

নূতন পাঠ্যসূচী অবলম্বনে ঐচ্ছিক বাংলা বোধিনীর ২য় ও ৩য় পত্র শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। বর্তমান সংস্করণটি সম্পর্কে বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার মতামত জানার অপেক্ষায় রইলাম। বইটির মানোন্নয়নের জন্য যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

বিনীত
প্রকাশক

জন্মাষ্টমী, ১৩৬৭

সূচীপত্র

১। বৈষ্ণব পদাবলী

২। মেঘনাদবধ কাব্য (১ম ও ২য় সর্গ)—মধুসূদন দত্ত

৩। সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪। ছন্দ

বৈষ্ণব পদাবলী

"বিদেশী সাহিত্যের অনুকরণে নহে, প্রাচীন সমালোচকের অনুশাসনে নহে, দেশ আপনার বীণায় আপনি সুর বাঁধিয়া আপনার গান ধরিল।······দেখিতে দেখিতে দশে মিলিয়া এক অপূর্ব সঙ্গীত প্রণালী তৈরী করিল, আর কোন সঙ্গীতের সহিত তাহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য পাওয়া শক্ত।"

॥ ভূমিকা ॥

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ প্রায় ছয়শত বৎসর বিস্তৃত। খ্রীস্টীয় ১২০০ অব্দ থেকে ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই যুগকে আবার দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। খ্রীস্টীয় ১২০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত চৈতন্য পূর্বযুগ এবং ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে চৈতন্য পরবর্তী যুগ বলা হয়। এই দুই পর্যায়ে নানা ধরণের সাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে পদাবলী সাহিত্য বিশেষ মর্যাদার দাবী করতে পারে। পদাবলী সাহিত্য আবার দুভাগে বিভক্ত—একটি বৈষ্ণব পদাবলী ও অপরটি শাক্ত পদাবলী। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় বৈষ্ণব পদাবলী। বিষ্ণু শব্দ থেকে বৈষ্ণব শব্দটি এসেছে। যারা বিষ্ণুর উপাসক তারাই বৈষ্ণব। কৃষ্ণ বিষ্ণুরই অবতার। মধ্যযুগে সাহিত্য ধর্মকে আশ্রয় করে বিস্তৃত হয়েছে। তাই বৈষ্ণবগণ যে সাহিত্য রচনা করেছেন তাকেই বৈষ্ণব পদাবলী অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকে বেশ কয়েকশত বৎসর এই ধরণের পদসাহিত্য বাংলা ভাষায় এত রচিত হয়েছিল যে তা একটি গ্রন্থের আকার নিতে পারে। বিভিন্ন সুধীজন এই ধরণের নানা পদসংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই পদগুলি এক একটি গীতি-কবিতা। অন্য নিরপেক্ষ হয়ে আস্বাদন যোগ্য। যদিও প্রত্যেকটি পদ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে রচিত। গীতিময়তা ও কাব্য চমৎকারিত্বে বৈষ্ণব পদাবলী বিশ্বের যে কোনো শ্রেষ্ঠ গীতি কবিতার সমমর্যাদা দাবী করতে পারে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যমূল্য অসাধারণ। এই পদাবলী বাঙালী চিত্তকে যুগ যুগ ধরে প্রভাবিত করে আসছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিময়তা ও ব্রজবুলির শব্দ ঝংকারে মুগ্ধ হয়ে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন ছদ্মনামে। এ থেকে অনুমান করা সহজ যে অদ্যাবধি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা—বিশেষ করে রাধাকৃষ্ণের লীলা কথাই পদাবলীর বিষয়বস্তু। পদাবলীর মধ্যে সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ সংখ্যায় বেশী নয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্য লীলা বিষয়ক পদও সংখ্যায় অল্প। পদাবলীতে মধুর রসের—শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা রসের পদের সংখ্যা প্রচুর। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ থেকে আরম্ভ ক'রে মধুর লীলা পর্যন্ত অবলম্বনে শত শত কবি সহস্র সহস্র পদ রচনা ক'রে গেছেন। রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা অবলম্বনে কবিতা ও গীতি কবিতা রচনা আজও সমানে চলেছে। পদাবলীতে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কথা অবলম্বনে রচিত পদের সংখ্যাও প্রচুর। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা কথা কতদিনের পুরানো তা কেউ জানে না। প্রাচীনত্ব বয়স নিয়ে নানা জনে নানা কথা বলেছেন।

হালের গাথা সপ্তশতীতে রাই কানু ও গোপীগণের কথা আছে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত এই কবিতা কম বেশী দুই হাজার বৎসর পূর্বে সংকলিত হয়েছিল। পরবর্তী বহু কবির রচিত খণ্ড কবিতায় কাব্য নাটকের নান্দীশ্লোকে রাধাকৃষ্ণ লীলা কথা পাওয়া যায়। আনন্দ বর্ধনের ধ্বন্যালোকে একটি প্রাচীন রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে।

ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত আছে। তিনি জয়দেবের পূর্ববর্তী কবি। জয়দেবের জীবদ্দশায় অথবা তার তিরোধানের অব্যবহিত পরে সম্রাট লক্ষ্মণসেনের সামন্ত বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাস 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নাম দিয়ে প্রাচীন ও সমসাময়িক কবিগণের সুভাষিতাবলী সংগ্রহ করেন। তার কিছু আগে বা পরে বাংলাদেশে আর একখানি গ্রন্থ সংকলিত হয় তার নাম 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। সংগ্রহ দু'খানির মধ্যে বাঙালী ও অবাঙালী বহু কবির রচিত কৃষ্ণলীলা তথা রাধাকৃষ্ণ লীলাত্মক শ্লোক আছে। পরবর্তী বৈষ্ণব কবিগণ এই গ্রন্থ দু'খানি এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কবি শ্রীরূপ গোস্বামীর সংকলিত অনুরূপ গ্রন্থ পদ্যাবলী থেকে বহু সাহায্য পেয়েছিলেন। এই সময় থেকেই প্রাকৃতে ও সংস্কৃতে এবং আঞ্চলিক ভাষায় রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা নিয়ে কবিতা ও কাব্য রচিত হচ্ছিল। দুর্দান্ত হাবশীদের অত্যাচারে রাজধানী গৌড় যখন সন্ত্রস্ত তখনই ঐ রাজধানীরই কোন নির্জন গৃহে বসে কবি চতুর্ভুজ 'হরিচরিত' রচনা করেন। ১৪১৫ শকাব্দে 'হরিচরিত' রচিত হয়। রাঢ়ের কুলীন গ্রাম নিবাসী মালাধর বসু ১৪০২ শকাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের আংশিক অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচনা করেন। পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত গ্রন্থের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। মিথিলার বিদ্যাপতির পদ বাংলায় ধীরে ধীরে একটি নূতন ভাষার ও কবি গোষ্ঠীর অবলম্বন হয়ে পড়ে। চণ্ডীদাস রচিত কৃষ্ণলীলার পদ বিশেষতঃ দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বাংলার কবিগণকে তথা রসিক সমাজকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি দীর্ঘ তিন শতাব্দীর ব্যবধান। এই সময়ে কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক ও একটি মাত্র সংস্কৃত কাব্য ছাড়া কোন পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য আবিষ্কৃত হয় নি। জয়দেবের পূর্বেও বাংলাদেশে সংস্কৃতে বা অপভ্রংশে রচিত পূর্ণাঙ্গ লীলাকাব্য ছিল বলেই মনে হয়। 'রাগাত্মিকা' শব্দটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের হলেও ভাবটি প্রাচীন। এই ভাবের একটি ব্যাপক ও পরিপুষ্ট বৈষ্ণবী ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত না থাকলে গীতগোবিন্দের লীলা পরিবেশ ও লীলা বৈশিষ্ট্য বাঙালী চিত্তে এত সাড়া জাগাতে পারত না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের

"কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নর লীলা
নরবপুঃ তাহার স্বরূপ।"

যে উৎস থেকে উৎসারিত, সেখানে কৃষ্ণকর্ণামৃতের সঙ্গে গীতগোবিন্দও বর্তমান। কর্ণামৃতে যা প্রকাশমান, গীতগোবিন্দে তা ইঙ্গিতময়। কর্ণামৃত কেবল অঙ্গীকৃত

নরাকার বলেই ক্ষান্ত হয়েছে। গীতগোবিন্দ কৃষ্ণের মুখের কথায় এবং কার্যকলাপে তাঁর মানবস্বরূপকেই উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাগাত্মিকা ভক্তির বশীভূত ভগবান আপন মস্তকে মানাশ্রিত ভক্তের চরণ-প্রার্থনা, ক'রে বলেছেন : "দেহিপদ পল্লব মুদারম"। জয়দেবের কাব্য সমকালীন বাঙালী বৈষ্ণবকে বিদ্রোহী করে নি বরং চমৎকৃত করেছে। কারণ ভক্ত ও ভগবানের প্রেম সম্পর্কের এই পরাকাষ্ঠা তার ভাব কল্পনার সম্ভাব্য পরিণতি। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাক্ জয়দেব যুগের এবং জয়দেবোত্তর তিন শতাব্দীর বাংলার বৈষ্ণব ঐতিহ্য জানবার কোন উপায় আজও আমাদের হস্তগত হয় নি।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান পূর্ণ নয়। গ্রিয়ার্সন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'মৈথিল পদ সংগ্রহে' বিদ্যাপতির মাত্র ৭৬টি রাধাকৃষ্ণ লীলাপদ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর সংগ্রহের ভিত্তি কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি নয়, অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে শোনা এবং দ্বারভাঙার রাজার গৃহে পাওয়া গান মাত্র। এই সংগ্রহের কিছু আমাদের অপরিচিত। কিছু সাধ্য বিষয়ক প্রহেলিকা মাত্র। গানগুলির সবই যে বিদ্যাপতির রচনা তা বলা যায় না। যেমন শুনেছেন তেমনি ছাপিয়েছেন না ভাষাতাত্ত্বিক অস্ত্রোপচার করেছেন তার উল্লেখ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর ভিক্ষুকের মুখে পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা না পাওয়াই স্বাভাবিক। ভাষাতাত্ত্বিক গ্রীয়ার্সন তা জানতেন এবং সেই কারণেই বিশ্বাস হয় যে কিছু ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন তিনি করেছেন। বাংলাদেশে বিদ্যাপতির নামে পদের সংখ্যা প্রায় হাজার। এ সংখ্যাও অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত। এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে এদের মধ্যে বহু উৎকৃষ্ট পদ বাঙালী পদকর্তা কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি কবিশেখর, কবিবল্লভ ভূপতি প্রভৃতির রচিত ব্রজবুলি পদ। বিদ্যাপতি-ভণিতার বাংলা পদগুলির রচয়িতা বাঙালী। বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত তেরটি পালায় বিভক্ত রাধাকৃষ্ণ গানের পুঁথি বাঁকুড়ার এক পল্লীতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করেন। "পুঁথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুঁথির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হয় চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন—কাব্য রচনা করেন।—অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ অসমীচীন নয়" [ভূমিকা]। ভাষাতাত্ত্বিকের মতে এই গ্রন্থের ভাষা চৈতন্য-পূর্ব সুতরাং বড়ু প্রাক চৈতন্য যুগের। পূর্বের ভূমিকায় বসন্ত রঞ্জন লিখেছেন যে চণ্ডীদাসের 'বাসুলী' বজ্রবাসী বৌদ্ধদের 'বজ্রেশ্বরী'। বাসুলী ও বিশালাক্ষী উভয়েই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের নূতন সংস্করণের পুনর্লিখিত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন : "কবির দেশ বীরভূম—নান্নুর। চণ্ডীদাস বাসুলীর বাগীশ্বরীর বরে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান করেন।···নান্নুরের বাসলী ধর্মপূজাবিধানের বাসলী···নহেন। ইনি পুস্তকাক্ষ মালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী মূর্তি ··ভাস্কর্য খ্রীস্টীয় ৮ম/৯ম শতাব্দীর অনুরূপ বাসলী বাগীশ্বরী শব্দেরই রূপান্তর [বাগীশ্বরী>বাইসরী>

বাসরী>বাসলী]...সরস্বতী ও বাসলী এক ও অভিন্ন। ইহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়।" চণ্ডীদাসকে বীরভূমের নান্নুরে আনায় বাংলায় চির প্রচলিত কিংবদন্তীর সম্মান রক্ষা করা হল বটে কিন্তু নূতন সমস্যারও উদ্ভব হল। আমরা আনন্দিতও হলাম আবার চিন্তিতও হলাম। বাঁকুড়া জেলার ছাতনার চণ্ডীদাস এক পুরাতন স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তুলেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"—গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে যে ছাতনা তখন ঠিক এইভাবে বিদ্যাপতিকেও দাবী করেছিল।

মহাপ্রভুর সমকাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পদাবলী সাহিত্যের যে কূলপ্লাবী মহাধারা প্রবাহিত হয়েছে তা প্রধানতঃ তিনটি ধারায় যুক্ত ত্রিবেণী—রাধাকৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা। পারিষদের চোখে, ভক্তের চোখে গৌরচন্দ্র 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ স্বরূপ।' পদকর্তাদের অনুপ্রাণিত করেছে রাধাভাবাক্রান্ত বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের মূর্তিমান বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে। নবদ্বীপের তরুণ নিমাই পণ্ডিত গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে পরম বৈষ্ণব ঈশ্বর পুরীর নিকট প্রেমধর্মে দীক্ষালাভ করেন। নদীয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর লোকে সবিস্ময়ে দেখল উদ্ধত পণ্ডিত নিমাই ললিত প্রেমিক নিমাইয়ে পরিণত হয়ে গেছেন। ভাবাবেশে বিহ্বল নিমাই-এর অলৌকিক আচরণে অদ্বৈত শ্রীবাস প্রমুখ প্রাচীন আচার্যগণ মুগ্ধ হয়ে ভক্তশিষ্য রূপে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করলেন। অচিরে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন নিমাই-এর গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য অবধূত নিত্যানন্দ। হরিনাম রসে "শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়"—জনগণের মনে সে এক অপূর্ব উন্মাদনা। শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার অঙ্গনে চলতে লাগল উদ্দাম কীর্তন নৃত্য—অনধিকারীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। জনগণ শুনল যে নাম সেই কৃষ্ণ—"নামের সহিত সদা ফেরেন শ্রীহরি"। শ্রীহরি ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নন, মাধুর্যময় সচ্চিদানন্দ মূর্তি মানব কিশোর কৃষ্ণ। মানুষের তিনি সখা, মানুষের তিনি সন্তান, মানুষের তিনি কান্ত। প্রতি মানুষের হৃদয়দ্বারে কাঙালরূপে তিনি নিত্য দণ্ডায়মান। দ্বার খুললেই মিলন ঘটবে। মানুষে মানুষে ভেদ নেই। ব্রাহ্মণ-শূদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র কৃত্রিম পরিচয়। মানুষের একমাত্র সত্য পরিচয় সে মানুষ। মানবতা তখনই সার্থক হয় যখন তার মধ্যে অনুস্যূত হয় ভগবৎ প্রেম। ভগবানকে ভালবাসা সহজ। তা তত্ত্বজটিল কৃচ্ছ্র সাধনের "ক্ষুরস্য ধারা দুরত্যয়া দুর্গং পথঃ" নয়। প্রতিদিনের সংসার যাত্রায় আমাদের প্রীতি মাতায় সন্তানে, বন্ধুতে বন্ধুতে, পতি-পত্নীতে যে বিচিত্রভাবে আপনা থেকেই স্বচ্ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে তারই ভগবন্মুখিতাই ভগবৎ প্রেম।

নিরভিমান মহাপণ্ডিত, সর্বত্যাগী, অনিন্দ্যসুন্দর এক তরুণ মানব সন্তান একদিকে দুই বাহু প্রসারিত করে পরম প্রেমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানবমাত্রকেই আপন বক্ষে আলিঙ্গন করছেন, অপরদিকে ভগবৎ প্রেমে সাশ্রুনেত্রে রোমাঞ্চিত

দেহে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করছেন—মানুষের অন্তর্লোকে আলোড়ন তুলতে তা যথেষ্ট। এই মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে আমাদের পদাবলীতে—গৌরচন্দ্রিকায় তথা রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার গানে। চৈতন্যোত্তর যুগের রাধা অনেকাংশে গোরাভাবে ভাবিত।—প্রেমিক গৌরচন্দ্রের নারী প্রতিরূপ মাত্র।

॥ গৌরচন্দ্র ও গৌরচন্দ্রিকা ॥

বাংলা সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্যরূপ লাভ করে বৈষ্ণব যুগে। বৈষ্ণব কবির তিন শতাব্দী ব্যাপী নিরবচ্ছেদ সাধনায় এই সাহিত্যের পুষ্টি ও পরিণতি। আধুনিককালেও এর প্রভাব গুরুতর এবং স্বাভাবিক কারণেই ভাবীকালেও এ প্রভাব থেকে বাঙালী কবি মুক্ত থাকতে পারবেন না। অথচ এই বিরাট সাহিত্যের মূলে রয়েছে একটি মহাপুরুষের অলৌকিক জীবন—ইনি গৌরচন্দ্র। সেই কারণেই এই মহাপুরুষ সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য্য।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবকালে নবদ্বীপে অদ্বৈত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, প্রভৃতি বহু আচার্য ও বৈষ্ণব ছিলেন। নামকীর্তনও অপ্রচলিত ছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক সংকীর্তনের পথে বহু বাধা ছিল। এই সকল বাধার অন্যতম—হিন্দু অবিশ্বাসীর দল—"সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে"। তবু মহাপ্রভুর জন্মরাত্রিতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে 'হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়"। শ্রীবাস রাত্রিতে আপন গৃহে নামগান করতেন বলে পাষণ্ডীরা বলত—

"এ বামনে গ্রাম হৈ তে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাই ফেলাই নিয়া স্রোতে।।"—চৈতন্য ভাগবত

অবিশ্বাসী অর্থে পাষণ্ড শব্দের প্রয়োগ সম্রাট অশোক করেছেন তাঁর এক শিলালিপিতে। পরে এই পাষণ্ডী বাধার সঙ্গে যুক্ত হয় এক কঠিন ও কঠোর বাধা—কাজীর বাধা। গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মহাপ্রভু যে সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেন, তা ঠিক নগর কীর্তন নয়—

"দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্তন করহ সভে।" —চৈতন্য ভাগবত

এটি মহাপ্রভুর নির্দেশ। 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ' সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোৎসাহে কীর্তন আরম্ভ হল। কিন্তু একদিন—

"যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।"—চৈতন্য ভাগবত।

ইনি চাঁদ কাজী—নদীয়ার শাসনকর্তা ও গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের গুরু। কাজীর সহায় ছিল পাষণ্ডীরা—

কৃষ্ণের কীর্তন করে নীচ বারবার
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সভে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জন ॥—চরিতামৃত

এই বিপদ থেকে মহাপ্রভু নবদ্বীপকে কেমন ক'রে রক্ষা করেছিলেন তার বিশদ বিবরণ চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে রয়েছে।

"মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক দিব কীর্তন না বাধিবে ॥ [চৈতন্য চরিতামৃত]

মহাপ্রভুর নিকট কাজীর শপথ গ্রহণের পর

মহাপ্রভু নিশায়ে কীর্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ ॥ [চৈতন্য ভাগবত]

এরপর কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ, শান্তিপুরে কয়েকদিন অদ্বৈত ঘরে অবস্থিতি ও নীলাচল যাত্রা। এ সময়ে তাঁর বয়স পূর্ণ চব্বিশ।

নবদ্বীপে মহাপ্রভু নামসংকীর্তনের ওপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এই নাম সূত্রেই মানুষে মানুষে যে গ্রন্থি বন্ধন হয়েছিল, তদনীন্তন জাতীয় জীবনে বাঙালীর সে এক অপূর্ব প্রাপ্তি। "চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণ"—সৎ বংশজাত সুপণ্ডিত এক ব্রাহ্মণের মুখে ব্রাহ্মণ্যের এই নূতন সংজ্ঞার উদাত্ত প্রচারে মুষ্টিমেয় গোঁড়া ব্রাহ্মণ উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও সাধারণ মানুষ সেদিন এক নূতন পথের সন্ধান পেয়েছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই উদার সমুন্নত মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তির সন্ধান পেয়েছিল। এতবড় অসাধ্য সাধন কেবল ব্যাখ্যান ও প্রচারণার দ্বারা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে কবিরাজ গোস্বামীর কথা প্রণিধান যোগ্য :—

"আপনা আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন ॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥
এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার।
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার ॥"

গৌরচন্দ্রের মানবপ্রেম অতীব স্বাভাবিক, কারণ তার ভগবান মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণ। তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নি, প্রয়োজন ছিল না বলে। অন্তরে সমুদিত তত্ত্ব তাঁর দেহে, বাক্যে, আচরণে যে সুনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করত, জনগণের নিকট তা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ অপেক্ষা বেশী মূল্যবান ছিল। বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। মহাপুরুষের জীবন সূত্র আর শিষ্যগণ ঐ সূত্রেরই ভাষ্যকার। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে মহাপ্রভুর কোন দান নেই—এই ভাবের কথার কোন মূল্য নেই।—যেমন মূল্য নেই চৈতন্যদেব পণ্ডিত ছিলেন না—ভক্তগণ তাঁকে পণ্ডিত বানিয়েছেন—ইত্যাকার কথার। মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে ছিল কোমল ও

কঠোরের সমন্বয়। প্রেমে মানুষকে তিনি যেমন মিলিয়েছিলেন তেমনি প্রচণ্ড বিক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির পরাভবের দ্বারা তাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার ক'রে ভয়হীন জীবনে তাদের প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। এই শক্তি সঞ্চারের মূল কথা 'আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চার'। এইজন্যই গৌরচন্দ্রের প্রথম পরিচয় 'সংকীর্তন ধর্মের নিধান'। আজও পশ্চিমবাংলার পল্লীতে পল্লীতে গৌর-আবাহনে নগর কীর্তনের আরম্ভ এবং 'নগর ভ্রমণ করি গৌর এল ঘরে' তে সমাপ্তি। মধ্যবর্তী পদগুলিতে গৌরচন্দ্র হরি রাধা-কৃষ্ণের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে রয়েছেন। এগুলিও আমাদের পদাবলী সাহিত্যের এক বিশিষ্ট রূপ এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষায় ও ভাবসম্পদে মূল্যবান। কীর্তন সঞ্চারী প্রেমদাতা গৌরাঙ্গের বহু সুন্দর চিত্র এগুলিতে অঙ্কিত রয়েছে।

গৌরচন্দ্র যে নগরকীর্তন, নামকীর্তন, বৃন্দাবন লীলাকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার কীর্তনেরই পুরোভাগে অধিষ্ঠান করবেন, তা একান্তই স্বাভাবিক। ভূমিকারূপী এই গৌরপদগুলিকে সাধারণভাবে গৌরচন্দ্রিকা বলাও অসঙ্গত নয়। তথাপি গৌরচন্দ্রকে নিয়ে রচিত পদমাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়, সত্যকার গৌরচন্দ্রিকার ক্ষেত্র বিশিষ্ট; সুতরাং অর্থ সেখানে যোগারূঢ়। পালাবদ্ধ রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই তার বিশেষ অধিকার। বিভিন্ন পদকর্তার রচিত পদাবলী যথাক্রমে সাজিয়ে কীর্তনীয়াগণ বিভিন্ন রাগে এবং তালে যে লীলাগান করেন, তারই নাম পালাবদ্ধ রসকীর্তন। এই জাতীয় কীর্তনের প্রারম্ভে পালার রসদ্যোতক যে গৌরপদ গীত হয়-তাকেই প্রকৃত গৌরচন্দ্রিকা বলে।

ভক্তের চোখে রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ গৌরচন্দ্র। বহিরঙ্গে তিনি রাধা, অন্তরঙ্গে কৃষ্ণ। স্বরূপ গোস্বামী রায় রামানন্দ প্রমুখ গোস্বামীবৃন্দ তাঁকে এই চোখে দেখেছিলেন। শচীমাতার দীক্ষা গুরু সবৃদ্ধ অদ্বৈত আচার্য, শচীমাতার 'সই' মালিনীর স্বামী শ্রীবাস আচার্য, অসাধারণ পণ্ডিত প্রবীণ বাসুদেব সার্বভৌম—প্রমুখ মনীষিবৃন্দ তাঁকে ভগবান বলে প্রণাম করেছিলেন। ভক্তগণ কখনো তার মধ্যে দেখতেন কৃষ্ণভাব, কখনও রাধাভাব :—

"ক্বচিৎ কৃষ্ণাবেশান্নটতি বহু ভঙ্গীমভিনয়ন্,
ক্বচিৎ রাধাবিষ্টো হরিহরিহরীত্যার্তিকলিতঃ।" [চৈতন্যচন্দ্রামৃত]

কিন্তু আমাদের চৈতন্যোত্তর পদাবলী প্রধানত অনুপ্রাণিত হয়েছে গৌরচন্দ্রের রাধাভাবে রাগানুগা ভক্তির দ্বারা। তাঁর মত অলৌকিক ভক্তের পক্ষে রাধাভাব সম্ভব। কিন্তু সাধক ভক্ত সাধারণের জন্য তাঁর উপদেশ গোপীভাব।—সখীর আনুগত্যে রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জ সেবা।

বৈষ্ণব ধর্মে গৌরচন্দ্রের অপূর্ব দান "উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রী"। এই রসরূপা ভক্তি কথা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে "তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, অন্তরতরং যৎ অয়ম্ আত্মা……আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত

(১৪।৮)।" এই প্রিয়তমকেই কান্তভাবে উপাসনা বা ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল সূত্র।

মানুষের কামক্রোধ ইত্যাদি স্বভাব ধর্ম। সীমা ছাড়িয়ে গেলে তা হয় রিপু। এদের মধ্যে কাম আদি ও প্রবলতম। কাম ও প্রেম মূলে এক। দেহসম্ভোগ বাসনার উদ্দামতায় যা রিপু, সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় যা জীবনানুকূল বৃত্তি, দেহানুগ অথচ সূক্ষ্ম সুন্দর ভাব কল্পনায় সমৃদ্ধ সুকুমার রূপে যা মানবীয় প্রেম, তাই দেহাতিক্রান্ত দিব্যপ্রীতিতে ভগবৎ প্রেম। সকল সাধনারই গোড়ার কথা কামজয়। কিন্তু জয় করবার পথ বিভিন্ন। রাজযোগের ভূমিকা কামের অস্বীকৃতিরূপ ব্রহ্মচর্যে। তন্ত্রযোগে কাম স্বীকৃত। কিন্তু উপায়রূপে উপেয়রূপে নয় অর্থাৎ সাধনরূপে সাধ্যরূপে নয়। সহজিয়া ধর্মের প্রকৃতি ভজনে কাম স্বীকৃত ঐ সাধনরূপে। তান্ত্রিকের তথা সহজিয়ার সাধ্য বস্তু মুক্তি। কাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনায় স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন নির্মল ভাবমাত্রে রূপান্তরিত। পূর্বোক্ত সাধনা দুটি থেকে গৌড়ীয় সাধনার পার্থক্য এই যে, এতে কামই সর্বস্ব, একমাত্র সাধ্য বস্তু পঞ্চম পুরুষার্থ। ভাববৃন্দাবনে কান্তকৃষ্ণের সঙ্গে কান্তরূপে ভক্তের বিপ্রলম্ভ সম্ভোগাত্মক নিরবচ্ছিন্ন প্রেমানন্দই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের একমাত্র কাম্য। প্রেম ও কৃষ্ণ এক। মুক্তিকে তাঁরা ঘৃণা করে।—"ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম।" (চৈতন্ত চরিতামৃত)। গৌতমীয় তন্ত্রে গোপীপ্রেমকে কামই বলা হয়েছে। "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম" এবং চরিতামৃতকার বলেছেন—

"সহজে গোপীর প্রেমে নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই 'অপ্রাকৃত কাম' যাকে সমর্পণ করেন, সে 'রসঃ বৈ সঃ' শ্রীকৃষ্ণ; সেই "অপ্রাকৃত নবীন মদন"। রাধাভাবে ভাবিত জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে যখন অন্তর্বৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন, তখন দ্বৈতভাবের ক্ষণিক বিলোপ ঘটে। এর আংশিক আভাস রয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪।৩২৪ : প্রিয়া স্ত্রীর দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের যেমন বাহ্য বা আন্তর কোন ভেদ থাকে না, প্রাজ্ঞ আত্মার দ্বারা আলিঙ্গিত পরমাত্মারও তেমনি বাহ্য বা আন্তর কোন ভেদ থাকে না। এ অবস্থায় কামনার যেমন চরম প্রাপ্তি তেমনি আবার সর্ব কামনার শেষ। (যথা প্রিয়য়া স্ত্রীয়া সংপরিষ্বক্ত ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম্; এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ, ন আন্তরম; তদ্ বা অস্য এতৎ আত্মকামম্ আপ্তকামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্)। বলা বাহুল্য যে, জীবাত্মা এখানে প্রিয়া অর্থাৎ কান্তারূপে কল্পিত এবং এ অবস্থায় ভেদজ্ঞান প্রিয়ারও থাকে না। এই উপলব্ধি গৌরচন্দ্রের ছিল বলে তিনি রায় রামানন্দের প্রেমবিলাস বিবর্তের পদে রাধার উক্তি।—

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভাব পেষল জানি ॥

শুনে স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদিল, কারণ এখানেই প্রেমের শেষ সীমা।
—'সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়' (চরিতামৃত)।

গৌরচন্দ্র ছিলেন রাধাভাবে ভাবিত। তাঁর সুকুমার স্বর্ণকান্ত তনু রাধার কল্পিত তনুর অনুরূপ ছিল বলে বহিরঙ্গে তাঁকে রাধা রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁকে "রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার, নিজ রস আস্বাদিতে" অবতীর্ণ "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ" বলা হলেও এর তাৎপর্য বোধহয় তার রাধাভাবে ভাবিত প্রেমসাধনারই ইঙ্গিত বহন করে। 'ভাবিত' শব্দের পারিভাষিক অর্থ 'বাসিত'। রাধার রাগের আনুগত্যময়ী প্রেমসাধনায় রাধার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মানস সান্নিধ্যে গৌরচন্দ্র রাধার ভাবসুরভিতে সুরভিত, ভাবরসে রসান্বিত হয়েছিলেন। এ অবস্থা মনোবিজ্ঞান সম্মত। বৃন্দাবন লীলায় রহস্যলোকে তিনি প্রবেশ করেছিলেন বলে অধিকারী ভক্তকে তিনি পথের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন। গ্রন্থ রচনার দ্বারা নয়, সভায় সভায় বক্তৃতা ক'রে আপন জীবনে প্রকটিত ক'রে 'আপনি আচরি' তিনি 'স্বভক্তিশ্রী'র 'উন্নতোজ্জ্বলরূপ' দেখিয়েছিলেন। এই ভাবের ভক্তি 'অনর্পিতচারী' ছিল—তার পূর্বে ভক্তিধর্মের কোন প্রবর্ত্তয়িতাই ভগবদ্-বিষয়িনী রতিকে এমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থরূপ অদ্ভুত শৃঙ্গার রসে পরিনমিত করতে পারেন নি।

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ পথ গতঃ কস্য ? নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা ? কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ ?
কো বা জানাতি রাধাং পরম রস চমৎকার মাধুর্যসীমাম ?
একশ্চৈতন্য চন্দ্রঃ পরম করুণয়া সর্বমাবিশ্চকার ॥"

—প্রবোধানন্দ সরস্বতীর এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। একখানি বাংলা পদেও এর অনুরসণ রয়েছে :—গৌরাঙ্গ না হইলে ('গৌর নহিত')

"রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানিত কে ॥
মধুরবৃন্দাবিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার ॥" —বাসু ঘোষ

রাধাভাবে ভাবিত গৌরচন্দ্রের ভাবসম্পাদনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাঁর ভক্তমণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পূর্বে বলা হয়েছে মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভের বিগ্রহ। তবু, পূর্বরাগাদির প্রকাশ লক্ষিত হলেও, যা সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল তা বিরহ বিপ্রলম্ভ। তাঁর নীলাচল জীবনের শেষ বার বৎসর একপ্রকার বিরহ দিব্যোন্মাদেই কেটেছিল।

"শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর ॥

নিরন্তর রাত্রি দিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিষাদে॥ —চরিতামৃত

অন্ত্যলীলায় কৃষ্ণদাস এই দিব্যোন্মাদের অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের অন্যতম ছিলেন সুধাকণ্ঠ কীর্তন গায়ক মুকুন্দ। মুকুন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল সময়-উচিত কীর্তন গান। কৃষ্ণদাস বলেছেন—

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে॥"

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'ভাবের সদৃশ' 'সময় উচিত' ও 'পদ'। কীর্তন গানকে 'পদ' বলা কৃষ্ণদাসের সময়ে নয়, তারও পূর্ববর্তী প্রথম চরিতকার বৃন্দাবন দাসের সময়েও প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাস স্বরচিত গান সম্পর্কে বলেছেন 'যথা রাগঃ'; কিন্তু মহাজনের গান উদ্ধার করে লিখেছেন "যথা হি পদম"। বৃন্দাবনদাসও মধ্যখণ্ডে লিখেছেন "শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীর্তন"। 'সময় উচিত' ও 'ভাবের সদৃশ' বলতে বোঝায় গৌরচন্দ্র বিচিত্র প্রেমধারার যে বিশেষরূপের দ্বারা আবিষ্ট হতেন, তার অনুরূপ গোপীপ্রেমের পদ। এগুলি গৌরচন্দ্রিকার বিপরীত। কারণ এ সকল গৌরভাবের সদৃশ রাধাভাবের পদ এবং গৌরচন্দ্রিকা রাধাভাবের সদৃশ গৌরভাবের পদ। অদ্বৈত গৃহে মহাপ্রভু যে বিরহার্ত রূপটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'হা হা প্রাণ প্রিয় সখী' ইত্যাদি পদ গেয়েছিলেন সেই রূপটিই গৌরচন্দ্রিকা, কিন্তু অলিখিত অর্থাৎ ভাষায় আরোপিত নয়। ঐ রূপগুলিরই মধ্যে নিহিত ছিল গৌর সমকাল থেকে রচিত গৌরচন্দ্রিকার বীজ। উত্তরকালের পালাকীর্তন তখন না থাকলেও একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, একই রসের পদ সমষ্টি আমাদের অপরিচিত সুরে ও তালে গাইবার প্রথা তখনও বর্তমান ছিল।

গৌরচন্দ্রের প্রেমবৈচিত্রীর যাঁরা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা তাঁদের অনেকে—মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব-মাধব-গোবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি—তাঁর ভাব-বিলাসের প্রতিটি রূপ নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত করেছেন। ঐ চিত্ররাজিকে আশ্রয় ক'রে পরবর্তীকালে বহু মহাজন অজস্র পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টিতে গৌরচন্দ্র একাধারে রাধা ও কৃষ্ণ। উভয়ভাবেরই গৌরপদ রচিত হয়েছে। তবু ভক্তিকে শুদ্ধসত্ত্ব উজ্জ্বল রসরূপে বৈকুণ্ঠের 'স্ত্রী' বা লক্ষ্মীকে বৃন্দাবনের রাধারূপে—সমর্পণের উদ্দেশ্যেই তাঁর আবির্ভাব বলে তাঁর মধ্যে রাধাভাবই অধিকতর স্ফুর্তিলাভ করেছে। এইভাবে কৃষ্ণ তাঁর কান্ত। কান্ত কৃষ্ণের সহিত কান্তা গৌরচন্দ্রের অনবচ্ছিন্ন মানসপ্রেমলীলা। ভবসিন্ধু কখনও স্তব্ধ, কখনও ঊর্মিচপল, কখন তরঙ্গে উদ্বেলিত। মূর্চ্ছায়, অশ্রুহাস্যে, দিব্যোন্মাদে তার বিচিত্র বহিঃপ্রকাশ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ধারা প্রাক্‌চৈতন্যযুগের বহু আগে থেকেই বাংলাদেশে বহমান থাকায়, বিশেষ ক'রে বৈষ্ণব বাঙালীর তা পরিচিতই ছিল। জয়দেব চণ্ডীদাস একদিকে যেমন ঐ ধারারই রূপকার অন্যদিকে তেমনি তার শক্তিসঞ্চালক ও রসপোষ্টা।

এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন 'মৈথিল কবি' বিদ্যাপতি—শৈবদেশের বাঙালীহৃদয় বৈষ্ণবকবি। বাঙালী বৈষ্ণবের রসবোধ জাগ্রত ছিল বলেই গৌরচন্দ্রের বিচিত্র ভাবলীলার কোনটিতে বৃন্দাবনলীলার কোন বিশেষরূপটির ব্যঞ্জনা রয়েছে তা তাঁরা অনায়াসেই বুঝেছিলেন। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের অনেকেই ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত—পূর্বরাগ ইত্যাদি পারিভাষিক নামগুলি তাঁদের জানা ছিল। তা না হলে ভাবের সদৃশ পদ গান করা মুকুন্দের পক্ষে সম্ভব হত না। সহজ কথায় গৌর-লীলা বৃন্দাবন লীলার ভাবপ্রতিরূপ। এই গৌরলীলার প্রতিটি স্পন্দন বাঁধা পড়েছে গৌরপদাবলীতে। এই সকল পদের নাম গৌরচন্দ্রিকা। রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের অবতরণিকা রূপে এই পদ কীর্তনের আসরে প্রথমেই গীত হয়। মর্মজ্ঞ শ্রোতা এই গৌরচন্দ্রিকা শুনামাত্র বুঝতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন পর্যায়টি বর্তমান আসরের বিষয়বস্তু।

> "আজ হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ।
> করতলে বয়ান করই অবলম্ব॥
> খনে খনে গতাগতি করু ঘর পন্থ।
> খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত॥"

—এই গৌরচন্দ্রিকায় শ্রোতার মানসনয়নে যে চিত্রখানি ফুটে ওঠে তা পূর্বরাগে ভাবান্তরিতা রাধার চিন্তা-ঔৎসুক্য-উদ্বেগের চিত্র। রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনাময়ী এই 'আখর' দিতে দিতে কীর্তনীয়া অবলীলাক্রমে প্রবেশ করে বৃন্দাবনলীলায়:

> "ঘরের বাহিরে   দণ্ডে শতবার
> তিলে তিলে আইসে যায়।
> মন উচাটন   নিশাস সঘন
> কদম্বকাননে চায়॥"

হিরণ্যদ্যুতি কমনীয় তনু, সন্ন্যাসীর পুণ্যজীবনের শুদ্ধপ্রেমপূত লীলাকে এইভাবে ভূমিকারূপে উপস্থাপিত ক'রে গায়ক এমন একটি পরিমণ্ডল রচনা করেন যা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তির স্পর্শাতীত। শ্রোতার মন অন্ততঃ সাময়িকভাবে, এক অপূর্ব নির্মলতা লাভ ক'রে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে মুক্তি পায়। এখানেই কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রিকার সার্থকতা।

কৃষ্ণভাব নিয়ে রচিত গৌরপদও বহুসংখ্যক। এদের মধ্যে অনেকগুলি গৌর-চন্দ্রিকারূপে গীত হয়। কিন্তু এই গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োগক্ষেত্র একদিকে যেমন ব্যাপক অন্যদিকে তেমনি সঙ্কুচিত। ব্যাপক এই অর্থে যে, প্রেমলীলার বহিঃক্ষেত্রে অর্থাৎ কৃষ্ণের শৈশবলীলা, বাল্যলীলা প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এগুলি প্রযুক্ত হয়। রস সেখানে বাৎসল্য, সখ্য ইত্যাদি। কৃষ্ণের নৃত্য-খেলা-ননীচুরি, পূর্বগোষ্ঠ, কালিয়দমন, উত্তরগোষ্ঠ প্রভৃতির গৌরচন্দ্রিকায় গৌরের কৃষ্ণভাব। আবার প্রেমলীলার ক্ষেত্রে সঙ্কুচিতভাবে বিশেষ বিশেষ পালাকীর্তনে, যেমন দানলীলা, নৌকাবিলাস, প্রভৃতিতে গৌরচন্দ্রিকা কৃষ্ণভাবের। বিপ্রলম্ভের বিশেষতঃ মাথুর বা বিরহের গৌরচন্দ্রিকায়

মহাপ্রভুর মুখ্যতঃ রাধাভাব। কিন্তু গৌণভাবে কৃষ্ণভাবও ক্ষেত্র বিশেষে আরোপিত হয়। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পারিষদগণের মধ্যে গোবিন্দ ঘোষের—

"হেদেরে নদীয়া বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরা চান্দেরে ফিরাও ॥"

—পদটিতে সন্ন্যাস নিয়ে গোরাচাঁদের নদীয়া ত্যাগে নদীয়াবাসীর বেদনা কৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগে ব্রজবাসীর বেদনার অনুরূপ। লক্ষণীয় যে, এই গৌরচন্দ্রিকা-খানিতে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার নেই। তবু এই জাতীয় পদ "প্রবাসরসেন পূর্বাপরগেয়ম্"। গোবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাসু ঘোষের—

"হরি হরি গোরা কোথা গেল।...
ফুকারি কান্দিতে নারে চোরের রমণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা মুখ খানি ॥" পদকল্পতরু (১৬৩৮)

মাথুরের গৌরচন্দ্রিকা। এখানে 'গোরা' শুদ্ধ কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের মিলিতরূপ নন। বরং ব্রজগোপীর ভূমিকায় 'নদীয়ানাগরী'। আখর দিতে দিতে কীর্তনীয়া আরম্ভ করবেন—

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুলমাণিক কো হরি নেল ॥"

রস এখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার, নায়ক গৌরকৃষ্ণ; কিন্তু নায়িকা 'নদীয়ানাগরী'। সকল গৌরপদই গৌরচন্দ্রিকা নয়।

॥ বৈষ্ণব পঞ্চরস বিচার ॥

মানুষ কতকগুলি মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই মনোবৃত্তির ধ্বংস নেই। শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ প্রভাব এগুলির প্রকাশকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কিন্তু বিনষ্ট করতে পারে না। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিরন্তন বলা হয়। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রমতে স্থায়ী ভাবের সংখ্যা আট—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, ও বিস্ময়। এগুলি আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে বর্তমান থাকে। উদ্বোধনের কারণ ঘটলে এগুলি আমাদের চেতনায় আবির্ভূত হয় এবং আমাদের দেহে বা আচরণে তার অভিব্যক্তি ঘটায়।

কাব্যে বিভাব অনুভাব ও ব্যাভিচারী ভাবের সংযোগে এই স্থায়ীভাব রসপরিণতি লাভ করে। সুতরাং রসের সংখ্যাও আট এবং তাদের যথাক্রমিক নাম শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত।

সাধারণ অলঙ্কার শাস্ত্রে 'রতি' স্থায়ীভাবের আস্বাদনীয় বিপরিণাম শৃঙ্গার রস। নায়ক ও নায়িকা সেখানে আলম্বন বিভাব। বৈষ্ণব আলংকারিক রতির অর্থ

সম্প্রসারণ করে তার রসপরিণতি অন্যভাবে দেখিয়েছেন। কিন্তু এই অর্থ সম্প্রসারণ তাঁরা জোর করে করেন নি। সাহিত্য দর্পণে তার বীজ রয়েছে। বিশ্বনাথের সংজ্ঞায় প্রতি মানবমনের সহজ অনুরাগই রতি। বৈষ্ণবের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তাঁদের রতি লৌকিক নয়, 'কৃষ্ণরতি'। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হলেও স্বরূপে রস একটি মাত্র—'ভক্তিরস'। রূপ গোস্বামী তাঁর ভক্তি-রসামৃত সিন্ধুতে বলেছেন—"বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্বি কৈর্ব্যভিচারিভিঃ। স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীত শ্রবণাদিভিঃ। এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥" অর্থাৎ শ্রবণ কীর্তন স্মরণ ইত্যাদি দ্বারা জাত স্থায়ীভাব 'কৃষ্ণরতি' বিভাব-অনুভাব-সাত্ত্বিকভাব-ব্যাভিচারী ভাবের দ্বারা ভক্ত হৃদয়ে আস্বাদ্য অবস্থায় আনীত হলে তা ভক্তিরস হয়ে যায়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি পাঁচ ভাবে হতে পারে। এই পাঁচ প্রকার রতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (শৃঙ্গার, উজ্জ্বল)।

(১) **শান্তরস :**—শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব ঐশ্বর্যশালী নিত্য বস্তুরূপে জেনে ভক্ত বিষয় বাসনা বর্জন পূর্বক ঐকান্তিক নিষ্ঠায় তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। এ অবস্থায় ভক্ত-ভগবানে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না। এতে স্থায়ীভাব সম নামে রতি। এই রতিতে 'সুতমিত রমণী সমাজ' 'তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম' ক্ষণস্থায়ী। এই অনিত্য বস্তু থেকে মনকে প্রত্যাহৃত ক'রে ভক্ত সমর্পণ করেন নিত্য ভগবানে—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত সাগরলহরী সমানা।"

বিদ্যাপতির এই প্রার্থনা পদটিতে রস শান্ত হলেও এতে গৌড়ীয় বিরোধী মুক্তি কামনা আছে—'তারণ ভার তুহারা'। প্রাক্ চৈতন্যযুগের পক্ষে এটি স্বাভাবিক।

(২) **দাস্যরস :**—ভগবান্ প্রভু, ভক্ত তাঁর ভৃত্য; ভগবান্ ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। এখানে স্থায়ীভাব সেবা নামে রতি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপই ভক্ত মনকে আকর্ষণ করে। এবং তাঁর সেবা ক'রে ভক্ত কৃতার্থ হতে চায়। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণ নিষ্ঠা বর্তমান, অধিকন্তু সেবা। সেবায় ভক্তভগবানে ঈষৎ মমত্ব সম্পর্ক জেগে ওঠে। মীরার 'চাকর রাখো জী' এই সূত্রে স্মরণীয়। নরোত্তম দাসের 'সেবা দিয়া কর অনুচর...' 'তু মেরে হৃদয়ক রাজা' পদখানিতে দাস্যের ভাব রয়েছে। শুদ্ধ শান্ত বা দাস্যরসের পদ চৈতন্যোত্তর যুগে নেই।

(৩) **সখ্যরস :**—ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এখানে বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার সম্পর্ক। শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা, দাস্যের সেবাও এতে বর্তমান। অধিকন্তু সমপ্রাণতা। সেবা কিন্তু শুধু ভক্তই করেন না, ভগবানও ভক্তের সেবা করেন। এতে স্থায়ীভাব 'বিশ্রম্ভ' (সংকোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস) নামে রতি।

"সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করয়ে সুখে।
ভাল ভাল ক'রে মুখ হ'তে লয়ে সভে দেয় কানু মুখে ॥"—বিশ্বম্ভর

"কানাই হারিল আজি বিনোদ খেলায়।
সুবলে করিয়া কান্ধে বসন আটিয়া বান্ধে
বংশী বটতলে লইয়া যায় ।"—বলরাম দাস

বলা বাহুল্য, সখ্যরসে কৃষ্ণে ঐশ্বর্যভাব ভক্ত মনে থাকে না।

(৪) **বাৎসল্যরস**:—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের এখানে পাল্য-পালক সম্পর্ক। ভগবান সন্তানভক্ত মাতা (বা পিতা)। এতে শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ, অধিকন্তু লালন মমতাধিক্য বর্তমান। প্রয়োজন হলে তাড়ন ভর্ৎসনাও ভক্তের অঙ্গরূপে দেখা দেয়। এর স্থায়ীভাব 'বৎসলতা' নামে রতি।

"বিপিনে গমন দেখি হ'য়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥
এ দু'খানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখুন তায়,
জানু রক্ষা করুন দেবগণ।
কটিতট সুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥"—দ্বিজমাধব

মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় নিরন্তর কম্পমান। মাতা যশোমতী যাঁর 'সর্ব অঙ্গে হাত দিয়া' রক্ষা মন্ত্র পাঠ করছেন তিনি সর্বমঙ্গলময় ভগবান। কিন্তু এ জ্ঞান থাকলে তো বৎসলতা সম্ভবপর হয় না। পদকর্তা মাতৃহৃদয়ের সহজ রূপটিই চিত্রিত করেছেন।

(৫) **মধুররস**:—ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব—এই পাঁচটির গভীর এবং আতিশয্যময় মিলনে মধুর রস। এতে স্থায়ীভাব 'মধুরা' নামে রতি।

শান্তে ভগবানকে ভালবাসার প্রশ্নই ওঠে না। ভালবাসার সূচনা দাস্যে। এবং সখ্য বাৎসল্যের ভিতর দিয়ে চরম পরিণতি মধুরে।

এই মধুরা রতির তিনটি প্রকারভেদ—সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। 'সমর্থা' সর্বশ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণের রূপলাবণ্য দর্শনে তাঁর সঙ্গলাভে নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করবার ঐকান্তিক বাসনা থেকে যে রতি ভক্ত হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় তার নাম 'সাধারণী'। কৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণে শাস্ত্রসম্মত পরিণয় বন্ধনের দ্বারা পারস্পরিক সঙ্গ সুখলাভের বাসনা থেকে যে রতি ভক্ত হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হয় তার নাম 'সমঞ্জসা'। ভক্ত হৃদয়ে যে কৃষ্ণ রতি স্বতঃসিদ্ধ ভগবানের (ভক্তের নিজের নয়) তৃপ্তিসাধনই যার একমাত্র

লক্ষ্য, যার কাছে সংসার সমাজ সব মিথ্যা হয়ে যায়, যার প্রভাবে ভগবান ভক্তের বশীভূত হন, তাই 'সমর্থা' রতি। মথুরায় কুব্জার রতি সাধারণী, দ্বারকায় রুক্মিণী, সত্যভামার রতি সমঞ্জস। বৃন্দাবনে ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী ও রাধার রতি সমর্থা—এঁরা কৃষ্ণের 'নিত্য প্রিয়া'। এই নিত্য প্রিয়াগণের শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী এবং রাধা এবং এই দুইজনের মধ্যে উচ্চতর আসন রাধার।

সুতরাং বলা যেতে পারে বৈষ্ণবীয় শৃঙ্গার রসের বৃন্দাবন লীলায় স্থায়ীভাব 'সমর্থা' নামে মধুরা রতি, নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলী। কিন্তু রাধা আয়ানের এবং চন্দ্রাবলী গোবর্দ্ধনের পরিণীতা বলে কৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া নায়িকা।

এ পরকীয়া লৌকিক পরকীয়া নয়। সম্পর্ক যেখানে ভক্তে ও ভগবানে, লৌকিকের প্রশ্নই সেখানে ওঠে না।

'সমর্থা' রতির মধ্যেই পরকীয়ার বীজ নিহিত রয়েছে। যে প্রেমের পথে বাধা নেই সে প্রেমের তীব্রতা নেই। স্বকীয়ার প্রেম বৈচিত্র্যহীন। সমর্থা রতি 'সান্দ্রতমা' (নিবিড়তমা), 'সর্ব বিস্মারি গন্ধা' অর্থাৎ 'কুলধর্ম লোকলজ্জাদি' সবকিছুকে বিস্মরণীয় অতলে ডুবিয়ে অর্থহীন ক'রে তোলাই এর স্বভাব। কোন ভাবান্তরের দ্বারা এর লেশমাত্র রূপান্তর হয় না। স্বকীয়ায় এই রতি সম্ভবপর নয়।

"গুরুগরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার।
নয়নের ধারা মম বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সব করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

পরকীয়ায় এই রতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। চণ্ডীদাসের—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥"

এই পদ যে রতিকে দিব্যোন্মাদের দ্বার প্রান্তে উপনীত করেছে, তা পরকীয়া রাধার সমর্থা রতি।

বৈষ্ণবের এই পরকীয়াবাদ যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা দার্শনিক। রাধাকৃষ্ণ লৌকিক নারী পুরুষ নন। শৃঙ্গার রসে পরকীয়া নায়িকা আমাদের অলংকার শাস্ত্রেরও অনুমোদিত নয় ("ন অন্যোঢ়া"—দশরূপক; পরোঢ়া বর্জয়িত্বা—সাহিত্য দর্পণ। ঊঢ়া বিবাহিতা)। লৌকিক অলংকার শাস্ত্রের এই অনুমোদন ব্রজগোপী

ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য নয়—তারও ব্যাখ্যা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ; নরাকার ভগবান্। 'সৎ' এর শক্তি 'সন্ধিনী', চিৎ এর শক্তি 'সম্বিৎ' এবং আনন্দের 'হ্লাদিনী'। ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী-রাধা সকলেই হ্লাদিনীর মানবীরূপ। হ্লাদিনীর সার অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ রাধিকা। সংক্ষেপে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অর্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আপন আনন্দকেই অভিনব উপায়ে আস্বাদন (নিজের রচিত কবিতা কবি যেমন আস্বাদন করেন, কতকটা সেইরকম—তুলনাটি দুর্বল; অনির্বচনীয়কে বচনে বোঝাবার প্রয়াস বলে; কেবল ব্যঞ্জনাটুকু এখানে নিতে হবে)। লৌকিক সম্পর্কগুলি মায়িক—শ্রীকৃষ্ণেরই সম্বিৎ-শক্তির অন্যতম বিকার 'যোগমায়ার' সৃষ্টি। তত্ত্বের দিক থেকে রাধাকৃষ্ণ স্বশক্তিরই অভিব্যক্তি বলে স্বকীয়া এবং লৌকিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ মায়িকভাবে আয়ানবধূ রাধা কৃষ্ণের পরকীয়া। জীব রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শের সহস্র বন্ধনে বাঁধা বলে জগতের স্বকীয় ভগবানের পরকীয়। ভগবানের আহ্বানে সাড়া দিতে হলে জীবকে সংসার বন্ধন তুচ্ছ ক'রে বের হতে হবে। একে বলা হয় পরকীয়ার অভিসার। বৈষ্ণব দর্শনের মতে জীবমাত্রই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কৃষ্ণের আনন্দ শক্তির অংশ। কিন্তু মায়াপ্রভাবে আপন স্বরূপ সম্বন্ধে অচেতন। সাধনার দ্বারা চেতনার জাগরণ সম্ভব বলে প্রত্যেকের মধ্যে আংশিক গোপী সম্ভাব্যতা বর্তমান।

রাধার ও ললিতা-বিশাখা ইত্যাদির কৃষ্ণরতি স্বভাবসিদ্ধ বলে তাঁদের সাধ্যভক্তি। জীবের কৃষ্ণভক্তি সাধনা-সাপেক্ষ বলে তা সাধনভক্তি। সাধনভক্তির প্রথম স্তর পরম্পরা বৈধী অর্থাৎ শাস্ত্র বিধান অনুযায়ী শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন (কৃষ্ণে পদসেবা নয়, তীর্থাদি যাত্রা), অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, আত্মনিবেদন ("শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"—ভাগবত ৭।৫।১৮)। এই ভাবের সাধনায় চিত্ত পরিমার্জিত ও নির্মল হলে সেখানে প্রেমের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রেমোদয়েই কান্তভাবের সূচনা। এরপর থেকে গোপীর অনুগত পন্থায় চলে কান্তভাবের সাধনা।

স্বতঃ উৎসারিত প্রেমে সহজচ্ছন্দে কৃষ্ণ ভজনের জন্য গোপীর ভক্তি রাগাত্মিকা। গোপীর এই 'রাগ' জন্মসিদ্ধ সাধনলব্ধ নয়:—"শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে পরাণে পরাণে নেহা"—চণ্ডীদাস। যে প্রেমে ভক্ত হৃদয়ে দুঃখও সুখরূপে ব্যঞ্জনা লাভ করে, সেই পরিণত প্রেমের নাম রাগ। চণ্ডীদাসের রাধার—

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

—এই রাগের নিদর্শন। এই রাগ গোপীর কৃষ্ণ ভক্তির অন্তরাত্মা বলে তার ভক্তি রাগাত্মিকা। জীবের রাগ স্বভাবজ নয়, সাধনলব্ধ গোপী তার আদর্শ।

জীবের সাধনা চলে গোপীর প্রেমভক্তির রাগের অনুসরণ পন্থায়। গোপী গুরু, জীব শিষ্য। গোপী সিদ্ধ, জীব তার অনুগত সাধক।—সুকঠিন মানসতপশ্চারী। এই কারণে জীবের ভক্তি রাগানুগা। নরোত্তম দাসের—

"দুই মুখ নিরখিব দুই অঙ্গ পরশিব
সেবা করিব দোঁহাকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।
কনক সম্পুট করি কর্পূরতাম্বুল ভরি
যোগাইব অধর যুগলে ॥"

—রাগানুগা ভক্তির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী। তাঁর মত লোকোত্তর ভক্তের পক্ষে তা সম্ভব। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণের ভজনা প্রকৃতপক্ষে গোপীভাবের, রাধাভাবের নয়, যদিও রাধা গোপীগণেরই অন্যতমা। গোপীভাবে ভজনার অর্থ শ্রীরাধার সখী ললিতা বিশাখা প্রভৃতির আনুগত্যময়ী রাধাকৃষ্ণের সেবারূপা।

স্থূল বিচারে মধুর রসের নায়িকা ব্রজগোপী মাত্রেই; কারণ এ রসের আলম্বন বিভাব শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর প্রেয়সীবৃন্দ এবং প্রেয়সী ললিতা বিশাখা রাধা প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনা। তবু, নায়িকা রাধা, যেহেতু তিনি হ্লাদিনীর সারভূতা, সর্বগুণসম্পন্না, 'মাদন' নামক ভাবের একমাত্র অধিকারিণী, মহাভাবময়ী। চন্দ্রাবলী প্রতিনায়িকা, রাধার অনুরূপ গুণশালিনী বলে। অন্য গোপীগণ কৃষ্ণপ্রিয়া হয়েও লীলাবিস্তারিকা সখীর অপূর্ব পদবী লাভ করে আছেন।

অন্য ভাবের বিচারে বলতে হয় যে নিখিল ভক্তের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতীক এবং মধুর রসের সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় শ্রীরাধা। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখী 'আরাধিকা' রাধিকার ভক্তিমুখী বিচিত্র চিত্তবৃত্তিরই মূর্তিমান বিগ্রহ, শ্রীরাধারই 'কায়ব্যূহ'। চরিতামৃতের 'কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ' এর তাৎপর্য এই।

তত্ত্ব যাই হোক, সখীহীন রাধাকৃষ্ণপ্রেম বৈচিত্র্যহীন লীলা অভিধার যোগ্য নয়। এই কারণে বৈষ্ণবমতে সখী 'লীলাবিস্তারিকা'। লৌকিক প্রেমের নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলে' অনসূয়া প্রিয়ংবদাহীন শকুন্তলা-দুষ্মন্ত-প্রেম বর্ণহীন হয়ে যেত—নাটকই সম্ভবপর হত না। ভাগবতে নায়িকা নেই, সুতরাং সখী নেই। কিন্তু তাই বলে সখী গৌড়ীয় বৈষ্ণবের কল্পনা নয়। প্রাক্ চৈতন্য যুগের জয়দেবে সখী আছে। 'রাধাপ্রেমামৃতে' সখী আছে, বিদ্যাপতিতে সখী আছে এমন কি 'রাধাতন্ত্রে', 'পদ্মপুরাণে ললিতা-বিশাখাদি পরিচিত নাম সহ সখী আছে। রূপগোস্বামী বিশাখা ললিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখেছেন "শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাঃ", এই 'শাস্ত্র' সম্পর্কে জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টীকায় ভবিষ্যপুরাণ স্কন্দ পুরাণাদির নাম করেছেন। 'রাধাতন্ত্র'কে প্রাক্‌চৈতন্যযুগের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে বসন্তরঞ্জনও

গ্রহণ করেছেন তাঁর বড়ু চণ্ডীদাসের নূতন সংস্করণে। সতীশচন্দ্রের "ললিতা-বিশাখা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ণব ধর্মরূপ কল্পতরুর পরবর্তী শাখা প্রশাখা"—এই বিদ্রূপগূঢ় উক্তিটি তথ্যসম্মত নয়।

'মধুর' ও 'উজ্জ্বল' শৃঙ্গার রসেরই নামান্তর। শৃঙ্গার রসের দুটি ভেদ: বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস এই চারটি বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক্।

মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শনাদির দ্বারা নায়ক নায়িকার চিত্তে উদ্বুদ্ধ রতি যখন বিভাবাদির সংযোগে আস্বাদনীয় অবস্থা লাভ করে, তখন তার নাম হয় পূর্বরাগ। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি', 'যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি' রাধার ও কৃষ্ণের রূপদর্শনজাত পূর্বরাগ। 'কেবা শুনাইল, শ্যাম নাম' রাধার কৃষ্ণনাম শ্রবণজাত পূর্বরাগ।

প্রতিনায়িকাকে নায়ক যদি উৎকর্ষ দেন, তাহলে নায়িকার মনে যে ঈর্ষাজনিত রোষের উদ্ভব হয়, তারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম 'মান'। 'ধনি ভেলী মানিনী' প্রভৃতি পদ এই সূত্রে স্মরণীয়।

প্রেমের গভীরতার ফলে প্রিয় সন্নিকর্ষে থেকেও বিরহবোধ-জনিত যে বেদনা, তারই আস্বাদযোগ্য অবস্থার নাম 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। 'নাগর সাজ রাজ যব বিলসই'—এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

দেশান্তর গমনাদি কারণে বিচ্ছিন্ন নায়ক নায়িকার হৃদয়ে যে বিরহ বেদনার সৃষ্টি হয় সেই বেদনার আস্বাদ্য অবস্থা 'প্রবাস'। মাথুর অংশের পদগুলি এর উদাহরণ।

এগুলির প্রত্যেকটি বিপ্রলম্ভ নামক শৃঙ্গার রস। এগুলি কেবলমাত্র ভালবাসা রোষ বেদনাবোধ নয়, পরন্তু উপযুক্ত বিভাব অনুভাব সঞ্চারীভাবের সংযোগে তাদের আনন্দময় সংগীতরূপ। আমাদের এই পদাবলী কাব্য, বস্তুজগতের সাধারণ ঘটনা নয়।

সম্ভোগ নায়ক নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় ভাব। এটিও বাস্তব নয়, কাব্যগত। বৈষ্ণবশাস্ত্রে বহুপ্রকার সম্ভোগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ'। এর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। রাধা পরকীয়া বলে পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে বৃন্দাবন লীলায় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ কল্পনা করা কঠিন। রূপগোস্বামী 'ললিত মাধব' নাটকে বৃন্দাবনের রাধাকে মায়িক ভাবে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে সত্যভামায় রূপান্তরিত করে মহারাজ কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছেন। পরকীয়াকে স্বকীয়া ক'রে তবে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ দেখিয়েছেন।

বিপ্রলম্ভেই সম্ভোগ পুষ্ট হয়, সার্থক হয়। এই কারণে রসব্যঞ্জনায় সম্ভোগ অপেক্ষা অনেক উচ্চ আসন বিপ্রলম্ভের। বৈষ্ণব মহাজনগণ অভিসারের পর মিলন, দানলীলা, নৌকাবিলাস, মানান্তে মিলন প্রভৃতি উপলক্ষে সম্ভোগের অনেক সুন্দর

পদরচনা করেছেন। কিন্তু সত্যিকারের কাব্য সৃষ্টি করেছেন বিপ্রলম্ভের পদে। এই জাতীয় পদের সংখ্যাও যেমন অত্যধিক, কাব্যোৎকর্ষও তেমনি সীমাহীন। স্থূলবিচারে সম্ভোগ মিলনসুখ ও বিপ্রলম্ভ মিলনের অভাবজনিত বেদনাবোধ। বাস্তবসুখ যখন সাহিত্যিক আনন্দময়তা অর্থাৎ রসরূপতা লাভ করে, তখন অবশ্যই তাতে বৈচিত্র্য থাকে। কারণ সাহিত্য বস্তুর অনুকৃতিমাত্র নয়, ব্যঞ্জনাময় মানসপ্রকাশ। কিন্তু দুঃখকে রসোত্তীর্ণ করার অর্থাৎ নির্মল আনন্দরূপে পরিণতি দান করার মধ্যেই কবির কৃতিত্ব—এখানেই কবি সত্যিকারের স্রষ্টা, 'কবিরেক প্রজাপতিঃ'।

এবার নায়িকার 'অষ্ট অবস্থা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক—

(১) অভিসারিকা : প্রিয় মিলনার্থে সংকেত কুঞ্জাভিমুখে যাত্রাকারিণী।

(২) বাসরসজ্জা : মিলনের উদ্দেশ্যে নিজদেহ সজ্জায় ও সংকেত গৃহসজ্জায় নিরতা।

(৩) উৎকণ্ঠিতা : উৎসুকভাবে নায়কের জন্য সংকেত কুঞ্জে প্রতীক্ষারতা।

(৪) বিপ্রলব্ধা : নায়কের দ্বারা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা।

(৫) খণ্ডিতা : প্রতিনায়িকার কাছ থেকে প্রভাতে আগত নায়ককে দেখে রুষ্টা।

(৬) কলহান্তরিতা : খণ্ডিতার আশ্রয় মান আর মানে কৃষ্ণকে হারিয়ে অনুতপ্তা।

(৭) প্রোষিত ভর্তৃকা : নায়কের মথুরাগমনে বিরহিনী।

(৮) স্বাধীন ভর্তৃকা : নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী—এতে খণ্ড মিলনের ব্যঞ্জনা আছে।

উপরিলিখিত আটটি শব্দের প্রত্যেকটি নায়িকার বিশেষণ।

পদাবলীর ভাষা

চৈতন্য প্রভাবে উদ্দীপিত বাঙালীর নবচেতনার আনন্দময় বিলাস কাব্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টি প্রধানতঃ দ্বিমুখী—চরিত কাব্য ও পদাবলী কাব্য। বাংলা সাহিত্যে চরিত কাব্যের প্রথম স্রষ্টা বৈষ্ণব। সুদীর্ঘ তিন শতাব্দী ধরে এই আনন্দ বিলাস চলেছে অব্যাহত গতিতে। শীতজীর্ণ মুহ্যমান বাঙলায় সে যেন এক অভূতপূর্ব বসন্তলীলা। রবীন্দ্রনাথের—

"বসন্তে আজি বিশ্ব খাতায়
হিসাব নাহিকো পুষ্প পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
সকল কথাই বাড়িয়ে বলে।"

বাংলার বৈষ্ণব যুগ সম্পর্কে কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্য। 'সকল প্রকার অজপ্রত্ব' যাঁদের অন্তরে বিরাজ করছে তাঁরা যে অনায়াসেই উদ্দামভাবে 'যোজন যোজন বাণী ছুটাইয়া' দেবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তাই দেখি পদাবলীতে বাঙলা, ব্রজবুলি, সংস্কৃত, সংস্কৃত মিশ্র বাঙলা, সংস্কৃত মিশ্র ব্রজবুলি, ব্রজবুলি মিশ্র বাংলার মহাসমারোহময় শোভাযাত্রা চলেছে। এই বিচিত্ররূপের যথাক্রমিক উদাহরণ :—

"ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে"—জ্ঞানদাস

"কুলমরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ তাহে কি কাঠকি বাধা"—গোবিন্দদাস

"ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পঙ্কজকলিতম্"—গোবিন্দদাস

"দেখ সখি মধুর সুবেশম্"—বীরবাহু (পদামৃতসিন্ধু)

"ধৈর্যং রহু ধৈর্যং হাম গচ্ছং মথুরাওয়ে"—যদুনন্দন (?)

"রাই কিছু কহই না পারি
তুয়া রূপ গুণের বালাই লইয়া মরি ॥"—নরহরি চক্রবর্তী।

রাধা ও উদ্ধবের প্রশ্নোত্তরাত্মক

"কস্ত্বং শ্যামলধামা ? হরি কিঙ্কর হাম উদ্ধবনামা।
কুরুতে কিং মধুনগরে ? কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে।"

—চন্দ্রশেখর রচিত এই পদখানির গঠন অদ্ভুত : প্রশ্ন দুটির ভাষা সংস্কৃত, উত্তর দুটির ব্রজবুলি, 'করি বিহরে' আবার বাংলা। কথোপকথনের নাটকীয় রীতি সংস্কৃত নাটকের বিপরীত—রাধার কথা সংস্কৃত উদ্ধবের কথা প্রাকৃত (ব্রজবুলিকে প্রাকৃত ধরা হল)।

বাংলা-সংস্কৃত-ব্রজবুলির এই সমমূল্যনির্ধারণ বৈষ্ণব কবিদের বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, যে চৈতন্যধর্ম দ্বিজ-চণ্ডালকে ভক্তির ক্ষেত্রে একাকার করেছে তারই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিরূপেই বাংলা সংস্কৃত ব্রজবুলি একাসনে বসেছে। বৈষ্ণব পরিধির মধ্যে সংস্কৃত বাংলা সবই 'দাস' হয়ে গিয়েছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর জয়দেবের সংস্কৃত গীতগুলি সহজেই বাংলা পদাবলী সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। রূপ গোস্বামীর, রায় রামানন্দের, চৈতন্যোত্তর কালের গোবিন্দদাস, রাধামোহন প্রভৃতির সংস্কৃত পদও বাংলা পদাবলীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। চণ্ডীদাসের পদ বাংলা, বিদ্যাপতির মৈথিল। পরকীয়াবাদী বিদ্যাপতিকে চৈতন্যোত্তর বাংলা আত্মসাৎ করেছে।

ব্রজবুলি : মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষায় বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য মহাজন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথও পদ রচনা করেছেন। এই কৃত্রিম মৈথিলকে বলা হয় ব্রজবুলি। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের মতে, জনসাধারণ বৈষ্ণব কবিদের ঐ নূতন ভাষা শুনে মনে করল যে, বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ সম্ভবতঃ ঐ ভাষাতেই কথা বলতেন। এটি ব্রজের বুলি ; তাই এর নাম হ'ল ব্রজবুলি। এই ব্যাখ্যাটি

কাল্পনিক। নামটির বয়স বেশী নয়। কারণ প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই। নামটি এখন আমরা সম্প্রসারিত অর্থেও প্রয়োগ করি অর্থাৎ যে সকল পদে রাধাকৃষ্ণ বা ব্রজলীলার প্রসঙ্গ নেই, তাদেরও মিশ্র মৈথিল বাহনটিকে আমরা ব্রজবুলি বলি। আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাংলা উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। এই সিদ্ধান্তটি পরীক্ষা করা যাক্।

আসামের প্রসিদ্ধ ভক্তকবি শঙ্করদেব মহাপ্রভু অপেক্ষা চব্বিশ বৎসরের বড় ছিলেন। পুরীতে এক সময়ে উভয়ের সাক্ষাৎও হয়েছিল। আসামে শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যধর্ম থেকে ভিন্ন—চৈতন্যদেব পরকীয়াবাদী, শঙ্করদেব স্বকীয়াবাদী। শঙ্কর রচিত 'রুক্মিণী হরণ', 'পারিজাত হরণ' দ্বারকার কথা, বৃন্দাবনের নয়। তিনি 'পারিজাত হরণ' নাটকটি গঠন করেছেন মিথিলার কবি উমাপতির 'পারিজাত হরণ' নাটকেরই আধারে—উমাপতির বাহন সংস্কৃত-প্রাকৃত-মৈথিল, শঙ্করদেবের সংস্কৃত-অসমীয়া-ভগ্ন মৈথিল; উভয় নাটকই গদ্য-পদ্যাত্মক। এখানে যে উমাপতির প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং বিদ্যাপতির পরোক্ষ একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। শঙ্করের মৈথিলানুগ ভাষা সত্যই সুন্দর: "হরি হরি পিয় মোরি বৈরি অধিক ভোলী, করলি অতত্র অপমানা" ভাষায় ব্যাকরণগত ত্রুটি সত্ত্বেও মৈথিল কবিকে এবং ছন্দে মৈথিল কবির (অরুণ পুরব দিশি বহলি নগর নিশি, গগন মগন ভেল চন্দা —উমাপতি) ভিতর দিয়ে জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। উক্তিটি দ্বারকার মহারাজ (মাধুর্যের নয়, ঐশ্বর্যের প্রতীক) কৃষ্ণের মহিষী সত্যভামার। এটি ব্রজের বুলি নয় সুতরাং তথাকথিত ব্রজবুলি নয়।

বাংলাদেশে চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বে রচিত বলে অনুমিত মিশ্র মৈথিল পদ মাত্র একখানি রয়েছে—যশোরাজ খান রচিত "এক পয়োধর চন্দন লেপিত…"। এতে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৮) নাম আছে। রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভও হতে পারে। পঞ্চদশের শেষও ধরা চলে। পদখানি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে রচিত পীতাম্বরদাসের বৈষ্ণবরস গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী'তে নায়িকা রাধার অবস্থা-বিশেষের উদাহরণস্বরূপে গৃহীত হয়েছে। যশোরাজ নাকি শ্রীখণ্ড বাসী, একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা, এবং পদখানি নাকি ঐ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ নরহরি সরকারের শ্রীখণ্ড চৈতন্য-সমকাল থেকেই বৈষ্ণবতীর্থ। চৈতন্যপ্রভাবের অব্যবহিত পূর্বে রচিত শ্রীখণ্ডের যশোরাজের কাব্য-সম্বন্ধে সপ্তদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত শ্রীখণ্ড নীরব। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীখণ্ডের গোপাল দাস হঠাৎ যশোরাজের কথা বললেন এবং তৎপুত্র পীতাম্বর একখানি পদ উদ্ধার করলেন। তারপর থেকে আবার সকলে নীরব। বিশাল নীরবতার বুকে আকস্মিক একটি বুদ্বুদের মত যশোরাজ জেগে উঠেই আবার মিলিয়ে গেলেন। কেন? গুণরাজ খানের 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রাধাহীন হয়েও মহাপ্রভুর

প্রশংসা লাভ করল; অন্যদিকে অমন সুন্দর পদযুক্ত রাধাকৃষ্ণলীলা থাকা সত্ত্বেও যশোরাজের কাব্য কারও দৃষ্টিগোচর হল না। কেন? অবস্থাটা সন্দেহজনক। তাঁর নামাঙ্কিত পদখানির নায়িকাও সন্দেহের অতীত নয়। পূর্বাপর প্রসঙ্গহীন ছিন্নসূত্র বর্ণনা থেকে নায়িকা স্বকীয়া কি পরকীয়া তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় না। স্বকীয়া বলেই মনে হয়; কারণ ইনি ঘরের চৌকাঠের বাইরে ধীরে ধীরে পদচারণা করছেন।—"আধ পদচারী করত সুন্দরী বাহির দেহলী মাঝে"। বিচ্ছিন্ন পদখানির নায়িকাকে পীতাম্বর রাধা করেছেন হয়ত যুগানুগত কল্পনায়, যেমন ঐ শতাব্দীরই শেষভাগে (১৬৯৬ খ্রীঃ) রচিত 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকায় অনেককিছু করেছেন প্রখ্যাত টীকাকার আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। বিশ্বনাথ 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে উদ্ধৃত 'যাতে যারা বতীম' ইত্যাদি রাধাবিরহ কবিতাটি বসিয়েছেন নান্দীমুখীর মুখে। কবিতাটি দেখি ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায়। একাদশ শতাব্দীর আচার্য অভিনবগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত কবিতায় ষোড়শ শতাব্দীর নান্দীমুখী কেমন ক'রে যাবে? অথচ ধ্বন্যালোকও বিশ্বনাথের অপরিচিত ছিল না। কারণ তারই ভিত্তিতে রচিত কবি কর্ণপুরের অলংকারকৌস্তভের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—টীকার নাম 'সুবোধনী'। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অজস্র আছে। এরূপ ব্যাপারকেই যুগানুগত কল্পনা বলা হয়েছে। যশোরাজের পদখানির নায়িকা স্বকীয়া হলে প্রভাব উমাপতির আর পরকীয়া হলে বিদ্যাপতির।

চৈতন্যপ্রভাবের পূর্বে রচিত মিশ্রমৈথিল পদ উড়িষ্যাতেও মাত্র একটি পাচ্ছি।—রায় রামানন্দের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল..."। মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম মিলন কালে (১৫১০) পদখানি তিনি গেয়েছিলেন প্রেমবিলাস বিবর্তের উদাহরণরূপে। সুতরাং এটির রচনাকাল চৈতন্যপ্রভাবের পূর্ববর্তী—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম অথবা পঞ্চদশের শেষভাগ। উক্তি পরকীয়া রাধার। ভাবে স্থূলতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (৪।৩।২১) এবং বিশেষত একটি সুপ্রাচীন অর্থাৎ 'দশরূপকে'র দশম শতাব্দীর আচার্য ধনিক কর্তৃক উদ্ধৃত সংস্কৃত কবিতার ("কো' সৌ, কস্মি, রতং নু কিং কথামিতি, স্মরামি যেনস্মৃতিঃ") ছায়া। মিশ্রমৈথিলে অন্য পদ তিনি রচনা করেন নি। করলে মহাপ্রভুর দীর্ঘকালের ভক্তসঙ্গী এই অসাধারণ ব্যক্তির পদ কখনই অসংগৃহীত থাকত না। ঐ একখানি মাত্র পদে রায় রামানন্দ মিশ্র মৈথিলের যে পরিণতরূপ দিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। এ ভাষায় আসামের শঙ্করদেব অজস্র পদ লিখেছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যায় শুধু রামানন্দের ঐ পদখানিতে ব্রজবুলির প্রথম ও শেষ পরিচয়। উড়িষ্যার মহাপ্রভুর প্রভাব এত গুরুতর যে, তাঁকে ও তাঁর মধুর রসকে নিয়ে বহু গান, বহু কাব্য ওড়িয়া ভক্তকবি তিন শতাব্দী যাবৎ রচনা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর দীনকৃষ্ণ গোবিন্দ ভঞ্জ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে সপ্তদশের শ্রীহরিদাস, দীনবন্ধু, বৃন্দাবতী, মুসলমান বৈষ্ণবী মালবেগ প্রভৃতির মাধ্যমে অষ্টাদশের সদানন্দ কবিসূর্য, অভিমন্যু সামন্ত সিংহার প্রভৃতির কেউই ব্রজবুলিতে

পদরচনা করেন নি। এঁদের পদের ভাষা ওড়িয়া (অধ্যাপক বিনায়ক মিশ্র রচিত ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত সালবেগের তিনখানি পদের একটির ভাষা ওড়িয়া, একটির ব্রজভাষা (মথুরা অঞ্চলে কথিত), তৃতীয়টির ব্রজবুলিগন্ধি (ঠিক ব্রজবুলি নয়)। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে ব্রজবুলি পদরচনার ধারা উড়িষ্যায় প্রচলিত হয়েছিল বলা তথ্যসম্মত নয়।

ধারাপ্রবর্তন একমাত্র বাংলাদেশেই হয়েছিল। এবং মহাপ্রভুর সমকালেতেই তাঁর দ্বারা আস্বাদিত ও বহুমানিত বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাব যে অতি স্বাভাবিক ভাবেই এ ব্যাপারে সক্রিয় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এ ধারার প্রথম প্রবর্তক মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতি। মুরারির "তপন কিরণে যদি অঙ্কুর দগধল, কি করব জল অভিষেকে…" অথবা বাসু ঘোষের "ভাঙ ভুজঙ্গম দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপয়ে মোর…" এ মিশ্র মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখি তা অজ্ঞাত একটি ভাষার অন্ধ অনুকরণে সম্ভব নয়। বৈষ্ণবযুগের মহাজনদের ব্রজবুলি-পদাবলীর প্রকাশ এত স্বচ্ছন্দ, প্রবাহ এত সাবলীল যে, মনে হয় এ ভাষা যেন তাদের মাতৃভাষা। অথচ প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াস সত্ত্বেও 'ভানুসিংহের পদাবলী'র ভাষা দুর্বল ও বিকৃত। তাঁর বিখ্যাত পদ "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান" এর 'মৃত্যু অমৃত করে দান' 'কি ভয় তাহারে' খাঁটি বাংলা। 'ভইবি', 'আসব' 'টুটাইব', 'ফুরাওল' শব্দগুলি ব্রজবুলি নয়। ব্রজবুলির কান এতে পীড়া অনুভব করে। এর প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণবকবিদের কালব্যবধান। মিথিলা-বাংলার যোগক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন। বৈষ্ণবযুগের পূর্ব থেকেই শিক্ষিত বাঙালী যে মৈথিল ভাষায় মোটামুটি কথা বলতে পারতেন তার প্রমাণ "এক বংগালী, দোসর তোতরাহ" (একে বাঙালী তাতে তোতলা) এই প্রসিদ্ধ মৈথিল প্রবচনটি। বিদ্যাপতিও যে বাংলা বলতে পারতেন, তার প্রমাণ তাঁর "কহিঅ না পারিঅ পহুমুখ ভাষা": কহিতে পারার পার্ ধাতু সমর্থ হওয়া (to be able) অর্থে বিদ্যাপতি প্রয়োগ করেছেন। এ অর্থ বাংলা এবং এই অর্থে ধাতুটির প্রয়োগ মিথিলায় আগেও ছিল না, এখনও নেই। বাংলা মিথিলার ঘনিষ্ঠ যোগের জন্য উভয়স্থানেই শিক্ষিতদের অনেকে পরস্পরের ভাষা বুঝতে ও মোটামুটি বলতে পারতেন। তদানীন্তন বাংলার অন্তর্ভূত আসামের প্রায় বাংলাভাষী শঙ্কর দেবও মৈথিল বলতে পারতেন বলেই বিশ্বাস হয়। ব্রজবুলি মৈথিলের অনুকরণ নয়। বাংলা প্রভৃতির সঙ্গে মৈথিলের ক্ষেত্র উপযোগী সমীকরণ। কিন্তু সচেতন প্রয়াসের দ্বারা নয়, আপন আপন মাতৃ-ভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে। মনে রাখতে হবে যে তদানীন্তন মিথিলা দীর্ঘকাল ধরে বাংলার সারস্বত তীর্থ ছিল। এবং স্বভাবতই তার ওপর মৈথিল ভাষার একটা আকর্ষণ ছিল। মিথিলাতেই ব্রজবুলির ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত হয়েছিল।— বিদ্যাপতি উমাপতি স্বয়ং একাজ করেছিলেন। শৈব মিথিলায় বৈষ্ণব ভাবধারা বর্ধিত হয়েছিল বাংলারই "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" থেকে। সেই ধারা পানে যে কটি

চাতক আনন্দে গেয়ে উঠেছিল, উমাপতি বিদ্যাপতি তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। সাধারণ মিথিলাবাসী যে সে গানে মুগ্ধ হবে না এবং বাঙালীই তা কান পেতে শুনবে একথা তাদের অজ্ঞাত ছিল না। তাই পদাবলী রচনায় তাঁরা প্রয়োগ করেছিলেন সরলতর ভাষা। আমাদের বিশ্বাস উমাপতি বিদ্যাপতি সমকালীন। ভণিতায় হিন্দুপতি প্রয়োগ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে না যে, উমাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রাজা হরিসিংহকেই বুঝিয়েছেন। হিন্দুপতি বিদ্যাপতিও প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাপতির 'হরগৌরী' পদাবলীর কঠিন ও দুর্বোধ্য মৈথিল দেখে মনে হয় এ পদরচনায় মিথিলার বাইরে তার দৃষ্টি ছিল না। যেমনটি দেখি বৈষ্ণবপদ রচনায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যাপতির প্রতি মিথিলাবাসীর উপেক্ষা লক্ষণীয়। গ্রিয়ার্সনের ও আধুনিক মৈথিল পণ্ডিতদের সহায়তায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষাকে খাঁটি মৈথিল বানাবার অমানুষিক চেষ্টা সত্ত্বেও 'হরগৌরী' পদের ভাষার সঙ্গে এর পার্থক্য আজও সুস্পষ্ট। তুলনামূলক পাঠ দ্বারা সহজে তা বোঝা যায়।

॥ পদাবলীর ছন্দবিচার ॥

জয়দেব যে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন বা গান করতেন তা প্রকৃতপক্ষে অপভ্রংশ। চর্যাপদের বাংলাগন্ধি গানগুলি হয়ত ঐ সময়ে বা কিছু পরে রচিত। গীতগোবিন্দের গীতসমূহ অপভ্রংশ ছন্দে সংস্কৃতভাষায় রচিত হলেও ধ্বনির সৌন্দর্য-তত্ত্বে সিদ্ধ জয়দেবের স্বকীয়তাও এতে প্রচুর। ব্রজবুলির ছন্দ মৈথিল পদাবলীর ছন্দের অনুসরণ। উমাপতি বিদ্যাপতির ছন্দ অপভ্রংশ থেকে আগত। তবু মনে হয় মৈথিল ও ব্রজবুলি দুই এরই ওপর জয়দেবের প্রভাব গুরুতর।

স্বরধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘ-বিচার মাত্রাচ্ছন্দ ব্রজবুলির প্রাণ হলেও সর্বত্র এ নিয়ম যে নিখুঁতভাবে মেনে চলা হয় না, তার কারণ পদগুলি গান। পাঠে বা ভুল বলে মনে হয় সুরে তা ঠিক হয়ে যায়। এই কারণে ছন্দের কাঠামোটির দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং কানের একটু শিক্ষাও আবশ্যক।

ব্রজবুলির (এবং সকল মাত্রাচ্ছন্দেরই) ছন্দ বুঝবার জন্য কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করা যেতে পারে। যে ন্যূনতম মাত্রা সংখ্যা ছন্দবিশেষের স্বরূপটি বুঝতে সাহায্য করে তাকে 'চা'ল' বলে। মোটামুটি চা'ল চারটি—তিনমাত্রার চারমাত্রার, পাঁচ-

১ ১ ১   ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১

মাত্রার ও সাত মাত্রার। আঁখিতে (৩); আঁখিপাতে (৪); আঁখিতে মম (৫);

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

আঁখিতে নিতি মম (৭)। সহজে বোঝার জন্য বাংলা উদাহরণ দেওয়া গেল।

১ ১

দ্রুত পড়লেই চলনের পার্থক্যটুকু কানে ধরা পড়বে। ব্রজবুলির উদাহরণ: নেহ;

১ ১ ১   ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
মীলিনি ; পন্থ ইহ ; বিজুরি চমকত। প্রথমটির কথা পরে বলা হবে।

(ক) চারমাত্রার চালের ছন্দ :

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১   ২ ১ ১ ২ ২
(১) গোবিন্দদাসের—ই থে যদি সুন্দরী-তেজবি গেহ। ৪ ৪,৪।৪
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥

অপভ্রংশ চর্যাপদের—"সোণে-ভরিতী-করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥..."

ও জয়দেবের—"মুহুরব লোকিত মণ্ডন লীলা।
মধু রিপু রহমিতি-ভাবন-শালা ॥"

দেখা যাচ্ছে যে, চারমাত্রার মূলটি চারবার আবৃত্ত হয়ে ষোলমাত্রার সৃষ্টি করেছে। আটমাত্রার পর যতি। ষোলমাত্রার পর পূর্ণ বিরতি। এই ষোলমাত্রার ছন্দটির নাম 'পাদাকুলক'। সংস্কৃত উদাহরণটির প্রতি পংক্তিতে নিখুঁত ষোলমাত্রা। অপভ্রংশ উদাহরণে 'থোই' এর 'ই' একমাত্রা হলেও ছন্দের জন্য দ্বিমাত্রিক। ব্রজবুলির 'ই থে' এর 'থে' দীর্ঘস্বরান্ত হলেও ছন্দের খাতিরে একমাত্রিক। এই জাতীয় ছন্দে পঙ্‌ক্তির অন্ত্যস্বর হ্রস্ব হলেও প্রয়োজন মত দ্বিমাত্রিক ধরার বিধি আছে। আধুনিক বাংলা কবিতাতেও এই পাদাকুলক ছন্দ দেখা যায় :

"ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে প্যাঁচ মারে কুস্তির,
জন্‌সাব কি ক'রে যে থাকে বলো সুস্থির।"—রবীন্দ্রনাথ

পাদাকুলক ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোমঞ্জরীতে নেই, আছে প্রাকৃত পৈঙ্গলে ও তার পূর্বকালীন সংস্কৃত বৃত্তরত্নাকরে। অপভ্রংশ ও সংস্কৃত পাদাকুলক একই লক্ষণাক্রান্ত। স্বরের লঘু গুরু বা হ্রস্ব দীর্ঘ সম্বন্ধে নিয়মহীন ষোলমাত্রার ছন্দ পাদাকুলক। পাদাকুলককে পজ্ঝটিকা ছন্দ বলেও অভিহিত করা হয়। যদিও মাত্রাসমক চিত্রা, উপচিত্রা, পজ্ঝটিকা নামে বিশেষ বিশেষ মাত্রাবিন্যাস নিয়মের ষোলমাত্রার ছন্দ অনেক আছে, তবু কোন বিশেষ নিয়ম না মেনে সব লক্ষণই মিলিয়ে শঙ্করাচার্য তাঁর "মোহমুদ্গর" এর ছন্দনাম দিয়েছেন 'পজ্ঝটিকা'।

(২) গোবিন্দদাসের—

২ ১ ১ ২ ১   ১ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ১   ২ ১ ১   ৩ ২
কণ্টকগাড়ি কমলসম পদতল মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন / কোমল মলয় সমীরে'র ছাঁচে ঢালা আটাশমাত্রার ছন্দ হলেও ষোলমাত্রার পাদাকুলকেরই দ্বিবাবৃত্তি। শুধু দ্বিতীয়াংশে চারটি মাত্রা ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। 'মাধব তুয় অভিসারক লাগি' উক্ত সংস্কৃত গানের ধ্রুবাংশ "বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে"র মত ষোলমাত্রার। 'করকঙ্কণ পণ ফণিমুখবন্ধন' কে অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টি করেছে তাও জয়দেবের অন্য একটি গানের 'মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং জাতীয়। 'কণ্টকগাড়ি'তে শেষ চারমাত্রা বাদ দেওয়া

হয়েছে। ইচ্ছা করলে কবি বাদ না দিতেও পারেন। যেমন গোবিন্দদাসের "চম্পক শোন" পদের—

১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
"নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত,। গায়ক কত কত ভকত হি মেলি

—পূর্ণ ১৬+১৬=৩২ মাত্রা। আবার ঐ পদেরই চম্পক পংক্তির দ্বিতীয়াংশে মাত্রা সংখ্যা চৌদ্দ।— ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২ ১ ১ ২
জিতল গৌরতনু লাবণি রে" এই প্রকার ছন্দের কিছু নিদর্শন রয়েছে চর্যাপদের চৌত্রিশ সংখ্যক গানে "কিন্তে মন্তে কিন্তো তন্তে। কিন্তো রে ঝানবখানে" ('ন্তোরে' দ্রুত উচ্চারণে দুইমাত্রা)। ঠিক এই ছন্দ প্রাকৃত পৈঙ্গলে নেই। 'তবে চউপইয়া (চতুষ্পদিকা) ছন্দের প্রথম দুইমাত্রা বাদ দিয়ে পড়লে অবিকল 'কণ্টকগাড়ি'র ছন্দ পাওয়া যায়। "(জাসু) সীসহি গংগা গৌরী অধংগা। গিম পহিরিঅ ফণিহারা।" রবীন্দ্রনাথের "জনগণ মন অধিনায়ক ভাগ্যবিধাতা" প্রধানতঃ 'কণ্টকগাড়ি'র ছন্দে রচিত।

(খ) পাঁচমাত্রার চালের ছন্দ :

শশিশেখরের—

২ ১ ১ ১ ২ ১ ২ | ১১ ১ ১ ২ ২ ১ ২
তুঙ্গ মণি মন্দিরে | ঘণ বিজুরি সঞ্চরে

২ ১ ১ ১ ১১১ ১ ১ | ২ ২
মেঘরুচি বসন পরি | ধানা

জয়দেবের—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ পল্লব মুদারম্"

এরই ছন্দের আধারে রচিত। প্রতি দশমাত্রার পর যতি। উদ্ধৃত পদ দু'খানির প্রত্যেকটির প্রথম পংক্তিতে কুড়িমাত্রা এবং দ্বিতীয়টিতে চৌদ্দ অর্থাৎ ১০+১০ ও ১০+৪। উৎসর্গ পুস্তকের 'ছল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম দুই পঙ্‌ক্তির প্রত্যেকটিতে কুড়িমাত্রা (১০+১০) দিয়েছেন। 'লেখনে' "লাজুক ছায়ার বনের তলে" (প্রথম পংক্তিতে) দশমাত্রা ও "আলোরে ভালবাসে" (দ্বিতীয় পংক্তিতে) সাতমাত্রা (৫+২) দিয়েছেন। চাল পাঁচমাত্রার। ছন্দ পূর্ণতা লাভ করে দশে। এই দশের বিচিত্র আবৃত্তি দ্বারা কবিরা ছন্দোবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। দশমাত্রাতে ছন্দের পূর্ণতা বলার কারণ এই যে আধুনিককালে কবিতায় এলেও মূলে ছন্দটি সঙ্গীতের দশমাত্রার 'ঝাঁপতাল' (৫+৫)। প্রাকৃত পৈঙ্গলে এই ছন্দের নাম 'ঝুল্লনা' এবং সেখানেও জোর দশের ওপর—"পঢম দহ দিজ্জিআ। পুনবি তহ কিজ্জিআ" (দহ=দশ প্রথমে দশ দিয়া পুনরায় তা করিয়া)। প্রাকৃত পৈঙ্গলে আর একটি এই ভাবের ছন্দ রয়েছে; নাম নিশিপাল। ছন্দটি অক্ষরবৃত্ত। মাত্রা বিন্যাস নিয়মবাঁধা—প্রথমে দীর্ঘ, পরে তিনটি হ্রস্ব; এইরূপ পরপর তিনবার;

তারপর দীর্ঘ-হ্রস্ব-দীর্ঘ (হারু ধরু তিন্নি নরু। হিন্নি পরি তিগ্গণ" ইত্যাদি)। ঠিক এই লক্ষণ পাচ্ছি জয়দেবের "নীলনলিনাভামপি তন্বি, তব লোচনম্", ব্রজবুলির "সোই যদি, তেজলকি কাজ ইহ্, জীবনে" এবং রবীন্দ্রনাথের "পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল, অন্তর"—তে যদিও গানগুলি মাত্রাছন্দে রচিত। সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে এ জাতীয় ছন্দ নেই। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে আমাদের ঝাঁপতালের নাম 'ঝুলা'। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই ঝুলা নামই রয়েছে।

(গ) সাতমাত্রার চালের ছন্দ:

বিদ্যাপতির—

১ ১ ১ ১ ২ ১ | ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২
এ সখি হমারি | দুখের নাহিক ওর

১ ১ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ২ ১ ১ | ২
এ ভরা বাদর | মাহ ভাদর | শূন্য মন্দির | মোর"

এবং রায় শেখরের—

১ ১ ১ ১১১১ | ২ ১ ২ ১ ১ | ১১১ ২ ১ ১ | ১১১২
"গগনে অবঘন | মেহ দারুণ | সঘন দামিনী | ঝলকই"

সাতমাত্রার ভিত্তিগত ছন্দে রচিত। এমনি একখানি গান জয়দেবে দেখা যায়—

২ ১ ২ ১ ১ | ২ ১ ২ ১১ | ২ ১ ২ ১ ১ | ২ ২
দেহি সুন্দরি | দর্শনং মম | মন্মথেন দু | নোমি

এ পঙ্‌ক্তিটিতেই লক্ষণ পরিস্ফুট। ৭=৩+৪; সূক্ষ্ম হিসাবে ৩+(২+২) মনে হয়, সাতমাত্রাতেই এই ছন্দ পূর্ণতা পায়। সাতের দুই বা ততোধিকবার আবৃত্তি ক'রে এবং আবৃত্ত অংশে পূর্ণ সংখ্যা সাত রেখে সঙ্গতভাবে মাত্রা সংখ্যা কমিয়ে কবি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। বিদ্যাপতির পদখানির উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে শেষাংশে মাত্রা সংখ্যা দুই। আবার পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলির প্রত্যেকটির শেষাংশে মাত্রা পাঁচ

১ ২ ২
(খন্তিয়া)। এই জাতীয় ছন্দের কথা সংস্কৃত ছন্দোগ্রন্থে নেই, পৈঙ্গলে নেই; চর্যাপদেও এই ছন্দের পদ নেই। সঙ্গীতের ক্ষেত্র থেকে এটি সোজাসুজি বাংলা কবিতায় এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় বিচিত্রভাবে এর প্রয়োগ করেছেন। (খাঁচার পাখি ছিল, বেলা যে পড়ে এল, গাহিছে কাশীনাথ, উতল সাগরের···)। এই সপ্তমাত্রিক গঠনটির সাঙ্গীতিক নাম 'রূপক তাল'। কবিতাটির ছন্দরূপে রূপক ছন্দই এর যোগ্য নাম।

(ঘ) তিনমাত্রার চালের ছন্দ:

তিনমাত্রার চালের ছন্দ বিদ্যাপতিতে নেই। ব্রজবুলিতে এই গতিভঙ্গির সৃষ্টি করেছেন বৈষ্ণব কবিরা। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ তার বিচিত্র প্রয়োগ করেছেন। এটিও সঙ্গীতের তাল থেকে এসেছে। বারোমাত্রা (অর্থাৎ চারিবার আবৃত্ত

তিনমাত্রার) তাল 'একতালা'; ছয়মাত্রার পরে 'সম'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেখি যে বারোমাত্রাতেই ছন্দের পূর্ণতা ধরা হয়েছে। ছয়ের পর পড়েছে 'যতি' (সঙ্গীতের 'সম')—"ক্ষমা কর মোরে / কুমার কিশোর"। এই বারোর দুইবার আবৃত্তির দ্বারা পঙ্‌ক্তিকে প্রয়োজনমত দীর্ঘ করা হয়; দ্বিতীয় অংশে মাত্রা সংখ্যা কম থাকে। "বাতাস, হয়েছে, উতলা, আকুল"—এ তিনমাত্রার চালটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

(১) শেখরের—

আওয়ত শ্রী / দামান্দ্র / রঙ্গিয়া / পাগড়ি / মাথে

ঐ তিনমাত্রা চালের বারোমাত্রার আধারে রচিত। পঙ্‌ক্তিটিতে বারোর দুইবার অর্থাৎ ছয়ের চারবার আবৃত্তি আছে। শেষাংশে মাত্রা সংখ্যা চার। এই পদখানির স্বরধ্বনির হ্রস্ব দীর্ঘ বিন্যাস নিখুঁতভাবে দেখা যাবে

১ ১ ২ ১ ১ / ১১ ২ ১ ১ / ২ ১ ২ ১ ১ / ২ ২
"স্ফুট চম্পক / দল নিন্দিত / উজ্জ্বল তনু / শোভা"—তে।

বাংলা মাত্রাচ্ছন্দে যুক্তব্যঞ্জনের পূর্বস্বর, হসন্তব্যঞ্জনের পূর্বস্বর, অনুস্বার বিসর্গের পূর্বস্বর ঐ ও ঔ দ্বিমাত্রিক। বাকী পূর্ণ উচ্চারিত স্বর মাত্রই একমাত্রিক (হ্রস্ব)। পদকর্তা এখানে বাংলা সংস্কৃত মেশামেশি করেছেন। 'রঙ্গিয়া' কে দ্রুত উচ্চারণে রঙিয়া, কিন্তু 'অঙ্গদ' কে অংগদ পড়তে হবে। "ধৈর্যং রহু / ধৈর্যং হম / গচ্ছং মথু/রায়ে" পদখানিও এই ছন্দে রচিত। এই পদের "মথুরা বাসিনী/এক রমণী"/-তে তিনের লক্ষণ স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের "নির্জন পথে / জ্যোৎস্না আলোতে / সন্ন্যাসী একা / যাত্রী" এবং "দহন শয়নে তপ্ত ধরণী" (গীতবিতান) যথাক্রমে "ধৈর্যং রহু" ও "মথুরাবাসিনী' এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে।

(২) জগদানন্দের

২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ...
"মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ

এবং শশিশেখরের

১ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১
"আজ অদ্ভুত তিমির রঙ্গ

—ঐ তিনমাত্রার চালের বারোমাত্রার আধারে রচিত দীর্ঘ চতুষ্পদী। প্রথম তিন পংক্তির প্রত্যেকটির মাত্রা সংখ্যা বারো। এবং শেষ পংক্তির প্রথম গানটিতে দশ (মঞ্জুল কুলনারী) ও দ্বিতীয়টির এগারো (অঙ্কুশ নাহি মানয়ে)—এইখানেই পূর্ণ যতি।

রবীন্দ্রনাথের—

১ ১১ ১ ১ ১ ২১ ২ ১
"গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে

১ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ২
সজনী আও আও লো"—ভানুসিংহ

"আজু অদ্ভুত..." পদেরই মত ১২+১২+১২+১১ বৈষ্ণব কবির মত রবীন্দ্রনাথও বহু স্থলে দীর্ঘস্বরে হ্রস্ব মূল্য ধরেছেন—'ভানুসিংহ কহে ছিয়ে ছিয়ে রাধা" এর তিনটি 'এ' একমাত্রিক (এই পংক্তিটি 'গহন কুসুমে'র সগোত্র নয়, এতে চারের চা'ল)।

নিষ্প্রয়োজন বলে পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনা করা হ'ল না। কেবল দুটি বিশেষ রূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক্ঃ

(১) "আজু কে গো মুরলী বা-জায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়।।"

—সংস্কৃতে উচ্চারণগত স্বাভাবিক কারণে সর্বত্রই অক্ষর বর্ণ ও syllable দুই-ই। বাংলা অক্ষরবৃত্তে তা নয়। পংক্তিতে পংক্তিতে বর্ণ সংখ্যা এক, syllable সংখ্যায় তারতম্য ঘটতে পারে। আমাদের এই উদাহরণটিতে দুটি পংক্তিতেই বর্ণসংখ্যা দশ, অক্ষর সংখ্যা নয় (৯)। এই গানেরই "এ তো নয় নন্দসুত কানু"—তে বর্ণ ও syllable দুইই দশ। আবার "এ না বেশ কোন দেশে ছিল"—তে বর্ণ দশ, syllable আট। এই জটিলতা এড়াবার জন্য আমরা syllable এর প্রশ্ন না তুলে অক্ষর-বর্ণ ধরলাম। একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ব্যঞ্জনান্ত syllable এর (যেমন 'বেশ' 'কোন') হসন্ত ব্যঞ্জনে যেমন শ্, ন্ syllable না থাকলেও তার দ্যোতনা রয়েছে অর্থাৎ বেশ্, 'কোন' প্রকৃতপক্ষে দুটি syllable এরই প্রতীক। গানখানির ছন্দ দশাক্ষর, ছন্দোনাম 'দিগক্ষরা,' যতি অষ্টম অক্ষরে। পূর্ণ যতি দশমে এবং চাল চারের।

চণ্ডীদাসের "বহুদিন পরে / বঁধুয়া এলে" ও মাধব ঘোষের "ব্রজবাসিগণ / জীবনশেষ" পদ দুখানির ছন্দ একাদশাক্ষরা 'একাবলী'। যতি ষষ্ঠে ও পূর্ণযতি একাদশে, চাল তিনের। দিগক্ষরার মত অষ্টম অক্ষরে যতিবিশিষ্ট একপ্রকার একাবলী আছেঃ—

'সভাস্থলে নরপতি। আসিয়া
মন্ত্রীবরে কহিলেন। হাসিয়া।'

এর সঙ্গে পূর্বরূপটির গতিপার্থক্য সহজেই বোঝা যায়।

॥ পদাবলীর অলঙ্কার বিচার ॥

কবিশেখর কালিদাস পদাবলীর অলঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের অলংকার বিষয়ে আলোচনা আছে। এখানে গোবিন্দদাসের অলংকার বিষয়েই আলোচনা করা গেল। কারণ বাঙালী পদকর্তাদের মধ্যে অলঙ্কার প্রয়োগে গোবিন্দদাস বোধ হয়

সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর পদে প্রায় সমস্ত রকম অলংকারের উদাহরণ আছে। এখানে সকল প্রকার অলংকারের উদাহরণ ও আলোচনা বাহুল্যমাত্র। কেবল অলংকারের পাঠ্যসূচীকে অনুসরণ করে যত বেশী সম্ভব উদাহরণ তুলে আলোচনা করা হল।

কাব্যনির্মিতি ও অলংকার প্রয়োগে বৈষ্ণব পদাবলী অনুপম। অলংকার শাস্ত্র অনুসারে সকল প্রকার শব্দ ও অলংকারের উদাহরণ বৈষ্ণবপদাবলীতে পাওয়া যায়। কাব্য আঙ্গিকের বৈচিত্র্যসম্পাদন অলংকার প্রয়োগের প্রধান কারণ। প্রতিভাবান বৈষ্ণবকবিগণ একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের কবি হয়েও কাব্যকে কেবল কাব্যরূপে নির্মাণ ও আস্বাদন করতে দ্বিধা করেন নি।

শ্লেষ :—যা করি লাগি মনহি মন গোই।
গঢ়ল মনোরথ না চঢল সোই॥

অতিশয়োক্তি :—এ সখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর
কৈছে ধরলি কুচ কনয় কটোর।

মালারূপক :—অধর পবার দশন মণি মোতি।
রোচন তিলক মৈনাকক জোতি।

শ্লেষমূলক বিষমলঙ্কার :
যো গিরি গোচর বিপিনহি সঞ্চরু কুশ কটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক চারু শটা পরিমণ্ডিত অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণ নয়ানি
সো চঞ্চল হরিহিয়া পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সেয়ানি॥

মালোপমা :—
তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেড়ল হেম॥
কনকলতায় জানু তরুণ তমাল। নবজলধরে জানু বিজুরি রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহু তনু পুলকিত প্রেম-তরঙ্গ॥

সামান্য :—
চান্দনি রজনী উজরোলি গোরি। হরি অভিসার রভসরস ভোরি॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বনই। ধবলিম কৌমুদি মিলি তনু চলই।
হেরইতে পরিজন লোচন ভুর। রঙ্গ পুতলি কিয়ে রস মাহা বুর॥
[জ্যোৎস্নার মধ্যে ধবলবসনা গৌরাঙ্গী রাধাকে চেনা যাচ্ছে না। যেন রাঙের পুতুল পারদের মধ্যে ডুবেছে।]

রূপক :—
(১) বেনুক ফুকে বুকে মদনানল কুল ইন্ধন মহাজারি।
দরশ পানি তুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রমজল জোরন বারি॥
(২) কিয়ে করব কুল দিবস দীপ তুল প্রেম পবনে ঘন ডোল।
গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজকজাল আগোল।

(৩) নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব॥
* * * *
চঞ্চল চরণ কমলদলে ঝঙ্করু ভকত ভ্রমরগণ ভোর॥

সাঙ্গরূপক:
"মাধব মনমত ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি.ফুলধারে ভারভবে পথ নহারতের।"

পরম্পরিত রূপক:
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহিঁ কনোভব সিন্ধু॥

বিশেষোক্তি:
হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম।
জলু বিরহানল মন মাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥

ব্যাজস্তুতি:
(১) পুর নগরি মঞে রসিক শিরোমণি পুরহ মনমথ কেলি।
বনচরি নারি তোহারি গুন গাওব পুতলিক মন্ত্রে মেলি।
(২) ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহু দূর।
অযতনে ধনিক মনোরথ পুর॥

সন্দেহ:—
(১) সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরীত॥
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সংবাদ।
তনু জীবন তুহুঁ ধনিক বিবাদ॥
(২) ঘন ঘন চুম্বন লুব্ধ ভেল তুহুঁ বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু।
হেরি হেরি সরম ভরম পরিপূরল কো বিধুমণি কো ইন্দু॥

উৎপ্রেক্ষামূলক ব্যতিরেক:—
ভালে সে চন্দন চান্দ কামিনী মোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।
মেঘের উপর কিবা সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা॥

নিদর্শনা:
রসিক শিরোমণি নাগর-নাগরী লীলা স্ফুরব কি মোয়।
ভাহু বাওন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চরবঙ্কিয়ে শিখরে॥
অন্ধ ধাই কিয়ে দশদিশ খোঁজব মিলব কল্পতরু নিকরে।

ব্যতিরেক :

(১) জলদহি জল বিজুরি দিঠি তাপক মরকত কাষ কঠোর ॥
এ দুহুঁ তনুমন নয়ন রসায়ন নিরুপম নওল কিশোর ।

(২) ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন মোহন আভরণ সাজ ।
অরুণ নয়ন গতি বিজুরি চমক নিতি দগধল কুলবতীলাজ ॥

উপমাত্মক : নীল অলকাকুল অনিলে হিলোলত নীলতিমিরে চলু গোই ।
নীল নলিনী জানু শামর সায়রে লখই না পারই কোই ।

বিরোধাভাস : বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনি স্বরসরিৎ স্রবে নয়নে ।
কমলজ কমলেই কমলজ ঝাঁপন সোই নয়নবর বয়নে ॥

উৎপেক্ষা :

ঘন ঘন আঁচর কুচগিরি কাঁচর হাসিহাসি তহি পুন হেরি ।
জনু মধু মম হরি কণয়া কুম্ভ ভরি মুহরি রাখাল কত বেরি ॥

অতিশয়োক্তি :

(১) কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক বেল ।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি পঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি নেল ॥
(২) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান ।
কতশত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি যাত পরাণ ॥

বিষমালঙ্কার :—

(১) চান্দ নেহারি চন্দনে তনু লে পই তাপ সহই না পার ।
ধবল নিচোল বহই না পারই কৈছে করবি অভিসার ॥
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমি পয়ান গতি আশে ।
আওত জলদ ততহিঁ উডি যাওত উতপত দীর্ঘ নিশাসে ॥

(২) যো কর বিরচিত হার উপেখলুঁ হার ভুজঙ্গম ভিল ।

অসঙ্গতি :

পদনখ হৃদয়ে তোহারি । অন্তর জলত হামারি ।
অধরহি কাজর তোর । বদন মলিন ভেল মোর ॥
হাম উজাগরি রাতি তুয়া দিঠি অরুণিম কাঁতি ।
হামারি রোদন অভিলাষ তুহুঁ কহ গদগদ ভাষ ॥

গোবিন্দ রচনার উপাদান উপকরণ পদ্ধতিরীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত সংস্কার অনুসরণ করেছেন। রূপবর্ণনায় তিনি প্রচলিত উপমানগুলিকেই গ্রহণ করেছেন। অভিসারের আয়োজন উপকরণ পূর্ববতী কবিদের রচনা থেকেই নিয়েছেন। বিপ্রলব্ধা খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা ইত্যাদি নায়িকার রীতি প্রকৃতি বিষয়ে নূতনত্ব কিছুই দেখেননি। মানভঞ্জন, সম্ভোগ ও বিরহের বর্ণনায় গতানুগতিক রীতিই তিনি অনুসরণ করেছেন। গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব এই—পুরাতন উপাদান উপকরণ নিয়ে

তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সম্পূর্ণ নূতন। অধিকাংশ পদেই তার নিজস্ব শক্তির ছাপ আছে। তিনি অন্যান্য অনেক কবির মত অনুকারক বা অনুসারক নন, তিনি একজন স্রষ্টা। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়লে চিরপুরাতন বিষয়বস্তু ও উপাদান যে কি রমণীয় রসঘন রূপ ধরতে পারে—তা গোবিন্দদাস দেখিয়েছেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপাদানগুলির সংস্কৃত কবিরা যে ভাবে প্রয়োগ করেছেন গোবিন্দদাস সেই উপমাগুলিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু পূর্ববর্তী কবিরা যে মামুলি ব্যতিরেক উপমা ও উৎপ্রেক্ষার দ্বারা রূপবর্ণনা করতেন গোবিন্দদাস তা না করে ঐগুলি নিয়ে নানা কৌশলের সৃষ্টি করেছেন। যেমন বিরহিনী রাধার প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

এতদিনে গগনে অখিন রহু হিমকর জলদে বিজুরি রহু থির।
চামরি চমরু নগরে পরিবেশউ মদন ধনুয়া ধরু ফীর॥
মাধব বুঝলুঁ তোহে অবগাই।
একবিয়োগে বহুত সিধি সাধলি অতয়ে উপেখলি রাই॥
কুমুদিনি বৃন্দ দিসই অব হাসউ বান্ধুলি ধরু নব রঙ্গ॥
মোতিম পাঁতি কাঁতি ধরু উজর কুঞ্জর চলু গতিভঙ্গে।

গোবিন্দদাস বিয়োগের কথা বলে এখানে অবশ্য দুর্বল করে ফেলেছেন। বিদ্যাপতি এখানে বিরহিনী রাধিকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কান্তি শোকে দুঃখে ম্লান হয়ে গেছে—এই ধ্বনি লক্ষ্য করে উপমেয় অপেক্ষা উপমানের প্রাধান্যজনিত ব্যতিরেক অলঙ্কারের সৃষ্টি করেছেন। এবং তার দ্বারা শিল্পকে ছাড়িয়ে গেছেন।

শরদক শশধর মুখরুচি সোঁপলক হরিণক লোচন লীলা।
কেশপাশ লয়ে চমরীকে সোঁপল ইত্যাদি

চিকুরে চোরায়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিন পাঁতি॥—ইত্যাদি পদে বিদ্যাপতির অনুসরণে গোবিন্দদাস একটি কৌশলের প্রয়োগ করেছেন। রূপকাত্মক পর্যায়ে অলঙ্কারের সাহায্যে 'মনমথ মকর ডরহি ডর কাতর'—ইত্যাদি পদটিতে কৌশলে মনোমীনের নানা অঙ্গে আশ্রয়ের উল্লেখ ছলে রূপবর্ণনায় একটি কৌশল দেখিয়েছেন। 'ঘন রসময় তনু অন্তর গহীন। নিমগন কতহুঁ রমণি মনোমীন—এই রূপকাত্মক পদে কৌশলে কবি কতগুলি উপমাকে গেঁথেছেন—অঙ্গসৌষ্ঠব বর্ণনার জন্য। গোবিন্দদাস অনেক সময় বক্তব্যকে জোরালো এবং রসালো করবার জন্য antithesis এর প্রয়োগ করে Emphasis দিয়েছেন। বিদ্যাপতির অনুসরণ হলেও এ ধরণের রচনারীতি তাঁর নিজস্ব। 'ভীত চকিত ভুজগ হেরি',...'কুলমরিযাদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ' ইত্যাদি পদ তার দৃষ্টান্ত।

১। যাহে বিনু নিমিখ আধ যুগ সম সোঅব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অবহুঁ নাকি নিকসয়ে পুন কিয়ে দরশন পাব॥
২। আনন্দনীরে নয়ন যব কাঁপয়ে তবহি পসারিতে বাহু।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন সুরত জলধি অবগাহ॥

—এগুলিও আলংকারিক কৌশলের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

কবি প্রত্যেক পঙক্তিকে অলঙ্কৃত ভাবগর্ভ ক'রে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে তাঁর রচনা রসঘন হয়েছে। অবান্তর কথা একেবারে নেই। তরল সুলভ বাক্য পদে স্থান পায় নি।—বক্তব্যের ব্যাখ্যান বিশদ বিবৃতি পদের মধ্যে নেই।—চরণগুলিতে ব্যঞ্জনা প্রচ্ছন্ন আছে—বাগবিন্যাসে আতিশয্য নেই—দীনতাও নেই। এখানে স্থলে স্থলে প্রসাদগুণের অভাব হয়ত রয়েছে। কিন্তু রচনা হয়েছে গাঢ়বন্ধ,—শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিদের রসঘন শ্লোকের মত।

কবি চাতুর্যের সঙ্গে মাধুর্যের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এই শ্রেণীর পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে মাধুর্য সৃষ্টি এক সংস্কৃত কবিদের মধ্যেই দেখা যায়।

॥ পদাবলীর কাব্যমূল্যবিচার ॥

রবীন্দ্রনাথের বহুস্থলে বৈষ্ণব লক্ষণ এত বেশী যে, মনে হয় তাঁর ওপর বৈষ্ণব প্রভাব গুরুতর। কিন্তু এই মনে হওয়া যে সত্য নয়, তা দেখাবার জন্য রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব ভক্তিবাদী, রবীন্দ্রনাথও ভক্তিবাদী। কিন্তু

"যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীত গানে
ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞান হারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ।
দাও ভক্তি শান্তিরস,
স্নিগ্ধ সুধা পূর্ণ করি মঙ্গল কলস
সংসার ভবন দ্বারে।"

এটি মহাকবির ভক্তিস্বরূপ। শ্রীচৈতন্য কিন্তু 'ভাবোন্মাদমত্ততার'ই মূর্তবিগ্রহ। কবির ভক্তি 'শান্তিরস', রসশাস্ত্রের 'শান্তরস' নয়। শান্তরসে জগৎ অসার বলে বিষয়াসক্তিহীন চিত্তে সারাৎসার ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা, স্থায়িভাব নির্বেদ। কিন্তু কবির কামনা

"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

বৈষ্ণবেরও দৃশ্য গন্ধ গান আছে, কিন্তু উদ্দীপন বিভাব রূপে। রবীন্দ্রনাথের এগুলি আলম্বন বিভাব। কারণ এগুলি অপরূপেরই রূপলীলা। এক এক সময়ে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বুঝি বৈষ্ণবের পাশেই এসে দাঁড়ালেন। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ

বিগ্রহ। রাধা তার হ্লাদিনীর নারীরূপ; রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলা কৃষ্ণ কর্তৃক আপনাকে আপনি আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথের—

"আপনারে তুমি দেখেছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

যেন ঐ বৈষ্ণবতত্ত্বেরই কাব্যায়ন। কিন্তু তা নয়। বৈষ্ণবতত্ত্ব বৈষ্ণব সাধারণের তত্ত্ব; রবীন্দ্রতত্ত্ব বিশেষভাবে রবীন্দ্র ব্যক্তির তত্ত্ব।

কবিধর্মে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক গীতিকবির মত অহং-তন্ত্রী বা Subjective। এই 'অহং' বস্তু জগৎকে বিচিত্রভাবে তিরস্কৃত (refractive) ক'রে অভিনব ভাবজগতে পরিবর্ত্তিত করে—"যথাস্বে রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে।" এটি রবীন্দ্রনাথের কবিস্বরূপ। রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করতে গিয়ে প্রচলিত অর্থে 'ভক্ত' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা কঠিন। সুন্দর ভগবান তার সুন্দর প্রকৃতির আনন্দরস পান করেছেন কবির রসনা দিয়ে। অসীমের সঙ্গীত অনাহত। কবির 'অহং' এর বেণুরন্ধ্রপথে তা বের হয় ধ্বনিত সঙ্গীতরূপে এবং অসীম তা শুনেছেন সসীম কবির "মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি"। কবি বলছেন—

"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়
তাকেই বলে আমি।"

কবির 'অহং' তাঁর খণ্ডিত মানবসত্তায় অখণ্ড অসীমেরই অহংকার; সুতরাং কবির 'অহং' দৃষ্টি অসীম 'অহং' এর দৃষ্টি। এই 'অহং' এরই

"চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুণি উঠল রাঙা হয়ে।…
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হ'ল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব কথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।"

বলা বাহুল্য যে, কবির সত্য, দর্শনের সত্য, বিজ্ঞানের সত্য এক নয়। কবির এই 'মত' ধারণার পশ্চাতে প্রজ্ঞা রয়েছে; কিন্তু এ প্রজ্ঞা দর্শন বিজ্ঞানের শুষ্ক প্রজ্ঞা নয়। কবিমানসের ভাব প্রজ্ঞা। 'অহং'-এর দ্বারা ভাবিত বিশ্বের যে বিচিত্র বর্ণাঢ্য চিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বচিত্র নয়, কবির অহং এরই বিচিত্র রূপায়ণ—

"একে বোল না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত

বিশ্ব আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ।"

এই আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, কবি রবির

"আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।"

এখানে যে তুমি-আমি লীলার কথা আছে তা বৈষ্ণবীয় মধুর রসলীলার সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক।

রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে বাঁশী-অভিসার-উৎকণ্ঠ মিলন বিরহের আলেখ্য যেভাবে অঙ্কিত হয়েছে তাতে মনে হয় এগুলি বৈষ্ণব অধিকারের স্বাধিকৃত রূপ। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। 'রঙিন খেলনা দিলে ও রাঙা হাতে' ইত্যাদি কবিতায় বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য রসের রূপ অনেকে দেখিয়েছেন, কিন্তু একটু অবহিত হলেই তাঁরা দেখতে পেতেন যে, এখানে ভগবান শিশু (সন্তান) নন, মাতা এবং রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে পরিব্যাপ্ত, বিশ্ব সন্তানের জন্য বিশ্বেশ্বর-জননীর পরিবেশিত আনন্দ-অন্ন।

রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব সাদৃশ্য বাহ্য; অন্তস্তত্ত্বে তিনি বৈষ্ণব অসদৃশ রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব মাধুর্যবাদী, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী। এবং এই সৌন্দর্যবাদ আবার ঐশ্বর্যবাদে সমাহিত। তাঁর 'প্রিয়', 'নাথ' প্রভৃতি নায়ক সম্বোধন নয়, মানসিক অবস্থার অনুগত প্রভু সম্বোধন। তাঁর ভগবান রসের নয়, ভাবের। মানুষের ধূলিমলিন মর্ত্যপরিবেশে মানুষের বেশে মানুষের কণ্ঠলগ্ন ভগবান রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে আঘাত করে।—

"আমিও কি আপন হাতে
করব ছোট বিশ্বনাথে
জানাবো আর জানব তোমায়
ক্ষুদ্র পরিচয়ে?"

তাঁর ভগবান রাজা; তাঁর বেশও মহার্ঘ, পূজার উপচারও মহার্ঘ। তাঁর ভগবান যেমন ঐশ্বর্যময়, ভাবও তেমনি ঐশ্বর্যময় এবং ভাবের বাহনও পদ পরিপাটীতে, ছন্দে, অলংকারে ঐশ্বর্যময়। কবির অসামান্য শিল্পী মনের পরমাশ্চর্যই সকল ঐশ্বর্যের মূলে। রবীন্দ্রনাথের উপর বৈষ্ণব প্রভাবও প্রচুর। কিন্তু সে অন্যদিকে। প্রেমের রাজ্যে নারী-পুরুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দনগুলিও ধ্বনিত হয়েছে পদাবলী কাব্যে। বৈষ্ণব মহাজন প্রেমমনস্তত্ত্বের (Psychology of Love) সুনিপুণ রূপকার। এই বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তরকালের কবিদের সম্পূর্ণ নূতন কথা বলা সত্যই সুকঠিন—নূতন প্রকাশ ভঙ্গী, নূতন ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও বৈষ্ণব সুরের ফল্গুধারার সন্ধান অনেক স্থলেই পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব কবি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কাব্য ভিত্তি দার্শনিক তত্ত্বে। শক্তিমান

শিল্পীর হাতে তত্ত্বও যে রসরূপতা লাভ করে রবীন্দ্রকাব্যের মত বৈষ্ণব কাব্যেও তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

কবি বর্ণ শিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি হয়ে প্রকাশিত হয়, যা দর্শকের ভাবলোকে উর্মি তুলে নিবৃত্ত হয়, তরঙ্গ তোলে না; কোথাও আবার লেখনীমুখে স্বল্পরেখায় আভাসিত করে 'খানিক কালো খানিক আলো'র স্বপ্ন চিত্র, যা দর্শক মনে যে আনন্দের সৃষ্টি করে তা ধ্যানানন্দ। বৈষ্ণবকাব্যে এই লক্ষণেরই প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। ব্যঞ্জনার সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সমুচ্চ স্তরে দুই বৈষ্ণব কবিও কখনও কখনও উঠেছেন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তিনি (চণ্ডীদাস) একছত্র লেখেন ও দশছত্র পাঠকের দ্বারা লেখাইয়া লন।" অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকৃত্রিমতা ও আন্তরিকতা বৈষ্ণব কবির বৈশিষ্ট্য। একজন মর্মজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলেছেন—"poetry is the speech of soul to soul"। কথাটি সুন্দর এবং দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মুখের ভাষা স্থূল, তার অর্থ বাচ্য; আত্মার ভাষা সূক্ষ্ম তার অর্থ গূঢ়। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির ভাষা আত্মার ভাষা। আবার, কবির আত্মা যদি আন্তরিকতার ও তন্ময়তার কবোষ্ণ স্পর্শে পাঠকের আত্মাকে আনন্দ মুগ্ধ করতে না পারে, কবির সৃষ্টি হয় অকৃতার্থ। এদিকেও বৈষ্ণব কাব্যের কৃতার্থতা। প্রেমধর্মে যাঁদের দীক্ষা, তাঁদের রচিত পদাবলী প্রিয়তমের পূজাঞ্জলি। বৈষ্ণব কবির প্রেরণা কবি যশঃ প্রার্থনা, নৈবেদ্য রচনা। কে কত বিচিত্রভাবে পূজার ডালা সাজাতে পারে, কবিদের মধ্যে তারই যেন এক উল্লাসময় প্রতিযোগিতা।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস দুজনেই পণ্ডিত কবি। রস শাস্ত্রে ও অলংকার শাস্ত্রে দুজনেরই অসামান্য পাণ্ডিত্য। পার্থক্য এইটুকু যে, গোবিন্দদাস রস সম্পর্কে রূপ গোস্বামীর অনুগত। দুইজনের প্রকাশ ভঙ্গী বিভিন্ন—বিদ্যাপতি তরল, গোবিন্দদাস সান্দ্র। বিদ্যাপতির রচনায় যুক্ত বর্ণের বাহুল্য, অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কার, দীর্ঘ সমাস নেই বললেই চলে; গোবিন্দদাস এগুলির বহুল প্রয়োগ করেছেন। গোবিন্দদাসের রচনাকে কোথাও কোথাও তা ভারাক্রান্ত করেছে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উদাত্ত-অনুদাত্ত মৃদঙ্গ ধ্বনি বৈচিত্র্যে বিষয়বস্তুকে তথা ভাববস্তুকে তা মহনীয়ই করে তুলেছে।—"স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব" বা "ত্রিভুবন মণ্ডন কলিযুগ-কাল-ভুজগভয় খণ্ডন রে"—তার উদাহরণ। "রূপক, সমাসোক্তি প্রভৃতি জটিল অলংকার পূর্ণ" বলে বিদ্যাপতির তুলনায় গোবিন্দদাসের কাব্য কঠিন—সতীশচন্দ্র এই নির্দেশ করেছেন। এ নির্দেশ তথ্য সম্মত হয়, কারণ বিদ্যাপতি রূপক অতিশয়োক্তি সমাসোক্তি, সূক্ষ্ম, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা প্রভৃতি অলংকারের প্রচুর প্রয়োগ করেছেন, মনে হয় গোবিন্দদাস অপেক্ষা অধিক করেছেন। তবু বিদ্যাপতির রচনা অনেক স্থলে ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও কতকটা পানীয়; গোবিন্দদাসের চর্বণীয়। বিদ্যাপতির অলংকার মালা মণ্ডিত "হাথক দরপণ" পদখানির সঙ্গে

গোবিন্দদাসের প্রায় নিরলঙ্কার "যাঁহা পঁহু অরুণ চরণ" পদখানি তুলনায় পড়লে দেখা যাবে বিদ্যাপতির রাধা চলেছেন সহজ হৃদয় ধর্মের পথে আর গোবিন্দদাসের রাধা চলেছেন কঠিন দার্শনিকতার পথে। দুখানি পদই রস মধুর; কিন্তু প্রথমটির আবেদন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ের কাছে, দ্বিতীয়টির মস্তিষ্কের মধ্যবর্তিতায় হৃদয়ের কাছে। গোবিন্দদাসের কঠিনতার বহু কারণ আছে। বিদ্যাপতির রস তরুণ, গোবিন্দদাসের প্রৌঢ়। গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও দুজন দু প্রকৃতির। বিদ্যাপতি ভক্ত নন, কবি; গোবিন্দদাস যতোবড় কবি ততোধিক ভক্ত। বিদ্যাপতির রাধায় কোন তত্ত্ব নেই. গোবিন্দদাসের রাধায় গভীরভাবে তা বর্তমান। বিদ্যাপতির রাধা উচ্চাঙ্গের নায়িকা মাত্র। যদিও পরিমণ্ডলটি বৈষ্ণবীয়। নায়িকা রূপে তিনি ভাববিলাসী, বিদগ্ধা, খর দীপ্তিময়ী। গোবিন্দদাসের রাধা মাধবের "অভিসারক লাগি দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে মন্দিরে যামিনী জাগি"; বিদ্যাপতির রাধার পক্ষে এটি অনাবশ্যক। গোবিন্দদাস চল্লিশের পর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়ে পরে অর্থাৎ অতি পরিণত বয়সে প্রেমলীলার পদ রচনা করেছিলেন। তথাপি গোবিন্দদাস প্রতিভাবান কবি। এমন কি যেখানে তিনি অন্য কবির নিকট ঋণী সেখানেও তাঁর রচনা মৌলিক হয়ে উঠেছে। পূর্বোক্ত 'যাঁহা পঁহু' পদখানি রূপ গোস্বামীর সংকলিত পদাবলী গ্রন্থের

"তদ্বাপীষু পয়ঃ, তদীয় মুকুরে জ্যোতিঃ তদীয়ালয়
ব্যোম্নি ব্যোম, তদীবর্ত্মনি ধরা, তত্তালবৃন্তে'নিয়ঃ"

কবিতারই মুক্তানুবাদ। তবু কবি গোবিন্দদাসের নৈপুণ্যে এটি অভিনব আস্বাদের বস্তু হয়ে উঠেছে। যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' প্রবন্ধে Watson-এর Autumn কবিতার অংশ বিশেষের মুক্তানুবাদ।

একজন প্রসিদ্ধ রূপকার কবি জগদানন্দ। ইনি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। এঁর কাব্যে তেমন ভাবগভীরতা নেই। কিন্তু ভাষার ঝংকার অতুলনীয়। "মঞ্জুবিকচ কুসুমপুঞ্জ" এর অপূর্ব সঙ্গীতময় তরঙ্গভঙ্গ জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই পদে শ্রবণ-নন্দন অনুপ্রাসের তলে উপমার আলোকে দীপ্তি পাচ্ছেন সখী-সঙ্গিনী রাধা। আবার ভাবের রাধাকে দেখা যায় "কেন গেলাম যমুনার জলে" পদখানিতে। পূর্বোক্ত গানের ধ্বনি ঐশ্বর্য এই বাংলা গানখানিতে নেই। অলংকার এখানে অর্থালোকে প্রবেশ ক'রে রাধাহৃদয়ের অভিমুখী হয়েছে। ব্যঞ্জনার গূঢ়পথে এ হৃদয়ের অতলে অবতরণ করতে না পারলেও এটি একেবারে ব্যঞ্জনাস্পর্শহীন নয়।

বলরাম দাস, জ্ঞানদাস বাংলা এবং ব্রজবুলির—দুই ভাষারই পদকর্তা। এঁদের কাব্যসিদ্ধি বাংলাতেই অধিকতর। দুজনেই উচ্চশ্রেণীর কবি। ভাবাবেগ প্রবণতা দুজনেরই কবি ধর্ম। এবং এই কারণেই এঁদের রচনাধারা স্বচ্ছন্দ। উভয়ের মধ্যে কার আসন উচ্চতর তা নির্ণয় করা কঠিন। অলংকার প্রয়োগ বলরাম করেছেন

বেশী, জ্ঞানদাস কম। তবু বহুক্ষেত্রেই বলরামের অলংকার বাহ্যভূষণমাত্রে পর্যবসিত না হয়ে রসাঙ্গ হয়েছে। "তুমি মোর নিধি রাই" পদখানির অলংকার প্রকৃতপক্ষে অলংকার ধ্বনি। "হিয়ার ভিতর কে কৈল বাহির"—দর্শন দৃষ্টিতে বৈষ্ণবের রাধাতত্ত্ব; কিন্তু তত্ত্বকেই কেন্দ্র ক'রে কবি ফুটিয়েছেন কাব্যকমল। যার মর্মকোষে টলমল করছে অনুরাগ রূপ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রস। বলরাম রবীন্দ্রনাথকেও প্রভাবিত করেছেন। 'উর্বশী' কবিতার "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল" বলরামেরই "কোথা হইতে আইলে তুমি" ইত্যাদি অতুলনীয় পদের "মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেখে ও চরণ"—কেই মনে পড়িয়ে দেয়। বলরামের ঐ "তুমি মোর নিধি রাই"—এর কৃষ্ণের পাশে রেখে দেখতে ইচ্ছা করে জ্ঞানদাসের নিরাভরণ "রূপ লাখি আঁখি ঝুরে" এবং সাভরণ "আলো মুঞি কেন গেলু" পদ দু'খানিতে অঙ্কিত অনুরাগময়ী রাধার ব্যঞ্জনামধুর ভাবমূর্তিখানিকে। "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর" অথবা—

"রূপের পাথারে অাঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরাণ।"

পদটি প্রেমের দেশকালজয়ী কাব্যরূপ।

বলরামের "তুমি মোর নিধি"-র ছায়ায় রচিত কবিবল্লভের সুন্দর পদ "কি পুছসি অনুভব মোয়"—উক্তিটি অবশ্য রাধার। কবিবল্লভ শুধু ছায়াটুকুই নিয়ে তাকে নবতররূপে ঘনীভূত করেছেন। "কি পুছসি"-এর প্রায় সদৃশ পদ গোবিন্দদাসের "আধি কি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে"—আবেগ কম্পিত অথচ ব্যঞ্জনামধুর। সতীশচন্দ্রের মতে কবিবল্লভের তুলনায় গোবিন্দদাসের এই পদটি উৎকৃষ্ট। আমাদের মতে দুটি পদ দুইভাবে উৎকৃষ্ট। তুলনামূলক বিচার ঠিক চলে না। 'আধি কি আধ' পদের তাৎপর্য: "সুনয়নী"র কাছে কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, রাধার কাছে বিদ্যুতের মত। 'রসবতীর' কাছে কৃষ্ণস্পর্শ স্নিগ্ধরস, রাধার কাছে আগুনের জ্বালা। দুই চক্ষু ভরে যিনি কৃষ্ণকে দেখেন, ধন্য তিনি, তার চরণে রাধার প্রণাম; রাধার কিন্তু অতি ঈষৎ অপাঙ্গে কৃষ্ণকে দেখা অবধি 'রহত কি যাত পরাণ'। বস্তুত কৃষ্ণ প্রেমিকার জীবনই এইরূপ 'রহত কি যাত'। এ প্রেমে বিরুদ্ধের সমাবেশ কৃষ্ণ শ্যাম মেঘ, আবার বিদ্যুৎ; কৃষ্ণস্পর্শ রসস্নিগ্ধ, আবার জ্বালাময়। অদ্ভুত বোধাতীত প্রেম। রাধা তা জানে। 'প্রেমক লাগি জিউ' না ত্যাগ করে নশ্বরজীবনকেই তিনি কামনা করেন। এই দুদিনের জীবনে বিষামৃতময় কৃষ্ণ-প্রেমের যতটুকু তিনি আস্বাদন করতে পারেন, তাই তিনি করতে চান। গোবিন্দদাসের এই পদ বিদগ্ধমাধব নাটকে "জ্বায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়:" এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত এই শ্লোকেরই অনুবাদ—"সেই প্রেম যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন" স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কি পুছসি'-র মধ্যে যে রাগ পলে পলে নূতন হয়ে সতত আস্বাদিত (অনুভূত) প্রিয়কে

(প্রিয়াকেও) পলকে পলকে নবনবরূপে আস্বাদনীয় করে তোলে, বৈষ্ণরসশাস্ত্রের সেই অনুরাগের কথা। লক্ষভাবে কৃষ্ণানুভব করেও রাধা অনুভবের সীমা পান না—এ পদে রাধা এই কথাই বলেছেন। গোবিন্দদাসের রাধা ও কবিবল্লভের রাধা দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন—যদিও দুজনেই অনুরাগময়ী। এ অবস্থায় তুলনার বিচার কেন? "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তব হিয়া জুড়ন না গেল"র 'লাখ লাখ' অনাদি অনন্ত অর্থে কবি লেখেন নি, লিখেছেন বহু অর্থে তা পূর্ববর্তী 'জনম অবধি', 'কত মধু যামিনী' ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায়। পদখানিতে চণ্ডীদাসের 'তবু না বুঝিনু কালা তোমার পিরীতি'র এবং বিদ্যাপতির 'তহুঁ কৈছে মাধব কহ তহুঁ মোয়' এর রেশ বাজে। রবীন্দ্রনাথের কো 'তহুঁ বোলবি মোয়' এই সুরে বাঁধা। শশিশেখর "প্রতিদিবস নৌতনা রাই মৃগীলোচনা" এর রাইরূপ রাইনিষ্ঠ নয়। কৃষ্ণের রাই-অনুরাগ নিষ্ঠ। সবচেয়ে মূল্যবান গোবিন্দদাসের পদখানির ভনিতা; এ ভনিতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিবল্লভের নাম রয়েছে। ("গোবিন্দদাস ভনে. শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রসময়িখাদ")। 'কিপুছসি' এর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এটি বৈষ্ণবীয় পদ হয়েও সর্বদেশের সর্বকালের অনুরাগকাব্যে পরিণত হয়েছে। আর একখানি উৎকৃষ্ট পদ পরমানন্দ গুপ্ত (কর্ণপুর পরমানন্দ সেন নন) রচিত 'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে"। গৌরাঙ্গর প্রতি কবির অনুরাগের এই কবিতাটি ভাবাবেগময়ী, সালঙ্কারা; কিন্তু অলংকার রসকেন্দ্র থেকে সমুত্থিত বলে স্বচ্ছন্দবিকসিত। পদখানি সহজেই অসাধারণের দলে পড়ে।

বলরাম মধুর রসে যেমন বাৎসল্যরসেও তেমনি সিদ্ধ। "দাড়াইয়া নন্দের আগে গোপাল কান্দে অনুরাগে" পদখানিতে অভিমানী শিশু কৃষ্ণের যে রূপটি ফুটে উঠেছে, তা অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভাব-শিশু। তাকে অনুভব করা যায়, ধরা যায় না। কিন্তু বৈষ্ণবের শিশু-কৃষ্ণ অসীমের রক্তে মাংসে গড়া সীমায়িত রূপ। এ শিশু অমানবীয় হলে বৈষ্ণবভাবরস খণ্ডিত হয়। তাই মানব শিশুর স্বভাব পূর্ণমাত্রায় এতে বিদ্যমান। ঠোঁট ফুলিয়ে কান্নার সঙ্গে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজে সাধু সাজবার চেষ্টা, মাতা যশোমতীর নামে অনুযোগ ক'রে একটু বেশী আদর আদায়ের চেষ্টা কবির লেখনীমুখে যে অভিনব ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন যুগের শিশুকাব্য-রচয়িতার পক্ষে তা গৌরবের।

এতক্ষণ আমরা পদগুলির পৃথক কাব্যমূল্য বিচার করলাম। কিন্তু বৈষ্ণবপদগুলি এমন ভাবে সাজান যায় যাতে পূর্ববর্তী পদ পরবর্তী পদের উপর নির্ভরশীল হয় এবং সামগ্রিক ভাবে রস পুষ্টির সাহায্য করে। এই ধরণের রসপর্যায়ে সজ্জিত পদের সৃষ্টিকে পালাকীর্তন বলে। পাঠের ক্ষেত্রে অথবা কীর্তনের ক্ষেত্রে এই পালাকীর্তনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তখন পদগুলি আর পৃথকভাবে আস্বাদ্য থাকে না। একটি সমগ্র পালার অংশ বিশেষরূপে গৃহীত হয় এবং রসাস্বাদ সামগ্রিক ভাবে লাভ করা

যায়। বৈষ্ণবপদগুলি সকলই কীর্তন করে গাওয়া হয়। ফলে কীর্তনের মাধ্যমে তার আস্বাদও ভিন্নতর হয়।

॥ গীতিকবিতা-হিসাবে পদাবলীর মূল্য ॥

কবিমনের স্বতোৎসারিত অনুভূতির সর্বজনীন প্রকাশ গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য। এখানেই আখ্যান কাব্যের সঙ্গে গীতিকবিতার পার্থক্য। আখ্যান কবিতা Objective বা বস্তুমুখী আর গীতিকবিতা Subjective বা আত্মমুখী। আধুনিক গীতি কবিতা ব্যক্তিকবির অনুভূতির প্রকাশ। বৈষ্ণবপদাবলীকে বা কোন বিচ্ছিন্ন পদকে আধুনিক অর্থে গীতিকবিতা বলা যায় না। তার অনেকগুলি কারণ আছে।

মধ্যযুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জাগ্রত না হওয়ায় সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনা। অতএব বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি না থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, এটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কাব্য। এই সম্প্রদায় ধর্মীয় সম্প্রদায়। ভক্তিরসকে অবলম্বন ক'রে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে উঠেছিল সেই দর্শনকে অবলম্বন ক'রে পদাবলী রচিত। গীতিকবিতা কোন সম্প্রদায়ের প্রচার করে না। অতএব সঠিকভাবে বৈষ্ণব পদগুলি গীতিকবিতা নয়। রাধাকৃষ্ণের লীলারস প্রচার এবং সাধনায় বিভিন্ন স্তর বিন্যাস পদগুলির প্রায় সকল ক্ষেত্রে বিদ্যমান। চৈতন্য পরবর্তী পদাবলীর মধ্যে এই দর্শন আরও বেশী লক্ষ্য করা যায়। তথাপি কীর্তিমান কবির সংখ্যা কম নয়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সকল সীমারতিকে স্বীকার করে রাধার হৃদয় বেদনা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পদকর্তা যে পদগুলি রচনা ক'রেছেন তাতে অনেক সময় মানবাত্মার শাশ্বত হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। অনেক সময় মনে হয় সম্প্রদায় ও দর্শনের ঊর্ধ্বে এমন এক কাব্যচেতনা ছিল যা চিরন্তন সাহিত্যরূপে বৈষ্ণব পদাবলীকে মর্যাদা দিতে পারে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতি-সাহিত্যের অন্যতম হিসাবে তা পরিগণিত হবে। তথাপি আধুনিক অর্থে এগুলি গীতিকবিতা নয়। কারণ সকল সময়েই রাধাকৃষ্ণের হৃদয়ের আকুলতা ও অনুভূতি নিয়ে পদগুলি রচিত। একমাত্র ভণিতায় কবির নামটুকু ছাড়া কবিকে জানবার সুযোগ আর কোথাও নেই—কবির অনুভূতি তো দূরের কথা।

তবুও রবীন্দ্রনাথ যে প্রশ্ন করেছেন "শুধু কি বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান?"—সেই প্রশ্ন আমাদের মনেও সদাজাগ্রত। রাধিকার মুখচ্ছবি, অনুভূতি, রূপ বর্ণনার বাস্তব চিত্র বৈষ্ণবরা কোথা থেকে পেয়েছিলেন। কার মুখ দেখে রাধিকার মুখ মনে পড়েছিল তা আমরা জানি; তবে এটা জানি যে কবির বাস্তব অনুভূতির রসসিক্ত প্রকাশই কবিতার আলম্বন বিভাব। যে আবেগ ও আনন্দ কবি মনে স্বতোৎসারিত

সেই আবেগ ও আনন্দের পটভূমি একটা থাকেই। মধ্য যুগে প্রত্যক্ষভাবে সেই পটভূমির নির্মাণ করা ছিল অসম্ভব। তাই প্রতিভাবান কবিরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন ক'রে তাঁদের হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছিল সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই।

পৃথকভাবে বিচার করলে এক একটি পদের মধ্যে গীতিরসের অসাধারণ প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস, জগদানন্দ, কবিবল্লভ প্রমুখ কবিদের পদগুলির মধ্যে চিরন্তন মানব-মানবী মিলনের ও বিরহের যে অনুভূতিগুলি রূপায়িত হয়েছে তা শাশ্বতকালের প্রেমের কাব্যরূপে স্থান পাবে। বৈষ্ণব দর্শনের পটভূমি রাধাকৃষ্ণের বিরহ-মিলনের তত্ত্বগত দিকটি বাদ দিলে এগুলি নিখাদ প্রেমের কবিতা হিসাবে পরিগণিত হবে। তথাপি এগুলিকে গীতিকবিতা অ্যাখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ কোন সম্প্রদায়ের বিশেষ দার্শনিক প্রচারের উদ্দেশ্যে গীতিকবিতা লেখা হয় না। আধুনিক গীতিকবিতায় আমরা ব্যক্তিকবিকে চাই এবং তার অনুভূতির সার্বজনীন রূপ অনুভব করি—যা বৈষ্ণব পদে কোন পদকর্তার ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না। সেখানে ব্যক্তি অপ্রধান, সম্প্রদায় ও দর্শন প্রধান॥

পদাবলী পাঠ

(১) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ

গোবিন্দদাস

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলকমুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাব-কদম্ব ॥
কি পেখলুঁ নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চরু
সুরধুনী তীরে উজাড় ॥
চঞ্চল চরণ কমলতলে ঝঙ্করু
ভকত ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুবধ সুরাসুর ধাবই
অহর্নিশি রহত অগোর ॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণে
অখিল মনোরথ পুর
তাকর চরণে দীনহীন বঞ্চিত
গোবিন্দদাস বহু দূর

[আলোচ্য পদটি কবি গোবিন্দদাস রচিত গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের অন্তর্গত। কবি গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের মহাপ্রয়াণের পর আবির্ভূত হয়েছিলেন। ফলে তাঁর অন্তরে চৈতন্যদেবকে দর্শনের যে আকাঙ্খা ছিল তা এই পদে ব্যক্ত হয়েছে]

শব্দার্থ : নীরদ নয়নে :—জল প্রদানকারী মেঘের ন্যায় চৈতন্যদেবের দুটি চোখ। কারণ তাঁর নয়নদুটি থেকে অবিরত জলধারা বর্ষিত হচ্ছে। **পুলক মুকুল অবলম্ব :** অবিরত বৃষ্টিপাত হলে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন নবমুকুলের সঞ্চার হয় তেমনি গৌরাঙ্গ দেহে রোমাঞ্চ রূপ মুকুলের উদ্গম হচ্ছে। জীবন্ত প্রেমভাবের বিগ্রহ চৈতন্যদেবকে এখানে পুষ্পতরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। **স্বেদমকরন্দ :** শুভ্র ফুলের মধু বা পুষ্পরস। **বিন্দু বিন্দু চুয়ত :** স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু বা ফোঁটা

ফোঁটা যেমন ঝরে পড়ে চৈতন্যদেবের অঙ্গ নিঃসৃত ঘর্মজলও তেমনি ঝরে পড়েছে। **বিকসিত ভাব-কদম্ব** :—অবিরত বারিপাতে যেমন বৃক্ষের মুকুল উদ্‌গত হয় তেমনি চৈতন্যদেবের দেহেও নানা ভাবকদম্ব প্রস্ফুটিত হচ্ছে। **পেখলুঁ** : দেখলাম। **গৌর কিশোর** :—কিশোর বয়স্ক গৌর বা চৈতন্যদেব। **অভিনব হেম কল্পতরু সঞ্চর** : গৌরাঙ্গের দেহ যেন একটি সোনার বৃক্ষ। **সঞ্চরু** : ঘুরে বেড়াচ্ছে। **অভিনব** : সম্পূর্ণ নূতন। এর পূর্বে আর এমন প্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ দেখা যায় নি। **সুরধুনী তীরে উজোর** : গঙ্গার তীর উজ্জ্বল করে ভ্রাম্যমান। **চঞ্চল চরণ কমল……ভোর** : ভক্তরূপী ভ্রমরগণ তাঁর পদতলে বিভোর হয়ে তাঁর নানা গুণকীর্তন করছেন। **পরিমলে লুবধ** : সুগন্ধে লুব্ধ হয়ে। **সুরাসুর** : সুর অথবা অসুর নির্বিশেষে। **ধাবই** : ধাবিত হচ্ছে। **অহর্নিশি রহত আগোর** : সর্বদা অজ্ঞান বা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। **অবিরত…প্রেম বিতরণে** : সর্বদা প্রেমরূপ শ্রেষ্ঠফল বিতরণ করে **অখিল…পুর** :—বিশ্বজনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। **তাকর চরণে** :—তাঁর বা চৈতন্য দেবের চরণ থেকে। **দীনহীন… বহুদূর** : অকিঞ্চন গোবিন্দদাস বহু দূরে রয়েছেন।

বস্তুসংক্ষেপ :—কবি গোবিন্দদাস এই পদে চৈতন্যদেবের একটি অসাধারণ ভাবমূর্তি রূপায়িত করেছেন। ভাবাবেশে শ্রী গৌরাঙ্গের নয়ন থেকে অবিরত বারিপাত হচ্ছে এবং সেইজন্য তাঁর চক্ষুদুটি মেঘের আকার ধারণ করেছে। বৃষ্টিপাতের ফলে বৃক্ষে বৃক্ষে যেমন মুকুল উদগত হয় তেমনি চৈতন্যদেবের দেহে রোমাঞ্চরূপ মুকুল উদ্‌গত হচ্ছে। কবি এই নবীন ও আশ্চর্যসুন্দর গৌরাঙ্গকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং কবির মনে হচ্ছে যেন একটি সোনার কল্পবৃক্ষ গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর চরণ তলে ভক্তগণ ভ্রমরের মতো নানা গুণগান করছে। তাঁর সুগন্ধে মুগ্ধ হয়ে সুরাসুর তার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তার পদতলে দিবানিশি অচেতন হয়ে পড়ে আছে। গৌরাঙ্গ অবিরত যে প্রেমরত্ন বিতরণ করেছেন তাতে পৃথিবীর সকল মানুষের মনোবাসনা পূর্ণ হয়। কবি গোবিন্দদাস তার চরণ থেকে বঞ্চিত কারণ তিনি চৈতন্যদেবকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। তাই তিনি দীনহীন মানুষের ন্যায় দূরে পড়ে আছেন।

(২) চণ্ডীদাস / পূর্বরাগ

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে তার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়॥
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে চণ্ডীদাস কুলবতী কুলনাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

(পদটি পূর্বরাগের অন্তর্গত। কৃষ্ণনাম শ্রবণে রাধার হৃদয়ে যে তীব্র আকর্ষণ দেখা দিয়েছে সেই আকর্ষণ কোন পার্থিব অনুভূতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। নামের মাধুর্য শ্রবণে ভগবৎ প্রেমের কথা বলা হয়েছে।)

শব্দার্থ: **সই**—সখী। **শ্যাম নাম**—কৃষ্ণ নাম। **মরমে**—হৃদয়ে। **পশিল**—প্রবেশ করিল। **জপিতে**—জপ করিতে। **পরতাপে**—প্রতাপে। **ঐছন করিল গো**—ঐ রকম করল। **পরশে**—স্পর্শে। **যুবতী ধরম**—যুবতী নারীর ধর্ম। **পাসরিতে**—ভুলতে। **পাসরা না যায় গো**—কিছুতেই ভোলা যায় না। **যৌবন যাচায়**—রূপ যৌবন অযাচিতভাবে দান করে।

বস্তু সংক্ষেপ: শ্রীরাধা শ্যাম নাম শ্রবণে আত্মহারা হয়ে পড়েছেন। কানের ভিতর দিয়ে সে নাম হৃদয়ে প্রবেশ করেছে এবং মন প্রাণ আকুল করেছে। শ্যাম নাম অর্থাৎ কৃষ্ণ নাম এমনই আকর্ষণীয় যে তা উচ্চারণ না ক'রে পারা যায় না। নাম জপ করতে করতে দেহ অবশ হয়ে পড়ছে। এখন কেবল তাঁর এই চিন্তা কিভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। যার নামের প্রভাবে শরীর মন আচ্ছন্ন হয় তার অঙ্গের পরশে যে কি হবে তা চিন্তার অতীত। কৃষ্ণকে দেখার পর যুবতী ধর্ম রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। যতবার তাঁকে ভোলবার চেষ্টা করেন ততবারই রাধিকা বিফল হন। তাই এই সমস্যার সমাধানের উপায় কি তা ভাবছেন। চণ্ডীদাস বলছেন যে শ্যামকে দেখে কুলবতী নারীরা রূপ যৌবন ও মন যেচে উৎসর্গ করেন।

(৩) চণ্ডীদাস / পূর্বরাগ

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু'হাত তুলি॥
একদিঠি করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে॥

(এই পদটিও চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের।) কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর রাধিকা যৌবনে যোগিনী সেজেছেন। জগৎ তাঁর কাছে কৃষ্ণময় হয়ে উঠেছে।

শব্দার্থ: **অন্তরে**—মর্মে। **বিরলে**—নির্জনে। **থাকয়ে**—বসে থাকে। **একলে**—একাকী। **ধেয়ানে**—ধ্যানে বা মনে মনে। **নয়ন তারা**—চোখের তারা। **সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে**—মেঘের রঙ ও কৃষ্ণের রঙ এক বলে রাধা মেঘের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন। **রাঙা বাস**—লাল রঙের কাপড়। **যোগিনী পারা**—যোগিনীর মত। **ফুলের গাঁথনি**—রাধার কেশে ফুলের সজ্জা আছে। **দেখয়ে**—দেখে। **খসায়ে**—খসাইয়া বা খুলিয়া। **চুলি**—চুল। **হসিত বয়ানে**—হাসি মুখে। **একদিঠি**—একদৃষ্টে। **কালিয়া বঁধু**—কৃষ্ণ। **সনে**—সাথে।

ভাব বস্তু: রাধা কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন। তাঁর অন্তর গভীর ব্যথায় পরিপূর্ণ। এই বেদনার মধ্যেও একটি আনন্দের অনুভূতি বিদ্যমান। তিনি নির্জনে একাকী বসে থাকেন; কারও কথা শোনেন না। সর্বদাই মেঘের দিকে তাকিয়ে আছেন কারণ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তাকে কৃষ্ণের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার চোখের তারাও নিশ্চল। তিনি আহার ত্যাগ করেছেন। পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র। তাকে দেখে যোগিনী মনে হয়। ফুল সজ্জিত বেণী খুলে চুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন—যেহেতু চুলের রঙের সঙ্গে কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের মিল আছে। তিনি হাসি মুখে মেঘের দিকে

তাকিয়ে থাকেন এবং মনে মনে কি যেন বলেন। ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের ন্যায় নীল। তাই একদৃষ্টে তাদের কণ্ঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন। চণ্ডীদাস বলেন যে এইভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে যেন শ্রীরাধিকার নতুন পরিচয় হচ্ছে।

(৪) বিদ্যাপতি / পূর্বরাগ

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহে দুহুঁ দোঁহা হোয়॥

(আলোচ্য পদটি বিদ্যাপতি লিখিত অনুরাগ পর্যায়ের পদ। ভক্ত ভগবানের রহস্যের তল খুঁজে পান না। তাই স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে 'মাধব তুমি কে?' পরে নিজেই উত্তর খুঁজে পান যে দুজন দুজনেরই—ভগবান যেমন ভক্তের তেমনি ভক্তও ভগবানের।)

শব্দার্থ: **হাথক**—হাতের। **দরপণ**—দর্পণ, আয়না। **মাথক**—মাথার। **নয়নক**—নয়নের। **অঞ্জন**—কাজল। **মুখক**—মুখের। **তাম্বুল**—পান। **হৃদয়ক**—হৃদয়ের। **মৃগমদ**—কস্তুরী (অর্থাৎ লেপন করা কস্তুরী)। **গীমক**—গলার। **দেহক**—দেহের। **সরবস**—সর্বস্ব। **গেহক**—গৃহের। **পাখিক**—পাখির। **পাখ**—পাখা। **মীনক**—মাছের। **পাণি**—জল। **জীবক**—জীবের। **হাম**—আমি। **ঐছে**—এমন। **তুহুঁ**—তুমি। **কৈছে**—কেমন। **মাধব**—কৃষ্ণ। **মোয়**—আমাকে। **দুহুঁ**—দুইজনে। **হোয়**—হয়।

ভাব বস্তু: রাধা কৃষ্ণকে বলছেন যে কৃষ্ণ তার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, চোখের কাজল, মুখের তাম্বুল, বক্ষের মৃগমদ চিত্র পংক্তি, গলার হার। তিনি দেহের সর্বস্ব, গৃহের সার। কৃষ্ণ তার কাছে পাখির পাখা, মৎস্যের জল স্বরূপ। রাধা কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবেসেও তিনি যে প্রকৃত কে, তা জানতে পারেন নি। বিদ্যাপতি বলেন যে রাধা কৃষ্ণ দুজনেই দুজনের মত, অর্থাৎ অনুরাগে ও ভালবাসায় দুজনই অনন্ত।

(৫) জ্ঞানদাস / পূর্বরাগ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই কি আর বলিব।
যে পণ কর‍্যাছি মনে সেই সে করিব॥
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥
দেখিতে যে কি সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে বহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি॥

(জ্ঞানদাস রচিত রূপানুরাগ পর্যায়ের পদ)

শব্দার্থ : **আঁখি**—চোখ। **ঝুরে**—ঝ'রে পড়ে। **আঁখি ঝুরে**—চোখ দিয়ে জল পড়ে। **ভোর**—বিভোর। **হিয়া**—হৃদয়। **পরশ**—স্পর্শ। **পিরীতি**—প্রীতি। **কর‍্যাছি**—ক'রেছি। **আরতি নাহি টুটে**—আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। **দরশ**—দর্শন, দেখা। **পরশ**—স্পর্শ। **আউলাইছে**—এলাইয়া পড়িতেছে। **মধু ধার**—মধুর ধারা। **লহু লহু**—মৃদু মৃদু। **পহুঁ**—প্রভু। **পিরীতির সার**—প্রেমের ভগবান। **গুরু গরবিত**—গুরুজন। **পুরয়ে**—পূর্ণ হয়। **পর সঙ্গে**—প্রসঙ্গে। **পরকার**—প্রকার। **অনিবার**—অবিরত। **যতেক**—যত লোক। **আগুনি**—আগুন।

ভাব বস্তু : কৃষ্ণের রূপসৌন্দর্য দেখার জন্য রাধার অন্তর ব্যাকুল এবং সেইজন্য তাঁর চক্ষু অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। কৃষ্ণের গুণে তাঁর মন বিভোর হয়ে থাকে। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের জন্য তাঁর প্রতি অঙ্গ তৃষিত হয়ে থাকে। কৃষ্ণের হৃদয় স্পর্শের জন্য রাধার হৃদয় ব্যাকুল। তাঁর প্রেমের জন্য রাধার হৃদয় আকুল।

রাধা কৃষ্ণের জন্যে সকল কিছু ত্যাগ করতে পারেন। কৃষ্ণের রূপ শতবার দেখার পরও তাঁর হৃদয় তৃপ্ত হয় না। বরং বারবার দেখবার বাসনা জাগ্রত হয়। কৃষ্ণ দর্শনের আনন্দ ও কৃষ্ণের রূপ মাধুরী ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এমন কি তাঁর দর্শন ও স্পর্শের জন্য শরীর এলিয়ে পড়ছে বা বিবশ হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণের হাসিতে যে মধু ঝরে। প্রেমের শিরোমণি প্রভু কৃষ্ণ লীলাময়। রাধা গুরুজনদের মাঝে ও সখীদের সঙ্গে বাস করেন। শ্যামের প্রসঙ্গ উঠলেই পুলকেই দেহ ভরে যায় এবং সেই পুলক নানা প্রকারে গোপন করার চেষ্টা করেন। আর রাধার নয়নে অবিরত অশ্রু ঝরে। বাড়ীর সবাই রাধার এই অবস্থা দেখে নানা কথা বলে। জ্ঞানদাস বলেন যে কৃষ্ণ-রাধিকার প্রেমলীলায় পার্থিব লাজ লজ্জার কোন স্থান নেই।

(৬) চণ্ডীদাস / পূর্বরাগ ও অনুরাগ

এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি॥
দুহুঁ কোরে কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥
জল বিনু মীন যে কবহু না জিয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥
ভানু কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥
চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা।
কুসুমে মধুপ কহি সেহো নহে তুল।
না যাইলে ভ্রমর আপনি না দেয় ফুল।
কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।

(পদটি অনুরাগ পর্যায়ের। চণ্ডীদাস অসামান্য কবিত্ব শক্তির সাহায্যে রাধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেম ও অনুরাগের রূপ চিত্র রচনা করেছেন। এখানে অনেকগুলি লৌকিক উপমান ব্যবহার ক'রে রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমের কাছে সেগুলি কত তুচ্ছ তা বর্ণনা করেছেন।)

শব্দার্থ :—পরাণে—প্রাণে। বান্ধা—বাঁধা। আপনা-আপনি—নিজে

নিজে। রাধাকৃষ্ণের প্রাণ আপনা আপনি অর্থাৎ স্বতঃই পরস্পর বদ্ধ। **দুহুঁ**—দুই জনে। **কোরে**—ক্রোড়ে, কোলে। **বিচ্ছেদ ভাবিয়া**—মিলনের মধ্যেও রাধা ও কৃষ্ণের প্রাণ আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। **আধ তিল**—এক মুহূর্ত। **বিনু**—বিনা। **মীন**—মাছ। **কবহুঁ**—কখনও। **জীয়ে**—বাঁচে। জল ছাড়া মাছ যেমন কখনও বাঁচে না। **ভানু**—সূর্য। **সেহো এমন নয়**—সেও এরূপ নয়। **হিমে**—শীতে। **জলদ**—মেঘ। **সময় নহিলে**—বর্ষা না এলে। **মধুপ**—ভ্রমর। **সেহো নহে তুল**—সেও রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুল্য নয়। **না যাইলে…কুল**—ভ্রমর যদি ফুলের ওপর না বসে, তবে মধুপান করতে পারে না। অর্থাৎ ফুল নিজের আগ্রহে মধু দেয় না। **কি ছার**—কি তুচ্ছ। **চান্দ**—চাঁদ।

ভাববস্তু :—কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গভীরতা ব্যক্ত করেছেন। একজনের প্রাণ অন্যের প্রাণের মধ্যে আপনা আপনি বাঁধা পড়েছে। মিলনের মধ্যেও দুজনে বিচ্ছেদের কল্পনায় কাতর। একমুহূর্তও একে অন্যেকে না দেখে থাকতে পারেন না। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না তেমনি তাঁরা একে অপরকে ছাড়া বাঁচতে পারেন না। মানুষের মধ্যে এমন গভীর ভালবাসা কোথাও শোনা যায় না। সূর্য ও কমলের ভালবাসা এমন গভীর নয়, কারণ হিমে কমল মারা গেলেও ভানু সুখেই থাকে। চাতক ও মেঘের ভালবাসা এত গভীর নয় কারণ সময় না হলে মেঘ চাতককে একবিন্দু জল দেয় না। কুসুম ও ভ্রমরের ভালবাসাও রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার সঙ্গে তুলনীয় নয়, কারণ কুসুম স্বেচ্ছায় মধু দান করে না। চকোর ও চাঁদের ভালবাসাও রাধাকৃষ্ণের ভালবাসার মত নিবিড় নয়। চণ্ডীদাস বলেন যে ত্রিভুবনে এমন ভালবাসার তুলনা মেলা ভার।

(৭) কবিবল্লভ / পূর্বরাগ ও অনুরাগ

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনু রাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঙায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন ন গেল ॥
কত বিদগধ জন রসে অনু গমন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক ॥

(আলোচ্য পদটি বৈষ্ণবপদাবলীর অনুরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত। কবিবল্লভ ভনিতায় বিদ্যাপতি পদটি রচনা করেছেন বলে অনুমিত হয়। তবে বিদ্যাপতি নাম না থাকায় কেউ কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। তথাপি কবিতাটির ঐকান্তিকতা বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদের আত্মনিবেদনের সুরটিকে মনে করিয়ে দেয়)

শব্দার্থ ঃ—**পুছসি**—জিজ্ঞাসা করিতেছ। **অনুভব**—অনুভূতি। **সোই**—সেই। **অনুরাগ**—ভালবাসা। **বাখানিতে**—জানাতে বা ব্যাখ্যা করতে। **তিলেতিলে**—প্রতি মুহূর্তে। **নূতন হোয়**—নবরূপ লাভ করে। **সোই পিরীতি ……হোয়**—কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ কখনও ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সেই প্রেম নিত্য ও নবীন। প্রতিমুহূর্তেই তা নূতনত্বের আস্বাদ বহন করে। অর্থাৎ তা নিত্য নবরূপ লাভ করে। **হাম**—আমি। **নেহারলুঁ**—দেখিলাম। **তিরপিত**—তৃপ্ত। **ভেল**—হইল। **বোল**—বাণী। **শ্রবনহি**—কানের মধ্যে। **শুনলুঁ**—শুনিলাম। **শ্রুতিপথে পরশ না গেল**—কানের মধ্যে গিয়েও পুরোপুরি স্পর্শ করল না অর্থাৎ বারবার শুনেও শোনা ইচ্ছা দূর হল না। **মধুযামিনী**—মধুরাত্রি। **রভসে**—মিলনের আনন্দে। **গোঁওায়লু**—কাটাইলাম। **বুঝনু**—বুঝিলাম। **কৈছন**—কিরূপ। **কেল**—মিলন। **লাখ লাখ যুগ**—লক্ষ লক্ষ যুগ। **হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ**—হৃদয়ে হৃদয়ে নিবদ্ধ হলাম। **জুড়ন না গেল**—জুড়াইল না। **বিদগধ**—বিদগ্ধ। **রসে অনুগমন**—রসে নিমগ্ন হইয়া। **অনুভব কাহু না পেখ**—কারও মধ্যেই সেই গভীর প্রেমানুভূতি দেখলাম না।

ভাববস্তু ঃ—রাধা সখীকে বলেছেন যে কৃষ্ণপ্রেম সম্পর্কে তার মনের ভাব ব্যাখ্যার অতীত। সেই প্রেম কখনও এক অবস্থায় থাকে না, তা নিত্য নবরূপে প্রকাশিত হয়। জন্মকাল থেকে রাধা কৃষ্ণের রূপমাধুর্য দর্শন করে আসছেন তথাপি তার নয়ন তৃপ্ত হয়নি। কৃষ্ণের মধুর বাণী শ্রবণ পথে প্রবেশ করেও পুরোপুরি অন্তরকে স্পর্শ করে না—আবার সেই মধুর বাণী শ্রবণ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। কতরাত্রি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে ও ক্রীড়াকৌতুকে অতিবাহিত করেছেন রাধা তথাপি প্রকৃত মিলনের স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। তিনি লক্ষ লক্ষ যুগ ধরে কৃষ্ণের হৃদয়ের সহিত নিজ হৃদয় মিশিয়ে রেখেছেন। তথাপি তাঁর হৃদয় শান্ত হল না। কত বিদগ্ধ ও রসজ্ঞ ব্যক্তি তিনি দেখেছেন কিন্তু কারও মধ্যে প্রকৃত প্রেমের অনুভূতি

তিনি দেখতে পান নি। কবিবল্লভ বলেন যে প্রাণ শান্ত করার জন্য লক্ষ লোকের মধ্যে একজনকেও পাওয়া যায় না।

(৮) গোবিন্দদাস (অভিসার)

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি॥
কর যুগে নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
কবকঙ্কণ পণ ফণীমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥
গুরুজন বচনে বধিরসম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমান॥

(আলোচ্য পদটি চৈতন্যোত্তর যুগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দদাস রচিত। পদটি অভিসার পর্যায়ের অন্তর্গত। "অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ"—রাধিকা প্রস্তুত হচ্ছেন অভিসারের জন্য। তার একটি বাস্তব চিত্র এখানে বর্ণিত আছে। এটি আসন্ন সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপযোগী হবার অভ্যাসযোগ। সাধনার পথে সর্বাধিক ভীতিকে জয় করার চেষ্টা করছেন রাধিকা)।

শব্দার্থ:—**কণ্টক গাড়ি**—কাঁটা পুঁতিয়া। **কমলসম পদতল**—রাধার পদতল পদ্মফুলের ন্যায় সুন্দর। **মঞ্জরী**—নূপুর। **চীরহি**—বস্ত্রদ্বারা। **ঝাঁপি**—ঢাকিয়া। রাধার পদযুগলে নূপুর বাঁধা রয়েছে। চলবার সময় শব্দ হতে পারে। তাতে অভিসারের কথা সকলে জেনে ফেলবে। তাই তিনি নূপুর বস্ত্রের মধ্যে ঢেকে নিয়ে চলেছেন। **গাগরি বারি**—কলসীর জল। **ঢারি**—ঢালিয়া। **চলতহি**—চলিতেছেন।

অঙ্গুলি চাপি—পায়ের আঙ্গুল চাপিয়া। **মাধব**—কৃষ্ণ। **তুয়া**—তোমার। **অভিসারক**—অভিসারের। **লাগি**—জন্য। **দুতর**—দুস্তর। **পন্থ**—পথ। **ধনি**—যুবতী। **সাধয়ে**—সাধনা করিতেছে। **মন্দিরে**—ঘরে। **যামিনী জাগি**—রাত্রি জাগিয়া। রাধাকে অনেক দুস্তর পথ অতিক্রম করতে হবে। পথে কত বিপদ আপদ। রাধা সেই পথ অতিক্রম করে কৃষ্ণের কাছে অভিসারে যাবার সাধনা করছেন। **করযুগে**—হস্তদুটি দ্বারা। **মুদি**—ঢাকিয়া। **চলু**—চলিতেছে। **ভামিনী**—নারী। **তিমির**—অন্ধকার। **পয়ানক**—কাটাইবার জন্য। **আশে**—আশায়। **কর কঙ্কন পণ**—হাতের কঙ্কন দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া। **ফণিমুখ বন্ধন**—সর্পের মুখ বন্ধ করবার কৌশল। **শিখই**—শিক্ষা করেন। **ভুজগ গুরু**—সর্পের গুরু—ওঝা। **মানই**—মানে। **আন**—এক। **মুগধী**—মুগ্ধা। **হাসই**—হাসেন।

ভাববস্তু :—রাধা অভিসারের পথে যাত্রা করবেন। সেইপথ অত্যন্ত কঠিন। তাই অভ্যাসের দ্বারা সেই দুস্তর পথ অতিক্রম করবার চেষ্টা করছেন। অন্ধকার রাত্রি। পথ পিচ্ছিল। মঞ্জীরের শব্দ অন্যকে সচকিত করে। তাই মাটিতে কাঁটা রোপন করে জল ঢেলে আঙ্গুল টিপে টিপে চলবার চেষ্টা করছেন রাধা। গৃহে সারা রাত্রি জেগে এই কঠিন অভ্যাসযোগে তিনি রত আছেন। অন্ধকার রাত্রে পথ চলতে হবে তাই করতল দ্বারা নয়ন বন্ধ করে পথ চলবার চেষ্টা করছেন। পথে সর্পদংশন করতে পারে। তাই করকঙ্কণের বিনিময়ে সর্পগুরুর কাছে সর্পকে বশ করবার মন্ত্র শিখছেন। এইভাবে অভ্যস্ত রাধা অমনোযোগী হওয়ায় গুরুজনের কথা এক শুনতে অন্য শোনেন আর মুগ্ধার মত হাস্য করেন।

(৯) বংশী শিক্ষা ও নৃত্য / চণ্ডীদাস

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এত কভু নহে শ্যাম রায়।
ইহার গৌরবরণ করে আলো।
চূড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু।
এত নহে নন্দসুত কানু॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।

এ না বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপখানি।
ইহার বামে দেখি চিকন বরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী।
সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী।
কোথায় গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত।
হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

["শ্রীরাধা বাঁশী শিখিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বলিলেন, আমার ন্যায় বেশভূষা পর, আমায় ন্যায় ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াও তাহা না হইলে আমার বাঁশী বাজিবে না। শ্রীমতী তখন অগত্যা তাহাই করিলেন, তিনি নিজের শাড়ী শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া পীতধড়া ও চূড়া পরিলেন। সখীরা দূরে বনে ফুলচয়নে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে আসিতে শ্রীমতির বাঁশী শুনিয়া বলিতেছেন—আজ কে বাঁশী বাজাইতেছেন? ইনি তো কখনও শ্যাম নহেন। ইহার গৌরবর্ণে বন আলো করিয়াছে।"—বৈষ্ণবপদাবলী ক: বি:]

শব্দার্থ:—**আজু**—আজ। **মুরলী**—বংশী। **শ্যামরায়**—কৃষ্ণ। **গৌরবরণে** ফর্সা রঙে। **আল**—আলো। **চূড়াটি**—কৃষ্ণের মাথায় মোহন চূড়া। **কান্তি**—বর্ণ। **তনু**—দেহ। **নন্দসুত কৃষ্ণ**—রাজা নন্দের পালিত পুত্র। **নবীন**—নূতন। **নটবর**—নর্তক। **কথি**—কোথায়। **বনাইল**—তৈরী করিল। **চিকন বরনী**—কৃষ্ণবর্ণা। **সুন্দরী**—প্রেমিকা। **ঠারাঠারি**—কানাকানি। **কুঞ্জে**—উদ্যানে। **কমলিনী**—রাধা। **দোঁহার চরিত**—দুই জনের বেশপরিবর্তন।

বিষয়বস্তু:—রাধা কৃষ্ণের কাছে বংশী শিক্ষা করতে চাইলে কৃষ্ণ বললেন যে রাধাকে পীতধড়া ও মোহন চূড়া পরিধান করে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে হবে; না হলে বাঁশী বাজবে না। তখন রাধা নিজের শাড়ী কৃষ্ণকে দিয়ে কৃষ্ণের সাজে সজ্জিত হয়ে বাঁশী বাজাতে লাগলেন। সখীরা ফুল তুলতে বনে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলছেন যে আজ কে বাঁশী বাজায়। এ ত কৃষ্ণ নয়। এঁর গৌরবর্ণে বন আলো করেছে। বংশীধারী রাধিকার মাথায় চূড়া বাঁধা। কৃষ্ণের দেহের বর্ণ ইন্দ্রনীল। ইনি তো নন্দের পুত্র কানু নন। রূপে ইনি নবীন। এরূপ নটবর বেশ কোথায় পেলেন। এই অসামান্য রূপরাশি কে নির্মাণ করল। এর পাশে কৃষ্ণবর্ণা এক সুন্দরী। বোধহয় এরই প্রেমিকা

হবেন। সখীরা বলতে লাগল কুঞ্জকাননে কৃষ্ণ রাধা ছিলেন। তাঁরা কোথায় গেলেন। আজ তাদের কাছে সবই বিপরীত মনে হল। বোধহয় এঁরা বিপরীত বেশ ধারণ করেছেন। চণ্ডীদাস মনে মনে হেসে বলছেন এইরূপ কোন্ দেশে দেখা যাবে।

(১০) প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপনুরাগ / চণ্ডীদাস

কি মোহিনী জান বঁধূ কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি॥
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।
কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥
বঁধূ যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥

[এটি আক্ষেপানুরাগ রসপর্যায়ের কবিতা। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগে চণ্ডীদাস অতুলনীয়। প্রেমের গভীরতায় প্রথম দুই ছত্রের অনুযোগের পর চণ্ডীদাসের রাধা দিব্যশক্তির অধিকারী হয়েছেন—সেখানে আপনপর ঘর বাহির সব একাকার হয়ে গেছে। দিব্য দৃষ্টিতে প্রেম সকল কিছুই অনুভব করতে পারে।]

শব্দার্থ :—মোহিনী—মায়া বা যাদু। **অবলার**—বলহীন নারীর। **অবলার প্রাণ⋯হেন**—রাধা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, কৃষ্ণ ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। কৃষ্ণনাম রাধার জীবন হরণ করেছে। তাই রাধা মনে করেন কৃষ্ণের মত কেহই অবলা নারীর প্রাণ হরণ করতে পারে না। **ঘর কৈনু বাহির**—ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। **বাহির কৈনু ঘর**—বাহিরের জগতকে ঘরের মধ্যে আনলাম। **রাতি ⋯রাতি**—কৃষ্ণকে ভালবেসে রাধা এমনই আত্মতন্ময় যে তার নিকট দিনরাত্রির ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে গেছে। **পর কৈনু⋯পর**—কৃষ্ণ রাধার নিকট পরপুরুষ। তথাপি এই পরপুরুষকেই রাধা আপন করে নিয়েছেন, আর নিজের

স্বামীকে করেছেন পর। **বুঝিতে নারিনু……পিরীতি**—রাধা কৃষ্ণের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন তথাপি কৃষ্ণের প্রেমের রীতি তিনি আজও স্পষ্ট বুঝতে পারেন নি। **বিধি**—বিধাতা। **সিরজিল**—সৃজন করিল। **শেঁওলি**—শ্যাওলা। **কোন বিধি…শেঁওলি**—রাধা নিজেকে স্রোতে ভাসমান শেওলার মত অসহায় মনে করেছেন। কৃষ্ণপ্রেমের প্রবাহে অসহায় ভাবে রাধা ভেসে চলেছেন। **যদি তুমি…হও**—যদি কৃষ্ণ রাধার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। **বাশুলী**—বাশুলী দেবী। ইনি লৌকিক দেবী। চণ্ডীদাস এই দেবীর উপাসক ছিলেন।

ভাববস্তু ঃ—রাধা কৃষ্ণকে বলেছেন যে কৃষ্ণ কত মায়াই না জানেন। অবলা নারীর প্রাণ নিতে কৃষ্ণের মত আর কেউ নেই। তিনি ঘরকে বাহির করেছেন আর বাহিরকে করেছেন ঘর। রাত্রিকে করেছেন দিন আর দিনকে করেছেন রাত্রি। পরকে তিনি আপন করেছেন, আপনকে করেছেন পর। তথাপি তিনি কৃষ্ণ প্রেমের রহস্য বুঝতে পারেন নি। বিধাতা তাকে স্রোতের শেওলা করে গড়ে তুলেছেন। কৃষ্ণ প্রেমের স্রোতে তিনি শেওলার মত ভেসে যাচ্ছেন। রাধার এমন কেউ নেই যাকে বন্ধু বলে ডাকতে পারেন। কৃষ্ণ যদি তার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন তবে তিনি তার সম্মুখে মৃত্যুবরণ করবেন। বাশুলী দেবীর আদেশে চণ্ডীদাস বলেন পরের জন্য কি আপনজন কখনও পর হয়।

(১১) জ্ঞানদাস / প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখি কি মোর করমে লেখি
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
নগর বসালাম সাগর বাঁধিলাম
মাণিক পাবার আশে।

সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল ।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল ॥

[পদটি জ্ঞানদাসের রচিত। এটি আক্ষেপানুরাগ রসপর্য্যায়ের পদ। এই পদে হৃদয়ের হাহাকার ও তজ্জনিত আক্ষেপ গভীর বেদনার সঙ্গে বর্ণিত]

শব্দার্থ :—বাঁধিনু—নির্মাণ করলাম। **অনলে**—আগুনে। **অমিয়**—অমৃত। **সিনান**—স্নান। **গরল**—বিষ। **ভেল**—হল। **করমে**—কর্মে। **লেখি**—লেখা আছে। **সেবিনু**—উপভোগ করলাম। **ভানুর**—সূর্যের। **উচল**—উচ্চ। **অচলে**—পর্বতে। **পড়িনু**—পড়িলাম। **লছিমী**—লক্ষ্মী। **বেঢ়ল**—ঘিরে ধরল। **হারানু**—হারালাম। **হেলে**—অবহেলায়। **অভাগীর**—ভাগ্যহীনা রাধার। **করম দোষে**—ভাগ্য দোষে। **পিয়াস**—পিপাসা। **জলদ**—মেঘ। **বজর**—বজ্র। **শেল**—আঘাত। **অমিয় সাগরে** ইত্যাদি—রাধা কৃষ্ণের ভালবাসা অমৃত বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু এই ভালবাসার মধ্যে এত যন্ত্রণা যে তা বিষাক্ত বলে মনে হচ্ছে। **শীতল…দেখি**—রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে চাঁদের স্নিগ্ধ ও শীতল জ্যোৎস্না বলে ভেবে ছিলেন। কিন্তু পরে দেখলেন তা সূর্যের প্রখর তাপের জ্বালা।

ভাববস্তু :—রাধা আক্ষেপ করে বলেছেন যে সুখের জন্য তিনি ভালবাসার যে ঘর বানিয়ে ছিলেন তা বিরহের আগুনে যেন পুড়ে গিয়েছে। তিনি অমৃত সাগরে স্নান করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু অমৃতের বদলে তার ভাগ্যে জুটল গরল। তার ভাগ্যে যে কি লেখা আছে তা তিনি জানেন না। শীতল বলে তিনি চাঁদের আলো উপভোগ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লাভ করলেন প্রখর সূর্যকিরণের জ্বালা। উচ্চ বলে তিনি পর্বতে চড়তে গেলেন, কিন্তু অগাধ জলে পড়ে গেলেন। ঐশ্বর্য তিনি চেয়েছিলেন তার বদলে তিনি লাভ করলেন দারিদ্র্য। তিনি মাণিক পাবার জন্যে নগর বসালেন, সাগর বাঁধলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে সাগর শুকিয়ে গেল এবং মাণিকও তিনি পেলেন না। পিপাসা চরিতার্থ করবার জন্যে তিনি মেঘ চাইলেন পরিবর্তে পেলেন বজ্র। জ্ঞানদাস বলেন যে কৃষ্ণের প্রেম মরণ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

(১২) চণ্ডীদাস / নিবেদন

বঁধু কি আর বলিব আমি।

জীবন মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।

সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।

রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।

শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥

আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে যে পরাণে মরি।

চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

[এটি নিবেদন পর্যায়ের পদ। চণ্ডীদাস এখানে রাধার ভূমিকায় নিজেকে স্থাপিত করে অন্তরের নিবিড় ও তীব্র আকুলতা প্রকাশ করেছেন। চণ্ডীদাস সমর্পিত প্রাণ কবি। চণ্ডীদাস ও তাঁর রাধা বেদনার গান গেয়ে সিদ্ধ যোগীর স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এখানে কেবল নিবেদনের ব্যাকুলতা নয়, কৃষ্ণকে একান্ত করে পাওয়ার উপলব্ধিটুকু কাব্যসত্য লাভ করেছে। বৈষ্ণবদর্শনের কথা বাদ দিলেও কবির আত্মনিবেদনের ঐকান্তিকতা পদটির শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য]

শব্দার্থ—প্রাণনাথ—প্রাণদেবতা। **পরানে**—প্রাণে। **তোমার…ফাঁসি**—তোমার চরণের সঙ্গে আমার প্রাণ প্রেমের ফাঁসে আবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ তোমার চরণে আমি আমার মন প্রাণ এমন ভাবে স্থাপন করেছি যে তোমার চরণ থেকে আমার প্রাণ সরিয়ে নিলে মৃত্যু অনিবার্য। **সমর্পিয়া**—সমর্পণ করিয়া। **শুধাইতে**—জিজ্ঞাসা করিতে। **একুলে**—পিতৃকুলে। **ও কুলে**—পতিকুলে। **ছলে**—ছলনায়। **অবলে**—অবলা নারীকে। **অখলে**—খলতাশূন্য নারীকে **নিমিষে**—নিমেষে। **পরশ রতন**—স্পর্শমণি। **চণ্ডীদাস কহে……পরি**—চণ্ডীদাস বলেন যে কৃষ্ণ স্পর্শমণি। তাঁর স্পর্শে সব সোনা হয়ে যায়। কৃষ্ণকে যেন গলার হার করে গলায় পরতে ইচ্ছা হয়।

(১৩) চণ্ডীদাস / নিবেদন

বঁধূ তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি
কুলশীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি যে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মনে নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥

[উদ্ধৃত পদটি বৈষ্ণব সাহিত্যের নিবেদনের পর্যায়ভুক্ত। এখানেও আত্মনিবেদনের সুরটি অনন্য। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে এমনকি আমিত্বটুকুকেও বিসর্জন দিয়ে নিজেকে অপরের কাছে এমন সরল ভাবে নিবেদন করতে আর কোন বৈষ্ণবকবিকে দেখা যায় না। গভীর আন্তরিকতা, সরলতা আর অকপটতা পদটিকে কালজয়ী করে তুলেছে।]

শব্দার্থ:—আদি—প্রভৃতি। **কুলশীল জাতি মান**—রাধা কৃষ্ণকে ভাল বেসেছেন কুল, আচার জাতি ও সম্মানের বিচার না করেই। সবকিছুই তিনি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেছেন। **অখিল**—বিশ্ব। **কালিয়া**—কৃষ্ণ। **যোগীর**—সাধকের। **গোপ গোয়ালিনী**—রাধা আয়ান ঘোষ নামে গোপের স্ত্রী। সেই অর্থে গোয়ালিনী। **হাম**—আমি। **পিরীতি রসেতে**—প্রেমের রসে। **তনু**—দেহ। **আন**—অন্য। **ভায়**—প্রকাশ পায়। **কলঙ্কী**—রাধা পরস্ত্রী হয়েও কৃষ্ণকে ভালবেসেছেন তাই তিনি লোকের কাছে কলঙ্কিনী বলে পরিচিত। এতে রাধার অন্তরে কিন্তু কোন দুঃখ নেই। কারণ তাঁর অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের গভীরতা অনেক বেশী। পক্ষান্তরে তিনি এই কলঙ্কী ডাকে সুখ অনুভব করেন। **সতী বা অসতী**—রাধা যথার্থ সতী বা অসতী তা শ্রীকৃষ্ণ জানেন। **বিদিত**—জ্ঞাত। **ভাল…জানি**—রাধা কৃষ্ণের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা তিনি জানেন না। **পাপপুণ্যসম…চরণখানি**—পাপ হোক আর পুণ্য হোক কৃষ্ণের চরণই রাধিকার সর্বস্ব। তিনি বাহিরের আর কিছুই জানেন না।

ভাববস্তু: রাধা কৃষ্ণের কাছে এই নিবেদন করেছেন যে তিনি তাঁর প্রাণ। তিনি তাঁকে দেহ মন কুলশীল প্রভৃতি সবকিছুই সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণ অখিলের রাজা। যোগীর আরাধ্য ধন। রাধা গোপ গোয়ালিনী, ভজন পূজন কিছু জানেন না। প্রেমের রসে দেহমন সিক্ত করে তিনি কৃষ্ণের চরণে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণ তাঁর পতি। তিনি তাঁর পরম গতি। তাঁর মনে আর কিছু নেই। তাঁকে সকল লোকে কলঙ্কী বলে ডাকে। তথাপি তাঁর মনে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের জন্য কলঙ্ককে হারের মত করে পরিধান করাতেও সুখ আছে। তিনি সতী বা অসতী তা কৃষ্ণই জানেন। ভাল মন্দ তাঁর অজানা। চণ্ডীদাস বলেন পাপ হোক বা পুণ্য হোক কৃষ্ণের চরণই শ্রীরাধিকার সর্বস্ব।

(১৪) মাথুর / বিদ্যাপতি

এ সখি হামার দুখের নাহি ওর।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরি খন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া॥
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঁডায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

[আলোচ্য পদটি মাথুর রস পর্যায়ের অন্তর্গত—বিদ্যাপতির রচনা। মতান্তরে এটি শেখরের রচনা। একদিকে ভরা বাদল অন্যদিকে বিরহের তীব্র জ্বালা কবিতায় রূপ লাভ করেছে। মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন বিরহ শাশ্বত সত্য।]

শব্দার্থ :—**হামারি**—আমারি বা আমার। **ওর**—সীমা। **ভরা**—পূর্ণ। **মাহ**—মাস। **ভাদর**—ভাদ্র। **শূন্য মোর**—আমার গৃহ শূন্য। **ঝম্পি**—[illegible]। **ঘন**—মেঘ। **গরজন্তি**—গর্জন করিতেছে। **সন্ততি**—সতত। [illegible] করিতেছে। **কান্ত**—প্রিয়। **পাহুন**—প্রবাসী। **কাম**—[illegible]দেবতার সহিত [illegible]কাংখা। **দারুন**—তীব্র। **সঘনে**—সরবে। **খর**—তীক্ষ্ণ। **শর**—তীর। **হন্তিয়া**—হানিতেছে। **কুলিশ**—বজ্র। **পাত**—পাতন জনিত। **মোদিত**—আনন্দিত। **নাচত**—নাচিতেছে। **মত্ত**—উন্মত্ত। **দাদুরী**—ভেক। **যাওত**—যাইতেছে। **ছাতিয়া**—হৃদয়। **তিমির**—আঁধার। **ঘোর**—গভীর। **যামিনী**—রাত্রি। **অথির**—অস্থির। **বিজুরিক**—বিদ্যুতের। **পাঁতিয়া**—পংক্তি। **কৈছে**—কেমন করিয়া। **গোঁডায়বি**—কাটাইবি। **হরি**—কৃষ্ণ। **বিনে**—বিনা। **রাতিয়া**—রাত্রি।

ভাববস্তু : রাধা গভীর বিরহে ব্যথিত হয়ে সখীকে বলেছেন যে তাঁর দুঃখের সীমা নেই। ভাদ্রমাসের ভরা বাদল কিন্তু তাঁর গৃহ শূন্য। আকাশে মেঘ ব্যাপ্ত হয়ে গর্জন করছে। পৃথিবী ভাসিয়ে বর্ষণ হয়ে চলেছে। প্রিয়তম কৃষ্ণ প্রবাসে, এদিকে নিষ্ঠুর কামদেব বা মদন দেব তীব্র ও তীক্ষ্ণ ফুলশর বর্ষণ করছে। শত শত বজ্রপাতে ময়ূর আনন্দে নৃত্য করছে। ভেক মত্ত হয়ে ডাকছে। ডাহুকী ডাকছে আর রাধার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দিক দিগন্তে অন্ধকার ঘোর রাত্রি। অস্থির বিদ্যুত

ঝলসিত হচ্ছে। বিদ্যাপতি বলেন হরি ছাড়া রাধা দিনরাত্রি কেমন করে কাটাবেন।

(১৫) বিদ্যাপতি / মাথুর

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করিব সো পিয়া লেহে॥
হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥
চন্দনে তরু যব সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি।
চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব
কি মোর করম অভাগী॥
শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু ঝাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে॥

[মাথুর পর্যায়ের পদ এটি। রচয়িতা বিদ্যাপতি। কৃষ্ণ, মথুরা গমনের পর রাধার অন্তরের তীব্র বেদনা ও হতাশা প্রকাশিত]

শব্দার্থ:—**অঙ্কুর**—বীজ থেকে প্রথম উদ্গত উদ্ভিদ। **তপন**—সূর্য। **জারব**—দগ্ধ হয়। **বারিদ**—জল দানকারী। **মেহে**—মেঘে। **নবযৌবন**—নবীন যৌবন। **গোঙায়ব**—কাটাইব। **সো**—সেই। **পিয়া**—প্রিয়। **লেহে**—স্নেহে। **এ নব যৌবন…লেহে**—নবীন যৌবন প্রেমিকের ভালবাসায় সার্থক হওয়ার কথা কিন্তু সেই নবীন যৌবন যদি বিরহে কেটে যায় তবে প্রিয়তমের স্নেহে কিবা তার প্রয়োজন। **দৈব**—অদৃষ্ট। **দুরাশা**—নৈরাশ্য। **সিন্ধু**—সাগর। **কণ্ঠ**—গলা। **শুকায়ব**—শুকাইয়া যায়। **কো**—কে। **সিন্ধু নিকটে…পিয়াসা**—সাগর নিকটে আছে তথাপি যদি পিপাসা দূর না হয়, তাহলে কে আর পিপাসা দূর করবে। **চন্দন তরু**—চন্দন গাছ। **যব**—যখন। **সৌরভ**—সুগন্ধি। **ছোড়ব**—ছাড়িয়া দিবে

শশধর—চন্দ্র। **বরিখব**—বর্ষণ করিবে। **আগি**—আগুন। **চন্দন তরু…আগি**—চন্দন তরু যখন সুগন্ধ দেওয়া বন্ধ করবে তখন শশধরও অগ্নি বর্ষণ করবে। **চিন্তামণি**—এমন রত্ন যার দ্বারা সকল বস্তু সুলভ হয়। চিন্তামণি হাতে পেলে যা চিন্তা করা যায় তা পাওয়া যায়। **করম**—কর্ম। **চিন্তামণি যব…অভাগি**—ভাগ্যদোষে চিন্তামণি যদি নিজগুণ ত্যাগ করে তবে দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। **মাহ**—মাস। **ঘন**—মেঘ। **বিন্দু**—বৃষ্টি। **না বরিখব**—বর্ষণ করে না। **সুরতরু**—কল্পতরু। **ঝাঝকি**—বন্ধ্যার। **ছন্দে**—মতো। **গিরিধর**—কৃষ্ণ। **সেবি**—সেবা করিয়া। **ঠাম**—ঠাঁই। **পাওব**—পাব। **রহু**—থাকে। **ধন্ধে**—ধাঁধার মধ্যে।

ভাববস্তু ঃ—নব উদ্গত অঙ্কুর সূর্যের তাপে দগ্ধ যদি হয় তাহলে তার ওপর মেঘ জল বর্ষণ করে কি করবে? এই নব যৌবন যদি রাধা বিরহ বেদনায় কাটাবেন তবে আর প্রিয়ের প্রেমে কি হবে? কৃষ্ণ এখানে একি দুর্দশা সৃষ্টি করলেন! সিন্ধু নিকটে থাকতেও যদি কণ্ঠ পিপাসায় শুকিয়ে যায় তবে সে পিপাসা কে আর দূর করতে পারে! চন্দন তরু যদি সৌরভ ত্যাগ করে তবে শশধরও আগুন বর্ষণ করবে। চিন্তামণি যদি নিজের গুণ ছেড়ে দেয় তাহলে অভাগী রাধার কি হবে! শ্রাবণ মাস যদি বারি বর্ষণ না করে, কল্পতরু বন্ধ্যার মত হয় এবং কৃষ্ণকে সেবা করেও যদি আশ্রয় না পাওয়া যায় তবে বিদ্যাপতি ধাঁধার মধ্যে পড়ে থাকেন।

(১৬) ভাবোল্লাস ও মিলন / বিদ্যাপতি

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ বলি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটলু সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

অব মঝু রব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥

[ভাবোল্লাস ও মিলন পর্যায়ের অন্তর্গত এই পদটি বিদ্যাপতির রচনা। রাধার মন বলেছিল শ্রীকৃষ্ণ আসবেন। বহু প্রতীক্ষা ও বিরহের পর ভাবরাজ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে যখন রাধার মিলন হ'ল তখন রাধার সকল সংশয় দূর হয়ে গেল—দশদিক প্রসন্ন ও সহাস্য হয়ে উঠল। ভাবের রাজ্যে মিলনের আনন্দঘন মুহূর্তটি শিল্পসম্মত বাণীমূর্তি লাভ করেছে।]

শব্দার্থ : **আজু**—আজ। **হাম**—আমি। **ভাগে**—ভাগ্য করে। **পোহায়লুঁ**—পোহালাম। অতিবাহিত করলাম। **পেখলুঁ**—দেখলাম। **প্রিয়া**—প্রিয়। **প্রিয় মুখচন্দা**—প্রিয়জনের অপরূপ মুখখানি। **সফল**—সার্থক। **মানলুঁ**—মানলাম। **দিশ**—দিক। **ভেল**—হল। **নিরদন্দা**—নির্দ্বন্দ্ব। **মঝু**—আমার। **গেহ**—গৃহ। **মানলুঁ**—মানলাম। **আজু…মানল**—রাধার গৃহ এতদিন যেন শ্রীহীন ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবমিলনে তা যেন শ্রীমণ্ডিত হয়েছে। **দেহা**—দেহ। **আজু…দেহা**—রাধার দেহের এতদিন যেন কোন সার্থকতা ছিল না। কৃষ্ণের সঙ্গে ভাবমিলনে তার দেহ সার্থকতা মণ্ডিত হয়েছে **বিহি**—বিধি। **মোহে**—আমাকে। **অনুকূল**—সদয়। **হোয়ল**—হল। **টুটল**—দূর হল। **সবহুঁ**—সমস্ত। **সন্দেহ**—সংশয়। **সোই**—সেই। **অব**—এখন। **ডাকউ**—ডাকুক। **উদয় করু**—উদিত হোক। **চন্দা**—চাঁদ। **সোই কোকিল…চন্দা**—রাধা যখন বিরহ কাতর ছিলেন তখন কোকিলের গান, চাঁদের আলো তার কাছে পীড়াদায়ক ছিল। কিন্তু এখন কৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলন হয়েছে, তাই এখন আর এই সবে তার ভয় নেই। **পাঁচবাণ**—পঞ্চবান। **হোউ**—হোক। **মন্দা**—মন্দ মন্দ।

ভাববস্তু : রাধা বলছেন যে আজ রাত্রি তাঁর সৌভাগ্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি প্রিয়তমের সুন্দর চন্দ্রানন দেখতে পেয়েছেন। তাঁর জীবন যৌবন আজ সার্থক হয়েছে। দশদিক নিঃসংশয় হয়েছে। আজ তিনি তাঁর গৃহকে যথার্থ গৃহ বলে মনে করেন। আজ তিনি দেহের সার্থকতা লাভ করেছেন। আজ বিধি তার প্রতি সদয় হয়েছেন। তাঁর মনের সব সন্দেহ দূর হয়েছে। কোকিল এখন লক্ষবার ডাকুক, চন্দ্র লক্ষবার উদিত হোক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হোক, মলয় বাতাস মন্দ মন্দ প্রবাহিত হোক। এখন যদি প্রিয়র সঙ্গে রাধার মিলন হয় তবে রাধা তাঁর দেহকে সার্থক বলে মনে করবেন। বিদ্যাপতি মনে করেন রাধার প্রেম মিলনে ধন্য।

(১৭) প্রার্থনা / বিদ্যাপতি

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তহু করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখি কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি বহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে হই ভব সিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব কবি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

[পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রার্থনা পর্যায়ের পদ। রচয়িতা প্রাক্-চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতি। তাঁর প্রার্থনা পদের আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। বিদ্যাপতি মাধবের চরণে শরণ নিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন যে তাঁর নিজের মধ্যে কোন গুণের লেশ নেই। তাই মাধব ছাড়া তাঁর আর কোন গতি নেই। তাঁরই করুণায় এই ভবসিন্ধু তিনি পার হতে চান]

শব্দার্থঃ **বহুত**—অনেক। **মিনতি**—অনুরোধ। **তোয়**—তোমাকে। **দেই**—দিয়া। **তুলসী তিল**—তুলসীপাতা ও তিল। **সমর্পিলুঁ**—সমর্পণ করিলাম। **জনু**—যেন। **ছোড়বি**—ত্যাগ করিবে। **মোয়**—আমাকে। **গণইতে**—গণনা করিতে। **লেশ না পাওবি**—বিন্দুমাত্র পাবে না। **যব**—যখন। **তহুঁ**—তুমি। **জগন্নাথ**—জগতের নাথ। **কহায়সি**—ঘোষণা করছে। **জগ**—জগৎ। **নহ**—নহি। **মুঞি**—আমি। **কিয়ে**—কিবা। **জগ বাহির…ছার**—আমি তো জগতের বাইরের কেউ নই। আমি জগতের ভিতরের। **জনমিয়ে**—জন্মগ্রহণ করে। **করম বিপাকে**—কর্মফলবশত। **গতাগতি**—যাতায়াত। **বহু**—থাকে। **তুয়া**—তোমার। **পরসঙ্গে**—প্রসঙ্গে। **ভণয়ে**—বলছে। **তরইতে**—পার করতে। **ভবসিন্ধু**—ভব সমুদ্র। **তুয়া**—তোমার। **তিল**—মুহূর্ত।

ভাববস্তু : কবি বিদ্যাপতি কৃষ্ণের উদ্দেশে বলছেন, হে কৃষ্ণ আমি আমার এ দেহ তিল ও তুলসী দিয়ে তোমাকে সমর্পণ করলাম।— তুমি দয়া ক'রে আমাকে ত্যাগ কর না। তুমি যখন আমার দোষ ও গুণের বিচার করবে তখন আমার মধ্যে একবিন্দুও গুণ দেখতে পাবে না। তুমি জগতের নাথ বলে জগতে বিখ্যাত আর আমিও তো জগতের বাইরের কেউ নই। কর্মফলবশতঃ মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হয়ে বার বার জন্মগ্রহণ করলেও তোমার প্রতি আমার যেন মতি থাকে। বিদ্যাপতি প্রার্থনা করেছেন যে কৃষ্ণের শ্রীচরণ অবলম্বন ক'রে তিনি যেন ভবসিন্ধু পার হতে পারেন। কৃষ্ণ যেন এক তিলের জন্য তাঁকে আশ্রয় দেন।

(১৮) প্রার্থনা / বিদ্যাপতি

তাতল সৈকত বারি বিন্দুসম
সুতমিত রমণী-সমাজ।
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজ ॥
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।
তুহুঁ জগ-তারণ দীনদয়াময়
অতএ তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিদে গোঙায়লুঁ
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী রসসঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুণ তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব তারণ-ভার তোহারা ॥

[আলোচ্য পদটিতে কবির আন্তরিক আত্মসমীক্ষা এবং ঈশ্বর-নির্ভরতা প্রধান হয়ে উঠেছে। এটি বৈষ্ণবপদাবলীর প্রার্থনা পর্যায়ের অন্তর্গত। এই বিখ্যাত পদটির প্রতিটি শব্দে ও ছত্রে কবির হৃদয় বেদনার নিগূঢ় প্রকাশ রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে।]

শব্দার্থ ঃ—**তাতল**—তপ্ত। **সৈকত**—বালু। **বারিবিন্দু**—জলবিন্দু। **সুত**—পুত্র। **মিত**—মিত্র। **রমণী**—নারী। **তোহে**—তোমাকে। **বিসরি**—বিস্মৃত হয়ে বা ভুলে। **সমর্পিলু**—সমর্পণ করলাম। **অব**—এখন। **মঝু**—আমি। **হব**—সাগর। **হাম**—আমার। **পরিণাম**—পরিণতি : **নিরাশা**—নৈরাশ্যজনক। **তুহু**—তুমি। **জগ**—জগৎ। **তারণ**—ত্রাতা। **দীন**—দরিদ্র। **অতয়ে**—অতএব। **তোহারি**—তোমার প্রতি। **বিশোয়াসা**—বিশ্বাস রাখি। **আধ**—অর্ধেক। **নিদে**—নিদ্রায়। **গোয়ায়লুঁ**—কাটালাম। **জরা**—বার্ধক্য। **শিশু**—শৈশব। **নিধুবনে**—কুঞ্জবনে। **রসরঙ্গে**—আনন্দ কৌতুকে। **মাতলুঁ**—মাতলাম। **তোহে**—তোমাকে। **ভজব**—ভজনা করব। **কোন বেলা**—কোন সময়। **চতুরানন**—ব্রহ্মা। **মরি মরি যাওত**—মরে যায়। **তুয়া**—তোমায়। **আদি অবসানা**—আদি অন্ত। **তোহে**—তোমাতে। **জনমি**—জন্ম নিয়ে। **সমাওত**—সমাগত, প্রবেশ করে। **সাগর লহরীসমানা**—সাগরের ঢেউয়ের মত। **শমন**—মৃত্যু। **আদি অনাদিক**—আদি অনাদির। **কহায়সি**—বলা হয়। **অব**—এখন। **তারন ভার**—ত্রাণের ভার।

ভাববস্তু ঃ—কবি বিদ্যাপতি প্রার্থনা করেছেন যে কৃষ্ণ যেন কবিকে আশ্রয় দেন। তপ্ত বালুতে বারিবিন্দু যেমন মুহূর্তে বিলীন হয়ে যায় তেমনি এই সংসারের পুত্র মিত্র জায়া সমাজ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। কবি এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারে অর্থাৎ সংসারে ব্যাপৃত ছিলেন কৃষ্ণকে ভুলে গিয়ে। এখন আর তিনি কি কাজে লাগবেন? এসকল কথা ভেবে তিনি বুঝেছেন যে তাঁর পরিণতি খুবই নৈরাশ্যজনক। শ্রীকৃষ্ণ জগৎত্রাতা এবং দীন দরিদ্রের ঈশ্বর। তাই কবি কৃষ্ণের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। জীবনের অর্ধেক অংশ নিদ্রায় কেটেছে। শৈশব ও জরা অবস্থায় অনেক দিন কেটেছে। আবার কুঞ্জবনে রমনীর সঙ্গে রসরঙ্গে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। সুতরাং কৃষ্ণভজনার সময় পান নি। কত ব্রহ্মার মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু কৃষ্ণের আদি ও অন্ত নেই। সাগর লহরী যেমন সাগরে জন্ম নিয়ে সাগরেই লীন হয়ে যায়, তেমনি সকল জীব কৃষ্ণের থেকে জন্মলাভ করে আবার তাতেই লীন হয়ে যায়। বিদ্যাপতি বলেন যে অন্তিমে আছে মৃত্যুভয়। কৃষ্ণ ছাড়া গতি নেই। কৃষ্ণ আদি ও অনাদির নাথ বলে কথিত। তাই সকল জীবকুলকে ত্রাণ করবার ভার একমাত্র তাঁর হাতেই সমর্পিত।

প্রশ্নোত্তর

৪। "বৈষ্ণব পদাবলীর রসভিত্তি পঞ্চরস"—সবিস্তারে আলোচনা কর। [ক বি ১৯৮১]

অথবা,

বৈষ্ণব পদাবলীর রসপর্যায়গুলি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : সাহিত্য সমাজের দর্পণ। আর সমাজ মানুষ নিয়ে গঠিত। সুতরাং মানুষকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। মধ্যযুগে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে প্রকাশ না পেলেও ধর্মকে আশ্রয় ক'রে পরোক্ষে মানুষের কথাই সেখানে বলা হয়েছে। মানুষ কতকগুলি মনোবৃত্তি বা ভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে যার ধ্বংস নেই। শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা, পরিবেশ এগুলির প্রকাশকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত ক'রে মাত্র। এই কারণেই এই বৃত্তি বা ভাবগুলিকে স্থায়ী বা চিরন্তন বলা হয়েছে। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রমতে এই স্থায়ীভাবের সংখ্যা আট—রতি, হাস্য, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এগুলি আমাদের বাসনায় সংস্কাররূপে বিরাজ করে। এই ভাবগুলির উদ্বোধনের কারণ ঘটলে তা চেতনায় আবির্ভূত হয় এবং দেহে বা আচরণে তার অভিব্যক্তি দেখা যায়।

কাব্যে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে মনের এই স্থায়ীভাব রস পরিণতি লাভ করে। সুতরাং রসের সংখ্যা আট। ভাব অনুযায়ী রসের ক্রমিক পরিণতি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। কিন্তু বৈষ্ণব দর্শন প্রবক্তাগণ রতির অর্থ সম্প্রসারণ ক'রে তার রস পরিণতি অন্যভাবে দেখিয়েছেন। সাহিত্য দর্পণে এর বীজ আছে। বিশ্বনাথ সাহিত্য দর্পণে বলেছেন প্রিয় বস্তুর প্রতি মানব মনের সহজ অনুরাগই রতি। বৈষ্ণবদের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং এই রতি লৌকিক রতি নয়। এই রতির রসরূপ পাঁচটি হলেও স্বরূপে রস একটি মাত্র—ভক্তিরস। বৈষ্ণব আলংকারিকদের মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি পাঁচ প্রকারে হতে পারে। এই পাঁচ প্রকার রতির পরিণতি পাঁচ প্রকার রসে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর (শৃঙ্গার, উজ্জ্বল)।

শান্তরস :—সাধারণ জীবনে দেখা যায় অমিত তেজসম্পন্ন পুরুষের প্রতি মানব মনের আকর্ষণ অধিক। তাই বিনা স্বার্থে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। বিনিময়ে কোন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা নেই। একেই বলে শান্তভাবের উপাসনা। এ অবস্থায় ভক্ত ভগবানে আত্মীয়তা সম্পর্ক থাকে না। এতে স্থায়ীভাব 'শম' নামে রতি। এই রতিতে সমাজের সকল কিছুই 'তাতল সৈকতে বারিবিন্দু'র মত ক্ষণস্থায়ী। সাংসারিক অনিত্য বস্তু ভক্ত ভগবানের উপর সমর্পণ করে।

প্রাক-চৈতন্যযুগে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য মূর্তি আস্বাদন এর প্রধান কথা।

দাস্য রস :—ভগবান প্রভু, ভক্ত তার ভৃত্য ; ভগবান ঐশ্বর্যশালী, ভক্ত দীন। এতে স্থায়ীভাব সেবা নামে রতি। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপই ভক্তমনকে আকর্ষণ করে এবং তাঁর সেবা ক'রেই ভক্ত কৃতার্থ হয়। এখানে শান্তরসের কৃষ্ণনিষ্ঠা বর্তমান, অধিকন্তু সেবা। সেবায় ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমত্ব সম্পর্ক জাগে। মীরার 'চাকর রাখ জী' এই সূত্রে মনে পড়ে যায়। নরোত্তম দাসের 'সেবা দিয়া কর অনুচর···', 'তু মেরে হৃদয়ক রাজা' পদখানিতে দাস্য ভাব রয়েছে।

সখ্য রস :—ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে এখানে পারস্পরিক বিশ্বাসময় সমপ্রাণতার সম্পর্ক বিদ্যমান। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবাও সখ্যে বর্তমান। অধিকন্তু সমপ্রাণতা নতুন যুক্ত হয়েছে। সেবা কিন্তু শুধু ভক্তই করেন না। ভগবানও ভক্তের সেবা করেন। এখানে স্থায়ীভাব 'বিস্রম্ভ' অর্থাৎ সংকোচহীন পারস্পরিক বিশ্বাস। যথা :—

সব সখা মিলি করিয়া মণ্ডলী ভোজন করায় সুখে।
ভাল ভাল ক'রে মুখ হ'তে ল'য়ে সভে দেয় কানু মুখে ॥—বিশ্বম্ভর

তবে একথা মনে রাখা দরকার সখ্যভাবে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে ঐশ্বর্যভাব আর বর্তমান থাকে না।

বাৎসল্য রস :—বাৎসল্য রসে কৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের পাল্য-পালক সম্পর্ক—ভগবান সন্তান, ভক্ত মাতা বা পিতা। এখানে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিস্রম্ভ অধিকন্তু লালন মমতাধিক্য বর্তমান। প্রয়োজন হলে তাড়ন ভর্ৎসনাও লালনের অপরিহার্য অঙ্গ রূপে এসে পড়ে। এতে স্থায়ীভাব বৎসলতা নামে রতি। যথা—

"বিপিনে গমন দেখি হয়ে সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥
এ দুখানি রাঙা পায় ব্রহ্মা রাখুন তায়
জানু-রক্ষা করুন দেবগণ
কটিতট সুজঠর রক্ষা করুন যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ।"—দ্বিজমাধব

—মায়ের প্রাণ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় নিয়ত কম্পমান। মাতা যশোমতী যার অঙ্গে হাত রেখে রক্ষামন্ত্র পাঠ করেন, তিনি নিজেই সর্বমঙ্গলময় ভগবান। কিন্তু এ জ্ঞান থাকলে বৎসলতা সম্ভবপর নয়। পদকর্তা মাতৃহৃদয়ের সহজ রূপটিই চিত্রায়িত করেছেন।

মধুর রস :—ভগবান এখানে কান্ত, ভক্ত কান্তা। শান্তের কৃষ্ণ নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের বিশ্রম্ভ, বাৎসল্যের লালন ও মধুরের কান্তভাব এই পাঁচটি ভাবের সুগভীর মিলনে মধুর রসের পরিণতি। উভয়ের প্রগাঢ় প্রেমলীলার মধ্যে যে ঈশ্বর সাধনা তাকেই মধুর ভাবের সাধনা বলে। এখানে স্থায়ীভাব মধুরা নামে রতি। দাস্যে ভালবাসার শুরু মধুরে তার পরিপূর্ণতা। যথা—

গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছল ছল আঁখি,
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি ॥

রাধার সাধনা এই মধুর ভাবের সাধনা। এই সাধনায় শ্রীরাধিকার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সিদ্ধিলাভ। রাধার ক্ষেত্রে এই সাধনা ও সিদ্ধি যত স্বাভাবিক অন্যের পক্ষে তা নয়। কারণ রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। চৈতন্য-চরিতামৃত রচয়িতার মতে—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥"

৪। 'গৌরচন্দ্র বিষয়ক-পদ মাত্রই গৌরচন্দ্রিকা নয়"—এই মন্তব্যের আলোকে বৈষ্ণবপদাবলীর রসাস্বাদনে গৌরচন্দ্রিকার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

অথবা

গৌরচন্দ্রিকা কাকে বলে? চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং পরবর্তী কালে রচিত গৌরবিষয়ক পদের একটি তুলনামূলক বিচার কর।

অথবা

"সকল গৌরচন্দ্রিকাই গৌর বিষয়ক পদ কিন্তু সকল গৌর বিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়"—উদ্ধৃতি সহযোগে বক্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর :—১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ ক্ষণ বলে চিহ্নিত। এই মহাপুরুষের দিব্যজীবন ও প্রেমসাধনা মধ্যযুগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছে। একটি চৈতন্য-পূর্ববর্তী ও অন্যটি চৈতন্য-পরবর্তী যুগ। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্মের প্রবাহ ক্ষীণ হলেও বিদ্যমান ছিল। চৈতন্যদেবের দিব্যভাব এই ভক্তিধর্মকে নূতন প্রাণরস দান করে এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বহু পদ রচিত হয়। শুধু তাই নয়, চৈতন্যদেবের দিব্যলীলাকে অবলম্বন করে এবং তার রাধাভাবদ্যুতি সম্বলিত দেহের বর্ণনা করে নানা পদ রচনা হতে থাকে। চৈতন্য-

দেবের জীবনীকারগণ সহচরগণ এবং অন্যান্য পদকর্তারা বহু গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচনা করেন। কারণ চৈতন্যদেবের মত এক মহান ব্যক্তিত্ব সেদিনের সমাজ জীবনকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। আর তারই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ। প্রধানত এই পদগুলিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

১। শ্রীচৈতন্যের রূপ ও মহিমা বর্ণনা
২। শ্রীচৈতন্যের গৃহজীবন সন্ন্যাস ও গানকীর্তনের বর্ণনা
৩। নদীয়া জাগরী ভাবের আশ্রয়ে রচিত পদ
৪। ব্রজলীলার ভাব অবলম্বনে রচিত পদ
৫। শচীমাতার বিরহ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অবলম্বনে রচিত পদ।
৬। চৈতন্য সহচর বিষয়ক পদ।

উল্লিখিত ছয় শ্রেণীর পদের মধ্যে প্রথম তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদগুলিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা হয়। বাকী পদগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক হলেও গৌরচন্দ্রিকার মর্যাদা পায়নি। কারণ পূর্বরাগ, অনুরাগ আক্ষেপানুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর ও ভাবোল্লাস প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণবীয় ভাবের পদ আছে সেই সকল ভাবগুলি ব্যঞ্জিত করে যে অনুরূপ গৌর বিষয়ক পদ সেইগুলিই গৌরচন্দ্রিকা। পালাকীর্তন গাওয়ার সময় মূলবিষয় শুরু করার আগে অনুরূপ গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদকীর্তন করা হয়। ফলে শ্রোতা বুঝতে পারেন কোন রসপর্যায়ের কীর্তন গাওয়া হবে। চৈতন্যদেব নিজে রাধার ভাবটিকে আত্মস্থ করে কৃষ্ণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ফলে তাঁর ভাবগুলি রাধিকার ভাবের অনুরূপ। সেইজন্য চৈতন্যদেবের ভাবরাশি প্রকাশক পদের সঙ্গে বৃন্দাবন লীলার ভাবরাশির মিল পরিলক্ষিত হয়। কারণ—

"গৌরাঙ্গ নহিত কেমনে হইত কেমনে ধরিত দে
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা জগতে জানিত কে
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার"

শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসমাধুরী গৌরাঙ্গরূপে নিজেই আস্বাদন করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই গৌরাঙ্গকে অবলম্বন করে লীলাকীর্তনের ভূমিকা রচনা করা হয়। এটি যে কোন লৌকিক ব্যাপার নয় তা শ্রোতাদের বোধগম্য করার জন্যও গৌরচন্দ্রিকা গাওয়া হয় সূচনায়।

বাকী পদগুলি রাধাবোধের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেনি। কেবল চৈতন্যবিষয়ক পদ বলে সেগুলি গৌরচন্দ্রিকা রূপে গৃহীত না হলেও গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ বলে গৃহীত হয়েছে। অতএব সকল গৌরচন্দ্রিকা গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ কিন্তু সকল গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ গৌরচন্দ্রিকা নয়।

গৌরচন্দ্রিকার কবিপ্রসঙ্গ :—গোবিন্দদাসের রচিত পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পদটি গৌরাঙ্গবিষয়ক বা গৌরলীলার পদ—

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
বিকশিত ভাবকদম্ব ॥

এই পদটির মধ্যে চৈতন্যের অপূর্ব রূপমাধুরী চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ভাব প্রকাশিত হয়নি, তাই এটিকে গৌরচন্দ্রিকা বলা যায় না। এই ধরনের আরও অসংখ্য পদ আছে যার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কোন ভাবসাদৃশ্য নেই। এগুলির কোনটিই গৌরচন্দ্রিকা নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, চৈতন্যদেব ছিলেন রাধাকৃষ্ণর যুগল মূর্তির ভাববিগ্রহ। অন্তরে তিনি কৃষ্ণ আর বহিরঙ্গে তিনি রাধা। তিনি রাধাভাবদ্যুতিসম্বলিত কৃষ্ণস্বরূপ। সেই কারণে গৌরচন্দ্রিকার পদগুলি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উদাহরণের সাহায্যে গৌরচন্দ্রিকার স্বরূপটি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

ধরা যাক, কীর্তনীয়াগণ আসরে পূর্বরাগের পালাবদ্ধ কীর্তন গান করবেন। এর উদ্দেশ্যে তারা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকর্তাদের পদ ক্রমসজ্জিত করে রেখেছেন। মূল পালাকীর্তন সুরু করবার পূর্বে তাঁরা আসরে এমন একটি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ কীর্তন করবেন যাতে মূল পালাগানের ভাবটি ব্যঞ্জিত হয়েছে। যেমন :—

আজ হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে বয়ান করই অবলম্ব।
ক্ষণে ক্ষণে গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খনে খনে ফুলবনে চলই একান্ত।

এটি রাধাভাবে ভাবিত চৈতন্যদেবের সুগভীর কৃষ্ণআর্তির চিত্র। এই পদ শুনে রসজ্ঞ শ্রোতার মর্মজগতে রাধার পূর্বরাগের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে। তখন তারা স্বভাবতই বুঝতে পারে যে এইবার আসরে শ্রীরাধার পূর্বরাগের পালাকীর্তন সুরু হবে। এর পরই কীর্তনীয়াগণ মূল পূর্বরাগের পদাবলী কীর্তন সুরু করেন—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশাস সঘন
কদম্ব কাননে চায় ॥

রাধার বিভিন্ন ভাব অবলম্বনে যে কীর্তন গীত হবে তার পূর্বসূচনা হিসাবে অনুরূপ ভাবব্যঞ্জনা যুক্ত গৌরাঙ্গপদ গাওয়া হয়। তাকেই গৌরচন্দ্রিকা বলে। মান, অভিসার, মিলন; ভাবোল্লাস মাথুর প্রভৃতি ভাবের অনুরূপ গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ আছে। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা যে লৌকিক ব্যাপার নয়, অধ্যাত্ম ব্যাপার তা বোঝাবার জন্য এই গৌরচন্দ্রিকার প্রয়োজন। এতে শ্রোতার হৃদয় পবিত্র ও নির্মল

হয়। লীলার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি হয়। রায় রামানন্দের ভাষায় বলা যায় "গৌরচন্দ্রিকা ব্রজলীলার পরমান্নে একবিন্দু কর্পূর"।

৩। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে পূর্বরাগ কাকে বলে? পূর্বরাগের পদরচনায় কোন কবি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন? তাঁর অন্ততঃ দুটি পদ উদ্ধৃতিসহ আলোচনা কর।

বৈষ্ণব রসপর্যায়ে পূর্বরাগ কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং পূর্বরাগের পদ রচনায় পদাবলীর চণ্ডীদাসের কৃতিত্ব বিচার কর।

বৈষ্ণব রসপর্যায়ে পূর্বরাগের তাৎপর্য বিচার কর। পূর্বরাগের পদগুলির কাব্যগত গুণাগুণ বিচার কর।

পূর্বরাগ কাহাকে বলে? পূর্বরাগের সহিত অনুরাগের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও এবং এই পর্যায়ে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

বৈষ্ণব পদাবলীর 'পূর্বরাগ' ও 'অনুরাগ' পর্যায়ভুক্ত তোমাদের পাঠ্যপদগুলিতে ভাবসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর :—'উজ্জ্বল নীলমণির' আদর্শ অনুসারে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক পদগুলিকে বিভিন্ন রসপর্যায়ে সজ্জিত করেছেন। পূর্বরাগ সেই রসপর্যায়ের প্রথম ধাপ। উক্ত গ্রন্থে বলা আছে—

> রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা।
> তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগ স উচ্যতে।

অর্থাৎ পূর্ণ মিলনের পূর্বে প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক দর্শন, বাক্য শ্রবণ প্রভৃতির মাধ্যমে চিত্তে যে অনুরাগ জন্মে তাকেই পূর্বরাগ বলে। এই পূর্বরাগে প্রথম প্রেমের নিবিড়তা আধিক্য লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বরাগ প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মনেই জাগ্রত হয়। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতায় রাধার পূর্বরাগের কথাই বেশী বর্ণিত। তাই রাধার পূর্বরাগের উপর যেরূপ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে কৃষ্ণের পূর্বরাগে সেরূপ গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রবল আকর্ষণ ও অনুরাগ অবলম্বনে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব রূপমাধুরী আকর্ষণের উৎস। তাই এই বিষয় নিয়ে বৈষ্ণবকবিগণ উচ্চাঙ্গের অনেক পদ রচনা করেছেন। কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার পূর্বরাগ জাগ্রত হয়।

পূর্বরাগের সঙ্গে অনুরাগের কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। মিলনের পূর্বে প্রেমের যে অবস্থা তাই পূর্বরাগ। এখানে কিছু দ্বিধা দ্বন্দ্ব বর্তমান। আর অনুরাগে দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। কেবল তীব্র আকর্ষণের অনুভূতিই অনুরাগের লক্ষণ। এই অনুরাগই প্রেমিক-প্রেমিকাকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। 'উজ্জ্বল

নীলমণি'তে অনুরাগের ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে প্রিয়তম সকল সময়ে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। প্রতি মুহূর্তে নতুন করে তাকে অনুভব করার নাম অনুরাগ।

যেমন :—রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। (জ্ঞানদাস)

পূর্বরাগ বৈষ্ণবকবিদের বেশী আকর্ষণ করে। তাই জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি অনেক কবি এই রসপর্যায়ের অনেক সুন্দর পদ রচনা করেছেন।

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদ—বিদ্যাপতির পূর্বরাগে কৃষ্ণ ও রাধা পরস্পর একাত্ম হতে চেয়েছেন। কৃষ্ণ এমনই প্রিয় রাধার কাছে যে রাধার সকল প্রিয় বস্তু ও কৃষ্ণের মধ্যে তিনি কোন ভেদ কল্পনা করতে পারেন না। কৃষ্ণ রাধার হাতের দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন এবং মুখের তাম্বূল। কৃষ্ণ হৃদয়ের মৃগমদ এবং দেহক সরবস গেহক সার"। বিদ্যাপতির কোন কোন পদে সলজ্জ কুণ্ঠিত রাধার সহজ সাবলীল রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি তার অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। অথচ গুরুজনের কাছাকাছি থাকার জন্য সহজভাবে কৃষ্ণের দিকে অনুরাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারছেন না রাধা। তাই গুরুজনদের পশ্চাতে ফেলে অগ্রসর হয়ে গেছেন।

সখি হে, অপরূপ চাতুরী গোরী
সবজন তেজি আগুসরি সঞ্চরী
আড় বদনে তঁহি কেরি

বিদ্যাপতির রাধা চতুরা; তাই পূর্বরাগের পদে রাধার এই চাতুর্য প্রকাশিত।

চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদ—চণ্ডীদাস তাঁর রচিত পূর্বরাগের পদে রাধার একটি বিষাদঘন আধ্যাত্মিক মূর্তি রচনা করেছেন। কেবল কৃষ্ণনাম শুনে রাধার অন্তরে যে আকর্ষণের সূত্রপাত হয়েছে সেই আকর্ষণের বশেই তিনি ঘরছাড়া হয়ে বিবাগী হয়ে যেতে পারেন। যোগিনী বেশ ধরে রাধা কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর। যেমন—

সই কেবা শোনাইল শ্যামনাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে রাধা আনন্দে আত্মহারা। নামের মহিমায় তিনি জীবিত আছেন। এই নামমহিমা কৃষ্ণকে পাবার জন্য তাঁকে ব্যাকুল করেছে—

না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী। কৃষ্ণ প্রেম তাকে ঘরে থাকতে দেয় না।

কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত তীব্র যে প্রকৃতি জগতের মধ্যেও তিনি কৃষ্ণের সন্ধান করেন—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।

কিংবা,

একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।

কৃষ্ণের প্রতি রাধার এই অপূর্ব অনুরাগ আর কোথাও দেখা যায় না। এই অনুরাগের তুলনা মেলে না। দুজনেই দুজনের প্রাণের সঙ্গে বদ্ধ। প্রকৃত এই অনুরাগ স্বর্গীয়। তাই পৃথিবীতে এর তুলনা নেই। প্রেমিক-প্রেমিকার আকর্ষণের অনেক তুলনা বা উপমা দেওয়া যায়, কিন্তু রাধা কৃষ্ণের এই অনুরাগ এত গভীর ও স্বর্গীয় যে পার্থিব কোন বস্তুর সঙ্গেই তার তুলনা চলে না—

জল বিনু মীন যেন কবহুঁ না জীয়ে।
মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে ॥

— — —

কি ছার চকোর চান্দ দুহুঁ সম নহে।
ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে।

বিদ্যাপতির পূর্বরাগের পদে রাধার মানবী চাতুরীটুকু যেমন ধরা পড়ে অন্যদিকে চণ্ডীদাসের পূর্বরাগের পদে ভাবগভীরতা এত বেশী যে আমাদের তন্ময় হয়ে ভাবতে হয় এই অলৌকিক অনুরাগের কথা।

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদ: চণ্ডীদাসের রাধা ভাবের গভীরতায় অনন্য, বিদ্যাপতির রাধা মানবী বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল আর জ্ঞানদাসের রাধা রূপসচেতন। কৃষ্ণের অসামান্য রূপ দেখে রাধার অন্তরে পূর্বরাগের যে সূচনা তা জ্ঞানদাসের কাব্যে চিত্রিত। কৃষ্ণের রূপ দেখে আশ্চর্য হয়ে রাধা বলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

কেবল রূপের প্রতি অনুরাগ নয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের আকর্ষণও তীব্র। কৃষ্ণের প্রেম লাভের জন্য তাই তিনি এমন অস্থির।—

রূপ দেখি হিয়ায় আরতি না টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে।

কৃষ্ণের হাসিতে যেন মধু ঝরে পড়ে। কৃষ্ণের মৃদুমন্দ হাসির মধ্যেই রাধা

অমৃতরসের সন্ধান পান। গুরুজনদের মাঝে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শুনে তাঁর তনুমন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। আনন্দের গভীরতায় তাঁর চোখে জল এসে পড়ে।

পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাই আগুনি।

জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদগুলি চণ্ডীদাসের পদের মতই ভাবগভীরতায় অনন্য।

৪। ব্রজবুলি ভাষার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

বা

ব্রজবুলি ভাষা সম্পর্কে সবিশেষ বিচার সহ সাধারণভাবে পদাবলীর ভাষা সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর: মৈথিলের ভিত্তিতে গঠিত এক কৃত্রিম অথচ মধুর সাহিত্যিক ভাষাতে বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসংখ্য মহাজন এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্ত-ভাগে তরুণ রবীন্দ্রনাথও পদ রচনা করেন। এই কৃত্রিম মৈথিলকে বলা হয় ব্রজবুলি। এই নতুন ভাষা শুনে পাঠক মনে করল যে রাধাকৃষ্ণ ব্রজে এই ভাষাতেই কথা বলতেন। এটি ব্রজের বুলি—তাই এর নাম ব্রজবুলি।

অনেকে বিদ্যাপতির বাসস্থান মিথিলার ভাষা থেকে ব্রজবুলির জন্ম বলে মনে করেন। ব্রজবুলিতে মৈথিল ভাষার কিছু কিছু শব্দ থাকলেও এটি পুরোপুরি মৈথিল ভাষা নয়। বরং মিথিলায় প্রচলিত অবহট্ট ভাষার সঙ্গে ব্রজবুলির বেশী আত্মীয়তা। কেউ কেউ বলেন ব্রজভাষা থেকে ব্রজবুলির উৎপত্তি। কিন্তু তা একেবারেই সত্য নয়। ব্রজভাষা থেকে হিন্দীভাষার জন্ম হয়েছে। আসলে ব্রজবুলি ভাষাতে মৈথিল, বাংলা এবং কিছু কিছু হিন্দী শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। এটি একটি কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা।

এই ভাষায় প্রথম পদ রচনা করেন উমাপতি, পরে বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন। এই ভাষার মূল অবলম্বন মিথিলা অঞ্চলে প্রচলিত অবহট্ঠ বা লৌকিক ভাষা। পরবর্তীকালে সারা পূর্বাঞ্চলে এই সাহিত্যিক ভাষাকে অবলম্বন ক'রে নানা পদ রচনা করা হয়। বাংলায় ব্রজবুলিতে প্রথম পদ রচনা করেন যশোরাজ খান ("এক পয়োধর চন্দন লেপিত আর সহজই গোর।")। কিন্তু ব্রজবুলিতে শ্রেষ্ঠ পদকার হিসাবে বিদ্যাপতি অমর হয়ে আছেন। মিথিলার কবি হয়েও ব্রজবুলিতে রচিত পদের জন্যই তিনি বাঙালী কবির মর্যাদা পেয়েছেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং বিদ্যাপতি রচিত ব্রজবুলি পদ আস্বাদন করতেন।

যে সকল বাঙালী কবি ব্রজবুলিতে পদ রচনা ক'রে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই গোবিন্দদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, শেখর প্রভৃতি কবিগণ ব্রজবুলিতে পদ রচনা ক'রে খ্যাতি লাভ করেন।

গোবিন্দদাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনায় এমন দক্ষতা দেখিয়েছেন যে তাকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি আ্যাখ্যা দেওয়া হয়। যেমন—

ঘন ঘন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকেই লোচন তার॥

শেখর ব্রজবুলির পদে শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রজবুলিকে অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব পদাবলী সার্থকতার স্বর্গে উপনীত হয়েছে।

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলী বলতে কেবল ব্রজবুলি ভাষা নয়। বাংলা ভাষা ও ব্রজবুলি ভাষা—এই দুই ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ কবিগণ পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস, শেখর ইত্যাদি যেমন ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন তেমনি অন্যদিকে চণ্ডীদাস খাঁটি বাংলা ভাষায় পদ রচনা ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন।

এছাড়া মুরারি গুপ্ত, বাসুদেব ঘোষ প্রভৃতির রচনায় ব্রজবুলির নিদর্শন পাওয়া যায়। চৈতন্য পরবর্তীকালে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর ব্রজবুলি পদ রচনায় এত সার্থকতা লাভ করেছেন যে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়—

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাহঁ তাহঁা বিজুরি চমকময় হোতি।
যাহঁ যাহঁা অরুণ-চরণ চল চলই।
তাহঁা তাঁ থল-কমল দল দলই॥ (গোবিন্দদাস)

কিংবা

পাহু নেহারিতে নয়ন অন্ধায়ল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিষ গেল
বরিষে বরিষে কত ভেল॥

বাঙালী কবিগণ ব্রজবুলি এত স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন যে মনে হয় ব্রজবুলি যেন তাদের মাতৃভাষা। তাছাড়া এই ভাষার শ্রুতিমাধুর্য এত অধিক যে তার একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ছন্দ যেমন শিশু রবীন্দ্রনাথের মনকে আবিষ্ট করেছে তেমনি ব্রজবুলির সুমধুর ধ্বনিঝংকার তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ব্রজবুলিতে পদ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে—

"মরণ রে তহুঁ মম শ্যাম সমান।"

৫। অভিসার কাকে বলে তা ব্যাখ্যা করে এর বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর এবং এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাও।

অভিসার পর্যায়ের পদাবলীতে আধ্যাত্মিক গৌরবের সঙ্গে রোমাণ্টিকতা যুক্ত হওয়ায় এর আস্বাদে এসেছে বৈচিত্র্য—আলোচনা কর।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার বলিতে কি বোঝায়? তোমাদের পাঠ্য এই পর্যায়ের কিছু পদ বিশ্লেষণ করে অভিসারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝাও।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার কাহাকে বলে? অভিসারের পদরচনায় বিদ্যাপতি অথবা গোবিন্দদাসের কবিকৃতির পরিচয় দাও।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দৃষ্টিতে অভিসার রসপর্যায়ের বিশেষ তাৎপর্য কি? তোমার বিবেচনায় এ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি কে? যুক্তিদ্বারা তোমার অভিমত সমর্থন কর।

উত্তর: মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—

"যে নাহং নামৃতাস্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্"

"যা দিয়ে অমৃত পাওয়া যায় না তা দিয়ে আমি কি করব।" অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সাধনায় অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মাকে পাওয়া যায়। স্থিতি মৃত্যু সাধনায় সিদ্ধি বা জীবন। কেবল জড়ের জীবন নয় গতির জীবন। আমরা দুর্বার গতিতে ক্রমশঃ সাধনার পথে এগিয়ে চলেছি। গতির এই বৈশিষ্টের জন্যই সাহিত্যে তার স্থান অমর হয়ে আছে।

সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া বা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের উদ্দেশে যে গমন তাকেই বলে অভিসার। বৈষ্ণবসাহিত্যে অভিসারের পদে এই গতিবেগ বৈষ্ণবদের এক অসামান্য প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে। ইংরাজী সাহিত্যে অভিসার স্বতন্ত্র। সেখানে নায়ক নায়িকার উদ্দেশে অভিসার করেছে। ভারতীয় দর্শনে ও সাহিত্যে নায়িকাই অভিসার করে নায়কের উদ্দেশে। কারণ ভারতীয় জীবনদর্শনে পুরুষ নিস্ক্রিয় এবং প্রকৃতি সক্রিয়। তাই নারী পুরুষের নিকট অভিসারিকা। দুঃসহ দুঃখকষ্ট ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সে প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে অভিসারে গমন করে। এইভাবে সে অধ্যাত্মসাধনার বিজয় পতাকা উড্ডীন করে।

রবীন্দ্রকাব্যে অভিসারের তাৎপর্য সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে—

রে অভিসারিকা তারই জয়।
আনন্দে চলেছে সে কাঁটা মাড়িয়ে।

কিংবা, বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলছে আহ্বানের সুরে। (পুনশ্চ)

বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে অভিসারের প্রকৃতি বর্ণনা ক'রে বলা হয়েছে—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্না তামসীযান যোগ্য বেশাভিসারিকা॥

নায়কের গমন কিংবা নায়িকার গমন অভিসারের লক্ষণ। তবে নায়িকার অভিসার অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধার অভিসারের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়—

রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবলম্বন মনুসর তং হৃদয়েশম্॥

পীতাম্বর দাস নায়িকার বিভিন্ন প্রকার অভিসারের কথা বর্ণনা করেছেন। যথা, জ্যোৎস্নাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মত্তাভিসার, সঞ্চরাভিসার।

পদাবলী সাহিত্যে অভিসারের মত একটি লৌকিক বিষয়কে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে কবিগণ অলৌকিকতার পথে নিয়ে গেছেন। অন্যান্য সাহিত্যের মত বৈষ্ণবসাহিত্যে অভিসার লৌকিক নয় ভগবৎ সাধনার একটি দুঃসাধ্য উপায় মাত্র। ঈশ্বর লাভের উপায়স্বরূপ অভিসার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের নানা কর্মবন্ধনে জড়িত মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকে না। ভগবৎ সাধনার কথা ভাবতেও পারে না। এই সকল বন্ধনকে যতক্ষণ না ত্যাগ করা যায়, তুচ্ছ করা যায় ততক্ষণ মন ঈশ্বরাভিমুখী হয় না। রাধার অভিসারের মধ্যে দিয়ে সাধনার সেই সুকঠিন স্তরটিকে অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের অবিরত আকর্ষণ করে। তার সেই আকর্ষণে মানুষ ঈশ্বরের পথে যাত্রা করে। এই সময় সে সমাজ ও সংসারের ভয় লজ্জা শাসন প্রভৃতি কিছুই গ্রাহ্য করে না। শীত, অন্ধকার, দুর্যোগ, অবিশ্রান্ত বর্ষণ, বিষধর সর্পভয় এই সকল বাধাবিঘ্ন জয় করে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে গমন করতে সে এতটুকু দ্বিধা করে না। কারণ তখন তার সকল দেহবুদ্ধির বিলোপ ঘটে। এই সাধনায় জয়ী হলেই সে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করবে। অলৌকিক অভিসার ভিন্ন মানুষ কখনও এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে না। ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে প্রবল দুঃখ জয় করতে হয়। দুঃখজয়ের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলেই ঈশ্বর পাওয়া যায়। অভিসার আমাদের এই শিক্ষা দেয়। আর বৈষ্ণবকবিগণ অভিসারের ব্যঞ্জনাটুকু নিয়ে সাহিত্য সাধনায় তৎপর।

রাধার মাধ্যমে এই অভিসারের তত্ত্বটুকু উপস্থিত। তাই রাধাই অভিসার সাধনার মেরুদণ্ড। সমাজ সংসারের সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে রাধা চলেছেন কৃষ্ণ অভিসারে। তার মন প্রাণ কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে ব্যাকুল। এই অভিসারের নিভৃত প্রস্তুতিটুকুও চমৎকার—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতলে
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।

গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

এ এমন প্রস্তুতি যে নিজের হাতের কঙ্কনের বিনিময়ে বেদের কাছে ফণীমুখ বন্ধনের উপায় জানতে হয়। প্রস্তুতির পর সাজসজ্জা—রূপলাবণ্য সকল কিছুই মাধবের পায়ে উৎসর্গ করতে হবে। তাই রাধা অপরূপ সাজে সজ্জিত হলেন—

নিরুপম কাঞ্চন রুচির কলেবর লাবণি বরণি না হোই।
নিরমল বদনে হাসরস পরিমলে মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥

রাধা সকল রূপ ও সজ্জা নিয়ে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের জন্য অভিসারে যাত্রা করেন।

বিদ্যাপতির অভিসারের পদ—বিদ্যাপতির অভিসারের পদে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অসাধারণ। প্রথমে তিনি রাধাকে ভয়চকিত বালিকা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে রাধা অধিকতর সাহসিকা। তৃতীয় পর্যায়ে হৃদয়ের প্রেরণায় কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসার যাত্রা করেছেন।

গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ—অভিসার পর্যায়ের পদে গোবিন্দদাসের কৃতিত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী। তিনি অভিসারিকা রাধার অপূর্ব সুন্দর ভাবমূর্তি রচনা করেছেন। রাধা কৃষ্ণপদে নিবেদিতা। অভিসারের প্রস্তুতি, পরবর্তী পর্যায়ে সাজসজ্জা এবং শেষে অভিসার যাত্রা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তথাপি রাধা দেহকে উপেক্ষা করে অভিসার যাত্রা করেন। তাই গোবিন্দদাস বলেন—

ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥

প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রাধা কেমন করে দয়িতের কাছে পৌছান কবির মনে সেই প্রশ্ন—

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

কিন্তু ভক্ত যখন যেখানে ভগবান আত্মলীন হতে চান সেখানে। প্রাণভয় তো তুচ্ছ। তাই রাধার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন বাধাই নয়—

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্‌ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু মঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥

গোবিন্দদাসের পদে রাধার অভিসার অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা লাভ করেছে।

বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদাবলীর মধ্যে অভিসার একটি বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে পারে। কারণ এখানে মানসিক দিকটি এত বাস্তব যে তা আমাদের হৃদয়কে সহজেই মুগ্ধ করে। আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা এখানে কাব্যরসাস্বাদে বাধা দেয় না।

রাধার হৃদয়ের প্রস্তুতিটুকু যে অসামান্য সাধনার স্তর তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

৬। বৈষ্ণবদর্শনে ও সাহিত্যে মান বলতে কি বোঝান হয়েছে? এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা কর :—

উত্তর : উজ্জ্বলনীলমণিতে মানের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছে—

"স্নেহস্তুৎকৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যা মাধুর্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥"

অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত এবং একত্রে অবস্থিত নায়ক নায়িকার দর্শন, আলিঙ্গনাদি নিরোধ করে যা তা হল মান। একত্রে অবস্থান করলেও নায়ক নায়িকা স্বীয় অভিমত অনুসারে অনেক সময়ে আলিঙ্গন ও দর্শনাদি থেকে বিরত থাকে। নায়ক নায়িকার এই মানসিক অবস্থাকেই মান বলে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনায় মধুররসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই সাধনার বিভিন্ন পর্যায় আছে। অনুরাগ বা পূর্বরাগ থেকে শুরু করে মাথুর ও ভাবসম্মিলন পর্যন্ত এই সাধনা পরিব্যাপ্ত। সাধনার স্তর বিন্যাসে মানের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে :—

'উজ্জ্বল চন্দ্রিকা'য় মানের সংজ্ঞা দেওয়া আছে—

"স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য নূতন।
তাতে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ ॥"

অর্থাৎ নায়িকার যে সঞ্চারি ভাব দেখা যায় তাদের মধ্যে আছে—নির্বেদ শঙ্কা ক্রোধ, চপলতা গর্ব, অসূয়া, ভাবগোপন অবহিত্থা, গ্লানি ও চিন্তা। মানের দুটি প্রধান শাখা—সহেতু মান ও নির্হেতু মান। নায়িকাকে নায়ক ছলনা করলে নায়িকার মনে যে মানের আবির্ভাব ঘটে তাকে সহেতু মান বলে। এই মানের আটটি উপায় ১। সখীমুখে শ্রবণ ২। মুরলীধ্বনি শ্রবণ ৩। শুকমুখে শ্রবণ ৪। নায়ক দেহে (বা নায়িকা দেহে) ভোগচিহ্ন দর্শন ৫। বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্কদর্শন বা প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্নদর্শন ৬। গোত্র স্খলন ৭। স্বপ্নে দর্শন ৮। অপর নায়িকার সঙ্গে প্রিয়তমকে দর্শন। বৈষ্ণবপদাবলীতে মানের পদগুলি সাধারণত প্রিয়তমের দেহে ভোগচিহ্ন দর্শনের ভাব নিয়ে রচিত।

কারণ না থাকলে বা কারণের আভাস মাত্র থাকলে প্রেমের অতিরেকহেতু নায়ক বা নায়িকার মনে যে অভিমান জন্মায় তাকে নির্হেতু মান বলে। কৃষ্ণের ছলনায় যে সহেতুমানের উৎপত্তি রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যিক অনুমোদন দেন নি। নির্হেতু মানের মধ্যে প্রেমের আধিক্য প্রকাশিত হয় এবং নায়ক নায়িকার প্রেম নব মাধুর্য লাভ করে। কারণ প্রেমের ক্ষেত্রে এই অভিমান হেতু বিপত্তি মনের ভাবকে আরও উচ্চাঙ্গ রসমূর্তি দান করে। কিন্তু পদাবলী সাহিত্যে সহেতুক মানের উৎপত্তিই বেশী—তবে রাধিকার নির্হেতু মানও কম নয়। কৃষ্ণবক্ষের কৌস্তভমণিতে স্বীয় প্রতিবিম্বকে অন্য নায়িকা ভেবে শ্রীমতি মানিনী হয়েছেন—এটি নির্হেতু

মানের নিদর্শন। অনুরূপভাবে রাধার লাবণ্য তরঙ্গে নিজের প্রতিরূপ দেখতে পেয়ে কৃষ্ণের অভিমান হ'ল। এ বিষয়ে রায় শেখরের একটি পদ—

"বড় অপরূপ পেখলুঁ হাম।
কি লাগিয়া দোঁহে করল মান॥
বিবরি কহিবে সজনি হে।
একথা শুনিলে আউলায় দে॥
এত অদ্ভুত কোথা না শুনি।
নাগরী উপরে নাগর মানি॥
এহো অপরূপ কোথা না দেখি।
হেন প্রেম দুহুঁ শেখর সাখি॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রে মানের সঙ্গে আরও অন্য অনুষঙ্গ থাকে। অভিসার থেকে তার সুরু; নায়কের সঙ্কেত অনুসারে নায়িকা অভিসারে যান। কান্তের বিলম্ব দেখে নায়িকা উৎকণ্ঠিতা হন। এর পর সংকেত সত্ত্বেও নায়িকা যখন নায়কের দেখা পান না তখন নায়িকার বিপ্রলব্ধা অবস্থা; প্রতিনায়িকার কুঞ্জে রাত্রি যাপন করে ভোগবিলাস চিহ্ন গায়ে মেখে নায়ক যখন নায়িকার কুঞ্জে যান তখন নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা। নায়িকা কলহ করে নায়ককে কুঞ্জ থেকে তাড়িয়ে দেন—এই অবস্থার নাম কলহান্তরিতা। এই সকল পর্যায়েই মানের অবস্থা থাকে। তার পর মানভঞ্জনের পালা। তার জন্য নায়ক ও সখীদের নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়।

মান বিচিত্র এবং ব্যাপক। কারণ প্রেমের অস্তিত্বের মধ্যেই মানের অস্তিত্ব বিদ্যমান। তাই পদাবলী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদগুলি এই অবস্থাকে অবলম্বন করে রচিত। মানের উৎকর্ষ বিষয়ে কবিশেখর কালিদাস রায়ের মন্তব্য :—"এখানেই পদাবলীর রসসৃষ্টি চরমে উঠিয়াছে। মানই প্রধানত পদাবলীর মান রাখিয়াছে। কোন দেশের সাহিত্যে অভিমানকে সাহিত্যের রসবস্তু রূপে গ্রহণ করিয়া এমন চমৎকার পদ রচিত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, যে মান—ভারতীয় প্রেমকবিতার প্রাণ—সেই মানের একটা উপযুক্ত প্রতিশব্দ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে নাই। প্রণয়ের গাঢ়তার সঙ্গেই মানের সম্পর্ক। বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রণয়ের গাঢ়তা গূঢ়তা ও গভীরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে—তাহার ফলে মান এখানে এতদূর পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে মান প্রণয়লীলার একটি গতানুগতিক অঙ্গমাত্র। পদাবলী সাহিত্যে ইহা গতানুগতিকার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পারমার্থিকতায় পৌঁছিয়াছে। লৌকিক প্রেমের কবিতা হিসাবেও 'মান' পদাবলীকে একটি অনন্য-সাধারণ স্বাতন্ত্র্যগৌরব ও উচ্চতর মর্যাদা দান করিয়াছে।"

সুতরাং এই মানের মধ্যে দিয়ে পদাবলী সাহিত্য যে উচ্চতর ভাবপরিমণ্ডল রচনা করেছে তা আগামীদিনের প্রেমের কাব্যে আপন বৈশিষ্ট্য ও মহিমার স্বাক্ষর রাখবে তাতে সন্দেহ নেই। প্রেমের অতিগাঢ়তায় শ্রীরাধিকা এখানে কৃষ্ণ প্রেমময়ী—

এককথায় শ্যামময়ী হয়ে ওঠেন। সখীরা নানাভাবে 'মানের' পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। রাধা কুঞ্জে অপেক্ষা করেছন, কৃষ্ণের সংকেতেই তাঁর কুঞ্জে আগমন। তবুও কৃষ্ণ এলেন না। ফলে শ্রীরাধা মানিনী হলেন। কৃষ্ণের রঙ কালো—তাই তিনি কৃষ্ণতিল চন্দন দিয়ে ঢেকে রাখলেন। কালো তমালের গায়ে সাদা রঙ করলেন। দর্পণে তাঁর কৃষ্ণরূপ প্রতিবিম্বিত হয় বলে তিনি দর্পণ ভেঙে ফেললেন।

কিন্তু মানিনী শ্রীরাধা এভাবে তো বেশীক্ষণ থাকতে পারেন না। রাগ করে কৃষ্ণকে কুঞ্জ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এখন হৃদয়ের উত্তেজনা ক্রমশঃ কমে আসছে। কৃষ্ণকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুতপ্ত রাধার মনোভাব সখীরা বুঝেছেন। তাই সখী বলেন—

"সুন্দরী ইথে কি মনোরথ পুর
যাচিত রতন ফেলি পুন মাঙন সো মিলন অতি দূর"

সখী পূর্বেই নিষেধ করেছিল কৃষ্ণের বাঁশী শুনে প্রীতি বা প্রণয় না বাড়াতে। তখন শ্রীমতী সখীর কথা শোনেন নি। এখন সখী সুযোগ পেয়ে বলেন যে তখন যেমন তার কথা শোনেন নি এখন সারাজীবন কেঁদে যেতে হবে। সখী কৃষ্ণের সঙ্গে প্রণয় ভাঙারও পরামর্শ দেন। আবার কেউ বলেন :

"অপরাধ জানি গারি দশ দেয়বি পিরীতি ভাঙবে কাহে লাগি।
পিরীতি ভাঙিতে যো উপদেশল তাকর মুখে দেই আগি॥"

শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাধিকার মান নানাভাবে ভঞ্জন করবার চেষ্টা করেন। সখীদের মাধ্যমে সংবাদ নিতে লাগলেন। কোন কোন সখী বোঝালেন যে কৃষ্ণের প্রতি এই ঔদাসীন্য ভাল না। তবুও কি মান সহজে ভাঙতে চায়। সখীরা নানাভাবে কৃষ্ণের কথা বলতে থাকেন। তিনিও মনে মনে এবার কাতর। অর্থাৎ মানের প্রাথমিক অবস্থা আর নেই। এখন তাঁর মনে হয়—কানুর যতেক মিনতি উপেক্ষা ক'রে শ্রীরাধা ভাল করেন নি। এই মনোভাব জানা মাত্র সখীরা ইঙ্গিত বুঝে কৃষ্ণকে সংবাদ দেন। আর কৃষ্ণ রাধার মান ভঞ্জন হয়েছে জেনে কুঞ্জে ফিরে আসেন। আর সেইসময়—

"চরণ কমলে পড়ল কাম
সখীর বচনে তেজল মান"

পদটি জয়দেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এবার শ্রীমতীর পালা—তিনি কৃষ্ণের রাঙা পা দু'খানি প্রক্ষালিত ক'রে নিজের চিকুর দিয়ে মুছিয়ে দেন। এইভাবে মানভঞ্জন হয়। প্রেমের গাঢ়তা ও পূর্ণতা সাধনে 'মানে'র গুরুত্ব অপরিসীম। রাধাকৃষ্ণের লোকোত্তর প্রেম সাধনায় লৌকিক প্রেমের সকল স্তরই বিদ্যমান।

৭। প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। এই রস পর্যায়ের পদ আলোচনা ক'রে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্দেশ কর।

উত্তর : প্রেমবৈচিত্ত্য প্রেমাবিষ্ট হৃদয়ের একটি বিচিত্র ভাব। প্রেমিক নিকটেই

আছেন তথাপি প্রগাঢ় প্রেমব্যাকুলতায় প্রেমিকার মনে হয়, এই বুঝি প্রেমিককে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। এর ফলে হৃদয়ে যে বিরহবোধ জনিত বেদনার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় প্রেমবৈচিত্ত্য। 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে প্রেমবৈচিত্ত্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষ ধিয়ার্তিঃ স্যাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমিষ্যতে॥"

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ প্রেমবৈচিত্ত্য অবলম্বন ক'রে অনেক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করেছেন। রাধা কৃষ্ণকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। তথাপি কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনুযোগের শেষ নেই—

বধুঁ কি আর বলিব তোরে,
অলপ বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।

প্রেমের জ্বালা বড় কঠিন। এই জ্বালায় জ্বলে বার বার বলেন—

কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥

আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যেরই একটি অবস্থা ভেদ। প্রেমিকের প্রতি তীব্র অনুরাগবশতঃ আক্ষেপ বা খেদোক্তি—এই হচ্ছে আক্ষেপানুরাগ। কৃষ্ণকে রাধা প্রাণাধিক ভালবাসেন। তার উদ্দেশ্যে তিনি দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করেছেন—তথাপি রাধার মনে অনেক আক্ষেপ ও অনুযোগ। শুধু কৃষ্ণের প্রতি নয়, কৃষ্ণের মুরলীর প্রতি, কালো রঙের প্রতি, সখীগণের প্রতি, গুরুজনের প্রতি, বিধাতার প্রতি, কন্দর্পের প্রতি এমন কি নিজের প্রতিও তাঁর আক্ষেপ।

এই শ্রেণীর পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। রাধা কৃষ্ণঅন্ত প্রাণ। কৃষ্ণের বাইরে তার জীবনের অস্তিত্ব নেই। কৃষ্ণও যে রাধাঅন্ত প্রাণ তা তিনি ভাল ক'রেই জানেন। এবং জেনেও আক্ষেপ করেন—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥
কোন বিধি সিরজিল সোতের শেঁওলি।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥"

কৃষ্ণপ্রেমের সুতীব্র যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে রাধার আক্ষেপোক্তির মধ্যে। কৃষ্ণকে

তিনি সর্ব সুখের আশ্রয় বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের গভীর দহন জ্বালা তাকে যেন বেদনার সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলেই গরল ভেল॥

সেই প্রেমের দহন জ্বালা যেন রাধার জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়তি—

সখি, কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥

রাধা ভেবেছিলেন যে কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে বোধহয় সর্ব প্রাপ্তির আনন্দ। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখলেন যে তা সুতীব্র বেদনা মাত্র। তাতে পিপাসার শান্তি হয় না বরং পিপাসা বর্ধিত হয়।

পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

প্রেমবৈচিত্ত্য হচ্ছে প্রেমের বিচিত্রতা; এর মধ্যে একটি বিরহের সুর আছে। প্রিয়তমের দর্শন না পেলে ক্ষণমাত্রকে যুগ বলে মনে হয়। আবার মিলন হলে সন্দেহ হয়—পেয়েছি তো? অভাগীর অদৃষ্টে এ সুখ স্থায়ী হবে তো? হয়ত এখনই হারাতে হবে। মিলনের দীর্ঘ সময়কে পল বলে মনে হয়। বোধ হয় এই তো এখনই ফুরিয়ে গেল। সংসারে কেউ পরের ভাল দেখতে পারে না। বিধাতাও বিরূপ। অন্য সব ত্যাগ ক'রে যাকে আপনার বলে রাধা ভেবেছিলেন তাকেই পর বলে মনে হচ্ছে। আর তাই রাধিকার মনে আক্ষেপ জাগছে। বাঁশীর ধ্বনি শুনে নিজেকে হারিয়ে সংসারের সকল কিছু হারালেন। অথচ সেই রসিক চূড়ামণির আদি-অন্ত পাওয়া গেল না। প্রেমের প্রগাঢ়তা তার মনে নানা আশঙ্কার সৃষ্টি করে। প্রেমের স্বভাবই এই।

চণ্ডীদাস আক্ষেপানুরাগ ও প্রেমবৈচিত্ত্যের পদে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এখানে কবির তথা রাধার ভাবতন্ময়তা পূর্বরাগ অপেক্ষাও গভীর। চণ্ডীদাসের রাধিকার মধ্যে অহং সম্পূর্ণরূপে বিসর্জিত। তাই এখানে রাধার মধ্যে কেবল আক্ষেপ, অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই,—তিনি যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে দিয়েছেন। তিনি শুধু অধীর প্রতীক্ষায় মগ্ন। কিন্তু তারপর তিনি যখন দেখেন 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া' তখন

জ্ঞানদাসের রাধিকা কেশ ছিঁড়ে বেশ ছিঁড়ে ফেলেন না বরং বলেন "আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে।" কখনও বলেন—

সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙায়।
হায় নারী অবলার বধ লাগে তায়॥"

রাধার অবস্থা—'চোরের মা যেন পোয়ের লাগিয়া
ফুকারি কাঁদিতে নারে॥'

চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের একটি উল্লেখযোগ্য পদ :—

"কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥"

কৃষ্ণ প্রেমের জন্য সকল অসাধ্য সাধন রাধা করেছেন তবুও তিনি কৃষ্ণ প্রেমের রীতি প্রকৃতি বুঝতে পারেন নি—

'বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।'

কখনো রাধিকা নিজেকে এত অসহায় মনে করেন যে এই সংসারে তার আর কোন বন্ধু নেই—এই দুঃসময়েও যদি প্রেমিক না আসে তবে আর কখন তিনি আসবেন!—

বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥

মৃত্যু বরণ করতে তিনি দ্বিধা করবেন না যদি কৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকেন। ব্যক্তিসত্তার এমন বিলোপ চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের পদ ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখি না।

বৈষ্ণব পদসাহিত্যে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাস প্রেমবৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগের পদে শ্রেষ্ঠ। এদের দুজনের মধ্যে আবার চণ্ডীদাসের ভাবতন্ময়তা সর্বাধিক। চণ্ডীদাসের রাধার ভাবব্যাকুলতা এবং প্রেমের গাঢ়তা প্রকৃত পক্ষে সাধনার উচ্চতর সোপান। রাধার অবস্থান সাধনার যে স্তরে সেই স্তরে কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পেঁছিবার কথা ভাবাই বিড়ম্বনা। তারা কেবল যোগীদের রাগানুরাগ ভক্তির সাধনা করতে পারেন মাত্র। মধুর তথা উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার রসের সাধনার উচ্চতম সোপানে রাধার অধিষ্ঠান। রাধা আসলে কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির যে লীলা তারই লৌকিক পরম্পরা নির্দেশ করেছেন বৈষ্ণব দার্শনিক ও কবিগণ। চরিতামৃতকার কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমান।

চৈতন্যপরবর্তীকালে এই দর্শন প্রাধান্য লাভ করলেও চৈতন্যপূর্বযুগে রাধাকৃষ্ণের মধুরলীলাকে অবলম্বন করে যে সকল পদ রচিত হয়েছিল তাতে পার্থিব মানব-মানবীর অন্তরের আকুলতা যে গভীর রসব্যঞ্জনা লাভ করেছে তা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

প্রেমকাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে। পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ছায়ায় রচিত বিভিন্ন রসপর্যায়ের পদে দার্শনিক প্রভাব পড়েছে। সুতরাং চণ্ডীদাসের পদে যে সহজ ভাবতন্ময়তা ও সুনিবিড় আর্তি দেখা যায় পরবর্তীযুগের কবিদের পদে তা ততখানি দেখা যায় না।

৮। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে মাথুর বলতে কি বোঝায়? এ প্রসঙ্গে তোমাদের পঠিত পদ অবলম্বনে মাথুরের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর

মাথুর রস পর্যায়ের পদগুলির কাব্য ও ভাবসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।

বৈষ্ণব গীতিসাহিত্যে 'মাথুর' পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে এই পর্যায়ের অন্তর্গত তোমার পাঠ্য পদগুলির ভাবসৌন্দর্য বিচার কর।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাথুরলীলাকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন তা সংক্ষেপে নির্দেশ করে উপযুক্ত উদ্ধৃতি সহযোগে মাথুর পদগুলির সাহিত্যিক সৌন্দর্য বিচার কর।

তোমার পাঠ্য পদগুলির উপর নির্ভর করে 'মাথুর পর্যায়ের পদগুলির কাব্যরস বিচার কর।

বৈষ্ণব রসপর্যায়ে মাথুরের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং মাথুর অংশের পদগুলির কাব্যমুল্য বিচার কর।

উত্তর :—প্রেমকাব্যে বিরহ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বিরহ একটি বিশেষ রসপর্যায়ের পদ। বিরহের পদগুলি যত রসোত্তীর্ণ অন্য পদ ততটা হয়নি। প্রেমের পূর্ণতা মিলনে। কিন্তু বিরহ সেই মিলনকে গভীর মাধুর্য রসে পূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করে। উজ্জ্বল নীলমণিতে প্রবাসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ :—

"পূর্বসঙ্গত যোর্ু নোর্ভবেদ্দেশান্তবাদিভি :।
ব্যবধানন্ত যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে ॥"

অর্থাৎ পূর্বসম্মিত নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে দেশ গ্রাম নদী বনাদি স্থানান্তরের ব্যবধান, পণ্ডিতগণ তাকেই প্রবাস বলেন। পদাবলীসাহিত্যে কেবল নায়কের প্রবাস গমনই বর্ণিত হয়েছে। বিপ্রলম্ভের চতুর্বিধরূপের মধ্যে শেষ বা চতুর্থটি প্রবাস। প্রবাস দু'রকম : বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কার্যানুরোধে দূরে গমনের নাম বুদ্ধিপূর্বক। বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস আবার দু'ধরণের অদূর প্রবাস ও সুদূর প্রবাস। অদূর প্রবাস, কলিয়দমন, গোচারণ ও রাসে অন্তর্ধান। সুদূর প্রবাস হয় তিন প্রকার। ভাবী ভবন ভূত এ ভেদ তার" ॥ ভাবী ভবিষ্যতে—অদূর ভবিষ্যতে ক্ষণপরে ঘটবে। ভবন—বর্তমানে যা ঘটেছে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাচ্ছেন। ভূত—শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়েছেন, আসব বলে গেছেন কিন্তু আজও প্রত্যাবর্তন করেন নি।

প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে বিরহের দুস্তর ব্যবধান, মিলনের জন্ম উভয়ের মধ্যে উদগ্র ব্যাকুলতা, অথচ মিলনের কোন উপায় নেই। বিরহ-সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয় এক অব্যক্ত বেদনায় ক্রন্দনমুখর হয়ে ওঠে। বিরহের মধ্যে প্রেমিকার হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ নিবিড় বলেই জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যেও বিরহ অবলম্বন করে বহু উৎকৃষ্ট পদ রচিত হয়েছে। মিলনের নিবিড় আনন্দে রাধাকৃষ্ণের হৃদয় উদ্বেল। মিলনের পর বিরহের ব্যথা বেদনা দু'টি হৃদয়কে দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত করে আবার নতুন করে মিলনের পটভূমি প্রস্তুত করে দেয়।

'মাথুর' বিরহেরই অন্তরূপ। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে কংসকে দমন করবার জন্ম মথুরা চলে গেলেন। আর বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না। চিরদিনের জন্ম বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরাগমনকে অবলম্বন করেই মাথুরের পদগুলি রচিত হয়েছে। সাময়িক বিরহের পর মিলনের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মাথুর চিরবিচ্ছেদ। এর পর আর মিলনের কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তাই মাথুর কেবল অন্তহীন ব্যথা-বেদনার পদাবলী।

রাধার জীবন কৃষ্ণময়। কৃষ্ণকেই তিনি দেহমনপ্রাণ নিঃশেষে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তার জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রবাহিত। কৃষ্ণের বাইরে তার কোন জগৎ নেই। সেই কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবন ত্যাগ করে চিরকালের জন্ম মথুরায় চলে গেলেন তখন আর দুঃখের সীমা রইল না। তাঁর ঘর শূন্য, বৃন্দাবন নগরীতে নেমে এসেছে শূন্যতার অন্ধকার। যমুনার কূল অতি প্রিয় স্থান, কারণ এখানে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু এখন কেমন করে তিনি যমুনার কূলে যাবেন? কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে পাছে বাধা হয় তাই তিনি হার পরতেন না। স্তনে চন্দনলেপন করতেন না। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে এখন নদী ও পর্বতের চিরন্তন ব্যবধান। প্রাকৃতিক পরিবেশ এখন রাধার দুঃসহ দুঃখকে যেন বাড়িয়ে তুলেছে। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে প্রিয়মিলনের জন্ম হৃদয় যখন ব্যাকুল, তখন কৃষ্ণের অনুপস্থিতি তার হৃদয় বিদীর্ণ করে—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥

আকাশ বাতাস বর্ষার আবেশে আচ্ছন্ন। ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে। ময়ূর আনন্দে উল্লাসনৃত্য করছে। ভেকের দল মনের আনন্দে ডাকছে। ডাহুক ডাকছে। এই সময় প্রিয় মিলনের জন্ম তার হৃদয় অধীর। কিন্তু কোথায় তার কৃষ্ণ—

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া

প্রচণ্ড দুঃখের আঘাতে রাধার জীবন্মৃত অবস্থা। কৃষ্ণবিচ্ছেদ তাঁর জীবন সংশয়

ডেকে এনেছে। জীবন ধারণের সার্থকতাও আর নেই। তিনি এখন মৃত্যুপথযাত্রিনী। এর পর আবার যদি কৃষ্ণ কখনও আসনও, তবে তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ নবজাত অঙ্কুর যদি প্রচণ্ড সূর্যকিরণে মরে যায়, তবে তাতে বর্ষার জলসিঞ্চনে কোন লাভ হয় না। তাঁর এখন নবযৌবন—অথচ নবযৌবনই বিরহের তাপে শুষ্ক হয়ে গেল।—

এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।

কৃষ্ণ প্রেমের সিন্ধু। জগৎবাসী তার প্রেমসমুদ্রে প্রেমপিপাসা চরিতার্থ করে। কিন্তু রাধার ক্ষেত্রে তার বিপরীত অবস্থা। কৃষ্ণ তার হৃদয়েশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রেমপিপাসা মিটল না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে? চন্দনতরু সুগন্ধি ছড়ায়। অথচ তার ভাগ্যে বিপরীত হল। কৃষ্ণরূপ চন্দনতরু তার ভাগ্যে সুগন্ধি দান করল না। তাঁর ভাগ্যে চন্দ্রও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা বর্ষণের বদলে অগ্নিবর্ষণ সুরু করল। রাধার এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? তাঁর ভাগ্যে শ্রাবণ মাস বৃষ্টিহীন। কল্পতরু বন্ধ্যা—

শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব
সুরতরু বাঁঝকি ছন্দে।
গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্দে॥

মাথুর শীর্ষক পদগুলির কাব্যমূল্য যথেষ্ট। বৈষ্ণব কবিগণ এই পদাবলীর মধ্যে রাধার হৃদয়ার্তি বর্ণনার কালে শাশ্বত প্রেমিকার অন্তহীন ব্যথাবেদনার কথা বর্ণনা করেছেন। বৈষ্ণবকবিগণ যথার্থ জীবন রসিক। মানবজীবনপ্রবাহে মিলনের আনন্দ অতি ক্ষণস্থায়ী, এবং সেই হিসাবে বিরহানুভূতিই যে জীবনের শাশ্বত সত্য, তা তাঁরা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁদের পদাবলীতে বিরহের ব্যাকুলতা এরূপ করুণ রসনিবিড়তায় মূর্ত হতে পেরেছে। এই বিরহ এক শূন্যতাবোধে পর্যবসিত। রাধা বলেন—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥

কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর রাধা সাধনার চরম স্তরে উঠে কৃষ্ণ ও তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি। শ্রীমতি রাধিকাই কৃষ্ণে পরিণত হয়েছেন—

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই"

এছাড়া চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ মাথুরের বিরহ-ভাব অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য রচনা করেছেন। তবে গোবিন্দদাসের সাধনা ভক্তের সাধনা—রাগানুগা ভক্তির সাধনা। তাই রাধার হৃদয়ভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে

তিনি পারেন নি। চণ্ডীদাস বিরহের কবি সত্য, কিন্তু মাথুরের বিরহে তাঁর কৃতিত্ব আপেক্ষিকভাবে কম। আক্ষেপানুরাগেই চণ্ডীদাসের সমধিক কৃতিত্ব।

৬। ভাবোল্লাস পর্যায়ের পদগুলির কাব্যগুণ বিচার কর। এই প্রসঙ্গে ভাবোল্লাস পর্যায়টির পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

অথবা

বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাবোল্লাস পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। এই পর্যায়ের পাঠ্য পদগুলির সৌন্দর্যবিচার কর।

উত্তর :—বৈষ্ণবশাস্ত্রে শৃঙ্গাররসের প্রধান দুটি বিভাগ—একটি বিপ্রলম্ভ ও অপরটি সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের চারটি স্তরের পর সম্ভোগ এবং সম্ভোগজনিত ভাবোল্লাস। সম্ভোগের সংজ্ঞা নিম্নরূপ—

"দর্শনালিঙ্গনাদী নামানুকূল্যান্নিষেবয়া।
যুনোরুল্লাস সমারোহন্ ভাবঃসম্ভোগ ঈর্য্যতে॥"

দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্যহেতু নায়ক-নায়িকার যে ভাবোল্লাস তারই নাম সম্ভোগ। মুখ্য ও গৌণভেদে ঐ সম্ভোগ দু' প্রকার। সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান এই তিন প্রকার মিলন গৌণ সম্ভোগ নামে অভিহিত।

কৃষ্ণ কংস দলন করবার জন্য মথুরায় গেলেন আর ফেরেন নি। অতএব শ্রীরাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের আর মিলন সম্ভব নয়। বৈষ্ণব কবিগণ বিরহিণী রাধিকাকে মিলিত করেছেন ভাবে—তাই ভাবসম্মিলন বলা হয় এই সম্ভোগের পদকে। বৈষ্ণবীয় রসশাস্ত্রে ভাবোল্লাসের কোন উল্লেখ না থাকলেও পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্লবে যে সকল পদ সংকলিত করা হয়েছে, তাদের ভাবোল্লাসের পদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মাথুরের বিরহ বৈষ্ণব কবিদের আচ্ছন্ন করেছে। তাই তারা এই বিরহ সইতে না পেরে কাল্পনিক মিলনের পদ রচনা করেছেন। রাধা কল্পনায় কৃষ্ণের সঙ্গ সুখ অনুভব করেছেন। এই ধরণের পদেই মিলন জনিত ভাবোল্লাস বর্ণিত আছে। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভাব-সম্মিলনের পদগুলির আবেগের নিষ্ঠা ও রসের বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ এই পদসমূহে বিরহ ও মিলনের রস একসঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর রাধা আর কৃষ্ণের পুনরায় মিলন হয় নাই বটে, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ এই বিরহের হাহাকারে কেমন করিয়া সমাপ্তির রেখা টানিবেন? তাই তাঁহারা ভাব সম্মিলনের ও ভাবোল্লাস পর্যায়ের এক পৃথক পরিকল্পনা করিয়াছেন। ভাবলোকে মনোজগতে কল্পনার আকাশে শ্রীরাধা কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া মনে করিতেছেন, যেন কৃষ্ণ সত্যই দীর্ঘ বিরহের ব্যবধানের পর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিতেছেন—চারিদিকে তাহারই শুভ সূচনা। কিন্তু কৃষ্ণ তো মথুরা হইতে ফিরেন নাই।...

পদকর্তা এ নির্মমতা সহ্য করিবেন কি করিয়া ? তাই এই পর্যায়ের পদে রাধাকৃষ্ণের কাল্পনিক মিলনের চিত্র অ'াকিয়া তাঁহারা লীলারসের উপসংহার করিয়াছেন।"

অতএব দেখা যাচ্ছে যা ভাবোল্লাস তাই ভাবসম্মিলন। সম্ভোগ নায়ক নায়িকার মিলনের বা সম্ভোগের একটি ভাব—এটি বাস্তব নয় ভাবগত—কারণ মাথুরের পদে যে বিরহ সেই বিরহের অবসান বাস্তবে হয় নি—কৃষ্ণ আর ফিরে আসেন নি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে যে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের কথা বলা হয়েছে তা এই ভাবসম্মিলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে নায়িকা এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কিন্তু রাধা পরকীয়া। তাই তাঁর পক্ষে পূর্ণ স্বতন্ত্রতা সম্ভবপর নয়। এই কারণে বৃন্দাবন-লীলায় সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ কল্পনা করা কঠিন। রূপ গোস্বামী 'ললিত মাধব' নাটকে রাধাকে মায়িকভাবে দ্বারকায় নিয়ে গিয়ে সত্যভামায় রূপান্তরিত ক'রে মহারাজ কৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। পরকীয়াকে স্বকীয়া ক'রে তবেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ দেখানো সম্ভব। অতএব পদাবলী সাহিত্যে যা সম্ভোগ তাকেই ভাবোল্লাস বা ভাবসম্মিলন রূপে অভিহিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে কালিদাস রায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণের যে নিত্য মিলনের কথা বলিয়াছেন তাহা বৃন্দাবনের রূপলোকে নয়, তাহা কোন কুঞ্জে নয়, তাহা ভাবলোকে। মহাভাবই বৃন্দাবন লীলায় রূপের মাঝারে অঙ্গ লাভ করিল—সে রূপ আবার ভাবের মাঝারে ছাড়া পাইল। ইহাই ভাব সম্মেলনের মূল কথা।..."

এই মহাভাবস্বরূপা রাধা ঠাকুরাণীর ভাবমিলন মায়িক বা কাল্পনিক। রাধা তো কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। সেই শক্তি শক্তিমানের সঙ্গে মিলিত হতে চায়; হৃদয়ের বস্তু হৃদয়ে ফিরে যাওয়াই ভাব সম্মেলনের পরম ও চরম সার্থকতা। রাধাকৃষ্ণ এক অথচ এক নয়; ভেদ আছে আবার অভেদও আছে। প্রজ্বলিত কাষ্ঠের অগ্নির সঙ্গে কাষ্ঠের যেমন ভেদ রাধাকৃষ্ণের সেইরূপ ভেদ, আবার অগ্নির অবস্থান কাষ্ঠ ছাড়া সম্ভব নয় আবার অগ্নি ছাড়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠের অস্তিত্ব কল্পনা করা কঠিন। সেইরূপ ভেদ ও অভেদের এই তত্ত্বকে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি প্রায় সকল রসপর্যায় অবলম্বন ক'রে পদ রচনা করেছেন। তবে ভাবসম্মেলনের পদে যে বিচিত্র অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছেন তা অনুভব করলে বিস্মিত হতে হয়। এইজন্যই মহাপ্রভু তাঁর কাব্য আস্বাদন ক'রে ভাবৈক রসঃ হতেন। এই পর্যায়ের পদে বিদ্যাপতি তুলনারহিত। বিরহের পদ রচনা করলেও মিলনের পদেই যেন বিদ্যাপতিকে প্রকৃতভাবে আমরা পাই। এই মিলন 'বাস্তব মিলনই হোক আর ভাব সম্মেলনই হোক।

কৃষ্ণ আসবেন দূতী মুখে তা শ্রবণ ক'রে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন—

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥

স্বদেহকে আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি কল্পনার মধ্যে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কবি-কল্পনা প্রকাশিত। তারপর প্রিয়কে পাওয়ার আনন্দ:

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা॥

আজ আর তাঁর জীবনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কোন সংশয় নেই। আজ তাকে মিলনের মধ্যেও প্রতি মুহূর্তে বিরহের ভয়ে যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে হবে না। এই ভাব-মিলনই যে প্রকৃত মিলন—এই মিলনের মধ্যেই তার দেহ সার্থক—

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

জাগতিক মিলনে আছে হৃদয় যন্ত্রণা। প্রকৃতির বুকে ঋতুচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাগে আবেগের প্লাবন। বসন্তকালে বিমল জ্যোৎস্না ধারায় কোকিলের কুহুতানে দেহ-মন প্রিয়-মিলনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে, সেই সময় প্রিয়কে না পাওয়া গেলেই হৃদয় কাঁদতে থাকে। কিন্তু এখন ভাব মিলনের পর্যায়ে সে ভয় আর নেই—

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

রাধা ভাবসম্মেলনের মধ্যেই চিরশান্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাই সখীকে আনন্দ-উৎফুল্ল কণ্ঠে বলছেন—

কি কহব রে সখী আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

চণ্ডীদাস আক্ষেপানুরাগের পদে অপরাজেয়, কিন্তু ভাব সম্মেলনে আন্তরিকতা আরও সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনভোর রাধিকা কৃষ্ণ সম্মেলনে কাটিয়েছেন তবুও তিনি বলেন—'জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি'—তখন আর বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। বিদ্যাপতির ভাব চণ্ডীদাসের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

(এখন) কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

চণ্ডীদাসের রাধা বলেন,

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরানগরে ছিলে তো ভাল॥
এসব দুখ কিছু না গনি।
তোমার কুশলে কুশল জানি॥

আমিত্বের এমন সম্পূর্ণ লোপ চণ্ডীদাসের রাধায় সম্ভব। ভাব সম্মেলনের আনন্দে রাধার আমিত্ব লুপ্ত হয়ে সকল কিছুই কৃষ্ণে সমর্পিত হয়ে গেছে।

১০। তোমার পঠিত আত্মনিবেদন বা প্রার্থনা পদগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: ভক্ত যেখানে ভগবানের পদতলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করেন তাকে আত্মনিবেদন বলে। এই রসপর্যায়ের পদগুলিই বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রার্থনা বা নিবেদন পর্যায়ের পদরূপে চিহ্নিত। রাধা ভক্ত শ্রেষ্ঠা। তাঁর মত সাধনা জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ রাধা তো আর জীব নন। তিনি ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। তথাপি দুয়ের মধ্যে ভেদ আছে। তাই রাধা ভগবানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করেন। বৈষ্ণব কবিরা রাধার এই নিবেদনের মধ্যেই মর্তজীবনের সার্থকতার পথ খুঁজে পেয়েছেন। রাধার আত্ম নিবেদন ও প্রার্থনা পদের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিবেদনে রাধা ভক্ত শ্রেষ্ঠা। ভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রেই তিনি সুখী—

বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।

কৃষ্ণের জন্য রাধা সমাজ সংসার সব ত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণ বিনা তার গতি নেই—

ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর

কৃষ্ণের মধ্যেই তার পৃথিবী। কৃষ্ণের জন্য তিনি সব নিন্দা কলঙ্কও সহ্য করতে প্রস্তুত।

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ ॥

প্রার্থনা : বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রার্থনা পর্যায়ের পদের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। পূর্বরাগ থেকে শুরু ক'রে মাথুর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়, প্রার্থনার পদ তার ব্যতিক্রম। এখানে ভগবান মুক্তিদাতা আর ভক্ত মুক্তিপ্রার্থী। ভক্ত যেন জীবন-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে পরিণত অবস্থায় ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের প্রার্থনায় ব্যাকুল। বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যান্য পদ যেমন মানবিক রসে উজ্জ্বল, প্রার্থনার পদ কৃষ্ণের ঐশ্বরিক রূপে সমৃদ্ধ।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদগুলিতে ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গের বাসনা মূর্ত হয়েছে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ঈশ্বরই মানুষের শেষ আশ্রয়। ঈশ্বরের নিকট নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা ভিন্ন আর অন্য কোন গতি নেই। তাই কবি তিল তুলসী দিয়ে নিজেকে কৃষ্ণপদে অর্পণ করেছেন—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসি তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।

কবি জানেন যে তাঁর জীবনের দোষগুণ বিচার করবার কালে গুণের ভাগ বেশী পাওয়া যাবে না। পরের জন্মে পশুপাখী প্রভৃতি যেভাবেই জন্ম হোক না কেন, তাঁর চিত্ত যেন ঈশ্বরের পাদপদ্মেই থাকে, কবির এই প্রার্থনা ;—

কিয়ে মানুষ পশু পাখি কুলে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥

ঈশ্বরের কাছে ভক্তের পরীক্ষা কর্মের মধ্যে। ভক্ত যদি পুণ্যকর্মে জীবন অতিবাহিত করে, তবে তাঁর পক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ কঠিন হয় না। কিন্তু কবি মনে করেন তাঁর জীবনের অনেকাংশ কেটেছে ভোগবিলাসের মধ্যে। :

তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম
সুতমিত রমণীসমাজে।
তোঁহে বিসরি মন তাহে সমর্পিলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে ॥

কবির অর্ধেক জীবন কেটে গেছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, নারীসঙ্গে ভোগবিলাসের মধ্যে যৌবনের দিনগুলি কেটেছে। এইরূপ জীবন যাপনের পরিণতি যে ভয়াবহ, কবি তা জানেন, তথাপি কৃষ্ণের প্রতি আছে তাঁর অগাধ বিশ্বাস—

তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা।

ঈশ্বরের আদিও নেই, অন্তও নেই। পৃথিবীর সব কিছু তার থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। কবির তাই নিশ্চিন্ত বিশ্বাস—

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনা গতি নাহি আয়া।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভবতারণ ভার তোহারা॥

চণ্ডীদাসের নিবেদন পর্যায়ের পদের সঙ্গে বিদ্যাপতির প্রার্থনা পদের ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধানতঃ রসসম্ভোগের কবিরূপে বিদ্যাপতি পরিচিত হলেও শান্তরসাশ্রিত প্রার্থনা পদগুলি তাঁর সাহিত্যকীর্তিরূপে অম্লান হয়ে আছে। বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের প্রথম রস শান্তরস। এখানে ভগবান বিষয়ে ঐশ্বর্যের অনুভূতি বর্তমান। তাই এই শ্রেণীর পদগুলিতে ভক্ত ভগবানের ঐশ্বরিক রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। চৈতন্যপূর্বযুগের কবি বিদ্যাপতির কাব্যে ভগবানের ঐশ্বর্যরূপটির প্রকাশ আছে সত্য। কিন্তু প্রার্থনা পর্যায়ের পদে যে দীনতা ও অকিঞ্চনতা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বিদ্যাপতিকে শ্রেষ্ঠ সাধকরূপে পরিগণিত করা যায়।

চণ্ডীদাস প্রার্থনা পর্যায়ের পদ লেখেন নি। তাঁর 'নিবেদন' পর্যায়ের পদগুলিকে প্রার্থনা পর্যায়ভুক্ত করা চলে। রাধার জবানীতে চণ্ডীদাস কৃষ্ণের পদে আত্মসমর্পণ করেছেন—

"কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্যসম
তোমারি চরণখানি।"

ঈশ্বরকে নিত্য বস্তু বলে মনে করে জাগতিক কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে ভক্ত ভগবানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এই পর্যায়ে। কখনো বা মুক্তি কামনা করেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্কের এই অবস্থাকে শান্তরসের অবস্থা বলা হয়। চৈতন্যপূর্বযুগের এই পদে মুক্তির বাসনা ছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম অনুসারে পরবর্তী কালে ভক্ত কখনই মুক্তির কামনা করেন না। শান্ত রসাশ্রিত পদে ভক্ত যখন ভগবানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেন এবং এই ভবপারাবার পার করবার দায়িত্ব অর্পণ করেন তখনই প্রার্থনার সূচনা। এই ভাববস্তুকে অবলম্বন করে যে পদ রচিত তাকে বলা হয় প্রার্থনার পদ। এইভাবে ভক্ত এই মায়াময় সংসার থেকে মুক্তি চান। প্রার্থনার পদে ভক্তের এই আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা ও মুক্তি বাসনা প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাপতি প্রার্থনা পদের শ্রেষ্ঠ রূপকার। এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবির আত্মদৈন্য, আত্মনিবেদন, জগতের অনিত্যতা এবং জীবের পরম আশ্রয় ভগবানে আত্মসমর্পণের কথা বলা হয়েছে। এই জগৎ যে অতি তুচ্ছ এবং

মায়াময়—এই অনুভূতি প্রথম জীবনে তাঁর না হলেও পরবর্তীকালে হয়েছে। জীবনের অর্ধেক সময় তিনি নিদ্রায় কাটালেন—বন্ধুদের সঙ্গে রসালাপে কতদিন গেল। যৌবনে রমণীসঙ্গে কত সময় নষ্ট করেছেন। আর বার্ধক্যে এসে দেখেছেন যে দোষগুণ বিচার করতে গেলে গুণের লেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাপি তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস এই বিশ্বের প্রতিটি কীটপতঙ্গ প্রাণীকে যিনি ত্রাণ করেছেন তিনি কবিকেও ত্রাণ করবেন। কারণ তাঁর থেকেই সকল কিছু জন্ম নিচ্ছে। চতুরানন ব্রহ্মাও এই পালনকর্তার অধীন। কিন্তু কৃষ্ণ—যিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত তিনি অনাদি ও অনন্ত। তাঁর সূচনাও নেই, শেষ বা মৃত্যুও নেই। কবি তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত কারণ তাঁর হাতেই আছে বিশ্বকে ত্রাণ করার ভার—"ভবতারণ ভার তোহারা"

শেষ বয়সে কবি আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে উন্নীত হয়েছেন। আমিত্বের বর্জন করে সবই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেছেন। ভক্তের তথা জীবের মাধবের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্য উপায় তো আর নেই। এই উপলব্ধি কবির প্রার্থনা পদকে শাশ্বত সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে।

১১। বৈষ্ণব পদাবলীর রসভাষ্যের সঙ্গে বাস্তবতার সামঞ্জস্য কতখানি সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কর।

অথবা

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব কবিতাকে শুধু বৈকুণ্ঠের গান বলে স্বীকার করতে চান নি। তিনি এই সঙ্গীত রসধারাকে মর্তবাসীর প্রেমতৃষ্ণা মেটাবার আধার রূপে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে বৈষ্ণব পদাবলীর মূল্যায়ন কর।

উত্তর: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী একটি অমূল্য সম্পদ। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের একটিমাত্র শাখাই সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে—তা হ'ল বৈষ্ণব পদাবলী। অথচ এ কথা স্পষ্ট যে এই পদাবলী একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাহিত্য। ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাহিত্য হয়েও যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায় ভুক্ত হতে পারে তার মধ্যে কিছু চিরন্তনত্ব আছে সন্দেহ নেই। কি সেই শাশ্বত সত্য? বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে বিচার করার আগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের মূল ভিত্তি অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি ক'রেই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য: জগৎ ও জীবের সঙ্গে ভেদও নেই আবার অভেদও নেই। জগৎ ও জীবের সঙ্গে ব্রহ্মার যে সম্বন্ধ, তার মাধ্যমে অভেদের মধ্যে ভেদ ও ভেদের মধ্যে অভেদ নিত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এদের সম্পর্ক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্ক। জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের

সঙ্গে অভিন্ন হয়ে তাকে জানতে পারে না বলে পূর্ণজ্ঞান লাভ হয় না। ফলে উভয়ের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন ভেদাভেদ থেকে যায়।

ব্রহ্ম এই জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি এদের আশ্রয় স্বরূপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি স্বতন্ত্র। "এই জগৎ ও জীব ঈশ্বরের ভোগের ও জ্ঞানের বিষয় হইয়া অনাদিকাল ইহারই মধ্যে রহিয়াছে। অনন্ত ব্রহ্মার সকল প্রকাশ, সকল রূপ ও রসের বিচিত্র মূর্তিকে অলীক ও মায়িক বলিতে সৃষ্টির আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় চলিয়া যাইতে হয়। অব্যক্ত যখনই আপনাকে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, সেই প্রকাশের সেই ব্যক্তের জগতেই জ্ঞানের ও আনন্দের উদ্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির আদিতে যাহা, সেই অসীম অনন্ত মহাশূন্য ব্যোমের কথা শুধু তত্ত্ব মাত্র। তাহার সহিত আমাদের জীবনের কোন যোগ নাই। এই তত্ত্ব অব্যক্ত ও অনন্ত। এই অব্যক্ত ও অনন্তই জীব ও জগতের নানাবিধ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন—ইনি আনন্দ স্বরূপ। কাজেই ইহার সৃষ্টির সকল কিছুই আনন্দময়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানবস্তু, ইহাই বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ আর তাঁহার সৃষ্ট জীব ও জগৎ তাঁহার প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। তিনি একা ভোক্তা আর জীব ও জগৎ অনুক্ষণ তাঁহার নিত্যলীলার আয়োজন রচনা করিতেছে। এই জন্যই বিশ্বের একমাত্র পুরুষ তিনি।"

জীব ও জগৎকে সাধারণভাবে প্রকৃতি বলা যায়। এই প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ও পূর্ণানন্দ বিকশিত হচ্ছে। পরমপুরুষের আকর্ষণে প্রকৃতি নিত্যকাল ধরে তার অনুসরণ করছে। ব্যক্ত ও অব্যক্তের নিত্যলীলাই পুরুষ-প্রকৃতির লীলা। অব্যক্ত আমাদের কাছে তত্ত্ব মাত্র। কিন্তু তিনি যখন ব্যক্ত হন আমরা তখন তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি। একদিকে বিশ্বের পরমপুরুষ আর একদিকে বিশ্ব প্রকৃতি অর্থাৎ তার সৃষ্টি। এই দুই বস্তু ভিন্ন নয়। আবার অভিন্নও নয়। এদের মধ্যে যুগপৎ ভেদ এবং অভেদের সম্পর্ক। এ মানবুদ্ধির অতীত; তাই এ অচিন্ত্য। একেই বলে বৈষ্ণবের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভক্তির স্থান সর্বোচ্চে। একমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়। পার্থিব সকল প্রকার সংস্কার পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণে দেহমন সমর্পণ করবার নাম ভক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র এই ভক্তিরই বশ। তাই চৈতন্যদেব বলেছেন—

"শাস্ত্র কহে কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয় ভক্ত্যে তারে ভজি ॥"

কিংবা—

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার।
রায় কহে ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্তি।
কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি যায় হয় খ্যাতি ॥

বৈষ্ণব দর্শনে রাধা মহাপ্রকৃতি স্বরূপা। তিনি জীব ও জগতের প্রতীক। তাঁর সঙ্গে পরমপুরুষের অবিশ্রান্ত লীলা চলছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধক প্রাণভরে পুরুষ-প্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণ-রাধার নিত্যলীলা আস্বাদন ক'রে তাদের জীবন সার্থক করেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ। সকল জীব ও জগৎ প্রকৃতি। সুতরাং বৈষ্ণব-সাধক মাত্রই জীবের অংশ। এরাই সখী নামে পরিচিত, এদের একমাত্র কাম্য : রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদন। চৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য এদের সম্পর্কে বলেছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এই ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক। পূর্বরাগ, মান, অভিসার সকল পর্যায়ে এই আধ্যাত্মিকতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত। চৈতন্যপূর্ব পদকর্তাদের পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন প্রভাব বিস্তার করেনি সত্য তথাপি সেখানেও আধ্যাত্মিকতার সুস্পষ্ট সুর প্রতিধ্বনিত হয়। চৈতন্য পরবর্তী কবিসমাজ আধ্যাত্মিকতাকে পুরোপুরি মেনে নিয়েই পদ রচনা করেছেন। রূপের মধ্য দিয়ে অপরূপের সাধনা। সীমার মাঝে অসীমের লীলা বৈচিত্র্য পরিস্ফুট করা পদকর্তাদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়েছে। অসীম যিনি—তিনি কৃষ্ণ। তিনি স্থির হয়ে নেই। সীমার মাঝারে হারা হবার বাসনা তার অন্তরে সদা জাগ্রত। তাই অরূপ অসীম অর্থাৎ ভগবান আপন হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে লীলা করার বাসনা নিয়েই জীব ও প্রকৃতি জগতের মধ্য অবস্থান করেন। আবার এই জীব ও জগৎ অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মের সৃষ্টি বলে সকলই তাঁতে অবস্থিত। এটি একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, এক ধর্মীয় কবিগোষ্ঠী কীভাবে এই তত্ত্বকথাকে সর্বজনের উপভোগ্য করে তুললেন?

এই প্রশ্নের উত্তরও দুষ্প্রাপ্য নয়। কারণ যিনি অসীম তিনিই নরদেহের সীমার মধ্যেই ধরা দেন। আমাদের এই ঘরেতে মানুষের ঠাকুরালি যেমন দেখা যায় তেমনি দেবতা মানুষ হয়ে বাস্তব জীবনের পটভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেন। নরদেহে লীলারস আস্বাদনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গৌরাঙ্গ রূপে মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব এখানে দেববাদ ও অলৌকিকতাবাদ বর্জিত হয়ে অপ্রাকৃতপ্রেম প্রাকৃত প্রেমের মর্যাদা গ্রহণ করেছে। যিনি ভক্তিরসের পূজারী নন তিনিও এই কাব্য থেকে আনন্দ আহরণ করতে সক্ষম হবেন। অতএব মানবিক আবেদনে এ কাব্য উজ্জ্বল। গোপবালা রাধার প্রেমের তীব্রতা ও ব্যাকুলতা যে কোন মানবিক ব্যাকুলতার সঙ্গে তুলিত হতে পারে। যেহেতু ভগবানের ঐশ্বর্যরূপ চৈতন্যোত্তর পদে বর্জিত হয়েছে সেইহেতু ধর্মীয় সংকীর্ণতা এই কাব্যের মানবিক আবেদনকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

হৃদয়াবেগের এমন সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সার্বজনীন হতে বাধ্য। কোন তত্ত্ব বা তথ্য এর কাব্যরসকে ভারাক্রান্ত করতে পারে না। পদের এই আকুলতা বোঝার জন্য কোন তত্ত্ব জানার ও কোন সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার প্রয়োজন নেই। এ চিরন্তন প্রেমের কাব্য হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। সকল দেশের সকল কালের বিবাহিতা নারীর হৃদয়ের আকুলতা এতে ধরা পড়ে। যা সার্বজনীন হতে পারে তাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। সেই কারণেই সকল শ্রেণীর পাঠক এই কাব্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে থাকেন। যদিও এর পিছনে একটি বিশেষ ধর্ম ও তত্ত্ব নিহিত, তথাপি তত্ত্ব ও ধর্ম ছাড়াই কেবল কাব্য হিসাবে একে অনায়াসে আস্বাদন করা চলে।

তাছাড়া রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্ভবত কোন লৌকিক কাহিনীর আধারেই রচিত। পরে তার ওপর তত্ত্বের বিন্যাস করা হয়েছে। চৈতন্যপূর্ব সাহিত্যে তত্ত্বের প্রচার ছিল না বললেই চলে। জয়দেবের কাব্যের কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যভাবের পদ আছে বটে তথাপি অন্য বৈষ্ণবপদে তত্ত্ব মুখ্য নয়—লীলারসই মুখ্য। ধর্মীয় প্রেরণার পরিবর্তে কাব্যপ্রেরণাই কবিদের এই ধরনের পদরচনায় সহায়তা করেছে। লোকগীতি ও জনশ্রুতি এই ধরনের কাব্যে প্রাণবস্তু। তাই তত্ত্বকে সরিয়ে রেখে কেবল কাব্যরূপে তা আস্বাদন করা সম্ভব। তাই কিন্তু ঘটেছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণবের সংখ্যা নগণ্য—কিন্তু কাব্যাস্বাদে আনন্দিত চিত্ত মানুষের অভাব নেই। অতএব ধর্মীয় মনোভাব এই কাব্যের আস্বাদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি।

ঠিক সেইকারণেই রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকবিদের এই প্রেমমন্ত্র দীক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন—

'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই মুখছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এ প্রেমগান
বিরহ তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।
বিজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি।"

কবিতা যদি "emotion recollected in tranquility" হয় তাহলে কবি হৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি কাব্যে রূপান্তরিত হয়। সেইযুগে কাব্যে ব্যক্তিজীবনের সরাসরি প্রকাশ ছিল না। তাই লৌকিক কাহিনী ও জনশ্রুতিকে অবলম্বন করতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ সোজাসুজি বৈষ্ণবকবিকে সেই প্রশ্নই করেছেন। তত্ত্ব যাই থাক নাকেন, ব্যক্তিহৃদয়ের প্রেমানুভূতির স্পর্শ না থাকলে এই কাব্য কখনও এমন সর্বজনের আস্বাদ্য হয়ে দেখা দিত না। বৈষ্ণব পদাবলী এক ধরনের গীতিকবিতা আর গীতি কবিতার প্রাণবস্তু ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ। এখানে ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ আছে ঠিকই কিন্তু তা সকলই রাধার জবানীতে। শাশ্বত কালে বিরহিনী নায়িকা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষাতেই রাধা কথা বলেছেন। প্রেমের দৃঢ়তা ও গভীরতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করাই বৈষ্ণব কবিদের কাজ। এবং প্রেম যেখানে ভাবতন্ময় হয়ে ওঠে সেই পর্যায়ে গিয়েও রাধা অনুক্ষণ হারাই হারাই ভাবে বিরহ-তাপিতা। জীবন সত্যের এমন প্রকাশ যে কাব্যে আছে সেই কাব্য যে কালজয়ী হবে তা তো খুবই স্বাভাবিক।

অতএব বিশেষ ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে থেকেও বৈষ্ণব পদাবলী সকল সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে শাশ্বত কালের জীবনকাব্যে রূপান্তরিত। এই অনুভূতি বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকেই জন্মলাভ করেছে। সেই কারণে শ্রীরবীন্দ্র কাব্যসত্যের সেই সহজ প্রশ্নটি করেছেন বৈষ্ণবকবিকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বভারে পদাবলী আক্রান্ত হয়নি। যদিও এই তত্ত্বকে মেনেই কবিরা পদগুলি রচনা করেছেন। তাই এই কবিতার সার্বজনীন আবেদন আছে। মানবমানবীর প্রেমকে অবলম্বন করে যে সাহিত্য তার ব্যাপক বিস্তৃত আবেদন থাকেই। তাই বৈষ্ণবকবিতায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তবতার মিলন ঘটেছে বলেই তা আধ্যাত্মিক হয়েও কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। মানব-জীবনের সকল অনুভূতি ও বৈচিত্র্য এই কবিতার মধ্যে বর্তমান। তাই তা বাস্তব—সাহিত্যের সত্য। সাহিত্যের সত্য আর নিছক সত্য এককথা নয়। এগুলি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কবিতা বলে অনেকে মনে করেন এতে গীতি কবিতার ধর্ম (ব্যক্তিক অনুভূতি প্রধান) ক্ষুণ্ণ হয়েছে। রাধা বাস্তবের নায়িকা নন—তিনি মহাভাবস্বরূপা। এই তত্ত্ব বাদ দিয়ে কেবল নায়িকা হিসাবে রাধার অস্তিত্ব মেনে নিলে বৈষ্ণবপদাবলীর মত বাস্তব জীবন চিত্র অন্যকোন কবিতায় আছে বলে মনে হয় না। অতএব বৈষ্ণব পদাবলীতে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে বাস্তবতার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে; আর তাই এ কাব্য এত জনপ্রিয়।

১৫। বৈষ্ণব পদকর্তা হিসাবে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও।

বিদ্যাপতি রচিত বিভিন্ন পদ অবলম্বনে তাঁর কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও

উত্তর ঃ 'পদাবলী শব্দটি জয়দেবের 'কোমলকান্ত পদাবলী' থেকেই এসেছে। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ রচনা মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাপতি মিথিলার কবি হয়েও বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

তখন মিথিলা সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান ছিল। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ব্রজবুলিতে পদরচনা করে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। ব্রজবুলি বলতে ব্রজ বা বৃন্দাবনের বুলি নয়, আসলে মৈথিল ভাষার সঙ্গে বাংলার মিশ্রণে একটি নতুন কাব্যভাষা তৈরী হয়েছিল। এই ভাষা যেমন শ্রুতিমধুর তেমনি সরল।

খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময় বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। এই অনুমানের পশ্চাতে অনেক কারণ আছে। তাঁর রচনা থেকে বোঝা যায় তিনি অন্তত: পাঁচজন মিথিলাপতির দরবারে আসন গ্রহণ করেছেন। মিথিলার এক পণ্ডিতবংশে তাঁর জন্ম। ব্রজবুলি পদের জন্য তিনি বাংলা ভাষায় উচ্চ আসন লাভ করলেও মিথিলায় তাঁর পরিচিতি সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরূপে। নানা বিষয় অবলম্বন করে সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 'বিভাগসার' ও 'দানবাক্যাবলী' তাঁর স্মৃতিশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। এ ছাড়া দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী ও বর্ষক্রিয়ায় নানা পূজাপদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন। পুরুষ-পরীক্ষা ও 'ভূ-পরিক্রমা নামেও দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ সকল গ্রন্থই তিনি সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। তবে সংস্কৃত ভাষার কদর যে ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছিল তা তিনি বুঝেছিলেন। তাই অবহট্ট ভাষায় 'কীর্তিলতা' ও 'কীর্তিপতাকা' নামে দুটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি লিখেছেন—

"সক্কয় বাণী বুহজন ভাবই।
পাউঅরসক মম্ম ন পাবই॥
দেখিল্ বঅনা সবসন সিট্‌ঠা।
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা॥"

'সংস্কৃত ভাষা বুধজন বা পণ্ডিতজন ভাবনা করেন। প্রাকৃতভাষার রস তাঁহারা বুঝেন না। অথচ দেশীয় ভাষা সর্বাপেক্ষা মধুর তাই আমি অবহট্টে লিখিতেছি।" শুধু অবহট্ট নয়, ব্রজবুলি ভাষায় যে মধুর পদ তিনি রচনা করেছেন তা তাঁকে কবিত্বের চরম শিখরে স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রজবুলি ভাষায় তিনি প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

সেইকারণে ব্রজবুলি পদ মাত্রকেই বিদ্যাপতির রচনা বলে ধরা হয়। প্রায় দুই সহস্র পদ বিদ্যাপতির নামে চললেও তাদের অনেকগুলি যে বাঙালী কবির রচিত তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটি কবিশেখরের ভণিতায় পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতির নামেই চলে আসছে। আবার 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়' পদটি কবিবল্লভ রচিত হলেও বিদ্যাপতির নামেই প্রচলিত। এইভাবে অনেক বাঙালী কবির ব্রজবুলিতে রচিত পদ বিদ্যাপতির নামে চলে আসছে। কারণ ব্রজবুলি বলতে আমরা এতকাল বিদ্যাপতিকেই বুঝেছি।

সে যাই হোক, বিদ্যাপতির অনেক পদ রূপনির্মিতির দিক থেকে, ধ্বনি সুষমার

দিক থেকে এত জনপ্রিয় যে ব্রজবুলি পদ বলতে আমরা বিদ্যাপতিকেই মনে করি। চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি রচিত পদ আস্বাদন করতেন—এটাই বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভার বড় প্রমাণ। বিদ্যাপতি রাজসভার কবি ছিলেন বলে তাঁর কাব্যে বিলাসকলার আধিক্য আছে। তিনি দেহবিলাস ও সম্ভোগের বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। অথচ ভোগাসক্তি কখনও গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। ভোগের মধ্যেও কবির রূপসচেতন মন কবিতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে নি। বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন ক'রে প্রেম মনস্তত্ত্বের একটি পারম্পর্য রক্ষা করেছেন। প্রাথমিক আকর্ষণ, অনুরাগ, অভিসার, মান, সম্ভোগ প্রভৃতি স্তর পরম্পরার মধ্য দিয়ে সমগ্র পদাবলী কাব্যকে একটি নূতন মহিমা দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেন : "বিদ্যাপতির রাধা অল্পে অল্পে মুকুলিত, বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ঢল ঢল করিতেছে। শ্যামের সহিত দেখা হয় এবং চারিদিকে যৌবনের কম্পন হিল্লোলিত হইয়া উঠে। খানিকটা হাসি, খানিকটা ছলনা, খানিকটা আড়চক্ষে দৃষ্টি। আপনাকে আধখানা প্রকাশ, আধখানা গোপন, কেবল উদ্দাম বাতাসের একটা আন্দোলনে অমনি খানিক উন্মেষিত হইয়া পড়ে।" এইভাবে বিদ্যাপতি রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি বিশ্লেষণ করেছেন। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় জ্ঞান এবং প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি না থাকলে কোন কবি হৃদয়ের উত্থান-পতনের এমন বাস্তব ও সুন্দর চিত্র আঁকতে পারতেন না। রূপ ও রস, সৌন্দর্য ও দেহসম্ভোগ এমন নিপুণভাবে তিনি অঙ্কিত করেছেন যা প্রখর জীবন-বোধে উদ্দীপ্ত। তাঁর অনুভূতির প্রাখর্য্য ছিল অতি তীব্র। প্রেমের বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য, নানা বর্ণনার চমক, অলংকারের ঘনঘটা, শব্দ ঝংকার ও ভাষার মাধুর্য বিদ্যাপতিকে সম্ভোগের কবি রূপে চিহ্নিত করেছে সত্য তবুও ভাবোল্লাসের পদে বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক অনুভূতি একটি নূতন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই শ্রেণীর পদে রাধিকার অনুভূতি এমন উচ্চস্তরের মর্যাদা লাভ করেছিল যা চৈতন্যদেব স্বয়ং আস্বাদন ক'রে আনন্দ পেতেন। এ ছাড়াও প্রার্থনা পদে বিদ্যাপতির ভিন্ন রূপ দেখি। সম্ভোগের কবি, দেহবিলাসের কবি কেমন শান্তরসের অসাধারণ পদ রচনা করেছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। আত্মসমপর্ণের এমন তীব্র আকুতি আর ক'জন কবির কবিতায় দেখি ?

বিদ্যাপতির কাব্য বিশ্লেষণ ও কৃতিত্ব আলোচনা করতে গেলে কয়েকটি বিশেষ রসপর্যায়ের পদ বিশ্লেষণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এই পদগুলিতে শ্রীরাধিকার পর্যায়-ক্রমিক বিকাশ অঙ্কিত হয়েছে। বয়ঃসন্ধি, পূর্বরাগ, অভিসার, বিরহ, ভাবোল্লাস, ও প্রার্থনা ইত্যাদি পদের মাধ্যমে শ্রীরাধিকার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। বয়ঃসন্ধির পদে সৌন্দর্যের পূজারী বিদ্যাপতির পরিচয় মেলে। এটি তাঁর মৌলিক সৃষ্টি। অসামান্য বাস্তবতার স্পর্শে সমুজ্জ্বল। বয়ঃসন্ধিতে দৈহিক রূপান্তর ঘটে। দেহের এই রূপান্তরে মনেরও পরিবর্তন হয়। বিচিত্র ভাব ভঙ্গীতে তার প্রকাশ ঘটে। শ্রীরাধিকার

বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় বিদ্যাপতির নৈপুণ্য অসাধারণ। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের ক্রান্তিকালটির বর্ণনায় কবি লিখেছেন :

'শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহু দলবলে দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥
কবহু বাঁধয় কুচ কবহুঁ বিথারি।
কবহু ঝাঁপয় অঙ্গ কবহু উথারি॥'

রাধিকার এই দৈহিক পরিবর্তন এবং তজ্জনিত কৌতূহল অতি নিপুণভাবে এখানে বর্ণিত।

'খনে খনে নয়ন কোন অনুসরঈ।
খনে খনে বসন ধূলি তনুভরঈ॥
হিরদয় মুকুল হেরি হেরি থোর।
খনে আচর দেয় খনে হয় ভোর॥'

দেহে যৌবন প্রতিষ্ঠিত। যৌবন আবির্ভাবের প্রাথমিক চাঞ্চল্য দূরীভূত হয়েছে। এবার মনে রসকথা শ্রবণের ইচ্ছা জাগ্রত হল।

'শুনইতে রস কথা থাপয় চিত।
জইসে কুরঙ্গিনী শুনয়ে সঙ্গীত।'

তথাপি লজ্জার পরিধি দুস্তর। গুরুজনের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়। অথচ অন্তরে অদম্য বাসনা। মনস্তত্ত্বের এমন নিপুণ বিশ্লেষণ অভিনব সন্দেহ নেই—

কেলিক রভস যব শুনে আনে।
অমতত্র হেরি ততহি করু কানে॥
ইথে যদি কেও করএ পরচারী।
কাঁদন মাথী হাসি দ-এ গারি॥

কেলিরভস সম্পর্কে আগ্রহ আছে অথচ লজ্জা দুস্তর। অবনত আননে সকল কথা শোনেন—সঙ্গীতমুগ্ধ বিহঙ্গীর মত।

বয়ঃসন্ধির পরের পর্যায় পূর্বরাগে বিদ্যাপতি অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তবে জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাস পূর্বরাগের পদে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার সঙ্গে বিদ্যাপতির তুলনা করা চলে না। কৃষ্ণের পূর্বরাগ বর্ণনায় বিদ্যাপতি কয়েকটি সুন্দর পদ রচনা করেছেন—

যব গোধূলি সময় বেলি।
ধনি মন্দির বাহির গেলি,
নব জলধরে বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পসারি গেলি॥

অথবা,

অপবশে পেখল রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিণী হীন ধামা ॥

বিরহের পদেও বিদ্যাপতি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। বিরহ চিরকালীন কাব্যের আলম্বন বিভাব। এখানে রাধার ব্যাকুলতা অসামান্য সৌন্দর্যে মণ্ডিত :

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
ঈ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥"

আধ্যাত্মিক অর্থেও এ বাণী যেমন সত্য, প্রেমকবিতার ব্যক্তিবেদনাও তেমনি সত্য। রাধা এখানে দুঃখের আগুনে পুড়ে আনন্দময় রসসত্তায় রূপান্তরিত। মানুষের জীবনের এক চিরন্তন সত্য :—যাকে চাই তাকে পাই না ;—এই গভীরতম বেদনার বাণী রাধার জবানীতে বিদ্যাপতি অলংকৃত পদে সুস্পষ্ট করেছেন—যা আমাদের অন্তরের সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে আঘাত ক'রে।

বিরহের তো বটেই, ভাবোল্লাসের পদেও বিদ্যাপতির কৃতিত্ব কম নয়। বিদ্যাপতি সম্ভোগের কবি—দেহবিলাসের কবি। তাই ভাবোল্লাসের পদে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে বেশী।—

'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা"

তাছাড়া, "কি কহব রে সখী আনন্দ ওর" অথবা "পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে" ইত্যাদি পদে রাধার মিলনোল্লাস গভীর অন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণিত।

প্রার্থনা কবিতাতেও বিদ্যাপতির আধ্যাত্মিক ভাব-গভীরতা ও সাধকের আত্ম-নিবেদন প্রকাশিত। তিল তুলসী দিয়ে সবকিছু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করার মধ্যে যে ভাবব্যঞ্জনা ও গভীরতা আছে তাও তুলনাহীন।

অতএব বিদ্যাপতি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে একটি উজ্জ্বল নাম।

১৬। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিসার পদ রচনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার পরিচয় দাও।

উত্তর : 'অভিসার' কথাটির সাধারণ অর্থ—প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক অনুরাগ হেতু সংকেত-স্থানে গমন। প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের পক্ষেই অভিসার সম্ভব। তবে বৈষ্ণব পদাবলীতে নায়িকার অভিসার বর্ণনায় গুরুত্ব স্থাপন করা হয়েছে বেশী। যে নায়িকা নিজে অভিসার করে বা কান্তকে অভিসার করায় তাকেই অভিসারিকা বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাই একমাত্র অভিসারিকা।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও পদাবলীতে অভিসারের একটি গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ভক্তের চোখে কৃষ্ণ ভগবান আর ভগবান নায়ক রূপে কল্পিত। ভক্ত ভগবানের দিকে নিত্য অভিসারী। পথে কত বাধা বিঘ্ন, সমাজের ভয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লোকের গঞ্জনা —সকলকিছু তুচ্ছ ক'রে ভগবানের উদ্দেশে অভিসারে যেতে হয় মিলনের জন্য। রাধার অভিসার আসলে ভক্তের ঈশ্বরমুখীনতার নামান্তর। পথের দুঃখ-কষ্ট সাধন তপস্যার ইঙ্গিত বলে পরিগণিত হয়। এই অভিসারের নানা পর্যায়: জ্যোৎস্নাভিসার, তমসাভিসার, কুজ্ঝটিকাভিসার, তীর্থাভিসার, উন্মাত্তভিসার, বর্ষাভিসার, অসমঞ্জসাভিসার। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যে এই সকল অভিসারের পদ পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতি রাধার অভিসারের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। রাধার অভিসারের মনস্তাত্বিক দিকটি উজ্জ্বলভাবে প্রকশিত তাঁর পদে। প্রথমে তিনি রাধাকে ভয়চকিত বালিকা হিসাবে চিত্রিত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে অধিকতর সাহসিকা। তৃতীয় পর্যায়ে রাধা হৃদয়ের প্রেরণায় অভিসারে গমন করেছেন কৃষ্ণের উদ্দেশে—

"তুঅ অনুরাগ মধুর মদে মাতলি
কিছু না শুনল বরনারী।।"

বাঙালী কবি গোবিন্দদাস অভিসারের পদে বিদ্যাপতির সমান কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বস্তুত বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে অভিসারের পদ রচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজনস্বীকৃত। গোবিন্দদাস অভিসারিকা রাধার অপূর্ব এক ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছেন। রাধা কৃষ্ণপদে নিবেদিতা। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য তাঁর দেহ মন ব্যাকুল। তাই সমাজ সংসার প্রাণ—সবকিছু তুচ্ছ ক'রে তিনি অভিসার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে গভীর অন্ধকারে তাঁকে পথ চলতে হবে। পথে পায়ে কাঁটা ফুটতে পারে, সাপ কামড়াতে পারে, তাই তিনি সতর্কতা অবলম্বন করছেন—

কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চল তহি অঙ্গুলি চাপি।।

অন্ধকার রাত্রে পথ চলতে হবে। তাই রাধা করযুগে চক্ষু আবৃত ক'রে পথ চলার অভ্যাস করছেন। সাপুড়ের কাছ থেকে সাপের মুখবন্ধন শিক্ষা করছেন—

কর কঙ্কণ পণ ফণী মুখবন্ধন
শিখই ভুজগগুরু পাশে।

অভিসার যাত্রার এই প্রস্তুতির জন্য গুরুজনরা নানা কথা বলেন। কিন্তু রাধার তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কৃষ্ণকে তিনি হৃদয় উজাড় ক'রে ভালবেসেছেন। কৃষ্ণ তার হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছেন। তাই কোন কথা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

রাধার এই অভিসারের যাত্রা কত যে বিপদসঙ্কুল, গোবিন্দদাস তা অপূর্ব বর্ণনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছে, দশদিকে বিদ্যুতের ঝলক। তাতে জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হতে পারে—

ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥

এই দুর্যোগের মধ্যে প্রচণ্ড বিপদ মাথায় নিয়ে রাধা কেমন ক'রে যে তাঁর দয়িতের কাছে পৌছবেন তার সম্পর্কে কবি নিজেই প্রশ্ন রেখেছেন—

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥

কিন্তু ভক্ত যেখানে ভগবানের সঙ্গে মিলিত অর্থাৎ আত্মলীন হতে চান সেখানে কোন বাধাই তো দুস্তর নয়। প্রাণভয় তো সেখানে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। তাই রাধার কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন বাধাই নয়।

কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিয়াদ সিন্ধু মঞে পঙারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা॥

এইভাবে রাধার অভিসার গোবিন্দদাসের পদে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা লাভ করেছে। গোবিন্দদাস চৈতন্য-পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব সাধনার মূল ধারাটিকে আত্মসাৎ করে রাধার অভিসার বর্ণনা করেছেন। সেখানে একদিকে যেমন কাব্য-চমৎকারিত্ব ও সার্বজনীনতা প্রকাশিত, অন্যদিকে যেমনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বটিও রক্ষিত।

১৪। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিকৃতির তুলনামূলক বিচার কর।

উত্তর ঃ বৈষ্ণবসাহিত্যে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির যেমন জনপ্রিয়তা, বাঙালী কবি চণ্ডীদাসেরও অনুরূপ সমাদর। রবীন্দ্রনাথ দুই কবির পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন।—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন, বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের

মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ, ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরও গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরও অধিক জানেন"—

বিদ্যাপতি রাজসভার কবি; বিদগ্ধ সমাজের জন্য তিনি কাব্যকলার চরম সমুন্নতি ঘটিয়েছেন। অলংকার ও শব্দ ব্যবহার পর্যায়ে তার নিপুণতা প্রবাদের মত। প্রেমলীলার বিভিন্ন পর্যায়গুলি অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বয়ঃসন্ধি থেকে সুরু ক'রে ভাবোল্লাস পর্যন্তগুলি প্রণয়ের যে নানা পর্ব সেগুলি শিল্পীর দৃষ্টিতে অবলোকন করেছেন এবং মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ ক'রে কিশোরী রাধার যৌবনে পদার্পণ এবং পরবর্তী কালে পূর্বরাগ অভিসার, মান ও ভাবোল্লাসের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যের মণ্ডনকলার দিকে বিদ্যাপতির দৃষ্টি ছিল প্রখর। আবার কিছু পদে অন্তরের গভীরতাও প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু চণ্ডীদাসসম্পর্কে আমরা জানি তিনি একজন গ্রাম্য কবি। বাশুলির উপাসক ছিলেন। তাঁর সাধন সঙ্গিণী ছিলেন রামী রজকিনী—এরকম একটা জনশ্রুতি আছে। চণ্ডীদাস ক'জন ছিলেন তা নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে যাই হোক পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস যে উচ্চ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদে চণ্ডীদাস তুলনাহীন। অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"চণ্ডীদাসের বাক্‌রীতি নানা অলংকারে ও ঝংকারে মণ্ডিত না হইলেও তাহার মধ্যে এমন একটা সরল ব্যঞ্জনা আছে যে তাহাকে রসিক হৃদয় সানন্দে গ্রহণ করিবে।" কয়েকটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটির যাথার্থ্য বোঝা যাবে। যেমন—"ক্ষুরের উপর রাধার বসতি নড়িতে কাটিয়ে দেহ", "বণিকজনার করাত যেমন দুদিকে কাটিয়া যায়", "কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়" "বদন থাকিতে না পারে বলিতে তেঁই সে অবোলা নাম" —এই সকল উক্তি সুগভীর ব্যঞ্জনাময়। চণ্ডীদাসের রাধা যেমন গভীর ও ব্যাকুল চণ্ডীদাসের ভাষাও তেমনি গভীর বেদনায় ও নিবিড় উপলব্ধিতে কম্পমান। চণ্ডীদাস মিলনের কবি নন, উল্লাসের ঐশ্বর্য তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। চণ্ডীদাসের রাধার কৃষ্ণপ্রেম দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে খাঁটি সোনার মর্যাদা পেয়েছে। চণ্ডীদাস যে গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে রাধা চরিত্র অংকন করেছেন—তার সমধর্মী আর কোন রচনা বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতিকে ভুলে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীর বেদনামধুর সৌন্দর্য কখনও ভোলা সম্ভব নয়। তার গান মুখের ভাষা নয়, বুকের রক্তে তার অভিষেক, অশ্রু লবণাক্ত আর্তিতে তার যা কিছু মূল্য। হৃদয়ের গভীরতা ও অনুভূতির ঐকান্তিকতা তাঁর রাধার উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। মিলন ও আনন্দের কথা রাধা বলেছেন বটে কিন্তু বিরহে ও শোকে উপনীত হয়ে রাধা জীবনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর রাধা একদিকে মর্ত্যের মানবী আর একদিকে

অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার প্রতীক। তাঁর প্রেমসাধনা নামজপের মতো ঐকান্তিক তদ্গত সাধনা—

না জানি কতেক মধু শ্যাম নাম আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

কখনও শ্রীকৃষ্ণকে সব কিছু সমর্পণ ক'রে বলে ওঠেন :

বঁধু কি আর বলিব আমি!
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

কৃষ্ণপ্রেম ব্যাখ্যার অতীত। তা উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু বোঝান যায় না। তাই শ্রীরাধা বলেন—

"রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥"

অপর পক্ষে বিদ্যাপতির পদে গ্রামীণ সরলতা অপেক্ষা নাগরিক আড়ম্বর ঈষৎ অধিক ফুটেছে। কবির অন্তরের গভীর প্রত্যয় কোন কোন সময়ে রচনাচাতুর্যের ঐশ্বর্যে কিছুটা আবৃত হয়ে পড়েছে। তিনি রাধার চরিত্রটিকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত ক'রে প্রকাশ করেছেন। (১) বয়ঃসন্ধি বা মুগ্ধাভাব (২) অভিসার মিলন মান (৩) মাথুর (৪) ভাবসম্মেলন। প্রথম দুটি পর্যায়ে রাধার চরিত্রটি মানবিক আবেগ সমন্বিত। কবির সূক্ষ্ম দর্শন শক্তি ও রচনার বিচিত্র কলাকৌশল নিশ্চয় উচ্চ প্রশংসা দাবী করতে পারে। কিন্তু যা হৃদয়কে বেদনায় বিবশ ক'রে দেয় তা তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের অর্থাৎ মাথুর ও ভাবসম্মেলনের পদাবলী।

বক্তব্যের অপূর্বত্ব, উপমা, রূপকের বিচিত্র ব্যবহার, চিত্র সন্নিবেশের অজস্রতায় বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ পদাবলী বাংলা-মৈথিলি সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। কৃষ্ণ রাধাকে চকিতের মধ্যে দেখে বলে ওঠেন—

সজনী ভল কত্র পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঁয়ে তড়িত লতা জনি
হিরদয়ে সেল দেই গেল॥

বিরহের পদেও বিদ্যাপতি অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধার বিলাপের ভাষা অপূর্ব আন্তরিকতা মণ্ডিত হয়েছে। মিলনে রাধা মত্ত, উল্লসিত ও

সার্থক। কিন্তু তবু যেন মনে হয় কোথায় যেন এক ব্যবধান আছে। কৃষ্ণকে নিবিড় ক'রে পেয়েও তিনি কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারছেন না।

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।।

অথবা,

"তুহুঁ কৈসে মাধব, কহ তুহুঁ মোয়" পদে প্রেমের চিরন্তন রহস্যমণ্ডিত প্রশ্ন: মাধব তুমি কেমন তা আমাকে বলে দাও।

এছাড়া ভাবোল্লাস ও প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি সমান কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্যাপতির রাধা বলেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু
পেখলু পিয়া মুখচন্দা।
জীবন যৌবন সকল করি মানলু
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।।

প্রার্থনার পদে বিদ্যাপতি যেমন আত্মসমর্পণ করেছেন, নিবেদন পর্যায়ের পদে চণ্ডীদাস তেমনি আত্মলীন হ'তে চেয়েছেন। বিদ্যাপতি প্রার্থনা পর্যায়ে নিজেই আত্মসমর্পণ করেছেন আর চণ্ডীদাস রাধার মাধ্যমে আত্মনিবেদন করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে কবিত্ব শক্তিতে কেউ কারও অপেক্ষা ন্যূন নয়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে কাব্যকলা মণ্ডনে দুজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দু'জন কবি দুটি দিকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান নিয়ে বিরাজ করছেন। বিদ্যাপতি অসামান্য শ্রুতিমধুর ভাষা ব্রজবুলি ব্যবহার করেছেন—যদিও তা বাঙালী পাঠকের নিকট বোধগম্য আর চণ্ডীদাস খাঁটি বাংলায় সহজ সরল ভঙ্গীতে অন্তরের গভীর প্রবেশ করেছেন।

১৫। জ্ঞানদাসের কবিকৃতিত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়?

উত্তর: মধ্যযুগের পদাবলীসাহিত্য তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়—চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সমস্যার শেষ নেই। কত নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে পুরাতন তথ্যকে অপাঙক্তেয় করে চলেছে। গোবিন্দদাসের জীবনকথা অনেকটা জানা যায়। কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা জ্ঞানদাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তাঁর জীবনী সম্পর্কে অতি অল্প তথ্যই পাওয়া গেছে। কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নিত্যানন্দের অনুরাগী ছিলেন এবং নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবীদেবীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও শিষ্য হন। শোনা যায়, তিনি নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করে ছিলেন। তা যদি সত্য হয় তাহলে তিনি ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ

করে থাকবেন। তাঁর পদসমূহ পড়ে মনে হয় তিনি নিত্যানন্দের লীলা চাক্ষুষ করেছিলেন। খেতুরী গ্রামে যে বৈষ্ণব সম্মেলন আহূত হয়েছিল সেখানে বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্তাদের সঙ্গে তিনিও উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর ভনিতায় প্রায় চারশ পদ পাওয়া গেছে। পদগুলি পড়ে মনে হয় সকল পদ এককবির লেখনীপ্রসূত নয়। কিন্তু জ্ঞানদাস দুজন ছিলেন এমন কথা বলবার পক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ নেই বলে আপাতত জ্ঞানদাস ভনিতাযুক্ত সমস্ত পদকেই সুপরিচিত জ্ঞানদাসের রচনা বলে স্বীকার করা হল। অবশ্য এও স্বীকার্য যে জ্ঞানদাসের ভনিতায় এমন কিছু কিছু পদ ও পালাগান পাওয়া গেছে যা সুপরিচিত জ্ঞানদাসের রচিত না হওয়াই সম্ভব।

ভক্তকবি জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি—উভয় ভাষাতেই চমৎকার পদ রচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রজবুলি অপেক্ষা বাংলা পদগুলিতেই তাঁর প্রতিভা যথার্থ পথ খুঁজে পেয়েছে। সেকালের বৈষ্ণবকবিগণ ব্রজবুলিতে পদ রচনা আবশ্যিক মনে করতেন। জ্ঞানদাসও সেই পথ ধরে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন—অনেকটা প্রথা পালনের জন্য। সুতরাং ব্রজবুলির পদগুলিতে কবিপ্রজ্ঞার স্পষ্ট স্বাক্ষর নেই। তাঁর বাংলা পদগুলির সঙ্গে ভাবে ভাষায় যেন চণ্ডীদাসের পদের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে তিনি চণ্ডীদাসকে অনুসরণ বা অনুকরণ করেন নি। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের অন্তর্জীবন ও ভাবকল্পনা অনেকটা একরকম ছিল। এই জন্য তিনি চণ্ডীদাসকে কেবল নকল করেছেন একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। চৈতন্য বিষয়ক কিছু কিছু পদ তার মন্দ নয়। অবশ্য এই সমস্ত রচনায় কিছু কিছু কৃত্রিমতা আছে তা স্বীকার করতে হবে। তবে জ্ঞানদাস যখন কৃত্রিম কাব্যকলা ছেড়ে সহজ সুরে ও স্বাভাবিক আবেগের বশে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনা করেছেন তখনই তা পাঠকের অন্তর লুঠ করে নিয়েছে, তখনই তিনি এবং চণ্ডীদাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এইরূপ ভাব ও ভাষাগত সাদৃশ্যের জন্য চণ্ডীদাসের কিছু কিছু পদ জ্ঞানদাসের ভনিতায় চলে গেছে। অবশ্য উভয়ের মনোধর্মের দিক থেকে কিছু কিছু পার্থক্যও আছে। চণ্ডীদাস ভক্তি আবেগ ও বেদনাকে অবলম্বন করে অনুভূতির যতটা গভীরে অবতরণ করেছেন, হয়তো জ্ঞানদাস একই পথের পথিক হওয়া সত্ত্বেও ততদূর যেতে পারেন নি। চণ্ডীদাস মূলতঃ ভাবুক ও সাধক, জ্ঞানদাস বৈষ্ণব ভাবরসিক ও সাধক হলেও তিনি প্রধানত শিল্পী ও রূপস্রষ্টা। তবে সেই শিল্পচেতনা ও রূপসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকতার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। তাতে কোন কৃত্রিম কবিসংস্কার নেই। শ্রীরাধা সখীকে তাঁর কৃষ্ণ অনুরাগ সম্বন্ধে বলেন :—

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥

সই কিবা সে পিরীতি তার।
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥

কিংবা,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে॥

এই পদের ভাব ও ভাষা যেন মধ্যযুগ পার হয়ে আমাদের কালে এসে পৌচ্ছেছে। তাই কেউ কেউ জ্ঞানদাসের মনোভাব ও রসসৃষ্টির মধ্যে আধুনিক কালের পরিচয় পেয়েছেন। রাধা যখন কৃষ্ণকে বলেন:

"তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।"

তখন শুধু রাধাকৃষ্ণের কথা না হয়ে নিখিল নরনারীর আত্মসমর্পণমূলক সাত্ত্বিক প্রেমের বাণী বহন করে আনে। কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে এমন নিবিড় ও মানবিক রসে ভরে তোলবার দুর্লভ শক্তির অধিকারী ছিলেন বলে এ কালের পাঠক সমস্ত অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনার মধ্যেও মর্ত্যের পরিচিত স্পর্শ খুঁজে পেয়েছেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ রাধা যখন কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন—

তোমার আমার একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ার হৈতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

আমি তো জানি তোমার আমার একই প্রাণ; আমার হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তুমি কিরূপে ছিলে? এই প্রশ্ন নিত্যকালের মানবমানবীর প্রশ্ন। জ্ঞানদাসের দুটি চারটি উক্তি অতি চমৎকার শিল্পগুণমণ্ডিত হয়ে সর্বযুগের রসিক পাঠককে আনন্দ দান করবে।

"রূপের পাথারে অাঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥"

এখানে যে ভাবে-ভাষায়-অলঙ্কারে-ইঙ্গিতে যৌবনরূপমুগ্ধতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য কোন পদকর্তা করতে পারতেন কি না সন্দেহ হয়। "ও অঙ্গ পরশে পবন হরষে বরষে পরশ শিলা"—এই সুন্দর উক্তিটির অসামান্য ভাষা ঝংকার প্রথম শ্রেণীর শিল্পী ভিন্ন আর কারও কাছে আশা করা যায় না। একটি অতি বিখ্যাত পদ জ্ঞানদাসের ভনিতায় পাওয়া যায়:

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলই গরল ভেল ॥

আবার কখনও কখনও চণ্ডীদাসের নামেও এ পদ পুঁথিপত্রে পাওয়া গেছে। বোধ করি বাঙালীর সংস্কার এ পদটিকে চণ্ডীদাস-রচিত বলে গ্রহণ করতে চাইবে। অবশ্য পদটির ভাব-ভাষা ব্যঞ্জনা—চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের কবিকর্মের সমধর্মিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীরাধার এই নৈরাশ্য যে কোন যুগের যে কোন পাঠকের অন্তরেই সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারে। এই দিক থেকে জ্ঞানদাস আর চণ্ডীদাস বিশেষ পার্থক্য নেই। মধ্যযুগের যে কয়েকজন কবির পদ অনুভূতির গভীরে নিয়ে যায় জ্ঞানদাস তাদের অন্যতম।

১৬। নিম্নোদ্ধৃত পদকর্তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

কবিরঞ্জন ; রায়শেখর ; বলরাম দাস ; লোচন দাস ; নরহরি সরকার

উত্তর :—

নরহরি সরকার : বৈষ্ণবসাহিত্যে দুজন নরহরির পদ পাওয়া যায়। একজন নরহরি সরকার (দাস) অন্যজন নরহরি চক্রবর্তী। নরহরি সরকার শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চৈতন্যদেবের পার্শ্বচর ছিলেন। আর নরহরি চক্রবর্তী অষ্টদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর' তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি ঘনশ্যাম দাস নামে পদ লিখতেন। এ প্রসঙ্গে ড: সুকুমার সেনের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "Narahari sarkar's language is simple and direct ; it does not contain a vast amount of Tatsama words as that of the later poet (i. e. Narahari chakravarti). Narahari Chakravarti, on the other hand, wrote mostly in Brajobuli and the poems are rather verbose and complex"- - Hist. of Brajabuli Literature. 'পদকল্পতরু'তে নরহরি ভনিতায় ৩৬টি পদ সংকলিত হয়েছে। 'কল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিচার করে এর মধ্যে ২৫টি পদকে নরহরি সরকারের এবং ১১টিকে নরহরি চক্রবর্তীর বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

বলরাম দাস : চণ্ডীদাসের মত বলরাম দাসকে নিয়েও মতান্তর দেখা যায়। যে বলরাম অধিকতর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি নিত্যানন্দের কিছু পূর্ববর্তী। এই বলরাম কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছিয়া গ্রামে বাস করতেন, কিন্তু তাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট। তিনি নিত্যানন্দের ভক্ত শিষ্য ছিলেন বলে মনে হয়। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তাঁর জন্ম হয়ে থাকবে। শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তিনি দোগাছিয়া গ্রামে বসবাস সুরু করেন। এই গ্রামে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালগোপাল মন্দির

এখনও আছে। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব হলেও বিবাহ করে সংসার-যাত্রা নির্বাহ করতেন। অদ্যপি তাঁর বংশধর বর্তমান আছে।

বলরাম ভনিতাযুক্ত পদসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেছেন যে নিত্যানন্দের শিষ্য বলরাম দাস অল্প কিছু বাংলা ও ব্রজবুলি পদ রচনা করেছেন। কিন্তু যে বলরামের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ও চৈতন্যসম্পর্কীয় পদ অতি বিখ্যাত হয়েছে, এবং যিনি বাৎসল্য রসের পদ রচনা করে বৈষ্ণব পদসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বর্তমান ছিলেন। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে স্বল্পপরিসরে অকৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করবার দুর্লভ ক্ষমতা প্রদর্শন করে মাঝে মাঝে তিনি চণ্ডীদাসের সমকক্ষতা অর্জন করেছেন—

হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পঁহুর চিত নহে স্থির॥

ছত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কিংবা ধ্বনিঝংকারময় নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি অল্প বিস্ময়কর নয়।—

কুঞ্জ চরণ খঞ্জন গঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জরী ভাস।
ইন্দুনিন্দন নখর চন্দন
বলি বলরাম দাস॥

কিছু বাৎসল্যের পদে তিনি আর সমস্ত পদকর্তাকে ম্লান করে দিয়েছেন। যশোদা-বালগোপালের স্নেহসিক্ত সম্পর্কটি মানবিক রসে স্নিগ্ধ ও মধুর হয়ে উঠেছে। রাখাল বালকেরা বালকৃষ্ণকে ধেনু চরাবার জন্য বনে নিয়ে যাচ্ছে। বন এমন কিছু দূরে নয়, তবু মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানছে না। তিনি কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ বলরামকে বলছেন—

বলরাম তুমি মোর গোপাল লৈয়া যাইছ।
যারে ঘুমে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায়।
এ হেন দুধের বাছা বনেতে বিদায় দিয়া
কেমনে ধরিবে প্রাণ মায়॥

এই ধরণের পদগুলি আন্তরিকতায়, সারল্যে ও মাতৃহৃদয়ের সশঙ্ক বেদনায় সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অনবদ্য সৃষ্টি বলে স্বীকৃত হয়েছে।

বলরাম দাসের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কিছু কিছু পদে রুচির শুচিতা প্রশংসনীয়। সেই সমস্ত পদে তিনি প্রায় চণ্ডীদাসের সমকক্ষ। সহজ জীবনরসপ্রীতি তাঁর রচনার পরম সম্পদ। এবং এইজন্যই তিনি প্রাচীন কালের কবি হলেও একালে আমাদের

আত্মীয়ে পরিণত হয়েছেন। কারণ তাঁকে আমরা একালের রসবোধ ও মনোভাবের দ্বারা বুঝতে পারি। অবশ্য তাঁর কতকগুলি নীতি ও বৈরাগ্যপূর্ণ কবিতা আছে। তাতে নীতি উপদেশের যতটা ছড়াছড়ি কাব্যরস ততটা নয়।

কবিরঞ্জন: কবিরঞ্জন ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী। তিনি বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়ভাষায় পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি উপাধি নিয়ে তিনি অনেক পদ রচনা করেন। ফলে তাঁর অনেক রচনা মিথিলার বিদ্যাপতির সঙ্গে মিলে গেছে। যে সকল বাংলা পদ বিদ্যাপতির ভনিতাতে পাওয়া যায় সেগুলি কবিরঞ্জনের রচনা। কবিরঞ্জন ছোট বিদ্যাপতি নামেও খ্যাত। ব্রজবুলি পদরচনায় বাংলা সাহিত্যে গোবিন্দদাসের পরই এঁর স্থান। কবিরঞ্জনের একটি পদে হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের নাম পাওয়া যায়:

"বিদ্যাপতি ভাবনি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমলা বাসী॥"

লোচনদাস: 'চৈতন্যমঙ্গল'নামক চৈতন্যজীবনী রচনা করেন লোচনদাস। ইনি বৃন্দাবন দাসের সমসাময়িক এবং তাঁর মতই একজন ভক্তকবি। তাঁর প্রকৃত জীবন কথা নিয়ে নানারূপ গালগল্প সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বৈষ্ণব সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিবাহ করে লোচনদাস সংসারী হয়েছিলেন। স্বামীস্ত্রী দু'জনেই চৈতন্যের পরম ভক্ত ছিলেন। লোচনের ভনিতায় অনেক সুললিত পদও পাওয়া গেছে।

লোচনের চৈতন্যমঙ্গল ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত সম্পর্কিত কথা এখানে আলোচনা করার অবকাশ নেই। তাঁর কাব্যেও সন তারিখের উল্লেখ নেই। তাই এ কাব্য ঠিক কবে রচিত হয়েছিল, তা স্থির করা দুষ্কর। তবে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার মনে করেন যে লোচনদাসের এই কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫৫০-৫৬) রচিত হয়ে থাকবে।

এই কাব্যটি সুদীর্ঘ নয় আবার সংক্ষিপ্তও নয়। মোট চারটি খণ্ডে (সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড ও শেষ খণ্ড) রচিত এই কাব্য প্রধানতঃ স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে গান করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। রচনার ধারাও সাধারণের বোধগম্য মঙ্গলকাব্য ধারার অনুরূপ। বর্ণনায় বেশ কবিত্ব থাকলেও জনরুচির খাতিরে বেশ কিছু লঘু ধরণের রচনা আছে। স্বল্পশিক্ষিত বৈষ্ণবসমাজে এ কাব্য বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদে শচীমাতার সকরুণ বেদনা নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় ফুটে উঠেছে:—

এমন কেনে হলে গৌরাঙ্গ এমন কেনে হলে।
নটবর বেশ গোরা কি লাগি ছাড়িলে॥

সুরধনী তীরে নিমাই তিলেক দাঁড়াও।
চাঁদমুখ নিরখিয়ে তবে ছাড়ি যাও॥
এক বোল বলি নিমাই যদি তুমি রাখ।
সন্ন্যাসেরে কাজ নাই ঘরে বসে থাক।।
সন্ন্যাসী না হও নিমাই বৈরাগী না হও।
অভাগী মায়েরে নিমাই ছাড়িয়া না যাও।।

সুললিত ভাষা ও ছন্দে তার দক্ষতা ছিল বলে এই কাব্য জীবনীকাব্য হিসাবে পুরোপুরি সার্থক না হলেও শুধু কাব্য রসের গুণে মনোহর।

রায়শেখর : ষোড়শ শতকের শেষভাগে যে সকল পদকর্তা বৈষ্ণবপদ লিখেছেন তাদের মধ্যে রায়শেখর অন্যতম। ইনি 'গোপাল বিজয়' নামক একাধিক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেছেন। গোপাল বিজয়ে কবির আত্মপরিচয় জানা যায়—

"সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্বজন।।"

এই কবি রায়শেখর, শেখর, কবিশেখর, শেখর রায় ইত্যাদি নামে পরিচিত। রায়শেখর অনেক পদ রচনা করেছেন। তার মধ্যে ভাল মন্দ দুই আছে। তবে ব্রজবুলি পদে তিনি যে অধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গোবিন্দদাসের পর যে দুজন কবি ব্রজবুলি পদ রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর একজন এবং অন্যজন কবিরঞ্জন।

'গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী চমকই।
কুলিশ পাতন শব্দ ঘন ঘন
পবন খরতর বল গই॥'

শ্রীরাধার অভিসারের পদগুলি রায়শেখরের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। বাল্যলীলা ও বাৎসল্য রসের পদেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। সমালোচকের মতে, "বৈষ্ণবপদ জগতে তিনি সাহসিক কবি। তাঁহার বিদ্যা এবং বৈদগ্ধ্য যেমন প্রচলিত কাব্যরীতির রস সৌন্দর্য নিষ্কাষণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছে, তেমনি এমন একটি স্বাধীনচিত্ততা দিয়াছে, যাহা প্রথানুগত্যের মতো প্রথা পরিহারেও বিশ্বাস করে।" শেখরে উভয় অবস্থাই দৃষ্ট হয়।

১৭। গোবিন্দদাসের কবি প্রতিভার বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : মধ্যযুগের গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির রচনা-রীতির আদর্শ অনুসরণ ক'রে প্রায় বিদ্যাপতির মতোই জনপ্রিয়তা ও গৌরব লাভ করেছেন। ভাষা ভঙ্গিমার অপূর্বত্ব ও শব্দের মধুর ঝংকার তাঁর জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

পাণ্ডিত্য, পরিশীলিত মন ও গভীর ভক্তিভাব গোবিন্দদাসকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখনও কীর্তনীয়া সমাজে বা সঙ্গীতপিপাসু গোষ্ঠীতে তাঁর পদগুলি কীর্তনের আকারে গীত হয়। বাংলা কীর্তনের একটা বড় অংশ তাঁর পদগুলিকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে।

গোবিন্দদাসের জীবনকথা কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বলে তাঁর প্রকৃত জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের মাতামহ দামোদর সেন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস করতেন। এটি বৈদ্যপ্রধান গ্রাম। গোবিন্দদাসও বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, তিনি চৈতন্যের পরমভক্ত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র রামচন্দ্র ও গোবিন্দদাস। রামচন্দ্রও পরে বৈষ্ণব মতাদর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় হয়েছিলেন। নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য থেকে মনে হচ্ছে গোবিন্দদাস ষোড়শ শতাব্দীর তিন-চার দশকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবনে শাক্ত মতাবলম্বী হলেও পরে বৈষ্ণব ভক্তিধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে এই দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বৈষ্ণব সমাজে কবি বলে সসম্মানে গৃহীত হন। মনে হয় তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পদাবলী ছাড়াও সঙ্গীতমাধব নামে একখানি সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয় এটি পাওয়া যায় না। তাঁকে খুব সম্ভব বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুরা কবিরাজ উপাধি দিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি গোবিন্দদাস কবিরাজ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন। জীব গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। জীব গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে তাঁকে সংস্কৃতে চিঠি লিখতেন, গোবিন্দদাসও তাঁকে স্বরচিত পদ উপহার পাঠাতেন। সমগ্র বৈষ্ণবসমাজ তাঁর রচিত পদের কাব্যসৌন্দর্য ও ভক্তিভাবে বিমোহিত হয়েছিল। তিনি বিদ্যাপতির ভণিতায় প্রচলিত কয়েকটি অসম্পূর্ণ পদকে সম্পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর ভাব ও ভাষার সঙ্গে বিদ্যাপতির পদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বস্তুতঃ তিনি কবিতার রূপনির্মিতিতে বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছিলেন। তাই তাঁকে বলা হত 'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি"। তিনি কোন কোন পদে নিজ ভণিতার সঙ্গে বিদ্যাপতির ভণিতা দিয়ে মৈথিল ভক্ত ও কবির নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন।

বিরহিনী রাধার খেদপ্রকাশে তিনি লিখেছেন :—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় বৈছে যামিনী
সুখলব ভৈ গেল নিরাশা।।

প্রেমের অঙ্কুর জন্মাতে না জন্মাতে প্রচণ্ড রৌদ্র উঠল। ফলে তার কোমল পত্র দুটি বিকশিত হতে পারল না। যেন রাত্রিতে প্রতিপদের চাঁদ উদিত হয়েই অস্ত গেল। সুখলাভের কণামাত্র আশা নৈরাশ্যে পরিণত হল।

কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে গোকুলের কি দশা হয়েছে তা নিয়ে চমৎকাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

তোহে রহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল গোকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সঘনে উঠিতে নাহি পারে।
সখাগণ ধেনু বেণু নাহি পুরত
বিছুরল নগর বাজারে॥
কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতলে লুঠত
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক ময়ূর ন নাচত
কোকিল না করতহি গান।

কৃষ্ণ বিরহে স্থাবর জঙ্গম কতটা ব্যাকুল হয়েছে, এখানে কবি গোবিন্দদাস আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। বর্ষার রাত্রিতে বিরহিনী রাধার মর্মবেদনা প্রকাশে বিদ্যাপতির স্বল্প প্রভাব লক্ষিত হলেও, অদ্ভুত দক্ষতার সাথে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—

নৈরাশ বাসর রজনী দশদিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী
হেরি:মানস কম্পিয়া।
পাপ ডাহুকি ডাহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে
জাগি সগরহি রাতিয়া॥

এখানে নির্জন নিঃসঙ্গ রাত্রি, ঝড় ঝঞ্ঝা, বজ্রস্বনিত আকাশ এবং অনিদ্র নয়নে শ্রীরাধার একলা জেগে থাকার চিত্রটি সার্থক গীতিকবিতায় পরিণত হয়েছে এবং এই ছত্র ক'টি একালের রসিক পাঠককেও মাতিয়ে তুলেছে। ভাষার ঝংকারের দিক থেকে দুটি স্তবকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন
গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।

জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ ॥

এ পর্যন্ত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত সাতশয়ও বেশী পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে অল্প কিছু বাংলা পদ আছে। বাকি সমস্তই ব্রজবুলিতে রচিত। দু-একটিতে আবার সংস্কৃত ধরনের বাগ্‌-বিন্যাস আছে। একটি পদ তো বিশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত। বৈষ্ণব পদাবলীতে একাধিক চণ্ডীদাস ও বলরাম দাসের মত একাধিক গোবিন্দদাসও আছেন। এমন কি গোবিন্দদাস ঠাকুর নামে এক মৈথিলি কবি ও বিদ্যাপতির রীতিতে গান লিখেছিলেন বলে শোনা যায়। ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদগুলির শ্রুতিমাধুর্য, ধ্বনিঝংকার ও শব্দের নিপুণতা এমনই চমৎকার যে একবার শুনলেই মন মুগ্ধ হয়ে যায়। কীর্তনের আসরে তাই গোবিন্দদাসের একচ্ছত্র অধিকার। সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে অতিশয় অভিজ্ঞ গোবিন্দাসের কবি প্রতিভায় একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর পদে তাই সংস্কৃত কাব্য-কবিতার ঘনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাবের গভীরতা, ভক্তির নিষ্ঠা এবং শিল্পের চমৎকারিত্ব তাঁকে কালজয়ী করেছে। গোবিন্দদাস একাধারে কবি ও সাধক। কিন্তু একালের রসিক ব্যক্তি তাঁর পদ থেকে অতি চমৎকার লিরিক রস ও গীতি-কবিতার প্রতিধ্বনি পাবেন। ভক্তিভাব ছাড়াও তাঁর কবিতার মধ্যে অতিরিক্ত কাব্যসৌন্দর্য থাকায়, এগুলি কালের শাসন উপেক্ষা করতে পেরেছে।

গোবিন্দদাস বৈষ্ণব আচার্য শ্রীনিবাসের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্বের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। সুতরাং বিশুদ্ধ শিল্পবোধের দ্বারা তাঁর পদাবলী যেমন আস্বাদন করা যায়, তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনার অনেক নিগূঢ় ইঙ্গিতও তাঁর রচনা থেকে পাওয়া যেতে পারে। গোবিন্দদাস একাধারে ভক্ত ও কবি। বৈষ্ণব সাধনা ও শাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন বলে তাঁর পদে গৌড়ীয় আদর্শের একটি পূর্ণ পরিচয় আছে। বাংলায় উত্তর চৈতন্যযুগের আদর্শ আলোচনা করতে গেলে তার রচিত পদাবলীকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উপরন্তু তাঁর হাতে ছিল শিল্পীর কলম। ফলে ভাষা, ছন্দ, ঝংকার, লালিত্য ও অলংকারে তাঁর প্রায় সমস্ত পদ অপূর্ব রসবস্তুতে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য পদকারদের মতো গোবিন্দদাসও রাধাকৃষ্ণলীলাকে নানাপর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। এই বিন্যাসের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের পূর্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহন্তরিতা ও মাথুরের পদ-সন্নিবেশ বিশেষ প্রশংসা দাবি করতে পারে। বলাই বাহুল্য এই বিন্যাসে উজ্জ্বল নীলমণির প্রভাবই স্বীকৃত হয়েছে। অভিসারের পদগুলি শিল্পগুণের দিক থেকে সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যে তুলনারহিত। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি বুঝি বিদ্যাপতিকেও ছাড়িয়ে গেছেন। অবশ্য এই সমস্ত অপার্থিব লাবণ্যে পূর্ণ পদগুলির মধ্যে বঙ্গভূমির কিছু কিছু প্রভাব

আছে। কীর্তনীয়া সমাজ এখনও গোবিন্দদাসের পদ অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গান ক'রে থাকেন। সেইজন্য এখনও লোকসমাজে গোবিন্দদাসের বহু পদ প্রচলিত আছে। তাঁর কিছু কিছু পদ রূপনির্মিতির বিশেষত্বে ও ধ্বনি ঝংকারে একালের পাঠকেরও বিস্ময় আকর্ষণ করবে। রাধা কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করলে সখিগণ কুলধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে রাধাকে ভর্ৎসনা করায় তিনি বলেন—

সজনি অব কি করবি উপদেশ।
কানু অনুরাগে তনু মন মাতল
না শুনে ধরম ভয় লেশ॥

সজনি আর উপদেশ দিয়ে কি হবে। কানু অনুরাগে আমার তনু মন মত্ত।

প্রেম আকুল গোপ গোকুল
কুলজ কামিনী কন্ত।
কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল
কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণী শঙ্খিনী
কুণ্ডল কুণ্ডলি ভাণ।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদকরি মান॥

এখানে শ্রুতিসুখকর অনুপ্রাসের সাহায্যে কবি চমৎকার ধ্বনি ঝংকার ও চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন।

বর্ষাভিসারের এই বর্ণনাটি বিদ্যাপতির সমকক্ষতা দাবি করতে পারে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নীচোল॥
এ সখী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥

কিংবা,

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণ মরম মরি জাত॥

সখীরা রাধাকে বলছেন, এই দুর্যোগের রাত্রিতে কৃষ্ণের অভিসারে বের হয়ে তুমি কি প্রাণত্যাগ করবে? রাধা বলেন—

প্রেম দহনদহ জাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরক আগি।

যার হৃদয়ে প্রেমের দহন জ্বালা, বজ্রাগ্নি তার কি করবে? বর্ষার ঘনঘটা তুচ্ছ ক'রে রাধা অভিসারে যাবার জন্য দুশ্চর তপস্যা ও সাধনা শুরু করলেন—

কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥

* * *

গুরুজন বচন বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।
পরিজন বচন মুগধি সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ॥

পরিশেষে সব দুঃখের অবসান হল। শ্রীরাধ কৃষ্ণের মিলন হ'ল—

একে পদ পঙ্কজ পঙ্কে বিভূষিত
কণ্টকে জরজরে ভেলা।
তুয়া মুখ দরশনে সব সুখ পায়লছ
চিরদুখ সব দূরে গেলা॥
তোহরি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল
ছোড়লু গৃহসুখ আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণলু
কহতহি গোবিন্দদাস॥

রাধা বলছেন—পদপঙ্কজ কর্দমাক্ত, কত কাঁটা ফুটেছে। কিন্তু হে কৃষ্ণ তোমার মুখ দেখে আমার সমস্ত দুঃখ দূর হ'ল। তোমার বংশী ধ্বনি আমার কানে প্রবেশ করা মাত্রই ঘরের সুখ সব ছাড়লাম, পথের দুঃখ তৃণবৎ তুচ্ছ করলাম।

শ্রীরাধার এই উক্তিতে বোঝা যাচ্ছে বৈষ্ণবরা সেই দুশ্চর তপস্যার কথা বলেছেন, যা শ্রেষ্ঠ প্রেমের লক্ষণ এবং সেই ভাবটি গোবিন্দদাস আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শুধু রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ নয়, শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক পদেও তাঁর ভক্তির গভীরতা ও রচনার বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। ভাবমুগ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য ভাবটি ভক্ত কবি কি চমৎকারভাবেই না ফুটিয়ে তুলেছেন—

জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন মণ্ডন কলিযুগ কাল
ভুজগ ভয় খণ্ডন রে॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।

লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে ॥

এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনার কথা মনে আসে। জ্ঞানদাস যেমন ভাষা ও ভাবের দিক থেকে বাংলা পদে চণ্ডীদাসের আদর্শ অনুসরণ করেছেন, তেমনি গোবিন্দদাস তার ব্রজবুলি পদের ভাষা, ছন্দ, অলংকারের দিক থেকে বিদ্যাপতির কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এমন কি তিনি বিদ্যাপতির কোন কোন অসমাপ্ত পদ সম্পূর্ণ ক'রে ভণিতায় বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজ নামও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভক্তির গাঢ়তা ও অনুভূতির গভীরতা বিচার করলে শিষ্য গুরুকেও মাঝে মাঝে ছাড়িয়ে গেছেন তা স্বীকার করতে হবে। সর্বোপরি চৈতন্য প্রভাবে পূর্ব ভারতে যে ধরনের সাধনতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছিল, গোবিন্দদাস তাতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ভক্তিনম্র আবেগ যে ভাবগভীরতা সৃষ্টি করেছে, তাঁর প্রায় দুশ বছর পূর্বে আবির্ভূত বিদ্যাপতির পদে তা আশা করা যায় না। অবশ্য ভাষা ভঙ্গিমার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে গোবিন্দদাস কোন কোন পদে কিছুটা কৃত্রিমতার সৃষ্টি করেছেন। উত্তর চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব পদের এটি সাধারণ লক্ষণ। তাঁর কোন কোন পদে ভক্তি ও সাধনার গতানুগতিক পথ নির্দিষ্ট হয়েছে। সে সকল পদে গভীর আবেগ অনুপস্থিত। সে যাই হোক, মধ্যযুগের গোবিন্দদাস যে এখনও বাংলাদেশের রসিক সমাজে বেঁচে আছেন তার কারণ ভাবে ও ভাষায়, ভক্তি ও অনুরাগে এখনও তিনি একালের মানুষের মনে আনন্দ সঞ্চারে সমর্থ।

অতএব চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য যেমন জ্ঞানদাস, তেমনি বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস। তথাপি চণ্ডীদাসে ও জ্ঞানদাসে যেমন পার্থক্যও আছে, তেমনি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান।

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ॥

১। "নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব"

—পদটি কার রচনা? এই বর্ণনা গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গে কেন করা হয়েছে?

পদটি গোবিন্দদাসের রচনা। ব্রজবুলি ভাষায় পদরচনায় গোবিন্দদাস কবিরাজ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

গৌরাঙ্গ বিষয়ে এই বর্ণনাটি করা হয়েছে। বর্ষার জলসিঞ্চনে বৃক্ষের অণুতে অণুতে আনন্দের শিহরণ দেখা দেয়। ঠিক তেমনিভাবে কৃষ্ণপ্রেমের সখাভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গৌরাঙ্গের সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়।

২। "গোবিন্দদাস রহু দূর"

—কোন দৃশ্য থেকে গোবিন্দদাস দূরে ছিলেন? দূরে থাকার কারণ কি?

—কৃষ্ণপ্রেমের অশ্রুতে চৈতন্যের সর্বাঙ্গসিক্ত হত। তাঁর মহাভাবে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরের মত অসংখ্য ভক্ত সমবেত হত। এই দৃশ্য থেকে গোবিন্দদাস দূরে ছিলেন।

দূরে থাকার কারণ গোবিন্দদাস কবিরাজের চৈতন্য বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না; কারণ তিনি চৈতন্য-পরবর্তী কবি ছিলেন।

৩। "অভিনব হেম কল্পতরু"—এখানে কার কথা বলা হয়েছে? এটি কোন রস পর্যায়ের পদ?

গৌরাঙ্গের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁকে অভিনব স্বর্ণকল্পতরুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কারণ তাঁর প্রেমামৃত বিতরণে জগতের মানুষের মনোরথ পূরণ হয়।

এটি গৌরচন্দ্রিকা পর্যায়ভুক্ত পদ। গোবিন্দদাস কবিরাজের রচনা।

৪। "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"

পদটি কোন্ রস পর্যায়ের? পদকর্তা কে? বক্তব্যটি কার?

—পদটি পূর্বরাগ ও অনুরাগ রসপর্যায়ের অন্তর্গত। রাধা কৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। পূর্বরাগময়ী রাধা কৃষ্ণনাম শ্রবণেই বিহ্বল হয়ে পড়েন। পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস। এখানে রাধার বক্তব্য উপস্থাপিত।

৫। "নাম পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়"

—তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

—এখানে রাধার অন্তরের ব্যাকুলতার কথা প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণনাম শ্রবণে রাধার অন্তর কাতর হয়ে পড়ে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম তো অপার্থিব প্রেম, তাই কেবল নাম শ্রবণে রাধিকার এতখানি কাতরতা; তার অঙ্গের পরশে কি যে অনুভূতি তা রাধা কল্পনা করতেও পারে না। দেহাতীত প্রেমের এক অসাধারণ বর্ণনা পাই চণ্ডীদাসের এই পদে। এখানে অনুভূতির গভীরতা আমাদের রসলোকে উত্তীর্ণ করে।

৬। এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি

—কোন্ রসপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত? কার সম্বন্ধে কোন্ কবির রচনা? অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—পদটি পূর্বরাগ রস পর্যায়ের অন্তর্গত। এটি চণ্ডীদাসের রচনা। এই অংশটিতে শ্রীরাধার অপার্থিব প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মানবমানবীর সাধারণ অনুরাগ এ তো নয়। কালিয়া বঁধুর রূপধ্যানে শ্রীরাধিকা

বাহ্যজ্ঞানশূন্য তিনি বার বার বেণীর ফুলের গাঁথনি খুলে দেখছেন আর নিজের কৃষ্ণ কেশপাশ দেখেই তাঁর প্রেমাস্পদের কথা মনে পড়েছে। প্রেমবৈরাগিণী রাধার এই চিত্রটি অনবদ্য সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ভাষায় প্রকাশিত।

৭। "বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা"

—উদ্ধৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ এত বেশী যে তাঁর বাস্তববিস্মৃতি ঘটেছে, আহারে রুচি নেই। সাজ-সজ্জা তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। কারণ কৃষ্ণের বিরহে রাধার জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। সাধারণত রাধা নীলাম্বর পরিধান করেন। কিন্তু কৃষ্ণের বিরহে তিনি সর্বত্যাগের প্রতীক গেরুয়া বসন পরেছেন।

এটি চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত।

৮। "পাখীক পাখ মীণক পানি
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি"

—এটি কোন্ পর্যায়ের পদ? পদকর্তা কে? অংশটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—উদ্ধৃত অংশটি পূর্বরাগ-অনুরাগ পর্যায়ের অন্তর্গত। পদটি বিদ্যাপতির রচিত। রাধাকৃষ্ণের অতিলৌকিক প্রেম বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্যাপতি রাধার মুখে এই প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীকৃষ্ণ রাধার কাছে জীবন সদৃশ। পাখীর কাছে পাখা যেমন অবশ্য প্রয়োজন, মাছের কাছে কিংবা জীবের কাছে জল যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণের গুরুত্ব রাধার কাছে। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে রাধা এইরূপই জানেন।

৯। "তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তহুঁ মোর"

—উক্তিটি কার? বক্তব্যটির অর্থ কি?

—উদ্ধৃতিটি বিদ্যাপতির রচিত রাধার অনুরাগ পর্যায়ের পদ। এখানে রাধা প্রেমের গভীরতায় শ্রীকৃষ্ণকে নিজের জীবন বলে মনে করেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর এই সুগভীর প্রেম থাকলেও মাধবের স্বরূপ তিনি বুঝতে পারেন না। নরনারীর প্রেমের সেই চিররহস্যময় প্রশ্ন বিদ্যাপতির রাধার মুখে উচ্চারিত হয়েছে:—মাধব তুমি কেমন তা আমাকে বল। বিদ্যাপতি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন: দুজনে দুজনের তুলনা।

১০। "পুলক ঢাকিতে কত করি পরকার
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার"

—পদকর্তা কে? কোন্ পর্যায়ের পদ? পুলক সৃষ্টির কারণ কি?

আলোচ্য পদটি বৈষ্ণব পদকর্তা জ্ঞানদাস রচিত 'পূর্বরাগ অনুরাগ পর্যায়ের। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ সম্বন্ধে তার সখীদের কাছে উক্তিটি করেছেন। গুরুজনদের মাঝে বসে

শ্রীরাধা কৃষ্ণের কথা ভাবতে পারেন না, তাই সখীদের সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন তাঁর জীবনের জীবন প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের কথা বলেন এবং অনুরাগে তাঁর অঙ্গে পুলক জাগে। কিন্তু কৃষ্ণ দর্শন হয় না বলে আনন্দের পূর্ণতা ঘটে না। তাই অনবরত তাঁর নয়নে অশ্রু ঝরে।

১১। "রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মনে উঠে॥"

—উক্তিটি কার? পদকর্তা কে? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—উক্তিটি শ্রীরাধিকার। সখীদের কাছে কৃষ্ণ প্রসঙ্গে তাঁর অন্তরের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন পদকর্তা জ্ঞানদাস। শ্রীরাধা কৃষ্ণ সম্পর্কে অন্তরে যে আকর্ষণ অনুভব করেন সেই আকর্ষণ কখনও হ্রাস পায় না। শ্রীকৃষ্ণকে একবার দেখার পর তাঁর দর্শন আকাঙ্ক্ষা আরও বর্দ্ধিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর অন্তরে কত কথারই সৃষ্টি হয়েছে। সবটা তিনি সব বলতে পারেন না।

১২। "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"

—পদটি কার রচনা? কোন্ পর্যায়ভুক্ত? বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও।

—চণ্ডীদাস রচিত এই পদটি পূর্বরাগ পর্যায়ভুক্ত। দুহুঁ বলতে রাধা কৃষ্ণ দুজনকে বোঝানো হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের এই নিত্য মিলনের মধ্যেও একটি বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়। কারণ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এই প্রেম পরকীয়া প্রেম নামে পরিচিত। তাই এই প্রেমের মিলন অস্থায়ী। আসন্ন বিচ্ছেদ ভাবনায় দুজনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও কাঁদছেন। বিরহ বেদনা তাঁদের নিত্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য।

১৩। 'ভানু-কমল বলি সেহো হেন নয়।
হিমে কমল মরে ভানু সুখে রয়॥"

—কোন প্রসঙ্গে কে এই উক্তি করেছেন? বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

—রাধাকৃষ্ণের দেহাতীত প্রেমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চণ্ডীদাস এই উক্তিটি করেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমের সঙ্গে ভানু-কমলের অর্থাৎ সূর্য ওপদ্মের আকর্ষণের তুলনা করেছেন। ভানু-কমলের আকর্ষণ উপমান আর রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপমেয়। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তুলনায় ভানু-কমলের প্রেম নিকৃষ্ট; কারণ শীতকালে যখন কমল মরে যায় তখন ভানু সুখেই থাকে। প্রিয়া বিরহে তার কোন বিকার ঘটে না। অপর পক্ষে রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদ উভয়ের পক্ষে মৃত্যুতুল্য।

১৪। "সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়"

—পদটি কার রচনা; কোন্ পর্যায়ের? অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—পদটি কবিবল্লভ রচনা করেছেন ব্রজবুলিতে। পদটি অনুরাগ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে মনে করেন এটি বিদ্যাপতির রচনা।

প্রেমের রীতি কোন নিয়ম মানে না। রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমের স্বরূপ আরও অভিনব। প্রেম তো কোন জড় বস্তু নয়, তিলে তিলে তা নূতন রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং জাগতিক ব্যাখ্যায় রাধাকৃষ্ণের নিত্য প্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটন সম্ভব নয়; তা বাস্তবিক অভিনব এবং নিত্য নূতন।

১৫। "জনম অবধি হাম……পরশ না গেল

—উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের তাৎপর্য হল অসীমের সঙ্গে সীমার মিলন পিপাসা। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেম জন্ম জন্মান্তর ধরে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণের রূপ তিনি বারবার দেখেছেন, তথাপি তাঁর নয়ন তৃপ্ত হ'ল না। এবং দর্শনের অভিলাষও মিটলো না। তিনি তাঁর মধুর ধ্বনি কতবার শুনেছেন তবু মনে হয় যে সম্পূর্ণ ভাবে শোনা হল না। প্রেমের সেই চিরন্তন অতৃপ্তি রাধার অন্তরে জাগ্রত। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনের বাসনা শাশ্বত।

১৬। কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল এক॥

—তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

প্রেমের চির অতৃপ্তি শাশ্বত সত্য। এ জগতে বিদগ্ধ ব্যক্তির অভাব নেই, রসিক ব্যক্তিও অনেক আছে। তথাপি যথার্থ সংবেদনশীল হৃদয় নিতান্ত দুর্লভ। রাধার প্রেমের অতৃপ্তি সেই কারণে। লাখের মধ্যে একজনেরও এই সংবেদনশীল হৃদয় আছে কিনা সন্দেহ।

১৭। করযুগ নয়ন মুদি চলু ভামিনী
তিমির পয়ানক আশে।
করকঙ্কণ পণ ফণী মুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ গুরু পাশে॥

—পদটি কোন্ পর্যায়ের? রচয়িতা কে? বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

—বাঙালী-কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ এই পদটির রচয়িতা। অভিসার পর্যায়ের পদ এটি। রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশে অভিসারে যাবেন—পথ দুর্গম, অন্ধকার রাত্রি। রাস্তায় সাপের ভয়। তাই তিনি চোখে হাত ঢাকা দিয়ে চলার অভ্যাস করছেন। নিজের কঙ্কণের বিনিময়ে সর্পগুরুর কাছে ফণীমুখ বন্ধন শিক্ষা করেছেন। ভগবানকে পেতে হলে দুশ্চর তপস্যা করতে হয়। এই তপস্যার ফলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া সম্ভব।

১৮। গুরুজন বচনে বধির সম মানই
আন শুনই কহ আন।

পরিজন বচনে মুগধী সম হাসই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥

—তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

রাধা পরকীয়া প্রেমিকা। তার পক্ষে অভিসার যাত্রা করা সম্ভব নয়। অনেক বাধা। তেমনি পরম পুরুষকে পেতে গেলে পরকীয়া নায়িকার মতই অসংখ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে অভিসারে যাত্রা করতে হয়। তাই গুরুজনের বচনে তিনি বধির, এককথা বললে অন্ত কথা শোনেন। গুরুজনের বাক্য যেন শোনেননি—এমন ভান করে অভিসারের পথ প্রশস্ত করেছেন।

১৯। "ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি
নটবর বেশ পাইল কথি"

—অংশটি কোন্ পর্যায়ের ও কার রচনা? প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—চণ্ডীদাস রচিত এই পদটি বংশীশিক্ষার অন্তর্গত। রাধা-কৃষ্ণকে কুঞ্জে রেখে সখীরা বনে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন বিপরীত চিত্র। কৃষ্ণবেশ ধারী এক পরম সুন্দর গৌরবর্ণ যুবক বাঁশী বাজাচ্ছেন। একে তাঁরা কৃষ্ণ বলে মেনে নিতে পারছেন না। তাই তাঁরা বিস্ময় মুগ্ধ স্বরে পরস্পর বলাবলি করছেন এই নবীন যুবক নটবর বেশ কোথায় পেল।

২০। চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে
এরূপ হইবে কোন দেশে —তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—সখীরা রাধাকৃষ্ণকে কুঞ্জে রেখে বনে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন এক নবীন গৌরবর্ণ যুবক বাঁশী বাজাচ্ছেন এবং তাঁর বাম পাশে রয়েছেন এক শ্যামবর্ণা নারী। সে বুঝি তারই সুন্দরী। এই দৃশ্য দেখে সকলেই বিস্মিত। কবি চণ্ডীদাস যেন কল্পনানেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব দেখেছেন। রাধাভাবে ভাবিত গৌরাঙ্গরূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ইঙ্গিত এই অংশে সুস্পষ্ট।

২১। "কোন বিধি সিরজিল স্রোতের শেঁওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥"

—কার রচনা? কোন্ পর্যায়ের? অংশটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—চণ্ডীদাসের এই পদ আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের। রাধা নানা দুঃখকষ্ট স্বীকার করেও কৃষ্ণের দেখা পাচ্ছেন না। তাই তিনি নিজেকে একান্ত অভাগিনী মনে করে স্রোতের শেওলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্রোতের শেওলার নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই; স্রোত যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যেতে হয়। রাধা নিজেকেও ঠিক তেমন অসহায় ভাবছেন। অসহায় অবস্থায় রাধা আক্ষেপ করছেন যে তাঁর এমন সমব্যথী কেউ নেই যাকে বন্ধু বলে মনে করতে পারেন।

২২। "পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়"—তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার জন্য রাধা অনেক অসাধ্য সাধন করেছেন। তবুও তাঁর কৃষ্ণ দর্শন হ'ল না। তিনি মনে মনে ভাবেন কৃষ্ণ তাঁর উপর নির্দয় হয়েছেন। যদি কৃষ্ণ তাঁকে ত্যাগ ক'রে থাকেন তবে রাধার মৃত্যু ভিন্ন কোন গতি নেই। রাধার এই আক্ষেপে কবি চণ্ডীদাস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন সত্তা। কৃষ্ণ রাধার অত্যন্ত আপনজন। কেউ কি পরের জন্য আপনজনকে পর ক'রে দিতে পারেন? কৃষ্ণকে যথা সময়ে আবার রাধা ফিরে পাবেন—এই আশ্বাস দিয়ে কবি পদটি শেষ করেছেন।

২৩। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥'

—পদটি কার রচনা ও কোন পর্যায়ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

—জ্ঞানদাস (অথবা চণ্ডীদাস) রচিত এই পদটি আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা হয়ে রাধা আত্মীয় পরিজন সকল কিছু ত্যাগ করলেন। কিন্তু ফল হ'ল তার বিপরীত। কৃষ্ণপ্রেমে সুখী হবার স্বপ্ন দেখে তিনি ঘর বাঁধলেন। কিন্তু বিরহ দুঃখের অনলে তা ভস্মীভূত হল। কৃষ্ণপ্রেমামৃত সমুদ্রে তিনি স্নান করতে গেলেন কিন্তু তাঁর এমনই ভাগ্য যে সেই অমৃতসিন্ধু তৎক্ষণাৎ গরলে পর্যবসিত হ'ল। অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধার জীবনে কেবল বিরহ, কেবল দুঃখ। এই আক্ষেপই এখানে ধ্বনিত।

২৪। পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥ —বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

পিপাসা নিবৃত্তির জন্য রাধা জল চাইছেন মেঘ-এর কাছ থেকে, জলের পরিবর্তে তিনি পেলেন বজ্রাঘাত। কৃষ্ণপ্রেম পিপাসা চরিতার্থ করতে চাইলেন, কিন্তু পরিবর্তে কেবল দুঃখ ও বিরহজ্বালা পেলেন। আত্মীয়দের কাছে কলঙ্কিনী নামে অভিহিত হলেন। জ্ঞানদাস বলেন কৃষ্ণপ্রেমের রীতিই এই। অতিশয় কঠোর সাধনা ও দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়েই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম লাভ করা যায়।

২৫। তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

—পদটির রচয়িতা কে ? কোন্ পর্যায়ের ? তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—চণ্ডীদাস রচিত এই পদটি নিবেদন পর্যায়ের অন্তর্গত। শ্রীরাধা অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা দুঃখ জ্বালা সহ্য ক'রে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হয়েছেন। কিন্তু কৃষ্ণকে শেষ পর্যন্ত পান নি। বিরহে তাঁর দিন কাটছে। শেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাই এক মনপ্রাণ হয়ে তিনি নিজেকে কৃষ্ণের চরণে উৎসর্গ ক'রে দিতে চান।

২৬। আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

—'পরশ রতন' কাকে কেন বলা হয়েছে ? বক্তব্যটি ব্যাখ্যা কর।

—রাধা কৃষ্ণ ছাড়া একতিল বাঁচতে পারেন না। তাই কৃষ্ণকে যদি তিনি দেখতে না পান তাহলে মৃত্যু ছাড়া তাঁর আর কোন পথ নেই। অনেক ভেবে রাধা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরশ রতন তার গলায় হার হয়ে বিরাজ করুক। রাধার এই অবস্থা দেখে চণ্ডীদাস বলছেন যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরশ মাণিক— যার স্পর্শে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। কাজেই রাধা যেন শ্রীকৃষ্ণরূপ পরশমণিকে এক তিলের জন্য কাছ ছাড়া না করেন। আর সর্বদা কাছে রাখার একটিমাত্র উপায় হ'ল কৃষ্ণরূপ স্পর্শমণিকে গলার হার রূপে ধারণ করা। অর্থাৎ কৃষ্ণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে রাধাকে এবং অহংবোধ বিলুপ্ত করতে হবে। তবেই পরমপুরুষ কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে।

২৭। কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥

—কোন্ পর্যায়ের পদ ? পদকর্তা কে ? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—বিখ্যাত পদকর্তা চণ্ডীদাস রচিত এই পদটি নিবেদন পর্যায়ের। এখানে রাধা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেছেন। কুলশীল ও মান বিসর্জন দিয়ে তিনি কৃষ্ণ অনুরাগিণী হয়েছেন। শ্রীমতী তার জন্য এতটুকু দুঃখিত নন। কারণ কৃষ্ণই তাঁর জীবন। তাই কৃষ্ণের জন্যে কলঙ্ককে হার রূপে কণ্ঠে ধারণ করতে পারেন। তাতেই তিনি আনন্দ বেশী পাবেন।

২৮। সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণখানি ॥ —তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী। জাগতিক নিয়মে, সমাজের দৃষ্টিতে এটি অন্যায়। তাই রাধার অসতী বলে কলঙ্ক রটেছে। কিন্তু কৃষ্ণ তো আসলে পরমপুরুষ। কাজেই জগতের নিয়ম তাঁর ক্ষেত্রে খাটে না। তাই রাধা বলছেন তিনি সতী কি অসতী তা কেবল পরমপুরুষ কৃষ্ণই নির্ণয় করবেন। কারণ তিনি সকলেরই পতি। কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকর্ষণ নিত্য সত্যরূপে দেখতে হবে।

২৯। "এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"

—কার রচনা? কোন্ পর্যায়ভুক্ত? কেন একথা বলা হয়েছে?

—বিদ্যাপতির এই পদটি 'মাথুর' বা 'প্রবাস' পর্যায়ভুক্ত। শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ বিহনে দিন কাটাচ্ছেন। কারণ কংস দমনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করেছেন। অতএব রাধা অতিশয় বিরহকাতরা। এই বিরহকাতর অবস্থায় দুরন্ত বর্ষা এসেছে। ভরা ভাদরের বর্ষা। এই সময়ে প্রিয়মিলনের জন্য দেহমন ব্যাকুল হয়, কিন্তু মিলনের উপায় নেই। কৃষ্ণ চিরকালের জন্য রাধাকে ছেড়ে গেছেন। তাই তাঁর দুঃখের সীমা নেই। এই দুঃখের চিত্র এখানে বর্ণিত হয়েছে।

৩০। "মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া" —তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—রাধা কৃষ্ণ বিরহে কাতর। কারণ কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। মিলনের সম্ভাবনা নেই। এদিকে প্রকৃতি বর্ষার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। প্রচণ্ড বারি বর্ষণে ভেক ও ডাহুক প্রিয়মিলনের আহ্বানে ডেকে চলেছে। রাধার অন্তরবেদনা তাই ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়েছে। তিনি বিরহে এতই কাতর হয়েছেন যে তাঁর মনে হচ্ছে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। এই আন্তরিক ব্যাকুলতাই পদটির এই অংশে প্রকাশিত।

৩১। বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া —তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন। রাধার বিরহ অনন্ত। ভরা বর্ষায় সকলে যখন প্রিয়মিলনে অধীর তখন রাধার অন্তর বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত। কবি বিদ্যাপতি সমব্যথীর মত শ্রীমতীকে প্রশ্ন করেছেন প্রাকৃতিক এই দুর্যোগে হরি ছাড়া দিনরজনী তাঁর কেমন ক'রে কাটবে? আসলে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। মাঝে অনন্ত সমুদ্রের অতলান্ত ব্যবধান। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া রাধিকার জীবন

যেমন অন্ধকার তেমনি ভগবানের সাথে মিলন না ঘটলে জীবের পূর্ণতা ঘটে না। আর এই মিলনের অভাবেই জীবন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

৩২। অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া নেহে॥

—পদটি কোন্ পর্যায়ের? তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—বিদ্যাপতি রচিত এই পদটি মাথুর বা বিরহ পর্যায়ের অন্তর্গত। অঙ্কুর রৌদ্রতাপে যদি বিনষ্ট হ'ল তাহলে জলদানকারী মেঘের আর প্রয়োজন কি? ঠিক সেইরকম রাধা তাঁর নবযৌবন যদি বিরহেই কাটিয়ে দেবেন তাহলে প্রিয়তম কৃষ্ণের ভালবাসার আর প্রয়োজন কি! কৃষ্ণ বিহনে শ্রীরাধিকার গভীর অন্তর বেদনা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

৩৩। সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিয়াসা॥ —ভাব বিশ্লেষণ কর।

—রাধার এমনই দুর্ভাগ্য যে তিনি কৃষ্ণকে পেয়েও হারিয়েছেন। তাই তাঁর জীবনে সবই বিপরীত। কৃষ্ণরূপ সিন্ধু নিকটে তবুও পিপাসা নিবৃত্ত করতে পারেন না। কারণ রাধা চির বিরহিনী। মথুরা থেকে কৃষ্ণ আর ফিরে এলেন না। বিরহেই তাঁকে দিনাতিপাত করতে হ'ল। পরমপুরুষ কৃষ্ণের প্রেমে ধন্য হয়েও তিনি চিরকাল প্রেম পিপাসায় কাতর হয়ে রইলেন। এই বিরহ বেদনা এই অংশে প্রকাশিত।

৩৪। গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওক
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে। —তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

—রাধার অপরিসীম বিরহকাতরতা বিদ্যাপতিকে দ্বন্দ্বকাতর করে তুলেছে। গিরিধর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ক'রে তাঁর আদি অন্ত পাওয়া যায় না। স্বয়ং ভগবানকে সেবা ক'রেও যদি রাধা তাঁর চরণে স্থান না পান তাহলে উপায় কি তা কবি নিজেও জানেন না। রাধার মত কৃষ্ণগতপ্রাণা আর কে আছে! তাঁর কৃষ্ণপ্রেম জগৎ-বিখ্যাত। তথাপি তাঁকে এই বিরহ জ্বালা ভোগ করতে হচ্ছে দেখে বিদ্যাপতি সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না।

৩৫। "জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ দশদিশ ভেল নিরদন্দা"—
উক্তিটি কার? পদকর্তা কে? কোন্ পর্যায়ের অন্তর্গত? অংশটি ব্যাখ্যা কর।

—পদকর্তা বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার জবানীতে এই উক্তিটি করেছেন। অংশটি ভাবোল্লাস ও মিলন রসপর্যায়ের। শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধিকাকে ফেলে মথুরায় গমন

করেন তখন শ্রীরাধার বিরহ-বেদনা অতি তীব্র আকার ধারণ করে। শ্রীরাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণের বাস্তব মিলন সম্ভব নয়। তাই ভাবের মিলন কল্পিত হয়েছে। এই ভাবমিলন রাধিকার অন্তরের সকল দ্বন্দ্বের অবসান করেছে। এর ফলে তাঁর জীবন ও যৌবন সফল হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবী তাঁর দিকে আজ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

৩৬। সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা —তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

—বিরহকাতরা রাধা কৃষ্ণের আগমন আশায় দিন যাপন করেন। কিন্তু বাস্তবে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে না। একান্তভাবে কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তিনি বিরহে যখন দিনপাত করতেন তখন কোকিলের ডাককে শত্রু বলে মনে করতেন। কারণ তা কেবল বিরহকে দ্বিগুণ করত। আর আজ তিনি প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণকে ফিরে পেয়েছেন। ভাবসম্মেলনে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনরজনী অতিবাহিত করেছেন। এখন লাখ লাখ কোকিলের ডাককেও তিনি ভয় করেন না। এক চন্দ্র লাখ চন্দ্র হয়ে শীতল কিরণ সম্পাত করুক তাতে তাঁর কিছু ভয় নেই। পঞ্চবাণ লাখবাণ হয়ে উঠুক এবং ধীরে মলয় পবন বয়ে চলুক। রাধার আর কোন উদ্বেগ নেই; কারণ প্রিয় মিলনে তাঁর জীবন ধন্য।

৩৭। "বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগী নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা।"
—কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

—বক্তব্যটি শ্রীরাধিকা সম্পর্কে কবি বিদ্যাপতির। মিলন ও ভাবোল্লাসের পদে শ্রীরাধার কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটেছে। জাগতিক নিয়মের উর্দ্ধে এই মিলন। ভাবের মিলন, কল্পনায় রাধার মিলনরজনী কেটেছে। তাই রাধার অন্তরে আজ আর কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই। নেই কোন অনুযোগ অভিযোগ। বিরহ অপসৃত। এক অসামান্য আনন্দের অধিকারী হয়েছেন শ্রীরাধিকা। ভগবানকে লাভ করলে ভক্তজনের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দের অধিকারিণী তিনি। মহাভাব-স্বরূপিণী রাধার এই প্রাপ্তি সম্পর্কে পদকর্তা বিদ্যাপতি বলছেন যে রাধা অল্পভাগী অর্থাৎ মন্দ-ভাগ্য নন, বরং অতিশয় সৌভাগ্যবতী তিনি, কৃষ্ণের স্নেহ বা ভালবাসা লাভ করেছেন যা কেবল শ্রেষ্ঠ সাধিকা বা সাধক লাভ করতে পারেন।

৩৮। দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
—পদটি কার রচনা? কোন্ পর্যায়ের? বক্তব্যটির অর্থ লিখ।

—এটি বিদ্যাপতির প্রার্থনা পর্যায়ের পদ। কবি সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের কাছে

আত্মসমর্পণ করেছেন। এখানে রাধার প্রেম পর্যায়ের বিশ্লেষণ নয়। বিদ্যাপতি সারাজীবন কৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকে ডাকার অবসর পান নি। তাই বৃদ্ধ বয়সে তিল তুলসী দিয়ে নিজেকে কৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণ নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন। কারণ এই পৃথিবীতে কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্তা। কৃষ্ণ ছাড়া কোন সাধকের পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। মুক্তিবাসনা এই কবিতায় প্রতিফলিত। কারণ এটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে রচিত। চৈতন্য পরবর্তী কালে কোন কবিই কখনই মুক্তির বাসনা প্রকাশ করেন নি।

৩৯। "তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার।" —তাৎপর্য বিচার কর।

সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের বাসনায় মাধবের কাছে কবি বহু মিনতি করেছেন। জগতেরপতি মাধব বা জগন্নাথ সকলের মুক্তিদাতা। বিদ্যাপতি সারাজীবন ধরে মাধবকে ডাকেন নি। দোষ-গুণ গণনা করতে গেলে দোষ ছাড়া কোন গুণের লেশ তাঁর মধ্যে পাওয়া যাবে না। তবুও কবির দৃঢ় বিশ্বাস যে মাধব তাঁকে মুক্তি দেবেন। কারণ কবি জগতের বাইরে নন। আর মাধব জগতের সকলেরই মুক্তিদাতা। কবির যত দোষ থাকুক, যেহেতু তিনি জগতেরই একজন সেইহেতু তিনি মাধবের বা জগন্নাথের করুণা পাবেন—এ বিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত। কবির আত্মদৈন্য ও ভাগবতী চেতনা এই অংশে প্রকাশিত।

৪০। করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে। —তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

বিদ্যাপতি বৃদ্ধ বয়সে মাধবের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেছেন প্রার্থনা পর্যায়ের পদে। এই পৃথিবীতে মানুষের জন্ম ও মৃত্যু মানুষেরই কর্মের বিপাকে ঘটে থাকে। কারণ ভাল কাজ করলে মাধব তাকে পুনর্জন্মের হাত থেকে মুক্তি দেন। আর কুকর্মের জন্য বার বার এই পৃথিবীতে দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাই বিদ্যাপতি বলেন তাঁর যেন মাধবের পদে মতি থাকে। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে ঈশ্বর তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করবেন সন্দেহ নেই।

৪১। "তাতল সৈকতে বারি বিন্দু সম সুত-মিত রমণী সমাজে"—
বক্তব্যটি বুঝিয়ে দাও।

—তপ্ত বালুকারাশিতে বারি বিন্দু পড়লে যেমন তা নিঃশেষিত হয় তেমনি পরিবার-পরিজন—পুত্র-মিত্র রমণী সমাজে বিদ্যাপতি নিঃশেষে বিলীন হয়েছিলেন। তাঁর পৃথক কোন অস্তিত্ব ছিল না। আজ জীবনের শেষ লগ্নে এসে তিনি বুঝতে পেরেছেন এই সুত-মিত্র ও রমণী সমাজ তাঁকে আপন কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। এখন উদ্ধারের একমাত্র আশা মাধবের কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন। পুণ্য কাজের হিসাব করতে গেলে জমার ঘর শূন্য। সমাজ ও পরিজন পরিবৃত হয়ে কবি বিপক্ষে

চালিত হয়েছেন। জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে মাধবের দয়ার উপর নির্ভর করা ছাড়া তাঁর অন্য গতি নেই।

৪২। কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥ —তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

এই পদটি বিদ্যাপতি রচিত। প্রার্থনা পর্যায়ের পদ এটি। কবি বলেন, কৃষ্ণের কোন আদি অন্ত নেই। তিনি চিরন্তন। কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ প্রাপ্ত হচ্ছেন; কিন্তু কৃষ্ণের বিনাশ নেই। সাগরের ঢেউ যেমন সাগরে উত্থিত হয়ে সাগরে লীন হয়ে যায় তেমনি জীবকুল কৃষ্ণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে আবার কৃষ্ণেই বিলীন হয়ে যায়। তাই কৃষ্ণকে অবলম্বন করে কবি এই ভব সিন্ধু পার হতে চান।

৪৩। 'বৈষ্ণব' শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপন্ন? বৈষ্ণব পদাবলী বলিতে কী বোঝ।

—বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলে। মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছিল। এই ধর্মসম্প্রদায় বৈষ্ণবপদাবলী নামে এক প্রকার গীতিরসমণ্ডিত পদ রচনা করেছিলেন যা ধর্মীয় সংকীর্ণতা অতিক্রম করে চিরন্তন সাহিত্যে পর্যবসিত হয়েছে।

৪৪। বৈষ্ণবশাস্ত্রে রস কয় প্রকার ও কি কি?

—গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে একটি মূলরস তা হ'ল ভক্তিরস। এই ভক্তিরসের পাঁচটি ধারা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বৈষ্ণবের সাধনা পাঁচটি উপায়ের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। এই পাঁচটি রসের সাধনার মধ্যে মধুর রসের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। রাধার মধুর রসের সাধনা।

৪৫। মধুর রস, (উজ্জ্বল রস) বা শৃঙ্গার রসের কটি বিভাগ ও কি কি?

—শৃঙ্গার রসের দুই বিভাগ—বিপ্রলম্ভ বা বিরহ এবং সম্ভোগ বা মিলন। বিপ্রলম্ভ বা বিরহ চার প্রকারের—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। পূর্বরাগের পর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, মানের পর সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ, প্রেমবৈচিত্ত্যে সম্পন্ন সম্ভোগ ও প্রবাসের পর সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ হয়। বিরহ মিলনের এই আট অবস্থার প্রত্যেকটির আবার আটটি করে বিভাগ করে চৌষট্টি রসের কীর্তনের কথা বলা হয়েছে।

৪৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে নায়িকার কটি বিভাগ ও কি কি?

—শ্রীরূপ গোস্বামী স্তবমালায় বাসকসজ্জা, অভিসারিকা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, ও স্বাধীনভর্তৃকা—নায়িকার এই আট বিভাগ করেছেন।

৪৭। অভিসারিকা কাকে বলে? অভিসারিকা কয় প্রকার ও কি কি?

দয়িতের উদ্দেশ্যে মিলনের জন্য গৃহত্যাগিনী রমণীকে অভিসারিকা বলে।

—অভিসারিকার আট বিভাগ সম্পর্কে পীতাম্বর লিখেছেন—

সেই অভিসার হয় অষ্ট প্রকার।
জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার॥
কুজ্ঝটিকা তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা সঞ্চরা।
পীতপদ্ম শাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা॥

অর্থাৎ জ্যোৎস্নারাত্রে, অন্ধকার রাত্রে, বর্ষার রাত্রে, বাদলা দিনে, কুয়াশাপূর্ণ প্রভাতে, মাঘমাসের শেষরাত্রে পবিত্র নদীতে স্নান করার ছলে নায়িকা অভিসারে যেতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুরলীর ধ্বনি শুনে যে নারী গৃহ ত্যাগ করে তাকে উন্মত্তাভিসারিকা বলে। সঞ্চরাভিসারিকাও পাগলিনীর মত অভিসার যাত্রা করে।

৪৮। ভাবোল্লাস কাকে বলে? ভাবোল্লাস মিলনের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে লেখ।

—দীনবন্ধু দাস সংকীর্ণামৃতে লিখেছেন—

মথুরা হইতে ব্রজে নাহি আগমন।
স্বপ্ন সন্দর্শনে মাত্র জানিহ সঙ্গম॥
নিত্য কৃষ্ণ যদি আছে বৃন্দাবনে।
ব্রজবাসী কৃষ্ণ দেখি স্বপ্নসম মানে॥
সাক্ষাৎ মিলন নাই শাস্ত্রে পরকাশ।
অতএব সেখানে সঙ্গত ভাবোল্লাস॥
নায়ক আসিবে বলি মনে উল্লাস।
সঙ্গম সমান ভাব নাম ভাবোল্লাস॥

রাধিকা কল্পনায় মিলন অর্থাৎ সঙ্গম অনুভব করে যে উল্লাস লাভ করেন তাকেই ভাবোল্লাস বলে।

৪৯। বিপ্রলব্ধা কাকে বলে? তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

—সংকেত করেও যদি নায়ক না আসেন, তাতে ব্যথিতা হয়ে নায়িকা খেদ প্রকাশ করেন। এই খেদপ্রকাশকারিণী রমণীকে বিপ্রলব্ধা বলে। উজ্জ্বল চন্দ্রিকায় আছে:

সংকেত করিয়া যার পতি নাহি মিলে।
দুঃখিত হৃদয়া তারে বিপ্রলব্ধা বলে॥
মূর্চ্ছা, নিঃশ্বাস বহে, করে বহু খেদ।
দুনয়নে অশ্রু বহে, অধিক নির্বেদ॥

বিপ্রলব্ধার আট ভেদ—বিকলা, প্রেমমত্তা, ক্লেশা, বিনীতা, নির্দয়া, প্রখরা, দূত্যাদরা, ভীতা।

৫০। 'খণ্ডিতা' নায়িকা কাকে বলে? বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

—সংকেতকালে না এসে, যে নায়িকার দয়িত অন্য নায়িকার সঙ্গে বিলাস করার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে প্রাতঃকালে আসেন তাকে খণ্ডিতা বলে।

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্য সনে।
রতিচিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে।।
তা দেখি নায়িকার হয় রোষ নিশ্বাস।
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহুভাষ।।

৫১। কলহান্তরিতা নায়িকার বৈশিষ্ট্য কি?

খণ্ডিতার পর কলহান্তরিতা। খণ্ডিতা অবস্থায় প্রিয়তমকে উপেক্ষা করে অনুতাপ করেন যে নায়িকা তাকে কলহান্তরিতা বলে। 'উজ্জ্বল নীলমণি' অনুসারে শচীনন্দন লিখেছেন:

খণ্ডিতা হইয়া করেন পতির তাড়ন।
পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ।।
প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন।
কলহান্তরিতা তারে কহে কবিগণ।।

৫২। স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকার পরিচয় দাও।

—নায়ক যে নায়িকার বশে বা অধীনরূপে সর্বদা নিকটে থাকেন, তাঁকে স্বাধীনভর্তৃকা বলে। পীতাম্বর দাস লিখেছেন:

স্বাধীনভর্তৃকা কথা শুন দিয়া মন।
কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা বিচক্ষণ।
উক্তকা, উল্লাসা, অনুকূলা অভিষেকা।
স্বাধীন ভর্তৃকা এই অষ্ট করি লেখা।।

৫৩। 'বাসকসজ্জা' নায়িকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

—নিজের অবসর অনুসারে প্রিয়তম আসবেন এই ভেবে যিনি নিজের দেহ ও বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন তাঁকে বাসকসজ্জিকা বলে। বাসকসজ্জা আবার আট রকম—'মোহিনী' প্রতীক্ষায় জাগ্রতা, নায়কের বিলম্বে রোদনপরায়ণা, মধ্যোক্তিকা বা কান্ত এসে প্রিয়বাক্য বলবেন এই চিন্তা করেন ও এই কথা বলেন যিনি, সুক্তিকা, চকিতা, সরসা বা সঙ্গীতপরা, এবং উদ্দেশা বা দূতী প্রেরণ করেন যিনি। রসমঞ্জরীতে চকিতার পরিবর্তে প্রগল্‌ভা ধরা হয়েছে।

৫৪। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা কাকে বলে?

বাসকসজ্জার শেষে, কলহান্তরিতা অবস্থায় এবং নায়ক নায়িকার পরাধীন অবস্থায়

জন্য মিলনের অভাবে উৎকণ্ঠা জন্মায়। দয়িতের বিলম্ব দেখে বিরহে পীড়িত কামিনীকে উৎকণ্ঠিতা বলে। উজ্জ্বল নীলমণির মতে নিরপরাধ প্রিয়তম বহুক্ষণ যাবৎ সংকেত-স্থলে না এলে যে নায়িকা উৎসুক হন তাকে উৎকণ্ঠিতা বলে। এরও আট বিভাগ : দুর্মতি, বিকলা, স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা, মুখরা এবং নির্বন্ধা।

৫৫। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল বর্ণিতব্য তত্ত্বটি কি? রাধা কি জীবাত্মার প্রতীক? রাধা তত্ত্বটি বুঝিয়ে দাও।

—রাধাকৃষ্ণলীলা এবং রাধার ভাব ও অঙ্গীকার করে অবতীর্ণ শ্রীগৌরাঙ্গলীলাই পদাবলীর বর্ণিতব্য বিষয়। পদাবলীর মধ্যে জীবাত্মা-পরমাত্মার বিরহ-মিলনের তত্ত্ব খুঁজতে যাওয়া উচিত নয়। শ্রীরাধা জীবাত্মার প্রতীক নন। তিনি পরব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি। আর জীব ব্রহ্মের তটস্থা শক্তি। নারদ পঞ্চরাত্রে বলা হয়েছে যে যিনি স্বীয় সংবেদ্য পরমেশ্বর থেকে বিনির্গত; অতএব স্বভাবতঃ সর্বগুণাতীত হয়েও গুণরাগের দ্বারা রঞ্জিত, সেই তটস্থ চিৎ-রূপকেই জীব বলা হয়। শ্রীজীব গোস্বামী ব্রহ্মের শক্তিকে প্রধানতঃ দু ভাগে বিভক্ত করেছেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নাম চিৎশক্তি, বহিরঙ্গা শক্তির নাম মায়াশক্তি। এবং দুয়ের মধ্যে অবস্থিত তটস্থ শক্তিকে বলা হয় জীবশক্তি। জীবশক্তি যখন মায়ার কবলে পড়ে, তখন সংসার প্রপঞ্চাদির দুঃখ ভোগ করে। আর যখন জীবশক্তি অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির অধিকারে আসে তখন তা লীলার দর্শনকারিণী ও পুষ্টিকারিণী হয়ে থাকে।

৫৬। শ্রীভগবানের চিৎ শক্তি কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি?

—শ্রীজীব গোস্বামী চিৎশক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিৎ, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সেইজন্য হ্লাদিনীসাররূপা শ্রীরাধাই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যা শক্তি।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ স্থাপন করেছেন। কার্য ও কারণ যেরূপ ভিন্ন হলেও এক, শক্তি ও শক্তিমানও সেইরূপ ভিন্ন হয়েও একই অদ্বয় তত্ত্বরূপে বিরাজ করছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে অতিসংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

—×—

মেঘনাদবধ-কাব্য

"মধুসূদনের প্রতিভা ও কাব্য সাধনার সম্পর্কে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। তাহা এই যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার অনুরূপ কবিকীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকস্মিক, তেমনই অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার লক্ষ্য স্থিরবদ্ধ ছিল না, দুঃসাহসের উত্তেজনায় তাঁহার প্রতিভার ক্ষণিক বিস্ফোরণমাত্র হইয়াছিল। সেই আতস বাঁজির অধীর অগ্ন্যুৎসবে কয়েকটি রঙিন আলোকচ্ছটা আভাসমাত্রেই মিলাইয়াছে। কেবল যে-দুই-একটি স্ফুলিঙ্গ অতি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি সেইটিই অনির্বাণ হইয়া কাব্যের নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছে। এই বৃহত্তম-উজ্জ্বলতম স্ফুলিঙ্গ মেঘনাদবধ—বাংলা কাব্যসাহিত্যে ইহার তুলনা নাই।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)

কবি প্রসঙ্গ :

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "এই প্রাচীন দেশে দুই সহস্র বৎসর-মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। ......জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। ......সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ—'শ্রীমধুসূদন'।" যুগপ্রবর্তক তথা যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তই সর্বপ্রথমে প্রাচী ও প্রতীচীর বাণী সাধনাকে একসূত্রে গ্রথিত করলেন, যা আকৃতি ও প্রকৃতিতে আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, অন্যদিকে তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী। এদের মধ্যে পার্থক্য আকাশ-পাতাল। ছন্দে, ভাষায়, ভাবকল্পনায়, বাগবিন্যাসে, কায়া গঠন রীতিতে, অন্তর্নিহিত রসের আবেদনে মধুসূদনের নির্মিত কাব্য সত্যই অভিনব। মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকবিতা, নাটক প্রহসন—সাহিত্যে বহুতর শাখায় মধুসূদন তাঁর অসামান্য সৃষ্টিক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে এক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারে মধুসূদন দত্তের জন্ম। তাঁর রচিত সমাধিলিপি--

দাঁড়াও, পথিক-বর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত-মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।

মধুসূদনের পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। চিত্তবিলাসিতা আর অকুণ্ঠ বদান্যতার আবহাওয়ার মধ্যেই বালক মধুসূদন প্রতিপালিত। কবির ভবিষ্যৎ জীবনে যে বিলাসপ্রিয়তা, যে আভিজাত্যবোধ পরিদৃষ্ট হয় তা মধুসূদনের জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত। এই দত্ত পরিবারের ধন গৌরব ও চিত্তবিলাসিতার মধ্যে কোনরকম সংযম-শাসন ছিল না—ছিল একটা অন্ধ তামসিকতার ভাব। যশোলাভ স্পৃহার রাজসিক মনোবৃত্তির সঙ্গে এই তামসিকতাটুকুও মধুসূদনের রক্তের অণু-পরমাণুতে সঞ্চারিত হয়েছিল।

মধুসূদন ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারে কখনও ত্রুটি দেখান নি। তিনি ছেলের ন বছর বয়সের সময় সেকালের বিখ্যাত হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দেন। হিন্দু কলেজে পড়াশোনার সময় মধুসূদন স্বনাম-

ধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও গৌরদাস বসাককে সহপাঠী হিসাবে পান। হিন্দু কলেজে মধুসূদন নিজের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অধিকার জন্মেছিল। ছাত্র জীবনেই তিনি ইংরেজীতে কবিতা রচনা করে সহপাঠী বন্ধুদের বিস্মিত করেছিলেন। কবিতা রচনায় তাঁর সবচেয়ে বড়ো উৎসাহদাতা ছিলেন হিন্দু কলেজের কবি-অধ্যাপক ডি. এল. রিচার্ডসন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময়ই তাঁর মনে অক্ষয় কবি-কীর্তি অর্জন ও বিলাত যাবার বাসনা জাগে। এই বাসনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকেই 'মাইকেল' নামে পরিচিত হলেন। এই ঘটনার পর হিন্দু কলেজে আর তাঁর স্থান হ'ল না। বাধ্য হয়ে তিনি শিবপুর বিশপ্‌স কলেজে ভর্তি হলেন। এই কলেজে অধ্যয়ন কালে মধুসূদন গ্রীক, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বিশপ্‌স কলেজে তিনি বেশীদিন পড়াশোনা করতে পারলেন না। পিতা রাজনারায়ণ পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃত হ'লে মধুসূদন নিজের ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মাদ্রাজে এসে সেখানকার মেল অর্ফ্যান অ্যাসাইলামে ইংরেজী শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিস্ নামে এক সুন্দরী নীলকর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর **"Captive Ladie"** এবং **"Visions of the Past"** নামক কাব্যগ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করেন।

এই সময়ে মধুসূদনের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন তাঁর **Captive Ladie** বইখানির একটি কপি **Council of Education**-এর সভাপতি স্বনামধন্য বেথুন সাহেবকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। বেথুন সাহেব গৌরদাসকে জানান যে মধুসূদন যেন বাংলা ভাষায় কাব্য কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। গৌরদাসও তাঁকে এ অনুরোধ করেছিলেন অনেক আগে। একজন চিন্তাশীল ইংরেজের নিকট থেকে এ ধরনের উপদেশ বাণীতে মধুসূদনের আত্মচেতনা ফিরে এল। তিনি বুঝতে পারলেন ইংরেজীতে কাব্য রচনা করে কবিখ্যাতি লাভ করা তত্টা সহজ নয়। তাই তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনের মাধ্যমেই কবিখ্যাতি লাভে প্রয়াসী হলেন।

মাদ্রাজে অবস্থান কালে মধুসূদনের পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর আত্মীয়স্বজন রাজনারায়ণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে অগ্রসর হয়। এ খবর জানতে পেরে গৌরদাস মধুসূদনকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার কিছুদিন আগে পত্নী রেবেকার সঙ্গে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া আঁরিয়েতা সোফিয়াকে বিবাহ করেন। এই মহিলাই কবির জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সকল দুঃখ-সুখের অংশীদারী হয়েছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন কলকাতায় ফিরে আসেন এবং কোর্টের 'জুডিশিয়াল ক্লার্ক'-এর পদে নিযুক্ত হন এবং পরে পুলিশ কোর্টের দোভাষীর পদে উন্নীত হন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। তার আগে নাটকের অভিনয় হত অভিজাতবংশীয় ধনীর বাসগৃহে বা তাঁদের বাগান বাড়িতে। সে যুগে বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। ঐ নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটক অভিনয়ের সময় ইংরাজদের নাটক বুঝবার সুবিধার জন্য নাটকটির ইংরেজী অনুবাদের ভার পড়ল মধুসূদনের ওপর। মধুসূদনের অনুবাদ যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করে। নাটকখানির অকিঞ্চিতকর নাট্যমূল্য দেখে মধুসূদন গৌরদাসকে জানালেন তিনিই নাটক রচনা করবেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা' কবির বাংলায় প্রথম শিল্পকর্ম। 'শর্মিষ্ঠা'র প্রকাশ বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করল।

এরপর ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়োশালিখের ঘাড়ে রোঁ" নামে দুখানি প্রহসন রচনা করেন। আশ্চর্যের কথা 'শর্মিষ্ঠা'র মত রোমান্টিক জাতের নাটক লেখার পর, বিদ্রূপাত্মক তাবল্য ধর্ম সংযুক্ত প্রহসন লিখলেন কী অপূর্ব প্রতিভা-বলে। ঐ বৎসর লিখলেন 'পদ্মাবতী' নাটক। এই নাটকখানিতে মধুসূদন সর্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ করলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে মধুসূদনের রচিত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম প্রকাশ লাভ করে। 'কৃষ্ণকুমারী' বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্রাজেডি।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কবির বিখ্যাত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি নিঃসংশয়ে যুগান্তকারী সৃষ্টি। ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, শিল্পরীতিতে গ্রন্থখানির নবীনতা অবিসংবাদিত। কাব্যখানি আদ্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

মধুসূদনের সর্বোত্তম কবিকীর্তি 'মেঘনাদবধ'—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। গ্রন্থ-খানি মধুসূদনকে প্রথম শ্রেণীর কবির দুর্লভ অমরতা দান করেছে। মেঘনাদ বধ বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। বিষয়বস্তুর তেমন কিছু অসামান্যতা এতে নেই; আছে শিল্পনির্মিতির আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়, যাতে ক্ষুদ্র একটি ঘটনা মহাকাব্যের সমুন্নতি বা উদাত্ততা লাভ করেছে।

স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবির 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যখানি প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের সবচেয়ে লক্ষণীয় বস্তু এর লিরিক ভংগী, রোম্যান্টিক ভাব কল্পনা। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত মধুসূদনের পত্রিকা কাব্য "বীরাঙ্গনা" প্রকাশিত হয়। 'বীরাঙ্গনা'য় মধুসূদন ভারতীয় পুরাণে বর্ণিত এগারজন নায়িকার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করেছেন—এঁদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে।

যে-নিয়তির বশে মধুসূদন যৌবনে স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, যে-নিয়তির দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে মধুসূদন মাদ্রাজ ভূমিতে ভাগ্যান্বেষণে ছুটে গিয়েছিলেন,

সেই নিয়তির অদৃশ্য সংকেত মধু-কবিকে আহ্বান করছিল সুদূর য়ুরোপে। কবিযশঃ-প্রার্থী মধুসূদনের অন্তরের গোপন প্রদেশে বিলাত যাত্রার বাসনা বহুদিন থেকেই সুপ্ত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের সেই বহুকালের বাসনা চরিতার্থ হতে চলল। বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে বন্ধু রাজনারায়ণকে একটি চিঠি লিখলেন—**I suppose my poetical career is drawing to a close. I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse. No more Madhu the 'কবি' old fellow; but Michael M. S. Dutta, Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law ! Ha !! Ha !! Isn't that grand ?** ইউরোপযাত্রা মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার অপমৃত্যু ডাকিয়া আনিল।

ইউরোপে থাকাকালীন সময়ে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে মধুসূদনের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মহাত্মা বিদ্যাসাগর সেই কবিকে যদি অকুণ্ঠচিত্তে অর্থ সাহায্য না করতেন তাহলে কবির অনশনে মৃত্যু অনিবার্য ছিল। ফরাসীদেশে অবস্থানকালে তিনি প্রায় শতাধিক সনেট রচনা করেছিলেন। কবি এই সনেটের নাম রাখলেন "চতুর্দশপদী"। চতুর্দশপদী কবিতা বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের দান। পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত এই কবিতা গুচ্ছের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে মধুসূদনের অন্তরতর বাঙ্গালী হৃদয়টি—তাঁর স্বদেশ-প্রীতি ও বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি।

ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মধুসূদন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু খুব বেশী সাফল্য লাভ না করায় তিনি প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। দু'বছর পরে তিনি মানভূমের পঞ্চকোট রাজ্যের আইন উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'হেক্টরবধ' প্রকাশিত হয়—হোমারের 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের উপাখ্যান অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

মধুসূদনের জীবনে মৃত্যুর কালোছায়া ধীরে ধীরে নেমে আসে। কবির জীবন নাট্যের শেষ অঙ্ক অতিশয় করুণ। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে পত্নী আঁদ্রেতা লোকান্তরিত হলেন। এই শোকের আঘাতে কবির হৃদয় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আলিপুরের চিকিৎসালয়ে তিনি তখন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন। মৃত্যুপথযাত্রী এই মহাকবিকে আর একজন মহাকবি রচিত নাটকের (**Macbeth**) একটি স্মরণীয় অংশ যখন আবৃত্তি করতে শুনি, তখন অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে :

"Out, out – brief candle
Life is but a walking shadow."

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মধুসূদনের প্রতিভার মূল্যায়ণ

মধুসূদনের সৃষ্টিপ্রতিভা যথাযথ উপলব্ধি করতে হলে উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে তাকে গ্রহণ করতে হবে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব আকস্মিক বা অতর্কিত মনে হলেও দেখা যাবে যে, সে যুগের আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁর কবিত্ব শক্তিকে উদ্দীপিত করবার প্রেরণা নিহিত ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে—এক যুগ সন্ধিক্ষণে—নব যুগের সূচনা কালে বাংলাদেশে কবি মধুসূদনের আবির্ভাব। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিখ্যাত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (১৮০০ খৃষ্টাব্দ) ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭ খৃঃ)। হিন্দু কলেজের মাধ্যমেই সে সময়ে দেশের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব পড়তে থাকে। ফলে বাংলার মানসলোকে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সূচিত হয়। বহু বছরের মুসলমান সংস্পর্শে এসেও বাংলা কিংবা ভারতের মানসিকতায় তেমন কোন লক্ষণীয় রূপান্তর ঘটে নি; কিন্তু অল্পদিনের ইংরেজ সংস্রবে আমাদের মনোজগতে যে পরিবর্তন ঘটে গেল তা যেমন অচিন্ত্যপূর্ব তেমনি বিস্ময়কর।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাপথে যে ভাব-বন্যা বাংলার চিত্তভূমিতে প্রবাহিত হল, সেদিনের উচ্চস্তরের বাঙালী সমাজ তারই স্রোতে অবগাহন করল। এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাস মনীষী রামমোহন রায়। বাঙালীর জাতীয় জীবনে রামমোহনই সর্বপ্রথম নবযুগের আগমনী সংগীত উচ্চারণ করলেন। ফলে, সমাজ-ধর্মে-সাহিত্যে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল—বাঙালীর ভাব জীবনে যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। এরকম একটা ভাঙন ও বিপ্লবের যুগে মধুসূদনের জন্ম।

সেই সময়ে ইংরেজিশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-কলেজ। এই হিন্দু কলেজেই মধুসূদনের শিক্ষারম্ভ। সে যুগে হিন্দু কলেজে, দুজন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন—ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির উদ্বোধন করাই ছিল এঁদের শিক্ষার মূল মন্ত্র। এই দুজন অধ্যাপকের শিক্ষাদর্শের প্রভাবে সর্বজনবিদিত 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের সৃষ্টি হল। মধুসূদনও ছিলেন ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর ব্যক্তিত্বে ও চরিত্রে সে যুগের ভালমন্দ লক্ষণগুলি সংক্রামিত হল। কবির বিধর্মী মনোভাব, নাস্তিক্যবুদ্ধি, পরবর্তী জীবনের কাব্যসৃষ্টিতে যুগের প্রভাব সুপ্রকট।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে রামমোহনের নাম স্মরণীয়। তাঁর রচনায় আধুনিকতার বলিষ্ঠ আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। সাহিত্যক্ষেত্রে রামমোহনের

প্রারব্ধ কর্মটিকে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অতন্দ্র সাধনা। দেশীয় প্রকৃতির বাংলা ভাষার মধ্যে আর্য-কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা এঁদের অক্ষয় কীর্তি। মধুসূদনের আগে গদ্য সাহিত্য ধীরে ধীরে প্রবন্ধ-উপন্যাস ইত্যাদি রচনার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। এই সময় প্যারীচাঁদ মিত্রের আবির্ভাবও একটি উল্লেখনীয় ঘটনা। কিন্তু বাংলা কাব্য সাহিত্যে তখন পর্যন্ত নবতন বাণীপন্থার কোন আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠেনি। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তে যে রসপিপাসা জাগ্রত হয়েছিল তা নিবৃত্ত করতে পারে এমন কোন নতুন প্রতিভার জাগরণ তখনো হয়নি।

মধুসূদনের কিছু পূর্ববর্তী সময়ের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি হচ্ছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। মঙ্গলকাব্যের যে রূপমূর্তি তিনি নির্মাণ করলেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম। ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন—এই দুটি বড়ো প্রতিভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। ইংরেজ আমলের প্রথমযুগে কবি ঈশ্বর গুপ্ত অশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর ও ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে কয়েকজন কবিওয়ালা, পাঁচালীকার ও টপ্পাসংগীত রচয়িতা বাংলা সাহিত্যের অঙ্গন মুখর করে তুলেছিলেন। কিন্তু এঁদের রচনার মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস ও কাব্যশিল্পকলার অভাব লক্ষিত হয়। স্থূল আনন্দ ও ক্ষণস্থায়ী সাহিত্য-উত্তেজনা সৃষ্টি ছিল টপ্পাগান ও পাঁচালী ইত্যাদি জাতীয় কবিতার লক্ষ্য।

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন ভারতচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। গুরুর শব্দালঙ্কার প্রিয়তা তিনি অতিমাত্রায় অনুকরণ করেছেন। ভারতচন্দ্রের রসিকতা তাঁর কাব্যে কাঁটায় ঘেরা হাসির রসে রূপান্তরিত হয়েছে। গুপ্তকবির ব্যঙ্গবিদ্রূপ কিংবা তাঁর ভারতচন্দ্রসুলভ যমক-অনুপ্রাস-শব্দঝঙ্কার মার্জিতরুচির কাব্যরসিকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অপ্রতিহত প্রতিপত্তির যুগে, মধুসূদনের প্রায় সমসাময়িক কালে, আর একজন কবির অভ্যুদয় হয়েছিল, ইনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করে তিনি স্বরচিত কাব্যে পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত সৃষ্টি ক্ষমতার অভাবহেতু রঙ্গলাল প্রাচীন বাংলাকাব্যের সংস্কার সাধন করে সাহিত্যে আধুনিক আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল মধুসূদনের সারস্বত প্রতিভার।

মধুসূদন দত্তের অসামান্য প্রতিভার যাদুস্পর্শে অত্যল্প কালের মধ্যেই বাংলা কাব্যের রূপান্তর ঘটল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তকবির তিরোধান, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তিলোত্তমাসম্ভব" এর প্রকাশ। এই কাব্যখানি নানাদিকে প্রাচীন বাংলা কবিতার সীমা নির্দ্ধারণ করছে। ভারতচন্দ্র থেকে রঙ্গলাল পর্যন্ত বাংলা কাব্যে যে অখণ্ড ভাবধারা ও রূপনীতি লক্ষ্য করা যায়, তার সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম দেখা গেল

"তিলোত্তমাসম্ভব" কাব্যে। মধুসূদনের এই কাব্যটি সত্যই যুগান্তকারী রচনা। মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের আদি কবি। তাঁর আগে অন্য কোন বাঙালী কবি আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চাত্য কাব্য মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারেন নি। পরবর্তী কালের বাঙালী কবিদল তাঁরই প্রদর্শিত কোন না-কোন পথে মুখ্য বা গৌণ ভাবে পদক্ষেপ করেছেন। মধুসূদনের আবির্ভাবের পর থেকেই বাংলা কাব্যের একতারা যন্ত্রটি স্বপ্তস্বরায় পরিণত হল।

মধুসূদন রচিত "মেঘনাদবধ" কাব্য বাংলা কাব্য সাহিত্যে অসঙ্গ, একক, অদ্বিতীয়। এই কাব্যটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন সার্থক গ্রন্থ অপর কোন বাঙালী কবি রচনা করতে পারেন নি। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু বাল্মীকির 'রামায়ণ' থেকে নেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য সংস্কৃত কিংবা বাংলা রামায়ণ পড়ে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করেন নি। এ কাব্যে পৌরুষদৃপ্ত মনুষ্যত্বের যে আদর্শ রূপায়িত হয়েছে, সে আদর্শের জন্য কবি প্রধানতঃ হোমারের কাছেই ঋণী। হোমারের কাব্যভাবনা মধুসূদনকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ রচনা করতে বসে মধুসূদন ভারতবর্ষ ও ইউরোপের নানা কবির কাব্য-ভাণ্ডার থেকে বিচিত্র উপাদান আহরণ করেছেন। মধুসূদন একদিকে যেমন ভারতীয় সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতির মন্ত্রশিষ্য, অন্যদিকে তেমনি ইউরোপীয় সাহিত্যের হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিল্টন ও বায়রনের কাব্য মন্ত্রে দীক্ষিত।

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয়বস্তু সংক্ষেপ

আলোচ্যকাব্যের নয়টি সর্গের মধ্যে কবি সুকৌশলে রামায়ণের লঙ্কাযুদ্ধের তিনদিন ও দুরাত্রির ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

প্রথম সর্গ – প্রথম সর্গের নাম 'অভিষেক'। বীণাপাণির আহ্বান ও বন্দনাগানে কাব্যের শুরু, তারপর বস্তু নির্দেশ। রক্ষোরাজ রাবণ পাত্র মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে ঐশ্বর্য দীপ্ত সভায় সমাসীন। এমন সময়ে তিনি দূতমুখে প্রিয়পুত্র বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শুনে বিস্মিত ও শোকাহত হলেন। সুতীব্র মর্ম যন্ত্রণায় পীড়িত লঙ্কেশ্বর যে আক্ষেপোক্তি করলেন, তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে পিতৃহৃদয়ের অগাধ স্নেহ, সীমা-হীন দেশপ্রীতি, বীর পুত্রের বীরত্বজনিত বীর পিতার গর্ব। তারপর সন্তান শোক-কাতরা জননী চিত্রাঙ্গদা সভায় প্রবেশ করে বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য রাবণকে দায়ী করলেন। রাবণ তাঁর পত্নীকে প্রবোধবাণী শোনালেন, কিন্তু রাবণের সান্ত্বনাবাক্যে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়বেদনা এতটুকুও প্রশমিত হ'ল না। পিতার পাপবহ্নিতে পুত্র আত্মাহুতি দিল—এতে কোন্ সন্তানহারা জননীর অন্তর প্রবোধ মানতে পারে? তারপর রাক্ষসসেনার রণসজ্জা—সৈন্যদলের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। জলতলে বারুণী চমকিত হলেন। সখী মুরলার সঙ্গে বারুণীর কথোপকথন দৃশ্যটি খুবই সুন্দর।

এ সময় মেঘনাদ ছিলেন প্রমোদউদ্যানে। ধাত্রীমাতার ছদ্মবেশধারিণী লঙ্কার রাজলক্ষ্মীর মুখে ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ শুনে মেঘনাদ পিতার সামনে উপস্থিত হলেন। রাবণ নিজেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, মেঘনাদ বিনীত অনুনয়ে পিতাকে নিরস্ত করলে তিনি মেঘনাদকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন রথিকুল শ্রেষ্ঠ মেঘনাদের অভিষেকে প্রথম সর্গ সমাপ্ত হল।

দ্বিতীয় সর্গ—দ্বিতীয় সর্গের সব ঘটনা ঘটেছে স্বর্গলোকে—সুরলোক বাসী দেবদেব দল এর অভিনেতা-অভিনেত্রী। দেবরাজ ইন্দ্র রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মীর মুখে ইন্দ্রজিতের অভিষেক বার্তা শুনে বিচলিত হলেন এবং অবিলম্বে ইন্দ্রানীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কৈলাস অভিমুখে যাত্রা করলেন। দেবদলের প্রত্যক্ষ সহায়তায় লক্ষণ ইন্দ্রজিত বধের অমোঘ অস্ত্র লাভ করলেন। অজেয় মেঘনাদের শোচনীয় মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠলো—রামানুজ লক্ষণ এখন দেববলে বলী। এইখানে দ্বিতীয় সর্গের পরিসমাপ্তি। এই সর্গের নামকরণ হয়েছে "অস্ত্র লাভ।"

তৃতীয় সর্গ—প্রমোদউদ্যান থেকে যাত্রা কালে মেঘনাদ তাঁর পত্নী প্রমীলাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, শীঘ্রই তিনি প্রমীলার কাছেফিরে আসবেন। স্বামীর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব দেখে বিচ্ছেদ কাতরা প্রমীলা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সখী বাসন্তীকে তিনি লঙ্কা প্রবেশের বাসনা জ্ঞাপন করলেন—লঙ্কায় গিয়ে প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবেন। অথচ তাঁর এই অভিলাষ চরিতার্থ হবার পথে বিস্তর বাধা—রামচন্দ্রের সেনাদল লঙ্কা পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু প্রমীলা এতে ভয় পান না। তিনি দানব-নন্দিনী, রক্ষোকুলবধূ, ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদ তাঁর স্বামী-ভিখারী রাঘবকে তিনি ভয় করেন না। বড়বার পৃষ্ঠ দেশে আরোহণ করে প্রমীলা রণরঙ্গিনী ভৈরবী মূর্তিতে লঙ্কাভিমুখে অগ্রসর হয়ে চললেন। বিভীষণ রামচন্দ্রের কাছে তাঁর পরিচয় দান করলেন। শ্রীরাম প্রমীলাকে তাঁর পথ ছেড়ে দিলেন। অতুল বিক্রমে লঙ্কায় প্রবেশ করে প্রমীলা স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বীরপত্নী বীরস্বামীর সঙ্গে মিলিত হলে স্বর্ণলঙ্কা আনন্দ কলরবে মুখরিত হ'ল। কিন্তু এই বীর দম্পতীর মিলনে স্বর্গরাজ্যে উমা বিচলিত হয়ে উঠলেন। বিজয়ার সঙ্গে উমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মেঘনাদ ও প্রমীলার মৃত্যুর পরিকল্পনা রচিত হয়ে রইলো। এই সর্গের নামকরণ "সমাগম"।

চতুর্থ সর্গ—অশোকবনে বন্দিনী সীতার সঙ্গে বিভীষণ-পত্নী সরমার মনোজ্ঞ কথোপকথন চতুর্থ সর্গে বাণীবদ্ধ হয়েছে। মেঘনাদ সৈনাপত্যে বৃত হয়েছেন, সমগ্র লঙ্কাভূমি আজ উৎসব আনন্দে মেতে উঠেছে। দুরন্ত চেড়িবৃন্দ সীতাকে ছেড়ে উৎসবে যোগদান করতে গেছে। এই অবসরে সরমা এসে সীতার পদতলে বসলেন এবং সীতার মুখ থেকে রাবণের দ্বারা সীতা হরণ বৃত্তান্ত শুনতে চাইলেন। রক্ষোরাজ রাবণ পঞ্চবটী বন থেকে কী ভাবে সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে এলেন, সরমার কাছে সীতা সেই ঘটনা আদ্যন্ত বিবৃত করলেন। চতুর্থ সর্গে বর্ণিত 'সীতা সরমা সংবাদ'

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল ঘটনার অন্তর্ভুক্ত নয়, একে এই কাব্যের শাখাকাহিনী বলা যেতে পারে। এই শাখাকাহিনীর মাধ্যমে কবি সুকৌশলে অনেকগুলি অতীত ঘটনা ও ভাবী ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছেন। এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে "অশোকবন।"

পঞ্চম সর্গ—এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে "উদ্যোগ।" দুস্তর বাধা ও প্রলোভন আর নানা বিভীষিকা উত্তীর্ণ হয়ে লক্ষ্মণ লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়াকে পূজায় পরিতুষ্ট করে আপনার অভিষ্ট বর লাভ করলেন। দেবতার কোন ছলনা, কোনো মায়াশক্তি জিতেন্দ্রিয় লক্ষণকে তাঁর কঠোর ব্রতসংকল্প থেকে বিচলিত করতে পারল না। ধীরে প্রভাত-সমাগম হল—প্রমীলা ও মেঘনাদ নিদ্রা থেকে জাগরিত হলেন। মেঘনাদকে আজ রাঘব সেনার সম্মুখীন হ'তে হবে। রণক্ষেত্রে প্রবেশ করবার আগে মেঘনাদ পত্নী প্রমীলা সহ জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হলেন। পতিপ্রাণা প্রমীলা স্বামীর কল্যাণ কামনা করে দেবী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা জানালেন। চণ্ডীর কৃপালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক দেবীর আরাধনা ও বরপ্রাপ্তি ঘটনাই পঞ্চম সর্গে বর্ণিত হয়েছে।

ষষ্ঠ সর্গ বিভীষণ ও মায়াদেবীর সহায়তায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদের হত্যাসাধন ষষ্ঠ সর্গের মূল ঘটনা। তাই এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'বধ'। মেঘনাদ যখন আপন ইষ্টদেবতার আরাধনায় রত, তখন বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণ চোরের মতো এই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করলেন। ইন্দ্রজিত সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—দেবঅস্ত্রধারী লক্ষ্মণ সেই নিরস্ত্র অবস্থায় একরূপ বিনা যুদ্ধেই মেঘনাদকে নিহত করলেন। মায়াদেবী ও বিভীষণের সাহায্য না পেলে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করা সৌমিত্রির পক্ষে কখনই সম্ভব হ'ত না। ধার্মিকতা, নির্ভীকতা, দেশাত্মবোধ, স্বজাতি-প্রীতি প্রভৃতি উচ্চতর মানবীয় ধর্মের দীপ্তি ষষ্ঠ সর্গে চিত্রিত মেঘনাদের চরিত্রে অত্যুজ্জ্বল ভাবে ফুটে উঠেছে। রাক্ষসভরসা ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করে লক্ষ্মণ অগ্রজ রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন।

সপ্তম সর্গ—লঙ্কার পঙ্কজরবি মেঘনাদ চিরকালের জন্য অস্তমিত হয়েছেন। রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে ইন্দ্রজিতের নিধন বার্তা সমগ্র লঙ্কাপুরীতে ছড়িয়ে পড়ল। কৈলাস নিবাসী মহাদেব বীরকুলচূড়ামণি মেঘনাদের মৃত্যুতে বিষণ্ণ। রাবণ ছিলেন শিবভক্ত। তাই পুত্রশোকাতুরা রাবণকে রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত করবার জন্য মহাদেব তাঁর অনুচর বীরভদ্রকে লঙ্কায় প্রেরণ করলেন। উপেক্ষনীয় শত্রুর হাতে ইন্দ্রজিৎ নিহত হলে রাবণ বুঝলেন, তাঁর ভাগ্য প্রতিকূল। এর পর শোকে কাতর মন্দোদরীকে সান্ত্বনা প্রদান করে মেঘনাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। রাবণ শক্তিশেলে লক্ষ্মণকে আহত করলেন—সংজ্ঞাহারা হয়ে সৌমিত্রি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ বর্ণনার চমৎকারিত্বে, বীররসের উচ্ছলনে

মেঘনাদবধের সপ্তমসর্গ অতিশয় চিত্তহারী। এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে "শক্তিনির্ভেদ"।

অষ্টম সর্গ—সেই দিনের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সূর্য অস্ত গেল, রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে অগ্নিপ্রজ্বলিত হ'ল। শক্তি শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের পাশে শোকাকুল রামচন্দ্র রোরুদ্যমান অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর করুণ বিলাপ পাষাণ হৃদয়কে বিগলিত করে। ভক্তবৎসলা পার্বতীর হৃদয় রামচন্দ্রের মনোবেদনায় ব্যথিত। শিবানীর অনুরোধে মায়াদেবী লঙ্কাপুরীতে এলে রামচন্দ্র তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রেতপুরীতে গেলেন এবং দশরথের কাছে লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভের উপায় জেনে এলেন। এই সর্গের নামকরণ করা হয়েছে "প্রেতপুরী"।

নবম সর্গ—এই সর্গে বর্ণিত হয়েছে রাক্ষসরাজ রাবণের অদৃষ্টচক্রের পরিবর্তনের কথা, নিয়তি নিহত মেঘনাদের প্রেতকৃত্য, মৃত স্বামীর শ্মশান বহ্নিতে সতীসাধ্বী প্রমীলার আত্মাহুতি। লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করলেন। ধরিত্রী প্রভাতসূর্য কিরণে স্নাত হল। রামচন্দ্রের শিবিরও আনন্দকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো। দুরদৃষ্ট লঙ্কেশ্বরের নয়ন সম্মুখে আশার সকল প্রদীপ একে একে নির্বাপিত হচ্ছে। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করলেন, দৈবশক্তি অপ্রতিরোধনীয়—নিজের পরাভব অনিবার্য। পুত্রের প্রেতকৃত্যসম্পাদনের জন্য রামচন্দ্রের কাছে তিনি সপ্তাহকালের জন্য যুদ্ধ বিরতির প্রার্থনা করলেন। তারপর কবি আমাদের দেখালেন, শ্মশান শয্যায় নিষ্প্রাণ স্বামীর পাশে উপবিষ্টা সদ্য বিধবা প্রমীলার বিষাদময় মূর্তি। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর, সন্তান শোককাতর রাবণের বিলাপ যেন অশ্রুর নির্ঝর। সিন্ধুতীরে চিতা জ্বলে উঠলো, দেখতে দেখতে মেঘনাদ ও প্রমীলার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হ'ল। তারপর চিতা ভস্ম সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করে রক্ষোদল শূন্য লঙ্কাপুরীতে ফিরে এল। ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলাকে হারিয়ে "সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

মেঘনাদবধ কাব্যের কায়াগঠন পরিকল্পনা ও শিল্পাত্মা।

মেঘনাদবধ কাব্য মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি—

মধুসূদনের কবি প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান 'মেঘনাদ বধ'। এই কাব্যগ্রন্থে মধুসূদন আপনার কবি স্বপ্ন ও কবি কল্পনাকে নিত্যকালের ভাষায় গ্রথিত করেছেন। কবির প্রাণগত উৎকণ্ঠা, তাঁর সুগভীর জীবনবোধ ও অগাধ মর্ত্যমমতা মেঘনাদের প্রতিটি ছত্রে স্পন্দিত হচ্ছে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, কেবল এই কাব্যটিতেই কবির অবাধ আত্মস্ফূর্তি ঘটেছে এবং এর মধ্যেই তাঁর কাব্যরচনা প্রতিভা নিঃশেষে সমর্পিত হয়েছে। "মধুসূদনের প্রতিভা ও কাব্য সাধনার সম্পর্কে একটা কথা সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে। তাহা এই যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার অনুরূপ কবিকীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিভার প্রকাশ যেমন আকস্মিক,

তেমনিই অসম্পূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার লক্ষ্য স্থিরবদ্ধ ছিল না, দুঃসাহসের উত্তেজনায় তাঁহার প্রতিভার ক্ষণিক বিস্ফোরণ মাত্র হইয়াছিল। সেই আতসবাজির অধীর অগ্ন্যুৎসবে কয়েকটি রঙিন আলোকচ্ছটা আভাসমাত্রেই মিলাইয়াছে। কেবল যে দুই-একটি স্ফুলিঙ্গ অতি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যেটি সেইটিই অনির্বাণ হইয়া কাব্যের নক্ষত্রলোকে স্থান পাইয়াছে।" এই বৃহত্তম ও উজ্জ্বলতম স্ফুলিঙ্গ 'মেঘনাদবধ'—বাংলা কাব্য সাহিত্যে এর তুলনা নেই।

মেঘনাদবধ কাব্য যুগ-প্রবৃত্তি ও বাঙালী জীবনের সংস্কারের প্রভাব—

মধুসূদনের কবি প্রতিভা যখন পূর্ণবিকাশের মুখে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, আলোচ্যমানকাব্য খানি সেই সময়কার রচনা। এতে কবি নিপুণ স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন—দূরাভিসারী ভাব কল্পনায়, চিত্ত চমৎকার বর্ণন সৌন্দর্য, অশ্রুতপূর্ব ছন্দোসংগীতে এই কাব্য অতিশয় সমৃদ্ধ। মধুসূদন পাশ্চাত্যকাব্য একরূপ মন্থন করেছিলেন, প্রতীচীর কাব্য সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ফলে ইউরোপীয় মানবিকতাধর্মের আবেদন তাঁর চিত্তে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। তাই কবি স্বরচিত কাব্যে পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন। আবার, ঊনবিংশ শতকের সেই ভাব বিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেও মধুসূদন বাঙালী জীবনের রক্ত—সংস্কারকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। সেজন্য একদিকে যুগপ্রবৃত্তি ও অন্যদিকে বাঙালীর হৃদয়বৃত্তির মোহময় আকুতি—এ দুয়ের দ্বন্দ্ব মেঘনাদবধ কাব্যে সুস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ করেছে। এই যুগ প্রভাব ও বাঙালীর রক্তের সংস্কারকে চিনে নিতে না পারলে পাঠক সাধারণ মেঘনাদ বধের ভাব কল্পনা ও এর রসনিষ্পত্তির প্রাণকেন্দ্রটি আবিষ্কার করতে পারবে না। ঐ দুটি বিরুদ্ধ-সংস্কারের ধাতুতেই রাবণ-চরিত্র গঠিত এবং রাক্ষসরাজ রাবণই মেঘনাদবধ কাব্যের সত্যকার নায়ক।

মেঘনাদবধের কথাবস্তু পুরনো, কিন্তু এর বাণীমূর্তি নতুন—

মেঘনাদবধের মূল গল্পটি রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই কাব্যের কাহিনী অংশের জন্য মধুসূদন মুখ্যত বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কাছে ঋণী। লঙ্কাধিপতি রাবণের পুত্র বীরকিশোরী মেঘনাদের মৃত্যুঘটনাই এ কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। মেঘনাদের মৃত্যুকাহিনীকে বাণীরূপ দান করতে গিয়ে কবি কিন্তু রামায়ণী কথাকে সর্বাংশে অনুসরণ করেননি। এই কাব্যের আখ্যানবস্তু প্রাচীন, কিন্তু এর বাণীবিগ্রহ সম্পূর্ণ নতুন। মেঘনাদবধের কায়াগঠনে, বিষয়বস্তুসজ্জায়, বর্ণনাভংগীতে দেশবিদেশের নানা কবির ভাবকল্পনার ছায়াসম্পাত হয়েছে। অথচ কবির মৌলিকতা কোথাও ক্ষুণ্ন হয় নি। মধুসূদনের কৃতিত্ব, মাধুকরীর আশ্রয় নিয়েও তিনি অপূর্ব এক মধুচক্র নির্মাণে সমর্থ হয়েছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কবির বিচিত্র কাব্য ভাবনার ছায়াসম্পাত ঘটলেও, এবং এর মূল কথাবস্তু পুরনো হলেও এই কাব্যের কায়াগঠন পরিকল্পনা ও ভাব পরিমণ্ডলটি সত্যই অভিনব।

মধুসূদনের কবি ভাবনায় হোমারের প্রভাব—

মেঘনাদবধ কাব্যের মূলঘটনাবিষয়ে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসই মধুসূদনের প্রধান ঋণদাতা। কিন্তু তাঁর কবি কল্পনাকে সর্বাধিক উদ্দীপ্ত করেছিল গ্রীক কবি হোমারের কাব্য ভাবনা। নিজের কবিস্বপ্নকে রূপায়িত করতে বসে মধুসূদন "ভার্জিল, দান্তে, টাসো, মিল্টন হইতে বায়রন মুর পর্যন্ত, এবং বাল্মীকি-কালিদাস হইতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত সকলেরই দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজস্ব কবিকল্পনা হোমারকে যে ভাবে অনুসরণ করিয়াছিল এমন আর কাহাকেও নহে। য়ুনানী কবির সেই আদিকাব্য প্রেরণার মধ্যেই তিনি আপন প্রাণের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন—তাঁহার [হোমারের] সেই সুস্থ সবল মানবতা এবং নির্দ্বন্দ্ব ও নিশ্চিন্ত জীবনধর্মের অনুধ্যানে তিনি নিজের অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। গ্রীক কবির সহজ সৌন্দর্য প্রীতি সরল তত্ত্ব চিন্তাহীন মানবতার আদর্শ মধুসূদনের কবিচিত্ত জয় করিয়াছিল। তাই পাপপুণ্যে সমান উদাসীন, প্রেমে ও প্রতিহিংসায়, সুখে ও শোকে সমান অধীর, অতীত-ভবিষ্যতের ভাবনাহীন এবং দেবতার প্রতিও সরল বিশ্বাসী যে রাবণ, সেই তাঁর কাব্যের নায়ক।" রক্ষোরাজের সম্পর্কে কবি নিজেই বলেছেন—"The idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow." মিল্টনের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তবু তিনি আন্তর প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন হোমারকে।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রেরণার উৎস—

রামায়ণের কবি বাল্মীকির অন্তরতর প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল রামচন্দ্রের দিকে—শূদ্রধর্মাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি তাঁর চিত্তের ঘৃণাই প্রদর্শিত হয়েছে। অবশ্য এই ঘৃণা বা বিদ্বেষ কোন রাজনীতিক কারণ অথবা জাতিগত-আদর্শ প্রসূত নয়, স্বাজাত্য বোধ বা প্রাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন নি। রামচন্দ্রের প্রশস্তি কীর্তনের নামে আদি কবি চিরকালীন মনুষ্যত্ব ধর্মের সর্বজয়ী মহাশক্তির উদাত্ত সংগীতই উচ্চারণ করেছেন। ঋষি কবির অনার্য ঘৃণা মানুষের শূদ্রধর্মিতা বা রাক্ষস কর্মের প্রতি বিরূপতার মনোভাব ছাড়া অন্য কিছু নয়। "মানুষ কি করিয়া দেবতার মাহাত্ম্যে মহীয়ান হয়, বিশ্বতন্ত্রে অধর্মের ত্রিলোকবিজয়ী শক্তিদর্প কি করিয়া আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র দুর্বল তৃণের দ্বারাও বিচূর্ণিত হইতে পারে, মহাকবি বাল্মীকি সেই মহারসে আবিষ্ট হইয়াই রামায়ণ গান ধরিয়াছিলেন। তাই রামচন্দ্রের ধর্ম পত্নীর উদ্ধার রূপ সত্য দাবীর বলে—সুতরাং ধর্মবলে—বলীয়ান নর বানরের হস্তে ত্রিভুবন জয়ী রাক্ষস রাজের অভ্রভেদী মাহাত্ম্যও ধূলিসাৎ হইয়াছে।" স্বাদেশিকতা কিংবা স্বাজাত্যবোধ থেকে রামায়ণের কবি কোন প্রেরণা লাভ করেন নি। কিন্তু হোমারের কাব্যে জাতি বাৎসল্য ও স্বাদেশিকতার ভাব

পরিলক্ষিত হয়—হয়তো স্বদেশপ্রীতির প্রেরণা বশেই হোমারের সহানুভূতি ও প্রীতিপক্ষপাত বিজয়ী গ্রীকপক্ষেই ছিল।

রাক্ষসবংশের প্রতি কবির আন্তর প্রীতি প্রদর্শনের কারণ—

যে রাক্ষসবংশের প্রতি আদি কবির আন্তর বিদ্বেষ বর্ষিত হয়েছে, মেঘনাদবধের কবি সেই রাক্ষস জাতির প্রতি সহানুভূতি, অনুকম্পা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করলেন। বাল্মীকি ও হোমার দুজনেই বিজয়ীপক্ষের কবি—মধুসূদন বিজিত পক্ষের। পরাজিত রাক্ষসবংশের প্রতি, রক্ষোরাজ রাবণের প্রতি, রাবণ পুত্র মেঘনাদ ও মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার প্রতি কেন মধুসূদনের এই প্রীতিপক্ষপাত ও অন্তরঙ্গ সহানুভূতি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, গ্রীক কবির কৃতিত্ব যে সুস্থ সবল মানবিকতার আদর্শ মধুসূদনের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল, আদিম মানুষের যে পৌরুষবীর্য তাঁর কল্পনাকে প্রাণিত করেছিল, তিনি তার প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন রামায়ণের রাক্ষস জাতির মধ্যে। তার ঐশ্বর্য-বিলাসী, প্রচণ্ডতাধর্মী…"কল্পনাচক্ষে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্র সমধিক উপযোগী বলিয়া মনে হইল, রাবণের ঐশ্বর্য ও দুষ্প্রধর্ষ আত্ম-নির্ভরতা ও মেঘনাদের শৌর্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল।" ঋষি কবির লক্ষ্য ছিল মহাপুরুষের মাহাত্ম্যকীর্তন, মধুসূদনের অভিলাষ মানুষের পৌরুষ ধর্মের জয়গাথা বিরচন। নিয়তি নির্যাতীত মানবজীবন ও মানব ভাগ্যই তাঁর কবি প্রাণকে উৎকণ্ঠিত করেছিল। তাই দুঃখ-বেদনার বজ্রনিপাতে বিদীর্ণ রাবণরূপী একটি মহাবৃক্ষের চিত্রকে ছন্দোসংগীতে ফুটিয়ে তুলে সহৃদয় মানুষকে তিনি কাঁদাতে চেয়েছিলেন।

মধুসূদনের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি—

অন্তরের কোন্ প্রেরণাবশে রাক্ষসবংশের প্রতি কবি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছিলেন, বন্ধুর কাছে লেখা একখানা চিঠি থেকে আমরা তার সন্ধান পাই। ঐ পত্রে মধুসূদন লিখেছেন, **By the by, if the father of Our Poetry had given Rama human companions, I could have made a regular Iliad of the death of Meghnad.** অর্থাৎ কবিগুরু যদি তাঁর রামচন্দ্রকে কেবল কতকগুলো মনুষ্য অনুচর দিতেন, তাহলে মধুসূদন মেঘনাদবধ-ঘটনাটিকে আর্যজয়ের 'ইলিয়ড' রূপে পরিণত করতে পারতেন। কবি অন্য জায়গায় লিখেছেন, **The subject is really heroic; only the monkeys spoil the joke, but I shall look to them.** জীবন রসিক "মধুসূদন কল্পনার উল্লাসের জন্য ঐশ্বর্য-বস্তুর অবলম্বনটি মেঘনাদবধ কাব্যের বিজয়ী পক্ষের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। ঐশ্বর্যরস-বিলাসী কবি রামচন্দ্রের বানরচমূর মধ্যে তাঁহার হৃদয়বাণী, ঐশ্বর্যমহিমময়ী, রাঘবের প্রতি তীব্র অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারিণী প্রমীলাকেই-বা কোথায় পাইবেন। আর, রত্নসৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর প্রতি প্রথমউচ্ছ্বাসী প্রীতিসহানুভূতির সূত্রটুকুই বা কি করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিবেন? ঐশ্বর্যের উচ্চ শিখর না দেখাইয়া দুর্দশার গভীর গহ্বরে অধঃপাত অথবা

নিয়তির বজ্রনিপাতের দৃশ্যেই বা কি করিয়া মানুষের চিত্ত দ্রবীভূত করিবেন? মহত্ত ও শৌর্যবীর্যের ছবি অঙ্কন পূর্বক প্রথমত মানুষের হৃদয়কে উহার প্রতি প্রীতি-অনুগত না করিয়া কেমন করিয়া তাহাকে পরের দুরদৃষ্টে করুণাবিষ্ট, সহানুভূতিতে বিগলিত করিবেন?—'এহেন সভায় বসি রক্ষঃকুলপতি বাক্যহীন পুত্র শোকে'—এই অবস্থা ও ঘটনার এবং কারুণ্য মূর্তিপ্রয়োগের রসাস্বাদটুকুই বা কী করিয়া উৎপন্ন হইত? পরিশেষে ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদ স্বামীর শ্মশানদৃশ্যে সেই মহিমময়ী প্রমীলাকে একেবারে সহমরণে লইয়া আসিয়া, ত্রিভুবন জয়ী 'রাবণ শ্বশুর' কে—'বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী' পরাইয়া—তাঁহাকে শোকে যোগী ও ভিখারী সাজাইয়া, কবি যে মহাদৃশ্য অঙ্কন করিয়াছেন তাহাই বা কী করিয়া দাঁড়াইত? তারপর, অন্তিমের সেই 'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে'—আমাদিগকে যে একটি অশেষ দীর্ঘনিশ্বাসে রাখিয়া গিয়াছে, আমাদের নিত্য-কালের দীর্ঘ নিশ্বাসবাসিনী সেই লঙ্কাপুরীই-বা কোথায় থাকিত?" মেঘনাদবধের রসনিষ্পত্তির কেন্দ্রমূলে মহাশোকের এই কারুণ্য মূর্তিটি রয়েছে বলেই রামায়ণী কথার বিরুদ্ধাচরণ করেও মধুসূদন পাঠকের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে মধুসূদনের উক্তি—

রাক্ষসরাজ রাবণ ও বাসববিজয়ী মেঘনাদের নিয়তিনিহত মূর্তি মধুসূদনের কবিসত্তাকে আলোড়িত করেছিল। এজন্য তিনি বন্ধু রাজনারায়ণের অনুরোধেও বীররসপ্রধান জাতীয় কাব্য (National Epic) না লিখে করুণ রসের মহাগীত (Sacred song) রচনা করতে এতখানি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। **So you (বন্ধু রাজনারায়ণ বসু) must wait a few years more [for a national epic]. In the mean time I am going to celebrate the death of my favourite Indrojit.** অপর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন, ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ও রাক্ষসরাজের মহানিপাত বর্ণনা করতে বসে তাঁকে অনেক চোখের জল ফেলতে হয়েছে। আবার অন্য জায়গায়—ইন্দ্রজিতের জন্য তাঁর বড়ই মন কাঁদে, ইন্দ্রজিৎ সত্যই একজন মহৎ চরিত্র বীরপুরুষ—**He would have kicked the monkey army into the Sea but for that Scoundrel Bibhisan,** অন্য আর এক জায়গায় কবি বলেছেন—**Ravana fires me with enthusiasm, I despise Rama and his rabble.**

কবির ঐ সব উক্তি মেঘনাদবধ কাব্যের শিল্প কৌশল ও ঐ কাব্যের প্রাণকেন্দ্রের দিকে রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি কি আকর্ষণ করছে না? বাস্তবিকই মধুসূদনের মেঘনাদবধের কাব্য সৌন্দর্য যথার্থ উপভোগ করতে হলে বাল্মীকির রামলক্ষ্মণকে যেমন ভুলতে হবে, তেমনি বাল্মীকির রাক্ষসকেও ভুলতে হবে। বাহ্যিক ঐশ্বর্য বিলাস ও মত্ততা ছাড়া হয় তো রাক্ষসত্বের অন্য কোন লক্ষণ মধুসূদনের চিত্রিত রাক্ষসকুলের মধ্যে প্রাবল্য লাভ করে নি। একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে,

মেঘনাদবধের মূলঘটনা রামায়ণ মহাকাব্য থেকে নেওয়া হলেও আর্য রামায়ণ মধুসূদনের "মহাগীত" রচনার প্রধান প্রেরণাস্থল নয়। এ প্রসঙ্গে কবির একটা চিঠিতে বিবৃত কয়েকটি লাইন—I mean to give free scope to my inventing powers (Such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki. Do not this startle you ? You shan't have to Complain again of the Un-Hindu Character of the poem. I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write as a Greek would have done. বাল্মীকির সাহচর্য যতদূর সম্ভব মধুসূদন পরিহার করেছেন। তিনি হোমারের 'প্যাগান' আদর্শ (Paganism) ও দেব যন্ত্র (Divine machinery) এবং গ্রীক ট্রাজেডিতে বর্ণিত অদৃষ্টবাদটিকে আশ্রয় করে মেঘনাদবধ কাব্যের কায়ানির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। দেবতার ইচ্ছার কাছে, নিয়তির ষড়যন্ত্রের সম্মুখে, মানুষের সমস্ত পৌরুষবীর্য যে নিষ্ফল—রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্র চিত্রণের মধ্যদিয়ে এই সত্যটিই মধুসূদন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন। হোমারের কবি কল্পনার প্রভাব; সফোক্লিস-ইউরিপিডিস-এসকাইলাসের জীবন দৃষ্টির ছায়াপাত মেঘনাদবধ কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয় এজন্যই মধুসূদন বলেছেন—My writings are three-fourths Greek.

মেঘনাদবধ কাব্যে গ্রীক দেববাদ, দেবযন্ত্র ও অদৃষ্ট-নিয়তি

পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত মধুসূদন কাব্য ক্ষেত্রে হোমারের প্যাগান দৃষ্টান্তে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং ঐ উৎসাহকে আমাদের চণ্ডীমঙ্গল ও মনসা মঙ্গলে চিত্রিত দেববাদের আদর্শে সমর্থিত করেই 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধ'-এর দেব যন্ত্রকে বাংলা কাব্য ক্ষেত্রে প্রবর্তিত করলেন। (মুখ্যত গ্রীক সাহিত্যের অদৃষ্টবাদের আশ্রয় নিয়ে মধুসূদন মেঘনাদবধের কায়াগঠন করেছেন। গ্রীক সাহিত্যের 'অদৃষ্ট' বা 'দেবতার ইচ্ছা' বা 'দৈব' অচিন্ত্যনীয়, দুর্বোধ্য, মানব-বুদ্ধির অগম্য। এই দেব রোষেই শক্তিধর রাবণের উদ্ধত শির 'ভিখারী রাঘব'-এর চরণ তলে অবলুণ্ঠিত হ'ল। দৈববলে বলীয়ান সামান্য মানুষের কাছে মহাবীর কুম্ভকর্ণ, বীরচূড়ামণি বীরবাহু, ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদের শক্তিদর্প চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রাবণরূপী মহাবৃক্ষকে ভূপাতিত করেছে মানুষের অপ্রতিরোধনীয় নিয়তিচক্র, এবং নিয়তিই মেঘনাদবধের 'দেবযন্ত্র'—ইহাই বিলাপী রাবণের সম্বোধিত 'বিধি' বা 'বিধাতা'। মেঘনাদবধ গ্রীকধর্মী করুণ-রসের কাব্য—এ জাতীয় কাব্যগ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে আর একটিও লিখিত হয় নি। একটা কথা—মেঘনাদবধকে আমরা গ্রীকধর্মী কাব্য বলেছি। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাবণের 'নিয়তি' গ্রীকসাহিত্যের বিশুদ্ধ 'অদৃষ্ট' নয়—এর মধ্যে ভারতীয় 'কর্মফলবাদ'-এরও কিছুটা মিশ্রণ ঘটেছে। সে যাই হোক বিধি কবলিত রাবণের করুণ মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে

মনীষী-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন বলেছেন—"মেঘনাদবধের নায়ক নিদারুণ অদৃষ্ট নিয়তি-নাগিনী-পাশবদ্ধ, অপরিহার্যভাবে মৃত্যুকবলোন্মুখ রাবণ। লঙ্কাপুরীর আশাযষ্টি ইন্দ্রজিতের দৈবনিয়োজিত বিনাশ রাবণ-অদৃষ্ট-নাটকের অন্তিমাঙ্কের চূড়ান্ত-পূর্ব দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার পর রাবণের জীবনের শেষদৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান বলিয়া শিল্পফলশ্রুতির আদর্শেই তাহা কাব্যক্ষেত্রে পরিহৃত হইয়াছে। মানব জীবনের অপরিহার্য নিয়তির ফলশ্রুতিই মেঘনাদবধ—কাব্যতরুর সকল গৌণ মুখ্য রসধারা, ঘটনা পল্লব ও শাখাপ্রশাখার মূলকাণ্ড—কাব্য তরুর করুণরসাত্মক স্থায়ীভাবের মেরুদণ্ড। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে', 'কালো বলী কেবল'—এই অদৃষ্টবাদ না ধরিলে কবি কখনো বাল্মীকি শিষ্য ভারতবর্ষের চিত্তে রাবণের প্রতি পাঠকের কারুণ্য—সহানুভূতিরূপ রসনিষ্পত্তি সিদ্ধ করিতে পারিতেন না। সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে কিনা জানি না যাহার কান্নাতেই আরম্ভ, কান্নাতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাপ্তি। সমগ্র কাব্যটি জুড়িয়া পাত্র-পাত্রীগণ অপরিহার্য দৈবদুঃখের মহাপাশে পড়িয়া কেবল ছট্‌ফট্‌ এবং হাহুতাশ করিতেছে। রাম-লক্ষ্মণের জন্য, সীতা অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিয়া, চিত্রাঙ্গদা-মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা স্বামিশোকে, রাবণ সর্বস্বনাশী অদৃষ্টের বজ্রপীড়ায় নিষ্পেষিত হইয়া ক্ষোভে, রোষে, ও নিরাশ্রয় দুঃখে বিধাতাকে অভিযোগপূর্বক মর্মচ্ছেদী হাহাকার তুলিয়াছে। অথচ এই কান্না কোনো দিকেই মানুষ্যহৃদয়ের কিছুমাত্র অবসাদকর হয় নাই।"

রাবণ চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি

উপরের কথাগুলি থেকে সহজেই বোঝা যাবে মেঘনাদবধ কাব্যের মুখ্যরস কোন্‌টি। মহিমান্বিত প্রতাপশালী রাবণের দুরদৃষ্টজনিত হৃদয়-যন্ত্রণা ও মর্মঘাতী শোকবিলাপ সহৃদয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় মহাবীর হার্কিউলিসের সুতীব্র আর্তনাদ, মহাপুরুষ ফাইলেকটেটের অসহ্য হাহাকার, আর মহামহিম প্রমিথিউসের বুক ফাটা ক্রন্দন। লক্ষ্য করতে হবে, দুঃখদীর্ণ রাবণ ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু তাতে রক্ষোরাজের আত্মার এতটুকু দৌর্বল্য প্রকাশ পায়নি। অদৃষ্টের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত হয়েও রাবণ দৈববলে বলীয়ান রাঘবের কাছে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নি, মহানিপাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর গর্বিত শির উন্নত রয়েছে—পরাজয় ভিক্ষা অপেক্ষা মৃত্যুই বরং বীরপুরুষদের কাছে অধিকতর বরণীয়। রাবণের নিঃসীম সহনশক্তি, অবিচল চিত্তস্থৈর্য মানবের অপরাজেয় পৌরুষবীর্যের প্রতিই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাবণের বিলাপ মানুষের মরণ বিজয়ী আত্মার গৌরবশ্রীকেই উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। রাবণ চরিত্রের এই নৈতিক ভিত্তিটি বুঝে নিতে না পারলে মেঘনাদবধ কাব্যে 'moral'-শক্তিটি উপলব্ধি করা পাঠকের পক্ষে সম্ভব হবে না।

মেঘনাদবধের প্রধান রস 'বীর' নহে, 'করুণ'

গ্রন্থের প্রারম্ভে কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন, 'গাইব, মা, বীররসে ভাসি, মহাগীত'। কিন্তু 'বীর' রস যে মেঘনাদবধ কাব্যের অঙ্গীরস নয়, তা পাঠককে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। হয় তো মধুসূদনের সঙ্কল্প ও সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল, রামায়ণে বর্ণিত ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন করে তিনি হোমারের 'ইলিয়ড' জাতীয় একখানি বীররস প্রধান মহাকাব্য রচনা করবেন, কিন্তু কবির সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি। সূক্ষ্ম বিচারে মেঘনাদবধ খাঁটি মহাকাব্য। কিন্তু একে বীররস প্রধান কাব্য বলা চলে না। বর্তমান কাব্যখানির মূলরস 'করুণ'। বীরবাহুর মৃত্যুতে এ কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদের মৃত্যুতে কাব্যটির পরিসমাপ্তি। কাব্যের আদ্যন্ত একটা করুণ শোক-বিলাপধ্বনি গুঞ্জিত হয়েছে। বিবদমান পক্ষে অস্ত্রঝণৎকার, সকল উৎসাহ ও উদ্দীপনা ঐ করুণ সুরটির অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই কাব্যে কয়েকটি জায়গায় বীররসের চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে।

রাক্ষসরাজ রাবণ ও স্বর্ণলঙ্কার শোকমূর্তি

যেহেতু মধুসূদন স্বদেশ, স্বজাতি কিংবা ধর্মের জয়গাথাবিরচনের প্রয়াস পান নি, সেহেতু মহাকাব্যসুলভ সহজ বীররস প্রীতি তাঁর চিত্তকে আবিষ্ট করতে পারে নি। নিয়তি-কবলিত মানবভাগ্য ও মানবজীবনের কারুণ্যের দিকটিই কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন বলেই মেঘনাদবধ বিনির্মল করুণ রসের আধার হয়েছে। এ কাব্যখানি পাঠ করে যে-একটি মূর্তি পাঠকের চোখের সামনে বিরাজ করতে থাকে তা শোকাদীর্ণ রাবণের। মেঘনাদবধ কাব্যের কয়েকটি পৃষ্ঠা পাঠ করবার পরই পাঠকের উপলব্ধি হয় যে, স্বর্ণলঙ্কার বুকের ওপর দিয়ে সর্বনাশের একটা প্রলয়ঙ্কর ঝড় বয়ে গেছে। তারপর ক্ষণকালের বিরতি। এই অবকাশে আমরা দেখলাম বজ্রজয়ী বনস্পতির মত উদ্ধতশির রাবণকে একান্ত অসহায় রূপে। তিনি যে ধীরে ধীরে মহানিপাতের সম্মুখীন হচ্ছেন, এ বিষয়ে তাঁর চিত্তে এখন কোন সংশয় নেই। বীরবাহুর পতনের পর রাক্ষসরাজ রাবণের শোকবিলাপের মধ্যেই লঙ্কা-পুরীর আসন্ন ধ্বংসের সুনিশ্চিত আভাস রয়েছে। এই মহানিপাতের রূপটি কী ভয়ঙ্কর, ভাগ্যাহত রাবণের স্বজনবিয়োগ যন্ত্রণা কী ভয়াবহ! বিধি নির্যাতিত রাবণের শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের মর্মন্তুদ হাহাকার ধাপে ধাপে চরমে উঠেছে নবম সর্গে। পুত্র ও পুত্রবধূর জ্বলন্ত চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান, ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকে বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরীয় পরিয়ে দিয়ে কবি তাঁকে শোকে যোগী ও সর্বরিক্ত ভিখিরী সাজিয়েছেন।

* * * * * *

বস্তুত, কবি যে বীররস-প্রধান কাব্য রচনা করছেন না, এ সত্যটি তাঁর নিজের অজ্ঞাত ছিল না। একখানি পত্রে বন্ধুকে তিনি লিখছেন, "You must not judge of the work as a regular 'Heroic Poem', I never meant it such. It is a story, a tale, rather heroically told." আবার অন্যত্র, Do not be frightened, my dear fellow ; I won't trouble my readers with "Vira-ras". আসল কথা, এই কাব্যের কায়া গঠন আদর্শটি classic হলেও, কবির romantic প্রবৃত্তি একে বীররস-প্রধান খাঁটি মহাকাব্য হয়ে উঠতে দেয় নি।

সর্বযুগের সর্বকালের চিত্তহরণ করতে হলে সাহিত্য-শিল্পে করুণ রসের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, মধুসূদন তা বিলক্ষণ জানতেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একখানি চিঠিতে কবি বলেছেন, "যে কবির সৌন্দর্যজ্ঞান আছে, যে কোমলমধুর এবং করুণরসে মনুষ্য হৃদয়কে সমুন্নত ভাবলোকে উন্নীত করিতে পারে, সে কবির তরণী কালস্রোতে আপনার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিয়া যায়।" এ হেন করুণ রসকে আশ্রয় করে এই কাব্যখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারুণ্যকে অবলম্বন করেই মধুসূদন 'সিদ্ধরস' রামায়ণের বিরোধিতা করতে সাহস পেয়েছেন। বীররসকে আশ্রয় করলে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য কতখানি সার্থক হয়ে উঠত তা ভাববার বিষয়।

'মেঘনাদবধ' কতখানি মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত

'মেঘনাদবধ' কাব্যের মহাকাব্যত্ব সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে মহাকাব্যের স্বরূপলক্ষণটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় আদর্শের মহাকাব্যের লক্ষণ :—মহাকাব্য সাহিত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ একটি রূপসৃষ্টি। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কবিপ্রতিভাকে আশ্রয় করে মহাকাব্যের সর্বজন পরিচিত একটি রূপমূর্তি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কৃত-অলঙ্কার শাস্ত্রীরা যাকে 'মহাকাব্য' নামে চিহ্নিত করেছেন, পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের ভাষায় তার নাম 'Epic'। বহিরঙ্গ লক্ষণের দিকদিয়ে মহাকাব্য ও epic-এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা গেলেও, স্বরূপ-লক্ষণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'-এ মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা লিপিবদ্ধ হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মহাকাব্য বড় একটা ঘটনাকে আশ্রয় করবে। এর কাহিনী হবে ঐতিহাসিক। কাব্যের নায়ক সদ্বংশজাত, ধীরোদাত্ত গুণ সম্পন্ন হবেন। শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত এই জাতীয় কাব্যের প্রধান রস, এর সর্গসংখ্যা অষ্টাধিক হতে হবে। এতে আরও থাকবে ছন্দোবৈচিত্র্য। গ্রন্থের প্রারম্ভে থাকবে আশীর্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দেশ অর্থাৎ প্রধান বস্তুর ইঙ্গিত। এই শ্রেণীর কাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি, মৃগয়া, যুদ্ধ, যুদ্ধাভিযান ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বাণীবদ্ধ হয়। সর্গবর্ণিত বিষয় অনুসারে প্রতিটি সর্গের এবং কাব্যে বর্ণনীয় ঘটনা অথবা নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হয়ে থাকে।

পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্যের লক্ষণ—Epic-এর পাশ্চাত্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিরাট ঘটনাকে উপজীব্য করে এপিক রচিত হয়ে থাকে। এপিকে বর্ণিত ঘটনাবস্তুর পটভূমিকায় থাকবে জাতীয় ইতিহাস অথবা পৌরাণিক কাহিনী। এপিকে দেবমানব একযোগে কাজ করবে। এপিকের নায়ক হবেন জাতীয় বীর, তাঁর জীবন হবে মহিমায় সমুজ্জ্বল। কাহিনীর অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, আখ্যান বর্ণনায় নাটকীয়তা, মহিমাদীপ্ত চরিত্রসৃষ্টি পাশ্চাত্য এপিকের লক্ষণীয় বস্তু। মূল কাহিনীর সঙ্গে শাখা কাহিনীর প্রয়োজনীয়তাও এপিকে স্বীকৃত। এপিক একটিমাত্র ছন্দে রচিত হয়। এপিক আদি, মধ্য ও অন্ত-সমন্বিত একটা বিরাট কাহিনীর ছন্দিত বাণীরূপ। এই কথাগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, মহাকাব্য বস্তুনিষ্ঠ রচনা। এর আকৃতি বিরাট, ঘটনাবস্তু বিশাল, এর বর্ণনীয় প্রধান চরিত্রগুলি সমুন্নত, এবং এতে কবির কল্পনা দুরারোহী ও বিশ্বচারী। মহাকাব্যের বস্তুধর্মিতা ও উদাত্ততা ভারতীয় পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত।

মহাকাব্যের রূপভেদ—মহাকাব্যের মধ্যেও আবার রূপভেদ আছে। ভারতবর্ষে ও ইউরোপে দুই শ্রেণীর মহাকাব্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে যে মহাকাব্য গুলো রচিত হয়েছিল, সেগুলোকে আমরা বলতে পারি Authentic Epic অথবা Epic of Growth,—এরাই জাতমহাকাব্য। গোটাজাতির সভ্যতা ও জীবনচর্যা এগুলির মধ্যে প্রতিবিম্বিত। এদের মধ্যে পাওয়া যায় জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সামগ্রিক পরিচয়। হোমারের 'ইলিয়ড', 'ওডেসি', বাল্মীকির 'রামায়ণ', ব্যাসের 'মহাভারত' এই শ্রেণীর মহাকাব্য।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত মহাকাব্যকে বলা হয় Imitative epic—এগুলি Literary epic অথবা Epic of Art নামেও পরিচিত। এদের আকৃতি প্রথমোক্ত মহাকাব্যের মত অতিকায় নয়। উন্মুক্ততা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, Authentic Epic এর বৈশিষ্ট্য ; আর সূক্ষ্মশিল্পচাতুর্য ও বিশেষ যুগের জীবনধারার রূপায়ণ Imitative Epic-এর লক্ষণীয় বিশিষ্টতা—The epic of growth is fresh, spontaneous, racy—the epic of art is learned, antiquarian, bookish, imitative. "ইমিটেটিভ এপিক" সম্বন্ধে একজন প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন—It is the product of individual genius working in an age of scholarship and literary culture on lines already laid down. মিল্টনের "Paradise Lost' ভার্জিলের 'Aeneid', দান্তের 'Divina Comedia', ট্যাসোর 'Jerusalem Delivered', কালিদাসের 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার', নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-প্রভাস' মোটামুটি এই শ্রেণীর মহাকাব্য।

'মেঘনাদবধ' কাব্য মহাকাব্য কিনা—এখন আমাদের কাছে প্রশ্ন, মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্যের পর্যায়ে পড়ে কি না। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বিচারে এ কাব্যটি মহাকাব্য নামে

অভিধেয় নয়। কারণ, এর নায়ক রাবণকে সদ্বংশজাত ও ধীরোদাত্ত গুণ সমন্বিত বলতে অনেকেই আপত্তি জানাবেন। মধুসূদনের কল্পিত রাবণ যে বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের সন্ততি, সাধারণ পাঠকের পক্ষে এ সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করা কিছুটা কঠিন। নায়কের জয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কাব্যখানির পরিসমাপ্তি ঘটে নি। 'মেঘনাদবধ' বিচিত্র ছন্দে রচিত নয়, আদ্যন্ত এটি একটি মাত্র ছন্দে—অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত হয়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নির্দেশ সম্মত চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটিরই প্রাধান্য বর্তমান কাব্যে চোখে পড়ে না। এতে আশীর্বচন ইত্যাদির অভাবও কিছুটা পরিলক্ষিত হবে। বস্তুতপক্ষে 'মেঘনাদবধ' রচনা করবার সময় মধুসূদন সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেন নি। অতএব 'মেঘনাদবধ'কে প্রাচ্য আদর্শের মহাকাব্য বলা যেতে পারে না। একে মোটামুটি পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্য বলা চলে। ইউরোপীয় Literary epic-এর লক্ষণই মেঘনাদবধে অনেকখানি পরিস্ফুট। গ্রন্থখানির ভাব কল্পনা, কায়াগঠনরীতি, চরিত্রগুলির নাটকীয় বিকাশ, ঘটনার একমুখিতা, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুগম্ভীর ধ্বনিপ্রবাহ, বিচিত্র অলঙ্করণ সৌন্দর্য প্রত্যেক পাঠককে পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের অভিমত

কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে 'মেঘনাদবধ' রীতিমত মহাকাব্য নয়। তিনি একে খাঁটি পাশ্চাত্য আদর্শের মহাকাব্য বলতে দ্বিধাগ্রস্ত। তিনি বলেন, "মহাকাব্য রচনার ভানে মধুসূদন একপ্রকার কল্পনা ও দীর্ঘছন্দের কথাকাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে শাস্ত্রশাসন অপেক্ষা কবির আপন রুচি ও আত্মভাব প্রশ্রয় পাইয়াছে,—আকারে প্রকারে যেটুকু মহাকাব্যের লক্ষণ আছে তাহা অবাধ কল্পনার শৃঙ্খলরূপে বড়ই কার্যকরী হইয়াছে। মেঘনাদবধের ঘটনাবস্তু জটিল নহে, চরিত্র-সৃষ্টিতে অথবা নায়কের কীর্তিকুশলতায় মহাকাব্যোচিত মহিমা ইহার নাই—এমন একটি চরিত্রও নাই যাহাকে দুর্ধর্ষ পুরুষ বীর বা মানুষরূপী দেবতা বলা যাইতে পারে। মেঘনাদের হত্যা, এবং যেভাবে সেই হত্যা সাধিত হইয়াছে, লঙ্কার সর্বনাশ ও রাবণের শোক—এ সকলের কোনটিতেই মহাকাব্যোচিত বিষয় গৌরব নাই। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক লক্ষণ ইহাতে আছে যাহা মহাকাব্যের শাস্ত্রসম্মত আদর্শের উপযোগী নয়। ক্লাসিক রচনাভংগী ও রোম্যান্টিক মনোবৃত্তি; মহাকাব্যীয় কল্পনা ও গীতিকাব্যীয় ভাবোচ্ছ্বাস, বিরাট ও বৃহতের প্রতি পক্ষপাত এবং সেই সঙ্গে দুর্বল মানব প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতি—করুণ ও মধুরের প্রতি বশ্যতা, এ সকলই এ কাব্যের রসপুষ্টি করিয়াছে।......আয়োজনের ত্রুটি ছিল না; ছন্দ, ভাষা, ঘটনা কাহিনী, হোমার-মিল্টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু— এমনকি, কাব্যঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা—সবই ছিল; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টি রহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া মধুসূদন

যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালীজীবনের গীতি কাব্য।" সহজ কথায়, মহাকাব্যের ঘনঘটা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' কাব্যে গীতিকবিতায় বিগলিত হয়েছে। এই কাব্যটি সম্বন্ধে অধ্যাপক হরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত বলেছেন, —**Michael began with an epic but ended in a lyric, or it may be said of him what Prof. Saintsbury says of Milton, that he was the greatest in the lyric in his epic.**

'মেঘনাদবধ ত্রুটিশূন্য এমন কথা কেউই বলবেন না। তথাপি বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক আদর্শের একমাত্র মহাকাব্য হ'ল এই গ্রন্থখানি। হেম-নবীনের কাব্যের সঙ্গে তুলনা করলেই 'মেঘনাদবধ'-এর দুর্লভ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় মিলবে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যুগোত্তীর্ণ কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের ব্যাপক পরিচয় ছিল। প্রধানত প্রতীচীর মহাকাব্যগুলির সমুচ্চ ও সুন্দর মধুর ভাবরাজি সযত্নে আহরণ করে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্যরূপী মধুচক্র নির্মাণ করেছেন—'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধানিরবধি'। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন ইউরোপীয় ভাব-জাগরণের আদি কবি—অদ্ভুত সৃজনীশক্তির যাদুমন্ত্রে তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালীর হৃদয় দ্বার ইউরোপীয় সাহিত্যের পথে উন্মুক্ত করে ধরে ছিলেন। মধুসূদন মাত্র পাঁচ-ছ' বছর কাল বাণীর সাধনা করেছিলেন, সেজন্য তাঁর নির্মিত সাহিত্যের পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। কিন্তু এই অল্পসময়ের মধ্যে মধুসূদনের কবি প্রতিভা যা সৃষ্টি করল তা বিস্ময়করই বলতে হয়। দেখতে দেখতে তিনি বাংলা কাব্যের গতিমুখ ফিরিয়ে দিলেন, সাহিত্যে একটা নবযুগের প্রবর্তন করলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা মধুসূদনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় নি, তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্যদিয়ে এ শিক্ষা অতিশয় ফলপ্রসূ হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ ফল 'মেঘনাদবধ' কাব্য। রামায়ণের একটি খণ্ডাংশকে মূলবিষয় বস্তুরূপে গ্রহণ করে মধুসূদন সম্পূর্ণ নতুন একটা কাহিনী রচনা করেছেন। রামায়ণী কথার মূল স্রোতে প্রাচী ও প্রতীচীর নানা কবির ভাবকল্পনা উপধারার মতো এসে মিশেছে।

'মেঘনাদবধ' কাব্যের কায়া গঠনে, ছন্দে, ভাষারীতিতে, বাক্যযোজনায়, অলঙ্করণ সজ্জায়, বাগ্‌ভঙ্গিতে পাশ্চাত্য প্রভাব সুপ্রকট। ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দটি উদ্ভাবনই করতে পারতেন না; এ ক্ষেত্রে তিনি মিল্টনের **Blank verse**-এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এই কাব্যের নায়ক—মহামৃত্যুর মুখে প্রধাবিত রাবণ—যে প্রতিকূল অজ্ঞেয় শক্তিকে 'বিধি', 'বিধাতা' বলে সম্বোধন করেছেন, গ্রীক সাহিত্যে তার নাম 'নিয়তি' বা **'Fate'**। অদৃষ্ট-নিয়তি হোমারের কাব্যে দেবতাগণেরও অপ্রতিরোধ্য—**'Even Gods cannot resist fate'**। প্রধানত গ্রীক দেবযন্ত্র (**Divine machinery**) গ্রীক দেববাদ বা অদৃষ্টবাদই মধুসূদনের চিত্রিত রাবণ চরিত্রকে নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

এই কাব্যের কাহিনী গঠন পরিকল্পনাটি গ্রীক কবি হোমারের 'ইলিয়ড'-এর অনুরূপ। হোমার ইলিয়ড বা ট্রয় নগরের অবরোধ ঘটনার শেষ কয়েক বছরের বিষয়বস্তু অবলম্বনে তাঁর 'ইলিয়ড' কাব্য রচনা করেছেন। লঙ্কাযুদ্ধের খণ্ডাংশ অবলম্বনে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' রচিত। 'ইলিয়ড' প্রকৃত প্রস্তাবে ট্রয়ভরসা হেক্টরবধ ছাড়া অন্য কিছু নয়—মধুসূদনের রাক্ষস কুলভরসা ইন্দ্রজিতের নিধনকাহিনী এই 'ইলিয়ড' কাব্যের আদর্শেই রচিত। মধুসূদন উক্ত গ্রীক কাব্যের গঠনরীতি অনুসরণ করেছেন বলে তাঁর 'মেঘনাদবধ' রামায়ণ-মহাভারতের মত 'ইতিহাসকাব্য' হয় নি।

মেঘনাদবধ কাব্যের সর্গ সংখ্যা নটি। সর্গগুলির প্রত্যেকটিতে ইউরোপীয় কবি-কল্পনার প্রভাব বিদ্যমান। প্রথম সর্গের প্রারম্ভে কবি বীণাপাণি ও কল্পনা দেবীর যে বন্দনা সংগীত উচ্চারণ করেছেন, তা হোমার, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবির 'Muse' বন্দনা বা Invocation'-এর অনুরূপ। কবির কল্পিত বারুণী-মুরলা সংবাদের ওপরও পাশ্চাত্য কাব্যের প্রভাব রয়েছে। বারুণী চরিত্র হোমারের জলদেবী 'থেটিস' ও মিল্টনের 'Comus' কাব্যের সেব্রিনার আদর্শে পরিকল্পিত। মেঘনাদের প্রমোদ-কাননের চিত্রে ইতালীয় কবি ট্যাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' কাব্যের মায়াবিনী 'আর্মিডা'র প্যারাডাইসের ছায়াপাত হয়েছে। বর্তমান কাব্যের প্রথম সর্গে কবি মেঘনাদ ও প্রমীলার যে বিদায় দৃশ্য অঙ্কন করেছেন, তার সঙ্গে হোমারের ইলিয়ডে বর্ণিত হেক্টর ও তাঁর পত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকির বিদায় চিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে।

দ্বিতীয় সর্গে দেখতে পাই, স্বর্গের দেবদেবীগণ রামচন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে লঙ্কাসমরে সহায়তা করছেন। রামায়ণে এরকম কোন বর্ণনা নেই। মধুসূদন হোমারের অনুসরণে দেবতাগণকে যুদ্ধমান পক্ষে প্রত্যক্ষ সাহায্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করিয়েছেন। এ সর্গে বর্ণিত হর-পার্বতী চরিত্রে গ্রীকপুরাণের জুনো-জুপিটারের ছায়াপাত রয়েছে। রক্ষোরাজ রাবণ যেদিন বীরকেশরী মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন, সেইদিন রাত্রে রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নিপাতিত করবার জন্য স্বর্গলোকে চলছিল দেবদলের ষড়যন্ত্র। ভক্তদ্রোহিনী রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবী কৈলাসে হর-পার্বতীর সন্নিধানে গিয়েছেন; দেবকুল প্রিয় রামচন্দ্রকে আসন্ন সংকট থেকে রক্ষা করবার জন্য পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করে মীনকেতন সমভিব্যাহারে যোগাসনশৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের তপোভঙ্গ করেছেন; পার্বতীর মোহিনীরূপে আবিষ্ট হয়ে মহাদেব ইন্দ্রজিতের নিধনোপায় পত্নীকে জানিয়ে দিয়েছেন; তারপর লক্ষ্মণ শক্তিশ্বরী মায়াদেবী ও বিভীষণের সহায়তায় নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে মেঘনাদকে দৈবী অস্ত্রনিক্ষেপে তস্করের মত হত্যা করেছেন।

সুরলোকের দেবদেবীর এই যে চরিত্র চিত্র, এর রূপায়ণ ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কবিকল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মধুসূদনের কল্পিত রতি ও মদনের ওপর সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রোদিতি ও নিদ্রাদেব সমনস্-এর ছায়া পড়েছে।

মেঘনাদবধে বর্ণিত কৈলাশ ও যোগাসনশৃঙ্গ পাঠককে ইলিয়ডে বর্ণিত অলিম্পাস ও আইডা পর্বতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তৃতীয় সর্গে কবি বীরাঙ্গনা প্রমীলার আলেখ্যটি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যক্ষভাবে উন্মোচিত করেছেন। মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রে ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যের ক্যামিলা, টাসোর 'জেরুজালেম ডেলিভার্ড' কাব্যের ক্লরিণ্ডার বীরপনার স্পর্শ রয়েছে।

চতুর্থ সর্গ—সীতা সরমাসংবাদ—লিরিক সৌন্দর্যে অতুলনীয়। এই সর্গটিতে ইউরোপীয় কবি কল্পনার অনুভাবনা তেমন দৃষ্ট হয় না। জটায়ুর সঙ্গে রাবণ যখন যুদ্ধে লিপ্ত, তখন মূর্চ্ছিত অবস্থায় সীতাদেবী ভাবী ঘটনার ছায়াদর্শন করলেন। এই ভবিতব্য-দর্শন ঘটনাটির চিত্রণকালে মধুসূদন বোধ করি ভার্জিলের 'ঈনিড' কাব্যে বর্ণিত অনুরূপ একটি ঘটনার কথা স্মরণ করে থাকবেন।

পঞ্চম সর্গে কবি লক্ষ্মণকে নানারূপ বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন করেছেন। ট্যাসোর কাব্যেও আমরা দেখি, ইউব্যালডো—অর্মিডার মায়াপুরীতে পৌঁছবার আগে এরকম কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। ইন্দ্রজিৎও প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গের বর্ণনাটি মিল্টনের চিত্রিত আদম ও ঈভের নিদ্রাভঙ্গের দৃশ্যটির সঙ্গে তুলনীয়।

ষষ্ঠ সর্গে রামচন্দ্র সর্প ময়ূরের মায়াযুদ্ধ চাক্ষুষ করেছেন। সর্প ও ময়ূরের এই যুদ্ধবর্ণনায় হোমারের 'ইলিয়ড' কাব্যের দ্বাদশ সর্গের প্রভাব বর্তমান। রামায়ণের শক্তিশেল নিক্ষেপ বৃত্তান্তের সঙ্গে 'ইলিয়ড' কাব্যের ঘটনাবলীর সংমিশ্রণে মেঘনাদের সপ্তম সর্গটি রচিত। অষ্টম সর্গের প্রেতপুরী-স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমার, দান্তে, ভার্জিল, মিল্টন প্রমুখ কবিগণের কল্পনা অনুসরণ করেছেন। নবম সর্গে মেঘনাদের প্রেতকৃত্য, প্রমীলার সহমরণ ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কালীন সমরসজ্জা ইত্যাদি ঘটনা ইলিয়ডের আদর্শেই রচিত।

'মেঘনাদবধ কাব্যে' এরকম আরো অনেক দৃশ্য ও চিত্র রয়েছে যা ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্য থেকেই নেওয়া হয়েছে। মধুসূদন পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্য গভীরভাবে মন্থন করেছিলেন এবং সেই মন্থনোত্থিত সুধা স্বরচিত কাব্যের মাধ্যমে তিনি বাঙ্গালী পাঠককে পরিবেশন করে গেছেন। প্রতীচীর কাব্য মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েই তিনি বাংলা কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর ভাব, ভাষা, বস্তুবাদী কল্পনা হোমারকে, ছন্দের প্রবাহমানতা ভার্জিল ও মিল্টনকে, সাবলীল রচনার মাধুর্য ট্যাসোকে, ভাববস্তুর উদাত্ততা দান্তেকে, এবং আত্মমুখী কাব্য ভাবনা পেত্রার্ক, বায়রণ প্রমুখ কবিকে মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে কালিদাস-ভবভূতি, কৃত্তিবাস-কাশীদাসকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। 'মেঘনাদবধ' কাব্য ইংরেজি শিক্ষিত বহুভাষাবিদ বঙ্গসন্তান মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি।

তৎসত্ত্বেও মধুসূদনের প্রতিভার মৌলিকতা ও অনন্য সাধারণত্ব অবশ্য স্বীকার্য। দেশীয় ও বিদেশীয় কবিদলের কল্পলোক থেকে তিনি বিচিত্র উপাদান উপকরণ সংগ্রহ

করেছেন। এগুলি তাঁর কাব্যের কঙ্কাল মাত্র—এই কঙ্কালকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে তাঁর অসামান্য সৃষ্টি-প্রতিভা। সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র মেঘনাদবধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

The reader who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensation of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived like Vya Valmiki or Kalidas ; Homer,Dante or Shakespeare. দেশ বিদেশের সাহিত্য মধুসূদনের কবিশক্তিকে পুষ্ট করেছিল—সেই অদ্ভুত শক্তিরই সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে তাঁর অপূর্ব বাঙনির্মিতি 'মেঘনাদবধ' কাব্যে।

কাব্য পাঠ

প্রথম সর্গ

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি ৫
রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষস ভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে-অজেয় জগতে
ঊর্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে
নিঃশঙ্কিলা?
বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
১০
ভারতি! যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
১৫
কে জানে মহিমা তব এ ভব মণ্ডলে?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি!
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর ২০
কাব্য রত্নাকর কবি!

সম্মুখ সমরে—প্রাচীনকালের যুদ্ধ সামনাসামনি হ'ত। এ যুদ্ধ ছিল যেমন বীরত্বব্যঞ্জক তেমনি প্রশংসার্হ। **বীরচূড়ামণি**—বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **বীরবাহু**—রাবণ পত্নী চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র। বীরবাহু বধের ঘটনাটি বাল্মীকি রামায়ণে নেই। মধুসূদন এটি কৃত্তিবাস রামায়ণ থেকে নিয়েছেন। **কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণী**—সুমধুর ভাষিণী বাগ্দেবী সরস্বতীকে আবাহন। পাশ্চাত্য কবিগণের Invocation-এর আদর্শে মধুসূদন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণিকে আহ্বান করে এই কাব্য আরম্ভ করেছেন। **রক্ষঃকুলনিধি**—রাক্ষসকুলের আধার অর্থাৎ রাবণ। **রাঘবারি**—রাঘব অর্থাৎ রামচন্দ্র; তাঁর অরি অর্থাৎ শত্রু। এক কথায় রাবণ। **কি কৌশলে**—লক্ষ্মণ সামান্য মানব হ'য়ে শ্রেষ্ঠ বীর 'ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করেছেন; এর মূলে নিশ্চয় কোন কৌশল আছে। **ঊর্মিলাবিলাসী**—অর্থাৎ লক্ষ্মণ। **ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা**—ইন্দ্রের শঙ্কা বিদূরিত হ'ল। মেঘনাদ একবার ইন্দ্রকে পরাজিত করে নাগপাশে বেঁধে লঙ্কায় এনেছিলেন। **বন্দি চরণারবিন্দ**—দেবী সরস্বতীর চরণ কমল বন্দনা করে। **মন্দমতি**—ক্ষীণমতি। কবির বিনয়সূচক উক্তি। **ডাকি আবার তোমায়**—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে কবি একবার সরস্বতীকে আহ্বান করেছিলেন। এখন তিনি আবার তাঁকে আহ্বান করছেন। **শ্বেতভুজে ভারতী**—শুভ্রবর্ণা দেবী সরস্বতী। **যেমতি মাতঃ……পদ্মাসনে যেন**—যেমন বাল্মীকির কণ্ঠে দেবী সরস্বতী অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে দিয়ে প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করিয়েছিলেন—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

—ওরে নিষাদ, যেহেতু তুই ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে অকারণে বধ করলি, সেই হেতু তুই এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না। **যব খরতর শরে……নিষাদ বিঁধিলা**—বাল্মীকি তমসা নদীতীরে ভ্রমণকালে আলাপরত ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর মধ্যে ক্রৌঞ্চকে যখন এক ব্যাধ কর্তৃক শর দ্বারা নিহত হ'তে দেখলেন, তখন তাঁর মুখ থেকে ঐ শ্লোকটি উচ্চারিত হল; যে শ্লোকটি পৃথিবীর 'আদিমতম শ্লোক'। **নরাধম আছিল……মৃত্যুঞ্জয়**—বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু রত্নাকর। পরবর্তীকালে ব্রহ্মার বরে তিনি মুনি বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হন এবং দেবী সরস্বতীর কৃপায় রামায়ণ কাব্য রচনা করে পৃথিবীতে অমর হন। **যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি**—উমাপতি শিব যেমন মৃত্যুকে জয় করেছেন। **চোর রত্নাকর……কবি**—প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্যু ছিলেন; পরবর্তীকালে সরস্বতীর প্রসাদে রামায়ণ রচনা করে কাব্যরূপ রত্নের আকর হলেন।

তোমার পরশে
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।
হায় মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ
দাসে?
কিন্তু যে, গো, গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি ২৫
সমধিক! উর তবে, উর দয়াময়ি,
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু ৩০
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।
কনক আসনে বসে দশানন বলী-
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা।
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিত্র-আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।
ভূতলে অতুল সভা-স্ফটিক গঠিত
তাহে শোভে রত্নরাজি মানস সরসে
সরস কমল ফুল বিকসিত যথা। ৩৯

তোমার পরশে……বিষবৃক্ষ ধরে—দেবী সরস্বতীর স্পর্শের মধ্যে এমন একটি পরমাশ্চর্য শক্তি রয়েছে, যার প্রভাবে গুণধর্মে প্রাণনাশক বিষবৃক্ষও মনোমুগ্ধকর সুরভি বিশিষ্ট চন্দন তরুর গুণ সৌন্দর্যে ভূষিত হয়। **এ হেন পুণ্য……দাসে**—কবি আত্মদৈন্য স্বীকার করে বলছেন যে বাল্মীকি যে পুণ্যফলে দেবী সরস্বতীর কৃপালাভ করেন, সে পুণ্যফল তাঁর নেই। **কিন্তু যে, গো……সমধিক**—কিন্তু তবুও কবি মনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে মা যেমন অধম সন্তানের প্রতি বেশী করুণা প্রকাশ করেন, তেমনি তিনিও অধম সন্তান হিসেবে দেবী সরস্বতীর করুণা থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হবেন না। **উর**—আবির্ভূত হও। **বিশ্বরমে**—বিশ্বের সৌন্দর্য-রূপিণী সরস্বতীকে আহ্বান। **গাইব, মা,……মহাগীত**—মহাগীত বলতে মহা-

কাব্যতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কবি যদিও বীররসের কাব্যরচনা করবেন বলে অঙ্গীকার করছেন, কিন্তু পরিশেষে কাব্যটিতে বীররসের পরিবর্তে করুণ রস প্রাধান্য লাভ করেছে। **মধুকরী কল্পনা**—কবির দৃষ্টিতে কল্পনা মধুকরীরূপিণী। এ দুয়েরই রয়েছে উদ্ভাবনী ও রচনাশক্তি। কবি কল্পনাকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন। **কবির চিত্ত ফুলবন মধু লয়ে**—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবিকুলের হৃদয়রূপ কুসুমোদ্যান থেকে মধু সংগ্রহ করে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিগণের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি থেকে ভাবসম্পদ গ্রহণ করে। **রচ মধুচক্র**—কাব্যের মৌচাক রচনা কর। **গৌড়জন**—বাংলার পাঠকবর্গ। **কনক আসনে**—সোনার সিংহাসনে। **দশানন বলী**—বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ। **হেমকূট······যথা**—হেমকূট পর্বতের স্বর্ণশিখরে পর্বতশৃঙ্গের মত। **নতভাবে বসে**—বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকে সকলে অবনত মুখে বসে। **স্ফটিকে গঠিত**—অতি শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। **মানস সরসে······ যথা**—রাবণের সভাগৃহ শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তরে গঠিত বলে মানস সরোবরের সঙ্গে তুলনীয় এবং সেই সভাগৃহের রত্নরাজি যেন মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি।

শ্বেতরক্ত নীল পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।

ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে ৪৫
রতন সম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে।

ফণীন্দ্র যেমতি······ধরারে—রাবণের সভাগৃহ দেখে মনে হয় যেন অনন্তনাগ বাসুকি তার অজস্র মণিদীপ্ত ফণার ওপর বিশাল পৃথিবীকে ধরে আছে। **ঝুলিছে ঝলি**—ঝলমল করছে। **মুকুতা**—মুক্তা। **পদ্মরাগ**—মণি বিশেষ। **মরকত**—পান্না। **ব্রতালয়ে**—শুভ উৎসব গৃহে। **ক্ষণপ্রভা সম**—বিদ্যুতের মত। **রতন সম্ভবা বিভা**—রত্নসমূহ থেকে বিচ্ছুরিত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি।

সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা। ধর ছত্র ছত্রধর; আহা, ৫০
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে!
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি। মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি
অনন্ত বসন্ত বায়ু, সঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর যথা ৫৭
বাঁশরী স্বর লহরী গোকুল-বিপিনে।
কি ছার ইহার কাছে, হে দানব পতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা ৬০
স্বহস্তে গড়িয়া তুমি তুষিতে পৌরবে?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে।
যথা তরু, তীক্ষ্ণশর সরস শরীরে
বাজিলে, কাঁদে নীরবে। করজোড় করি
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত, ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব কলেবর।৬৮

চারুলোচনা কিঙ্করী—সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট দাসী। **হরকোপানলে······ ছত্রধর রূপে**—কামদেব মদন উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের উদ্দেশ্যে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করলে শিব কুপিত হয়ে মদনকে ভস্ম করেন। কবি এখানে বলছেন যে কামদেব যেন ভস্মীভূত হন নি, তিনি ছত্রধর রূপে রাবণের রাজসভায় বর্তমান। **দৌবারিক ভীষণ মুরতি**—ভয়ঙ্করদর্শন দ্বার রক্ষক। **রুদ্রেশ্বর যথা শূলপাণি**—মহাভারতে আছে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের শিবির রক্ষার ভার নিয়েছিলেন ত্রিশূলধারী মহাদেব। রাবণের সভাগৃহের দ্বাররক্ষীকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ত্রিশূলধারী মহাদেবের মত ভীষণ। **অনন্ত বসন্ত বায়ু**—রাবণের প্রতাপে লঙ্কাভূমিতে চিরবসন্ত বিদ্যমান। **কাকলী লহরী**—মধুর অস্ফুট বাদ্যধ্বনি। **স্বরলহরী**—বাঁশীর স্বর তরঙ্গ। **গোকুল-বিপিনে**—বৃন্দাবনের বনভূমিতে। **কি ছার ইহার কাছে······পৌরবে**—খাণ্ডব দাহে অর্জুন ময়দানবের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। প্রতিদান স্বরূপ ময়দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য এক অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করেন। কবি বলেছেন ময়দানব নির্মিত সেই সভাগৃহ থেকে রাবণের সভাগৃহ উৎকৃষ্ট। ব্যতিরেক অলঙ্কারের এটি একটি দৃষ্টান্ত। **পৌরবে**—পাণ্ডবগণকে।

রক্ষঃ কুলপতি—রাবণ। **তিতিয়া**—সিক্ত করে। **ভগ্নদূত**—যে দূত যুদ্ধের পরাজয় বার্তা বহন করে আনে। **ধূসরিত**—লিপ্ত।

বীরবাহুসহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণ সাগরে তা সবার মাঝে ৭০
একমাত্র বাঁচে বীর; যে-কালতরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি ৭৫
নৈকষেয়! সভাজন দুঃখী রাজদুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিন নাথে! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিল রাবণ:
"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, ৮০
রে দূত! অমর বৃন্দ, যার ভুজবলে
কাতর, সে-ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে?" ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

কালতরঙ্গ—করালমৃত্যু। **নাম মকরাক্ষ····· সম**—যে ভগ্নদূত দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে তার নাম মকরাক্ষ। সে যক্ষপতি কুবেরের ন্যায় বলশালী। **নৈকষেয়**—নিকষার পুত্র অর্থাৎ রাবণ। রাবণের পিতার নাম—বিশ্রবা ঋষি এবং মাতার নাম নিকষা রাক্ষসী। **ঘন**—মেঘরাজি। **দিননাথ**—সূর্য। **বারতা**—বার্তা, খবর। **অমরবৃন্দ**—দেবতারা। **রাঘব**—রামচন্দ্র। **ফুলদল দিয়া······শাল্মলী তরুবরে?**—কোমল ফুলের পাপড়ি দ্বারা কি বিরাট শিমুল গাছকে ছেদন করা হয়েছে? রামচন্দ্র কর্তৃক বীরবাহু নিহত হওয়ার সংবাদ রাবণের কাছে নিশার স্বপ্নের মত অলীক বলে

মনে হয়েছে। ফুলের পাপড়ি দ্বারা যেমন বৃক্ষ ছেদন করা অসম্ভব, তেমনি সামান্য মানব রামচন্দ্র দ্বারা বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে নিহত করাও অসম্ভব। এটি একটি নির্দেশনা অলঙ্কারের উদাহারণ।

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি! ৮৫
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কাল সমরে! ৯০
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে ৯৫
এ শরে! তা নাহলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত
রাক্ষস কুলরক্ষণ? হায়, সূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখিছিলি তুই রে অভাগী, ১০০
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে! কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখারূপিনী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে! হায়, ইচ্ছা করে
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় কাননে ১০৫
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে!
কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম, রে, আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী; ১১০
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;
তবে কেন আর আমি থাকিরে এখানে?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে?
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস—
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা ১১৫
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয় পুত্র কুরুক্ষেত্র রণে।

শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ—রাবণের ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ মহাদেবের মত বীর ও তেজস্বী। **আমার দোষে**—রাবণ কর্তৃক অসময়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ দোষে। **কি কুক্ষণে……এ ভুজগে**—কি কুক্ষণে সূর্পনখা পঞ্চবটীবনে বিষপূর্ণ সর্প রামচন্দ্রকে দেখেছিল। এটি অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত! **পাবকশিখারূপিনী জানকী**—সীতা যেন প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা, তারই স্পর্শে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। **হৈমগেহে**—স্বর্ণলঙ্কায়। **কুসুমদাম সজ্জিত……সুন্দর পুরী**—অভিনয় কালে নাট্যগৃহ পুষ্প সম্ভারে সজ্জিত থাকে, উজ্জল আলোকে আলোকিত হয়, গীতবাদ্য ধ্বনিত হতে থাকে। কিন্তু অভিনয় শেষে নাট্যশালা শ্রীহীন নিস্প্রভ হয়ে গেছে। আজ রূপৈশ্বর্যময়

লঙ্কাপুরীর অবস্থাও অভিনয় শেষে নাট্যশালার মত হয়ে উঠেছে। **দেউটি**—প্রদীপ। **রবাব**—বাদ্যযন্ত্র। **মুরজ**—মৃদঙ্গ। **মুরলী**—বাঁশী। **এইরূপে বিলাপিলা……কুরুক্ষেত্র রণে**—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে সঞ্জয় যুদ্ধের বর্ণনা করেন। বেদব্যাসের কৃপায় সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। সঞ্জয়ের মুখ থেকে ভীমের হাতে নিজ পুত্ররা নিহত হচ্ছে শুনে ধৃতরাষ্ট্র যেমন বিলাপ করেছিলেন, রাবণও আজ সেইভাবে বিলাপ করছেন।

তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ)
কৃতাঞ্জলি পুটে উঠি কহিতে লাগিলা ১২০
নতভাবে—'হে রাজন, ভুবন বিখ্যাত,
রাক্ষস কুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে !
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে ? ভাবি, প্রভু দেখ কিন্তু মনে—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে ১২৫
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ সুখ যত ;
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।

সচিব শ্রেষ্ঠ বুধঃ—জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী। **অভ্রভেদী চূড়া**—আকাশচুম্বী পর্বত-শৃঙ্গ। **ভূধর**—পর্বত। **অভ্রভেদী চূড়া……সে পীড়নে**—পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গ যখন বজ্রের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। তখন কিন্তু পর্বত তার বেদনায় কাতর হয় না। তবে কেন পর্বতের মত সুদৃঢ় রাবণ রাজা বীরবাহুর মৃত্যুতে অধীর হয়ে উঠেছেন।

উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ; ১৩০
"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ ! জানি হে আমি, এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম, ১৩৫
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।"
এতেক কহিয়া রাজা, দূতপানে চাহি,
আদেশিলা,—"কহ, দূত কেমনে পড়িল ১৪০
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী ?"
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীর কুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে; ১৫০
সিংহনাদে ; জলধির কল্লোলে ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন— ;
পথে ; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড টঙ্কারে।
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর ! ১৫৫
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি।

পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন অবারিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎ ঝলা-সম চকমকি ১৬০
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি কে পারে গণিতে?

হৃদয়-বৃন্তে……হরি—পদ্মের ডাঁটার অগ্রভাগে পদ্মফুল ফোটে। ফুলটি ছিঁড়ে নিলে ডাঁটাটি জলে নিমজ্জিত হয়। সেইরকম হৃদয়রূপ ডাঁটা থেকে পুত্ররূপ পদ্মকে মৃত্যু হরণ করলে হৃদয়রূপ ডাঁটাটি শোকের সাগরে নিমজ্জিত হয়। 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কারের উদাহরণ। **অমরত্রাস**—মৃত্যুঞ্জয়ী দেবতাদের ভীতি উৎপাদনকারী। **মদকলকরী**—মদমত্ত হস্তী। **বীরকুঞ্জর**—বীরশ্রেষ্ঠ। **ইরম্মদ**—বজ্রাগ্নি। **পবন পথে**—আকাশমণ্ডলে। **জলধি**—সমুদ্র। **কোদণ্ড-টংকার**—ধনুকের জ্যা বা ছিলা আকর্ষণজনিত সুতীব্র শব্দ। **কভু নাহি শুনি**—মেঘের গম্ভীর গর্জন, অরণ্যের সিংহনাদ, সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি অপেক্ষাও বীরবাহুর কোদণ্ড-টংকার ধ্বনি অধিকতর ভয়ঙ্কর। **ঘন ঘনাকারে**—ঘন মেঘের আকারে। **যূথনাথ**—দলপতি। **গজযূথ**—হস্তিসমূহ। **কলম্বকুল**—বাণসমূহ। **অম্বর**—আকাশ।

এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে, ১৬৫
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব—
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ;
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত।" এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া ১৭০
পূর্বদুঃখ। সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী-মনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?" ১৭৫

নরেন্দ্র রাঘব…কনকমুকুট শিরে—ঐশ্বর্যবিলাসী মধুসূদন এখানে অনবধানতা-বশতঃ বনবাসী 'ভিখারী রাঘব'কে 'নরেন্দ্র রাঘব'এ রূপান্তরিত করে তাঁর শিরে কনক মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। বনবাসী রামচন্দ্রের মাথায় যে সোনার মুকুট থাকতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। **বাসবের চাপ যথা**—রামচন্দ্রের ধনুকটি ইন্দ্রধনুর মতই প্রকাণ্ড ও বিচিত্রবর্ণে সুশোভিত। **বিলাপী**—বিলাপকারী। **মন্দোদরী-মনোহর**—মন্দোদরীর চিত্তরঞ্জনকারী। **সন্দেশবহ**—বার্তাবহ, দূত। **দশাননাত্মজ শূরে**—রাবণের পুত্র রথিশ্রেষ্ঠ বীরবাহুকে। **দশরথাত্মজ**—দশরথের পুত্র রামচন্দ্র।

"কেমনে, হে, মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত, "কেমনে হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া, ১৮০
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ

নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম
ধূমপুঞ্জসম চর্মাবলীর মাঝারে ১৮৫
অযুত! নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে!—
কি আর কহিব. দেব? পূর্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি! হায়রে বিধাতঃ
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি, ১৯০
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী—
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস ১৯৫
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে? ২০০
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।"

অগ্নিময় চক্ষু—রক্তবর্ণ চক্ষু। **হর্য্যক্ষ**—হরি (হরিদ্বর্ণ) অক্ষ অর্থাৎ অক্ষি যার, সিংহ। **দ্বন্দ্বি**—যুদ্ধ করে। **ভাতিল**—দীপ্তিমান হয়ে উঠল। **ধূমপুঞ্জ……অযুত**—কৃষ্ণবর্ণ ঢালগুলি যেন ঘনকৃষ্ণ ধূমপুঞ্জ, তার মধ্যে শাণিত অসি উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত দীপ্তি পেতে লাগল। **নাদিল কম্বু**—রণশঙ্খ গম্ভীর রবে ধ্বনিত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করল। **অম্বুরাশিরবে**—সমুদ্র কল্লোলের মত প্রচণ্ড শব্দে। **ক্ষত বক্ষঃস্থল মম……অস্ত্র লেখা**—দূত বলছে যে সে প্রাণভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় নি, তাহলে তার পিঠে অস্ত্র আঘাতের চিহ্ন থাকত। কিন্তু অস্ত্র আঘাতের চিহ্ন তার বুকে—সেও সম্মুখ যুদ্ধ করেছে। তবে সে বেঁচে রয়েছে, এটা তার ভাগ্যবিড়ম্বনা মাত্র। **হরষে বিষাদে**—বীরবাহুর বীরত্ব কথা শুনে পিতা রাবণের হর্ষ এবং যুদ্ধে বীরবাহুর মৃত্যুর জন্য বিষাদ। **ডমরুধ্বনি……বিবরে?**—ডমরুধ্বনি শুনলে যেমন সর্প পরম উৎসাহে বিবর. অর্থাৎ গর্ত ত্যাগ করে বাইরে ছুটে আসে তেমনি ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের কাহিনী শুনে সংগ্রামপ্রিয় বীরহৃদয় বিপুল উৎসাহে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। **বীরপুত্রধাত্রী**—লঙ্কাপুরী সত্যই বীরপুত্রের জননী।

উঠিল রাক্ষসপতি প্রাসাদ শিখরে, ২০৫
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন—
সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!
হৈম হর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃছটা; ২১০
তরুরাজী; ফুলকুল—চক্ষু—বিনোদন,
যুবতী যৌবন যথা; হীরাচূড়া শিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতনপূর্ণ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, ২১৫
রেখেছে, রে চারু লঙ্কে, তোর পদতলে
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।

কনক···অংশুমালী—যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য দেখার জন্য রাবণ পর্বতের শিখরে আরোহণ করলে মনে হল যেন সমুজ্জ্বল রশ্মিমালা-বিভাসিত উদয়শিখরে অতিভাস্বর সূর্যদেবের প্রকাশ। 'দিনমনি' ও 'অংশুমালী' উভয় অর্থই সূর্য। এখানে অংশুমালী শব্দটিকে দিনমণি শব্দের বিশেষণরূপে গ্রহণ করতে হবে। এখানে রাবণ উপমেয়, দিনমণি উপমান উপমেয়কে উপমান হেতু সংশয় বলে 'উৎপ্রেক্ষা' অলঙ্কার হয়েছে। **কাঞ্চন ······লঙ্কা** - লঙ্কার সোনার প্রাসাদগুলি মুকুটের মত। **হেমহর্ম্য**—সোনার অট্টালিকা। **রজঃছটা**—রূপোর মত সাদা।

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীরে
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা ২২০
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা— ২২৫
নক্ষত্রমণ্ডল কিংবা আকাশমণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্বদ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ করভসম নব বলে বলী;
কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক--২৩০
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্ধ্বফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।
উত্তর-দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি,
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম-দুয়ারে—
হায় রে, বিষণ্ণ এবে জানকী বিহনে, ২৩৫
কৌমুদীবিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক। লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে
বেড়িয়াছে বৈরীদল স্বর্ণলঙ্কা পুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধদল মিলি ২৪০
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী,
নয়ন রমণীরূপে, পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা! অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে। ২৪৫
কেউ উড়ে, কেউ বসে, কেউ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে; কেহ গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি, কেহ শোষে রক্ত স্রোতে।

পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি, ২৫০
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য; নিষাদী, সাদী, শূলী,
রথী, পদাতিক, পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম, চর্ম অসি, ধনু,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু, ২৫৫
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্কর।

অস্ত্রীদল—নানা অস্ত্রধারী সৈনিক। **শৃঙ্গধরোপরি সিংহ**—পর্বতের ওপর সিংহ যেমন ঘুরে বেড়ায়, সুউচ্চ প্রাচীরের উপর অস্ত্রধারী প্রহরীদল তেমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে। **বৈদেহীহর**—রাবণের এক নাম। কেননা তিনি বিদেহের রাজকন্যা সীতাকে হরণ করেছিলেন। **থানা দিয়া**—পাহারা দিচ্ছে। **করভসম**—হস্তীশাবকের ন্যায়। **কঞ্চুক**—সাপের খোলস্। **দুলি**—সঞ্চালন করে। **অবলেপে**-গর্বের সঙ্গে। **কিংবা বিষধর ……অবলেপে**—বালিপুত্র অঙ্গদ শত্রুর কাছে কি রকম ভীতিজনক এখানে তাই বলা হয়েছে। বিষধর সাপ যখন খোলস ত্যাগ করে তখন সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে শীতের অবসানে আবার যখন নতুন চর্মে আচ্ছাদিত হয়, তখন সে নব বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং দীপ্ত তেজে দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা সঞ্চালিত করে তার উদ্যত ফণা নিয়ে চতুর্দিকে ভ্রমণ করে—এইরূপ বিষধর সাপ সকলের ভীতিজনক। **দাশরথি**—রামচন্দ্র। **বিষণ্ণ এবে……শশাঙ্ক**—জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্র যেমন নিষ্প্রভ সীতাবিহীন রামচন্দ্রকেও সেইরকম মলিন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। **বায়ুপুত্র হনূ**—পবননন্দন হনুমান। **প্রসরণে**—বেষ্টনে। **কেশরী কামিনী**—সিংহিনী, লঙ্কাপুরীর উপমান। **নয়নরমণীরূপে**—কেশরী কামিনী এবং লঙ্কাপুরী উভয়েই দেখতে সুন্দর ও ভীম পরাক্রমা। **পরাক্রমে ভীমা ভীমাসমা**—সিংহী দৈহিক বীর্যবত্তায় ভীষণা; অন্যদিকে অগণন রাক্ষসবীরের শৌর্যবীর্যই লঙ্কাপুরীর পরাক্রম। সুতরাং সিংহী ও লঙ্কাপুরী দুইই চণ্ডীদেবীর মত ভীষণা। **ভীমা**—চণ্ডী। **শিবাকুল**—শৃগালদল। **পিশাচদল**—কাঁচা মাংসাহারী জীবগণ। **গৃধিনী**—শকুনি। **পাকশাট**—পাখার ঝাপট। **কুঞ্জরপুঞ্জ**—হস্তীদল। **নিষাদী**—গজারোহী সৈন্যদল। **সাদী**—অশ্বারোহী সৈনিক। **শূলী**—শূলধারী সৈন্যদল। **ভিন্দিপাল**—ছোঁড়বার মত বর্শাজাতীয় অস্ত্র। **পরশু**—কুঠার। **কিরীট**—মুকুট। **শীর্ষক**—পাগড়ী।

পড়িয়াছে যন্ত্রীদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যমদণ্ডাঘাতে
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি ২৬০
স্বর্ণচূড় শস্য, ক্ষত কৃষিদল-বলে
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর,
রবিকুল রবি শূর রাঘবের শরে।
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীরচূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা ২৬৫
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাগ্নীবাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ:

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার ২৭০
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে!
সদা রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে-ডরে ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক তারে।
তবু, বৎস, যে-হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে, ২৭৫
কোমল সে ফুল সম। এ বজ্র-আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি ২৮০

হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুখী
তুমি হে জগৎ পিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্র কেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?''
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর ২৮৫
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয় । মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে । দুই পাশে তরঙ্গ নিচয়
ফেনাময়, ফণীময় যথা ফণিবর, ২৯০
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে ।
অপূর্ব বন্ধন সেতু ; রাজপথ সম
প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোত কলরবে,
স্রোতঃ পথে জল যথা বরিষার কালে ।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ ২৯৫
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর ? ৩০০

ধ্বজবহ—পতাকা বাহক । **হেমধ্বজদণ্ড**—স্বর্ণনির্মিত পতাকার দণ্ড । **রবিকুল-রবি**—সূর্যবংশীয় প্রধান । **যেমতি স্বর্ণচূড়……রাঘবের শরে** কৃষকের অস্ত্রের আঘাতে যেমন স্বর্ণবর্ণ পক্বশস্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তেমনি সূর্যবংশের প্রধান রামচন্দ্রের অস্ত্রাঘাতে অসংখ্য রাক্ষস সেনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে । **চাপি রিপুচয় বলী……কৌরবে**—হিড়িম্বার অশেষ স্নেহে বর্ধিত ভীমপুত্র শক্তিধর ঘটোৎকচ কর্ণের একাঘ্নী বাণে আহত হয়ে মৃত্যুকালে আপনার বিশালকায় দেহের পেষণে যেমন করে শত্রুদলকে দলিতমথিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়েছিলেন, বীরবাহুও সেইরূপ মৃত্যুমুহূর্তে শত্রুসৈন্যের উপর পড়ে তাঁর বিশালদেহের চাপে বহু সেনা বিনষ্ট করেছিলেন । **কালপৃষ্ঠধারী**—কর্ণ ; কর্ণের ধনুকের নাম কালপৃষ্ঠ । **মকর**—সামুদ্রিক মৎস্য বিশেষ । **মেঘশ্রেণী যেন…দৃঢ় বাঁধে**—প্রাসাদের ওপর থেকে রাবণ দূরে সাগরের ওপর রামচন্দ্র নির্মিত শিলাময় সেতুবন্ধ নিরীক্ষণ করলেন । দূর থেকে সেতুর কৃষ্ণবর্ণ প্রকাণ্ড পাথরগুলি নীল আকাশের কোলে স্থির নিশ্চল মেঘের মত দেখাচ্ছে । **ফণিধর**—বাসুকি । **দুইপাশে……নির্ঘোষে**—সমুদ্রের দুই তীর তরঙ্গ-উদ্বেল—মনে হচ্ছে অসংখ্য ফণাধারী নাগরাজ যেন ফুঁসে উঠেছে । **বীরকুলর্ষভ**—বীরকুলের অগ্রগণ্য অর্থাৎ রাবণ । **প্রচেতঃ**—সমুদ্র । **কি সুন্দর মালা……রত্নাকর**—কৃষ্ণবর্ণ শিলা নির্মিত সেতুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সমুদ্রকে রাবণ বিদ্রূপ করছেন । কৃষ্ণবর্ণ শিলা দিয়ে রচিত সেতুকে যদি মালা বলা যায়, তাহলে সে মালা সুন্দর নয়, কুৎসিত । (এখানে প্রশংসার ছলে সমুদ্রকে নিন্দা করা হয়েছে বলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয়েছে ।) এ মালা কি সমুদ্রের যোগ্য ? যে রত্নের আকর, তার গলায় কালো পাথরের মালা ? এটা কি সত্যই তার অলঙ্কার ?

কোন্ গুণে, কহ দেব, শুনি ৩০১
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন সম
ভীম পরাক্রমে! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে ৩০৫
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে,
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংশে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে. হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, ৩১০
কেন হে নির্দয় এবে তুমি তার প্রতি?
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"

এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্র মিত্র, সভাসদ-আদি ৩২০
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে!
হেনকালে চারি দিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুর-ধ্বনি, কিঙ্কিনীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনী দল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরী বন্ধন?!
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী
লতা! অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির ৩১৫
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন। ৩৩০

কিনেছে তোমারে—দাসত্বে মস্তক অবনত করতে তোমাকে বাধ্য করেছে। তুমি রামচন্দ্রের বশ্যতা স্বীকার না করলে তোমার ওপর সামান্য মানব কি শিলাময় সেতু নির্মাণ করতে পারতো? **প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি** গ্রীক পুরাণে সমুদ্রাধিপতি বরুণ বায়ুদেবের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কল্পিত হয়েছে। **নিগড়**—সেতুরূপ শৃঙ্খল। **বীতংশ** -পাখী ধরবার ফাঁদ। **অধম ভালুকে……বীতংশে**—ভালুক নিকৃষ্ট প্রকৃতির পশু বলে যাদুকর তাকে শৃঙ্খলিত করে খেলা দেখাতে পারে। কিন্তু কে কবে কোথায় শুনেছে পশুরাজ সিংহ পাখী ধরবার ফাঁদে ধরা দিয়েছে? **হৈমবতী পুরী**—স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী। **নীলাম্বুস্বামি**—নীল সমুদ্রকে সম্বোধন। **কৌস্তুভরতন**—বিষ্ণুর বক্ষস্থিত রত্ন বিশেষ। **জাঙাল**—সেতু, বাঁধ। **কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে**—কৌস্তুভ মণি যেমন বিষ্ণুর বক্ষোভূষণ, লঙ্কাপুরীও সেইরূপ সমুদ্রের বুকের অলঙ্কার। **বারীন্দ্র** সমুদ্র। **রোদননিনাদ মৃদু**—মৃদু ক্রন্দন ধ্বনি। **কিঙ্কিনীর বোল**—ঘুঙুরের শব্দ। **চিত্রাঙ্গদা**—ইনি বীরবাহুর জননী. রাবণের অন্যতমা পত্নী। বাল্মীকি রাবণে চিত্রাঙ্গদা চরিত্রটির কোন উল্লেখ নেই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে অবশ্য এর উল্লেখ আছে। **হিমানীতে যথা……বনসুশোভিনী লতা**—শীতকালে বন-লতিকার দেহ থেকে বর্ণ বিলসিত ফুলদল যখন ঝরে পড়ে, তখন সে সৌন্দর্যহীনা হয়ে

পড়ে, সুন্দরী চিত্রাঙ্গদা সেইরকম পুত্রশোকাতুরা বলে আভরণহীনা। **পদ্মপর্ণ**—পদ্মপত্র। কিন্তু এখানে পদ্মের পাপড়ী অর্থে ব্যবহৃত। চিত্রাঙ্গদার আঁখি শোকাশ্রুতে পরিপূর্ণ, তার সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন রাত্রের শিশির সম্পৃক্ত পদ্মের পাপড়ীর।

বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায় পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিলা সভাতে
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে ৩৩৫
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব!
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্র নীরে ৩৪০
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে রোষে, দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী; পাত্র মিত্র সভাসদ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী ৩৪৫
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়ী; দান আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র ধন-রক্ষণ রাজধর্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ কেমনে রেখেছ।
কাঙালিনী আমি' রাজা' আমার সে ধনে
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী;—৩৫৫
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী?
হায় বিধিবশে, দেবি সহি এ যাতনা
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনক পুরী!
দেখ বীরশূন্য এবে; নিদাঘে যেমতি
ফুল শূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী!
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে। দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি৩৬৫
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে!
এক পুত্র শোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শতপুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

বিহঙ্গিনী যথা……শাবকে -পাখীর বাসায় প্রবেশ করে সাপ পাখীর ছানাকে গ্রাস করলে মাতা পক্ষীর যে অবস্থা হয়, পুত্রহারা হয়ে চিত্রাঙ্গদারও সেই অবস্থা। **আসার**—জলধারা বর্ষণ। **জীমূতমন্দ্র**—মেঘের গর্জনধ্বনি। **নিষ্কোষিলা**—তরবারি কোষমুক্ত করল। **নিদাঘে** গ্রীষ্মকালে। **বরজ**—পান চাষ করার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া, উপরে আচ্ছাদন যুক্ত সুরক্ষিত স্থান। **বারুই**—বারুজীবী, পান চাষ করে যারা। **আপনি জলধি……তার অনুরোধে** রামচন্দ্রের অনুরোধে সমুদ্র পায়ে শিকল পরেছেন।

হায় দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমূলশিম্বী ফুটাইলে বলে ৩৭০
উড়ি যায় তুলারাশি। এ বিপুল কুল
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কালসমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব নন্দিনী, ৩৭৬
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।

কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি
তোমারে ?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব ৩৮০
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্মে হত পুত্রহেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশমম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
৩৮৫

শিমুল-শিম্বী শিমূলের বীজ কোষ। **বিধুমুখী**—চন্দ্রাননা। **গন্ধর্বনন্দিনী**—চিত্রাঙ্গদা চিত্রসেন গন্ধর্বের কন্যা। **ইন্দুনিভাননে**—চন্দ্রসদৃশ সুন্দর মুখ যাহার। **তিত অশ্রুনীরে**—শোকাশ্রু বর্ষণ করিতেছ।

উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রী দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
৩৯০
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসনে আসে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
৪০০
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি

কেহ, উর্দ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !
৪০৫

এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা কাঁদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে,
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে অভিমানে,
ত্যজি সুকনকাসন উঠিলা গর্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
৪১০
বীর শূন্য লঙ্কা মম ! একাল সমরে
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষস কুলের মান? যাইব আপনি। ৩৯৫
সাজ হে বীরেন্দ্র বৃন্দ লঙ্কার ভূষণ।
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুল মণি ! ৪১৫
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন

শূরসিংহ সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্বুর-বৃন্দ বীর মদে মাতি, ৪২০
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে
বারি হতে (বারিস্রোতঃ-সম পরাক্রমে
দুর্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজিরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে, রথ স্বর্ণচূড়; ৪২৫
বিভায় পুরিয়া পুরী।

প্রসূন—ফুল। **বীরপ্রসূন**- বীরত্বের সৌন্দর্যের প্রতীক বীরবাহু ফুলের মত। **প্রসূ** জননী। **দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত**—স্বর্ণলঙ্কা দেবরাজ ইন্দ্রেরও আকাঙ্ক্ষিত। **রজত প্রাচীর সম**—লঙ্কার চারপাশে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে দেখে মনে হয় যেন এটি লঙ্কা পুরীকে রূপোর প্রাচীরের মত বেষ্টন করে আছে। **তব হৈমসিংহাসন……দাশরথি**—তোমার সোনার সিংহাসনের লোভে কি রামচন্দ্র যুদ্ধ করছেন? **কাকোদর**—সাপ। **অরাবণ, অরাম বা……আজি**- এই পৃথিবীতে হয় রাবণ না হয় রাম—এ দুজনের মধ্যে একজন থাকবে। **নিকষানন্দন**—নিকষার পুত্র রাবণ। **দুন্দুভি**—ঢাক। **জীমূতমন্দ্র** - মেঘের গর্জন। **কর্বুরবৃন্দ** রাক্ষসগণ। **বারী**—হস্তিশালা। **বারণযূথ**—হস্তিদল। **মন্দুরা**—অশ্বশালা। **বাজিরাজী**—অশ্বসকল। **বক্রগ্রীব** বাঁকা ঘাড়। **মুখস্**—লাগাম। **রড়ে**—দ্রুত গতিতে।

পদাতিক ব্রজ,
কনক শিরস্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে বর্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনীকুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী,
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল। ৪৩৫

কনক শিরস্ক—সোনার শিরস্ত্রাণ। **ভাস্কর পিধানে অসিবর**—তাদের কোমরে উজ্জ্বল কোষে রয়েছে বৃহৎ তরবারি। **বর্ম**—ঢাল। **আয়সী আবৃত দেহ**—দেহ লৌহবর্ম দ্বারা সুরক্ষিত। **নিষাদী** - গজারোহী সৈনিক। **যথা মেঘ বরাসনে ব্রজপাণি**—যেন মেঘের পৃষ্ঠে আরোহণকারী ইন্দ্র। **সাদী**—অশ্বারোহী। **অশ্বিনী কুমার**—ঘোটকীরূপধারিণী সূর্যপত্নীর নাম অশ্বিনী। তাঁর গর্ভে অশ্বরূপীসূর্যের ঔরসে যমজ পুত্র জন্মে। তারাই অশ্বিনীকুমার বলে পরিচিত। **ভিন্দিপাল**—ভীষণ ক্ষেপনীয় অস্ত্র। **পরশু**—কুঠার।

রক্ষঃকুল ধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতন বর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয় ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে, ৪৪০
গরজিলা গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড টঙ্কারসহ অসির ঝনঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে।
টলিল কনক লঙ্কা বীর পদভরে;—
গর্জিলা বারীশ রোষে! যথা জল তলে

কনক-পঙ্কজ বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুনী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
করবী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি ৪৫০
মৃদুস্বরে ;—"কি কারণে, কহ, লো, স্বজনি
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা ?
দেখ থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয় সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি ? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে
সাধিনু সেদিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে ; কারাগারে রোধিতে সবারে।
৪৬০
হাসিয়া কহিলা দেব,—"অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরী, তরঙ্গিনী বিমল সলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত
তা হলে, পালিব আজ্ঞা"—তখনি স্বজনি
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা ?"
উত্তর করিলা সখী কলকল রবে ;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্র মহিষী
তুমি। এ ত ঝড় নহে ; কিন্তু ঝড়াকারে
৪৭০
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ—"সত্য, লো, স্বজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাঁহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেখানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশীমুখী বসি পদ্মাসনে ,৪৮০
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধি-গৃহ গিয়াছেন গৃহে।
উঠিলা মুরলী সখী বারুনী আদেশে,
জলতল ত্যজি যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্তি-ছটা
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে।

রক্ষঃ কুলধ্বজ—রাক্ষস বংশের পতাকা। **কেতনবর**—বিশাল ধ্বজা। **বিস্তারিয়া পাখা……অম্বরে**—আকাশে উড্ডীন বিরাট পতাকা দেখে মনে হয় যেন গরুড় আকাশে পাখা বিস্তার করে উড়ছে। **হয়ব্যূহ**—অশ্বসকল। **হ্রেষিল উল্লাসে**—আনন্দে অশ্বসকল চীৎকার ধ্বনি করল। **কোদণ্ড**—ধনু। **বারীশ** সমুদ্রপতি দেবতা বরুণ। **বারুণী** বরুণপত্নী। **আরাব**—শব্দ। **জলেশ**—বরুণ। **পাশী**—পাশ অস্ত্রধারী। [বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গটির মধ্যে ইংরেজী কবি Milton ও গ্রীক কবি Homer এর অনুকরণ আছে। Milton তাঁর Comus কাব্যে Severn নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Sabrina ও তার সখী Nymph Ligea এর কল্পনা করেছেন। Homer এর "ইলিয়াড" কাব্যে বর্ণিত সমুদ্রদেবী Thetis-ই মধুসূদনের কল্পনায় বারুণী চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গটি রামায়ণে বর্ণিত হয় নি, এটি কবির স্বকপোল কল্পিত। 'মুরলা' নামটি কবি ভবভূতির উত্তররামচরিত থেকে নিয়েছেন।]

জলশ্বরী—বারুণী। **তরঙ্গিণী**—নদী। **বৈদেহী**—বিদেহ রাজনন্দিনী সীতা। **যেখানে তাঁহার রাঙা পা দুখানি ইত্যাদি**—পুরাণে কথিত আছে দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মীদেবী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করেছিলেন। কবির কল্পনা, লক্ষ্মীদেবী সমুদ্রতলে যেখানে তাঁর সুন্দর চরণ যুগল রেখেছিলেন সেখানে স্বর্ণপদ্মবনের সৃষ্টি হয়। **আঁধার জলধিগৃহ**—লক্ষ্মীদেবীর অবর্তমানে সমুদ্রগর্ভ আবার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয়েছে।

সফরী—পুঁটিমাছ। **রজঃ**—ধুলি। কিন্তু কবি এখানে রজত অর্থে ব্যবহার করেছেন। **বিভাবসু**—সূর্য।

ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সমুখে, ৪৯০
যে রূপমাধুরী মোহে মদন মোহনে।
বহিছে বসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমল পদপরিমল-আশে
সুস্বনে। কুসুম রাশি শোভিছে চৌদিকে,
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজি যথা।
শত স্বর্ণ ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধমোদে আমোদি দেউলে
স্বর্ণ পাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈল পূর্ণ হীনতেজোঃ, ৫০০
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজ!
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল আসনে
পশে কি শোক হেন কুসুম হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে ৫১০
প্রণমিলা, নত ভাবে, আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী কহিতে লাগিলা।

"কি কারণে হেথা আজি, কহ লো মুরলে
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুনী, কভু কি আমি পারি তা ভুলিতে
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধ গুণে ৫২০
ভাল তো আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটে ছিল সুখে;
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি
তেঁই-পাশী প্রণয়িণী প্রেরিয়াছে এরে।
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা ৫৩০
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না—"হায়লো স্বজনি
দিন দিন হীন বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাত
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা ৫৩৫
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকায় রথী।

বসন্তানিল—মলয় বাতাস। **কমল-পদ পরিমল আশে**—লক্ষ্মীর চরণপদ্মের সুরভি লাভের বাসনায়। **খদ্যোতিকাদ্যোতি**—জোনাকির আলো। **ইন্দিরা**—লক্ষ্মীদেবী। **জলদলেশ্বরী**—বরুণমহিষীকে বলা হয়েছে। **হরির উরসে**—বিষ্ণুর বক্ষোদেশে। **পাশী প্রণয়িনী**—পাশ অস্ত্রধারী দেবতা বরুণের প্রিয়া অর্থাৎ বারুণী। **এরে**—স্বর্ণ পদ্মটিকে। **যাদঃপতি-রোধঃ যথা—চলোর্মি আঘাতে**—অবিরত প্রচণ্ড বেগশালী তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্রের তটভূমি যেমন করে ভেঙে ধ্বসে পড়ে, রাবণও তেমনি তার অধর্মাচারের জন্য ক্রমশঃ শক্তি হারিয়ে ধ্বসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। **যাদঃপতি**—সমুদ্র। **রোধঃ**—তীর বা কিনারা। **চলোর্মি**—বেগশালী তরঙ্গমালা। **ভীমাকৃতি**—ভীষণদর্শন। **অকম্পন**—একজন রাক্ষস সেনানী। **অতিকায়**—রাবণের এক পুত্রের নাম। ধান্যমালিনীর গর্ভে ইহার জন্ম।

আর যত রক্ষ আমি বর্ণিতে অক্ষম। ৫৩৭
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি,
ঐ যে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে ৫৪০
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবা নিশি
প্রমদা কুল রোদন! প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী"
শুধিলা মুরলা;—"কহ, শুনি, মহাদেবি
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব রমণী;
"না জানি কে সাজে আজি। চল লো মুরলে,
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ, ৫৫০
রক্ষঃকুল বালারূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূলবসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিনী; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়ন রঞ্জন কাঞ্চী কৃশকটি দেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা, ৫৫৫
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজ পথে

সাগরতরঙ্গ যথা পবন তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝড়াকারে
অধীরিয়া বসুধারে পদভারে, চলে ৫৬০
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল দণ্ড বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর [illegible] পাশে. হৈম নিকেতন
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবন মোহিনী ৫৬৫
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম আসার,
করিয়া মঙ্গল ধ্বনি। কহিলা মুরলা;
চাহি ইন্দিরার ইন্দু বদনের পানে;—
ত্রিদিব-বিভব: দেবি, দেখিতলে,
আজি! মনে হয় যেন, বাসব আপনি ৫৭০
সুরীশ্বর, সুর বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ শুনি কোন্ কোন্ রথী
রণহেতু সাজে এবে মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমল সতী কমলা নয়না;—
"হায় সখী বীরশূন্য স্বর্ণ লঙ্কাপুরী!
মহারথীকুল—ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয়

:ণ! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি!
(; যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড় রথে ৫৮০
মূর্তি বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দলপতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর দুর্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কালবলী, ভিন্দিপালপাণি।
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি ৫৮৫
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি। সমর-মদে মত্ত ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব?

মাধব রমণী—লক্ষ্মীদেবী। **রক্ষঃকুলবালারূপে**—রাক্ষস কুলনারীর বেশ ধারণ করে। **দুকুল বসনা**—পট্টবস্ত্রপরিহিতা। **নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে**—ক্ষীণ কটিদেশে নয়ন বিমোহন সুদৃশ্য চন্দ্রহার শোভা পাচ্ছে। **চক্রনেমি**—চাকার বেষ্টনী। **অধীরিয়া**—অধীর করিয়া। **কালদণ্ড**—যমের দণ্ড। **নিক্কণ**—বাদ্যধ্বনি। **কেতু**—পতাকা। **কুসুম আসার**—পুষ্পবৃষ্টি। **ত্রিদিববিভব**—স্বর্গপুরীর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধি। **স্বরীশ্বর**—স্বর্গলোকের অধিপতি। **সুর বল-দল**—দেবসৈন্যদল। **বীরূপাক্ষ**—একজন রাক্ষসসেনানী। **প্রক্ষেড়ন**—লৌহ নির্মিত ধনুক। **কালনেমি**—রাবণের শ্বশুর। **রিপুকুল কালবলী**—শক্তিধর কালনেমি অমিত তেজে শত্রুদলের যম স্বরূপ। **ভিন্দিপাল**—এক ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র। **তালজঙ্ঘা**—একজন রাক্ষসের নাম। **গদাধর যথা মুরারি**—গদাধর বিষ্ণুর মত দেখাচ্ছে। **প্রমত্ত**—একজন রাক্ষসের নাম।

শত শত হেন যোধ হত এ সমরে ৫৯০
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।”
সুধিলা মুরলা দূতি; কহ দেবীশ্বরি
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃকুল হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, একাল সমরে?”
উত্তর করিলা রমা সুচারু হাসিনী;—
“প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ নাহি জানি হত আজি রণে ৬০০
বীরবাহু; যাও তুমি বারুনির পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে এ কনক-পুরী
্যজিয়া বৈকুণ্ঠধামে ত্বরা যাব আমি।
ন্দদোষে মজে রাজা লঙ্কা অধিপতি।
া, বরিষারকালে বিমল সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দম উদগমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল আসনে যথা বসেন বারুনী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা ৬১০
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা ধামে
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা। পবন পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল ধনুঃ
বিবিধ রতন কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু, কুঞ্জবনে!
উতরি জলধিকূলে, পশিলা সুন্দরী
নীলঅম্বুরাশি। হেমা কেশব-বাসনা
পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ কুললক্ষ্মী, দূরে ৬২০
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি

মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চিররণ জয়ী
ইন্দ্রজিত। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারিদিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্মরিছে পাতা,
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে ৬৩০
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী স্বর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা স্বর্ণদ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।

দুলিছে নিষঙ্গ সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলসম, বেণীর মাঝারে
রত্নরাজী, তূণে শরমণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি স্বর্ণ কবচ
রবি-কর জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর ৬৪০
আয়ত-লোচন শর। নবীন যৌবন
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুর শিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা, মুরজ, মুরলী; ৬৪৫
সঙ্গীত তরঙ্গ মিশে সে রবের সহ।
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া।

মহীরুহব্যূহ—বৃক্ষরাজি। **দেবীশ্বরি**—লক্ষ্মীদেবীকে সম্বোধন। **রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষ্য**—সংগ্রামে যিনি রাক্ষসকুলের মধ্যে অমিত শক্তির আধার; সিংহ সদৃশ। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **মঞ্জু**—মনোরম। **কেশব-বাসনা**—লক্ষ্মীদেবী। **পদ্মাক্ষী**—পদ্মের মত সুন্দর নয়ন বিশিষ্ট। **নিষঙ্গসঙ্গে**—তীর রাখবার আধার অর্থাৎ তূণের সঙ্গে। **কিন্তু খরতর আয়ত-লোচনার**—নারীগণের কটাক্ষের শর প্রকৃত শর থেকে আরো তীক্ষ্ণ। **কাঞ্চী**—মেখলা বা চন্দ্রহার থেকে যে শব্দ হয়। **শিঞ্জিতে**—অলংকারের শব্দে।

বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে ৬৫০
ভানু সুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্ব মূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে।
মেঘ নাদ ধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমনী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বাসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্র কেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,

কহিলা, "কি হেতু মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল।' ৬৬০
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলি!
তার শোকে মহা শোকী রাক্ষসাধিপতি
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি, কে বধিলা কবে

প্রিয়ানুজে ? নিশা রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে ; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু ৬৭০
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে ; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ্র কহ দাসে।"
রত্নাকর—রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা ;—হায় ! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি ; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি ; রক্ষ রক্ষঃ কুল—
মান ; এ কাল সমরে, রক্ষঃ চূড়ামণি !"
ছিঁড়িলা কুসুম দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয় ৬৮০
দূরে ; পদতলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়। "ধিক্ মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার "হা ধিক্ মোরে ? বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে ?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ ; আন রথ ত্বরা করি ;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
হৈমবতী সুত যথা নাশিতে তারকে ৬৯০
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাট পুত্রসহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমী বৃক্ষ মূলে।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি। রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু কুলেশ্বরে) কহিল
কাঁদিয়া ধনী,'কোথা প্রাণসখে ৭০০

বরাঙ্গনা প্রমদা—রূপসী রমণীকুল মেঘনাদের সঙ্গে রয়েছে। **রজনীনাথ চন্দ্র**—রাত্রির ভূষণ চন্দ্র। **দক্ষ বালাদলে লয়ে**—দক্ষ প্রজাপতির অশ্বিনী, ভরনী কৃত্তিকা, রোহিনী ইত্যাদি সাতাশটি কন্যা ছিল। চন্দ্র তাদের স্বামী। চন্দ্র এই দক্ষবালাদের সঙ্গে যেমন ভ্রমণ করেন মেঘনাদও তেমনি প্রমদা কুলে মনের আনন্দে ভ্রমণ করেন। **ভানুসুতে** যমুনাকে সম্বোধন। যমুনা সূর্যকন্যা। **প্রভাষা**—এক রাক্ষসীর নাম। **বিশদ-বসনা**—শ্বেত বসন পরিহিতা। **অম্বুরাশিসুতা** লক্ষ্মীদেবীর বিশেষণ। সমুদ্র মন্থনে উত্থিত সামগ্রীর মধ্যে লক্ষ্মীদেবীই সর্বোৎকৃষ্ট। **রথীন্দ্রর্ষভ**—বীরশ্রেষ্ঠ। **কিরীটী**—অর্জ্জুন। **ইন্দ্রচাপরূপী**—রথের উপরে অবস্থিত বিচিত্র বর্ণ শোভিতা পতাকা ; দেখতে ঠিক আকাশের ইন্দ্রধনুর মত। **হেমলতা**—স্বর্ণলতা।

রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথ নাথ। তবে কেন তুমি, গুণ নিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি !"
উঠিল পবন পথে, ঘোরতর রবে,
রথীবর। হৈম পাখা বিস্তারিয়া যেন ৭২৫
উড়িল মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি !

শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে। কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিলা জলধি!
সাজিছে রাবণ রাজা, বীর মদে মাতি; ১২০
বাজিয়ে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ;
হ্রেষে অশ্ব; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিলা মেঘনাদ রথী। ১২৫
নাদিলা কর্বূরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা;—"হে রক্ষঃকুলপতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"
আলিঙ্গিয়া কুমারে, চুম্বি শিরঃ মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস। তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি। ১৪০
কে কবে শুনেছে পুত্র, ভাসে শিলা জলে
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ
বাঁচে?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি।
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে।" ১৫০
কহিলা রাক্ষস পতি; কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা

ব্রততী—লতা। **শিঞ্জিনী**—ধনুকের গুণ বা ছিলা। **কৌশিক ধ্বজ** রেশমী বস্ত্রে নির্মিত ধ্বজা। **কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা**—সোনার বর্মের উজ্জ্বল দীপ্তি। **কর্বূর-দল**—লঙ্কার রাক্ষসদল। **পামরে**—অধম রামচন্দ্রকে। **অসুরারি রিপু**—দেবরাজ ইন্দ্র অসুর কুলের অরি, তাঁর রিপু মেঘনাদ। **রুষিবেন দেব অগ্নি**—অগ্নি মেঘনাদের আরাধ্য দেবতা, পরাক্রমশীল পুত্র বর্তমান থাকতে পিতা যুদ্ধে গেলে পুত্রের কাপুরুষতা দেখে অগ্নিদেব ক্রুদ্ধ হবেন।

বজ্রাঘাতে তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্ট দেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস রাঘবের সাথে।” ১৬০
এতেক কহিযা রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; “নযনে তব, হে রাক্ষস পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি; ১৬৫
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোকপরিহরি, সতি!
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী। ১৭০
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম!
গুণিগণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী, ১৭৫
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে!
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি।
আকাশ-দুহিতা ওগো শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্ত কণ্ঠে, সাজে অরিন্দম ১৮০
ইন্দ্রজিৎ। ভযাকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ কুল-কালি
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।”
বাজিল রাক্ষস বাদ্য, নাদিল রাক্ষস,—
পূরিল কনক লঙ্কা জয় জয় রবে। ১৮৫

ইতি মেঘনাদ বধ কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথম সর্গ:

গঙ্গোদক—গঙ্গাজল। **অভিষেক** মাথায় পবিত্র গঙ্গাজল সিঞ্চন করে সৈনাপত্যে বরণ। **বিভাবরী**—রাত্রি। **কোদণ্ড**—ধনু। **আখণ্ডল**—দেবরাজ ইন্দ্র। **পশুপতি**—শিব। **পাশুপত**—শিব প্রদত্ত অস্ত্র। **আকাশ দুহিতা**—আকাশ-সম্ভবা প্রতিধ্বনিকে সম্বোধন। **কহ সবে মুক্ত কণ্ঠে**—প্রতিধ্বনি সমগ্র লঙ্কাভূমিকে প্রতিশব্দিত করে ঘোষণা করুক। **দণ্ডক অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত**—দাক্ষিণাত্যের দণ্ডক বনচারী বানর সকল।

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন প্রত্যেকটি সর্গশেষে সংস্কৃত ভাষায় সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। রক্ষোরাজ রাবণ কর্তৃক পুত্র মেঘনাদকে সৈনাপত্যে অভিষেক বর্তমান সর্গের প্রধান ঘটনা বলে এই সর্গটির নাম অভিষেক।

প্রথম সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপ

মহাকবি শ্রীমধুসূদন প্রথমে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির করুণা প্রার্থনা করে ও মধুকরী কল্পনাকে আহ্বান করে তাঁর কাব্য আরম্ভ করেছেন। কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পাত্র মিত্র সহ রাজসভায় সমাসীন—স্বর্ণময়ী লঙ্কা-ভূমির শোভা সৌন্দর্য জগতে অতুলনীয়, অনির্বচনীয়। রক্ষোরাজের এই অপূর্ব সুন্দর সভাগৃহ তাঁর বিস্ময়কর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে। কিন্তু দেবদুর্লভ সম্পদ-প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও লঙ্কাধিপতি রাবণের হৃদয় আজ মর্মচ্ছেদী শোক-বেদনায় ক্লিষ্ট, সভা মধ্যে তিনি নির্বাক হয়ে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে মকরাক্ষ নামক ভগ্নদূত দাঁড়িয়ে, সে বহন করে এনেছে রক্ষোরাজের বীরপুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ। রাবণের বুকে পুত্রশোকের মর্মান্তিক বেদনা বজ্রাঘাতের মত বাজছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণ শোকাকুল হলে সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করবার অভিপ্রায়ে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি স্বভাব-গম্ভীর বিরাট শক্তিধর পুরুষ; এই শোকের আঘাতে বিহ্বল মুহ্যমান হয়ে না পড়ে একে অতিক্রম করাই তো তাঁর উচিত। তদুপরি মায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে সব কিছুই তো নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী—পৃথিবীর সুখ দুঃখ মায়ারই লীলা, অজ্ঞানতা-নিবন্ধন মোহে বিভ্রান্ত হয়েই মানুষ শোক তাপের জালে জড়িয়ে পড়ে। লঙ্কাধিপতি রাবণ উত্তরে বললেন, মন্ত্রী সারণের সকল উক্তিই সর্বৈব সত্য, জগতের সকল কিছুই যে অনিত্য একথা তাঁর অবিদিত নয়। কিন্তু তবু মানুষের হৃদয় যন্ত্রণা সর্বদা যুক্তির পথে চলে না, প্রিয় বস্তু, প্রিয় জনকে হারালে সমস্ত অন্তর মর্মঘাতী বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। তখন সে যুক্তির শাসন মানে না।

অতঃপর রক্ষোরাজ কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করে ভগ্নদূত মকরাক্ষকে পরম বীর্য-শালী পুত্র বীরবাহুর সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। রাবণের আদেশে ভগ্নদূত আবেগপূর্ণ ভাষায় অমিত বীর্যের অধিকারী বীরবাহুর বিস্ময়কর শৌর্য বীর্য ও রণ কৌশলের কথা বিশদ বর্ণনা করল। বীর সন্তানের বীরত্বের পরিণতি শুনে বীর-পিতার অন্তরদেশ আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হারানো বীর্যকে তিনি যেন আবার ফিরে পেলেন। যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রিয় পুত্র বীরবাহু অন্তিম শয্যায় শায়িত, তা দেখবার জন্য স্বর্ণ লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে তিনি দেখলেন, কাঞ্চনসৌধ-পরিশোভিত মনোহর লঙ্কাপুরী তার অতুলন সৌন্দর্য নিয়ে প্রসারিত রয়েছে। সুদূর বিস্তৃত উন্নত প্রাচীরের ওপর বিবিধ অস্ত্রধারী শত শত রাক্ষস সেনা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নগর বাইরে অসংখ্য অগণিত রাঘব সেনাকে দেখা যাচ্ছে। অদূরে রণক্ষেত্র পুঞ্জীভূত শবে আকীর্ণ, মাংসাশী পশুপক্ষীর উন্মত্ত চীৎকারে প্রতিশব্দিত। সংগ্রাম ভূমির প্রেত মূর্তি, শ্মশান দৃশ্য দেখে রক্ষো-রাজের হৃদয় আবার শোকাকুল হয়ে উঠল, পুত্রের বিচ্ছেদজনিত অসহ্য মর্মযাতনায় তিনি হাহাকার করে উঠলেন। কিছুক্ষণ আক্ষেপ করে রাক্ষসরাজ রাবণ দূরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। যে-সমুদ্রের বুকে লঙ্কা নগরী শোভা পাচ্ছে, সে সমুদ্র আজ

সেতুবন্ধন রূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। ভাগ্য বিড়ম্বিত রাবণ শৃঙ্খলিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গভীর মনোবেদনায় খেদোক্তি করলেন।

রণক্ষেত্র প্রদর্শন করে লংকেশ্বর রাবণ রাজসভায় ফিরে এসেছেন, এমন সময় বীর-বাহুর জননী রাণী চিত্রাঙ্গদা পুত্রশোকে আর্তনাদ করতে করতে সহচরীগণসহ সেই সভাস্থলে প্রবেশ করলেন। পুত্রহারা জননীর আকুল ক্রন্দনে সভা গৃহে শোকের ঝড় বয়ে গেল—পাত্র-মিত্র-সভাসদ সকলেই অপরিসীম মর্মবেদনায় ক্রন্দন করে উঠল।

রক্ষোরাজ শোকাকুলা পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যে দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বীরবাহু মৃত্যু বরণ করেছে, চিত্রাঙ্গদা তো বীরমাতা—যে পুত্র বীর ধর্মের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তার জন্য শোকের কোন হেতু নেই। রক্ষোরাজের এই সান্ত্বনা বাক্যে শোকপীড়িতা চিত্রাঙ্গদার হৃদয় বেদনা কিন্তু প্রশমিত হ'ল না। উত্তরে তিনি বললেন, দেশবৈরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে প্রাণ বিসর্জন দেয়, সে সত্যই ভাগ্যবান, আর তার জননীও যথার্থ ভাগ্যবতী। কিন্তু রামচন্দ্র স্বর্ণ লঙ্কার সিংহাসন লোভে লঙ্কা নগরী আক্রমণ করেন নি। লঙ্কায় যে সমরাগ্নি প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছে, তার প্রধান হেতু রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ। রাক্ষসরাজ রাবণই এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী—রাবণের পাপকর্মের জন্যই বীরবাহুকে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে। সুতরাং পুত্রহারা জননীর শোকের সান্ত্বনা কোথায়?—"হায়, নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি",--এই শোক বাণী উচ্চারণ করে রোরুদ্যমানা চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

একদিকে পুত্রশোকের বেদনা, অন্যদিকে পত্নীর সুতীব্র গঞ্জনা—পুত্রহন্তার প্রতি প্রদীপ্ত ক্রোধে রাক্ষসরাজ রাবণের সকল চিত্ত জ্বলে উঠল। লঙ্কাভূমি আজ বীরশূন্য। দুরন্ত সংগ্রামে আর কাকে তিনি সৈনাপত্যে বরণ করে প্রেরণ করবেন? সুতরাং নিজেই তিনি যুদ্ধযাত্রার কঠোর সঙ্কল্প করলেন—'দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি! অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।" দেখতে দেখতে হাজার হাজার রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হ'ল .সুগম্ভীর রণবাদ্যে দিগ্‌দেশ প্রতি- শব্দিত হ'তে লাগল, রণোন্মত্ত সৈন্যদলের বীরপদভরে কনকলঙ্কা কেঁপে উঠল।

পৃথিবী কাঁপল, সঙ্গে সঙ্গে কাঁপল নিতল সমুদ্র। গভীর সাগর তলে যেখানে সমুদ্র-পত্নী বারুণী কেশ বিন্যাস করছিলেন, রাক্ষস সেনার প্রচণ্ড কোলাহল, তাদের প্রচণ্ড পদক্ষেপ সে স্থানকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলল।

সমুদ্রের এই আকস্মিক বিক্ষুব্ধতায় ও চাঞ্চল্যে বারুণী চমকিত বিচলিত হয়ে ভাবলেন, দেবতা প্রভঞ্জন বুঝি দুষ্ট বায়ুকুলকে সংগে নিয়ে আবার সমুদ্র তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবেই বুঝি সমুদ্রের এই আকস্মিক বিক্ষোভ। কিন্তু সখী মুরলা বারুণীকে জানাল যে, সমুদ্রের এই বিক্ষুব্ধতা বা চঞ্চলতা-

ঝটিকার আবির্ভাবজনিত নয়, রক্ষোরাজ রাবণের অগণিত সেনাবৃন্দের পদভরে ও গর্জন-কোলাহলেই পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে—সমুদ্র গর্ভেও তাই এই প্রচণ্ড আলোড়ন। লঙ্কার সমর বৃত্তান্ত বিশদ ভাবে অবগত হবার নিমিত্ত বারুণী তখন সখী মুরলাকে কনকলঙ্কা নিবাসিনী লক্ষ্মীর কাছে প্রেরণ করলেন।

মুরলা তখন লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত লক্ষ্মী দেবীর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বারুণীর কথা নিবেদন করল এবং রামচন্দ্র ও রক্ষোরাজ রাবণের যুদ্ধ সংবাদ সবিস্তারে জানতে চাইল। তখন রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী বিষাদ-ক্লিষ্ট কণ্ঠে মুরলাকে বললেন, লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ দিন দিন হীনবীর্য হয়ে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে। লঙ্কা নগরী আজ প্রায় বীরশূন্য হয়েছে—ভীমাকৃতি কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে মরেছে। অকম্পন নিহত হয়েছে, মহাবলী বীরবাহুও জীবিত নেই—রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে আরো কত কত রাক্ষসবীর প্রাণ হারিয়েছে। পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা নারীর মর্মচ্ছেদী হাহাকারে লঙ্কার আকাশ বাতাস প্রতিশব্দিত হচ্ছে—লঙ্কাপুরীতে কমলার অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছে, বীরশূন্য এই স্বর্ণলঙ্কা শীঘ্রই তিনি পরিত্যাগ করে যাবেন। বর্তমান মুহূর্তে কোন্ কোন্ রাক্ষস বীর যুদ্ধার্থ বহির্গত হবার জন্য সজ্জিত হয়েছে, মুরলা তা জানতে চাইলে লক্ষ্মী-দেবী বললেন, মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালে তিনি তার যথার্থ বৃত্তান্ত দিতে পারবেন।

এরপর তাঁরা দুজনে রক্ষোরমণীর ছদ্মবেশে মন্দিরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালেন। রাজপথে তাঁরা দেখলেন অগণিত রাক্ষস সেনার সংগ্রাম-অভিযান। মুরলা তখন ঐ সকল রক্ষোবীরের পরিচয় জানতে চাইলে দেবী তাকে রাক্ষস সেনানীবৃন্দের পরিচয় দিতে লাগলেন। এদের মধ্যে দেখা গেল বীরূপাক্ষ, কালনেমি, তালজঙ্ঘা, প্রমত্ত প্রভৃতি সুবিখ্যাত রাক্ষস বীরদলকে। এই অভিযানে বীরাগ্রগণ্য ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদকে দেখতে না পেয়ে মুরলা কমলাকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে কমলা বললেন, বোধ হয় মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার সঙ্গে লঙ্কার বহির্ভাগে অবস্থিত প্রমোদ উদ্যানে রয়েছেন। লঙ্কাভূমির আসন্ন বিপদের কথা হয়তো এখনো তার কর্ণ-গোচর হয় নি। হায়, নিজদোষেই রক্ষোরাজ নিজের সুবর্ণ লঙ্কার বিনাশ ডেকে আন-লেন—"পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কা, কেমনে এখানে আর বাস করি আমি?"

অতঃপর মুরলাকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রজিতের প্রমোদ-কাননের দিকে যাত্রা করলেন। মেঘনাদের ধাত্রীমাতার নাম প্রভাষা। লক্ষ্মীদেবী সেই প্রভাষার রূপ ধারণ করে প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাদকে বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানা-লেন এবং বললেন, বীর সেনাপতির অভাবে শোকবেদনাবিদ্ধ রাক্ষস-অধিপতি রাবণ নিজেই এবার সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন। রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে মেঘনাদ অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, নিশাযুদ্ধে তাঁরই শরাঘাতে রামচন্দ্রের প্রাণ বিনাশ ঘটেছে। প্রভাষার ছদ্মবেশধারিণী কমলা তাঁকে বললেন যে এতে বিস্ময়বোধ করবার কিছু নেই। রাম মায়াশক্তির অধিকারী,

মায়ার অলৌকিক প্রভাবেই আবার সে পুনর্জীবিত হয়েছে। অনতিবিলম্বে মেঘনাদের লঙ্কাভূমিতে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্য কর্তব্য।

বীরচূড়ামণি প্রিয় ভ্রাতা বীরবাহু নিহত, স্বর্ণলঙ্কা আসন্ন বিনাশের পথে ধাবিত। বীর সেনাপতির অভাবে শোকদীর্ণ হৃদয়ে পিতাকে অবশেষে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছে—আর মাতৃভূমির এই চরম বিপদ মুহূর্তে তিনি রমণীকুল পরিবেষ্টিত হয়ে বিলাস ব্যসনে নিমগ্ন হয়ে রয়েছেন! বেদনায় আত্মগ্লানিতে, ক্ষোভে, রোষে রাক্ষসকুলভরসা ইন্দ্রজিতের সকল অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। রোষভরে মেঘনাদ বিলাসসজ্জা দূরে নিক্ষেপ করলেন, বীরবেশে সজ্জিত হলেন এবং রথে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। পত্নী প্রমীলা স্বামীর বিচ্ছেদ শঙ্কায় কাতর হলে মেঘনাদ তাঁকে বললেন, সমরে শত্রু পক্ষকে মুহূর্তে ধ্বংস করে তিনি অবিলম্বে প্রমোদকাননে প্রত্যাবর্তন করবেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন। এমন সময় মেঘনাদ সেখানে উপস্থিত হলেন এবং পিতৃচরণে প্রণত হয়ে যুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। আগেও তিনি রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। তাঁর সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে রামচন্দ্র তাঁরই অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু পরম বিস্ময়ের কথা, রামচন্দ্র আবার নাকি বেঁচে উঠেছেন। কোন মায়াবলে রামচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করলেন, তা মেঘনাদের বুদ্ধি ও চিন্তার অগম্য। সে যাই হোক। পিতা যদি এবার তাঁকে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দান করেন, তাহলে তিনি রামচন্দ্রকে সমূলে ধ্বংস করবেন, নতুবা তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করে পিতার সমক্ষে উপস্থিত করবেন।

প্রত্যুত্তরে পুত্রশোকাতুর রাবণ বললেন, এই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে মেঘনাদকে সৈনাপত্য বরণ করতে তিনি শঙ্কা অনুভব করছেন। কেননা, ভাগ্যবিধাতা আজ তাঁর প্রতি একান্ত প্রতিকূল। বীরদর্পে মেঘনাদ উত্তর করলেন, রামচন্দ্র সামান্য মানব মাত্র। স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর হয়ে রাবণ তাকে ভয় করছেন, এটাই আশ্চর্য! তাছাড়া পুত্রের বর্তমানে পিতা যুদ্ধ যাত্রা করছেন শুনলে পুত্রের অপযশ ত্রিভুবনে প্রচারিত হবে। যুদ্ধে যাবার অনুমতি লাভ করলে মেঘনাদ এবার রামচন্দ্রের পুনর্জীবনের সকল সম্ভাবনা বিলুপ্ত করবেন।

রাক্ষসপতি পুত্রকে বললেন, বিধি যে তাঁর প্রতিকূলতা করছে তার প্রমাণ, মহাবীর কুম্ভকর্ণের অকালমৃত্যু—দৈবের বিরোধিতার কাছে মর্ত্যলোকচারীর শৌর্য-বীর্য-পরাক্রম সবই নিষ্ফল। তবে, যদি মেঘনাদ যুদ্ধগমনে একান্তই অভিলাষী, তাহলে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তিনি যেন আপনার আরাধ্য দেবতা অগ্নির উদ্দেশ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অতঃপর রক্ষোরাজ পুত্র মেঘনাদকে যথাবিধি সেনাপতি পদে বরণ করলেন। রাক্ষসকুলভরসা রথিশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত দেখে রাক্ষস সৈন্যেরা অপার আনন্দে কোলাহল করে উঠল। স্তুতিপাঠকেরা উল্লসিত চিত্তে বন্দনা সংগীত উচ্চারণ করল—বিষাদক্লিষ্ট লঙ্কাপুরীর বুকে জেগে উঠল আশা ও আনন্দের কলকল্লোল।

মেঘনাদ বধ কাব্য
দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদি;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে,
গোষ্ঠ গৃহে গাভী বৃন্দ ধায় হাম্বারবে। ৫
আইলা সুচারু-তারা-শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে;
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা
আইলেন নিদ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল ১০
জননীর ক্রোড়নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেব সভা মাঝে, ১৫
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোমনন্দিনী
চারুনেত্রা, রাজছত্র মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র শিরে। রতনে খচিত
চামর, যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন কানন,— ২০
গন্ধ মধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিমতী
ছত্রিশ-রাগিনী সহ, আসি আরম্ভিলা
সংগীত। উর্বশী, রম্ভা সুচারু হাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনি মিশ্রকেশী, আসি ২৫
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব কুলমনঃ।
যোগায় গন্ধর্ব স্বর্ণপাত্রে সুধারস।
কেহ-বা দেব-ওদন; কুমকুম্, কস্তুরী,
কেশর, বহিছে কেহ; চন্দন কেহ-বা;
সুগন্ধ মন্দারদাম গাঁথি আনে কেহ। ৩০
বৈজয়ন্তধামে সুখে ভাসেন বাসব
ত্রিদিবনিবাসী সহ; হেন কালে তথা
রূপের আভায় আলো করি সুরপুরী,
রক্ষঃ কুল রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে ৩৫
শচীকান্ত। আশীষিয়া, হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা: "হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।

অস্তগেলা দিনমণি—বীরবাহু যেদিন নিহত হলেন, সেইদিন রক্ষোরাজ রাবণ পুত্র মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন। তাঁর সেনাপতি পদে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরক্ষণেই লঙ্কাপুরীতে সূর্য অস্তমিত হ'ল। মনোরম সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে কবি দ্বিতীয় সর্গ আরম্ভ করেছেন। **একটি রতন ভালে**—গোধুলি সময়ে আকাশে শুধুমাত্র শুকতারাকেই দেখা যায়। উপমানকে উপমেয় রূপে নির্দেশ করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়েছে। **মুদিলা সরসে……নলিনী**—সান্ধ্য মুহূর্তে পাপড়ি-

গুলি শুষ্ক সংকুচিত হয়ে যায়। কবি সূর্য এবং পদ্মে নায়ক-নায়িকার ভাব আরোপ করে বলেছেন, গোধূলিক্ষণে প্রিয়তম সূর্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ হেতুই মর্মবেদনায় পদ্ম বুঝি চক্ষু নিমীলিত করল। অচেতন পদার্থের ওপর চেতন পদার্থের গুণ আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়েছে। **কূজনী**—কলধ্বনি করে। **ভূচর সহ জলচর আদি**—সমগ্র প্রাণী জগৎ। **শশিপ্রিয়া**--রাত্রি দেবী। **ত্রিদশ আলয়ে**—স্বর্গভূমিতে। **পুলোমনন্দিনী**—শচীদেবী। পুলোমা নামক দানবের কন্যা শচীকে ইন্দ্র পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। **ত্রিদিব-বাদিত্র**—স্বর্গের বিচিত্র বাজনা। **শিঞ্জিতে রঞ্জি**—নৃত্যপরায়ণা অপ্সরাদলের অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি দেবতাদের মনোরঞ্জন করছিল। **ওদন**—অন্ন। **মন্দারদাম**—স্বর্গীয় পুষ্প মন্দারের মালা। **বৈজয়ন্ত ধাম**—ইন্দ্রের অমরাবতী। **ত্রিদিব নিবাসী সহ**—স্বর্গের অন্যান্য দেবগণ সহ। **রমা**—লক্ষ্মী দেবী। **শচীকান্ত**—ইন্দ্র। **পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ষোনিবাসিনী**—শ্বেতপদ্মকে বলা হয় পুণ্ডরীক। এই পুণ্ডরীক-কোরকের মত আয়ত ও সুন্দর অক্ষি যাঁহার-তিনিই পুণ্ডরীকাক্ষ। অর্থাৎ দেবতা বিষ্ণু। লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর হৃদয়-বাসিনী।

উত্তর করিলা ইন্দ্র : হে 'বারীন্দ্র সুতে'
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা, মা গো ! যার প্রতি তুমি
কৃপা করি, কৃপাদৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জন্ম তার। কোন পুণ্য ফলে
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে?" ৪৫
কহিলেন পুনঃ রমা : 'বহু কালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ লঙ্কা ধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ ! হায়, এতদিনে
বাম তার প্রতি বিধি ! নিজ কর্ম দোষে ৫০
মজিছে বংশে পাপী ; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব ! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হ'তে ? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে। ৫৫
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্র বিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কা ধামে
এবে ; আর বীর যত, হত এ সমরে।
বিক্রম কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে ; পুনঃ তারে সেনাপতি পদে
বরিয়াছে দশানন। দেবকুলপ্রিয়
রাঘব ; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সংকটে ৬৫
ঠেকিবে বৈদেহী নাথ, কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
'দেবেন্দ্র ! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বলজ্যেষ্ঠ, রক্ষঃকুল শ্রেষ্ঠ শূর মণি।'
এতেক কহিয়া রমা কেশব বাসনা ৭০
নীরবিলা ; আহা মরি, নীরবে যেমতি,
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে ;
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী আদি যত—
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম ; বসন্তকালে, পাখীকুল যথা, ৭৫
মুঞ্জরিত কুঞ্জে শুনি পিকবর ধ্বনি !
কহিলেন স্বরীশ্বর : "এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে

রাঘবে ? দুর্বার রণে রাবণ নন্দন !
পন্নগ—অশনে নাগ নাহি ডরে যত, ৮০
ততোধিক ডরি তারে আমি ! এ দম্ভোলি
বৃত্রাসুর শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্রবলে মহাবলী ; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্বশুচি বরে
সর্ব জয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে, ৮৫
যাই আমি শীঘ্র গতি কৈলাস সদনে ;

হে বারীন্দ্রসুতে—লক্ষ্মীদেবীকে সম্বোধন। দুর্বাসার অভিশাপে লক্ষ্মীদেবী কিছু-কাল সমুদ্রগর্ভে অবস্থান করেছিলেন, এবং দেবাসুর কর্তৃক সমুদ্রমন্থন কালে তিনি সাগর-গর্ভ থেকে উঠে এসেছিলেন। এইজন্য লক্ষ্মীদেবী সমুদ্রের কন্যা রূপে কল্পিত হয়েছেন। **বিশ্বরমে**—বিশ্ববিমোহিনী। **হে বৃত্র বিজয়ি**—ইন্দ্রকে সম্বোধন। **বৈদেহী নাথ**—রামচন্দ্র। **বিক্রম কেশরী শূর**—বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ দুর্নিবার পরাক্রমে কেশরী বা সিংহের তুল্য। **দেবকুলপ্রিয় রাঘব**—ধর্মপরায়ণ বলেই রামচন্দ্র দেবকুলের প্রিয়। **মন্দোদরীর নন্দন**—মেঘনাদ। **বৈনতেয় যথা বলজ্যেষ্ঠ**—বিনতার পুত্র গরুড় পরাক্রমে পক্ষিকুলে যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি রাক্ষসকুলে শৌর্যবীর্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন ইন্দ্রজিৎ—মেঘনাদ। **কেশব বাসনা**—বিষ্ণুর আকাঙ্ক্ষার ধন অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী। **স্বরীশ্বর**—স্বর অর্থাৎ স্বর্গলোকের অধিপতি দেবতা ইন্দ্র। **পন্নগ অশনে**—পন্নগ (সর্পকুল) অশন (খাদ্যবস্তু) যাহার অর্থাৎ গরুড়কে। **দম্ভোলি**—দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তধৃত বজ্রাস্ত্র। **বৃত্রাসুর শিরঃ চূর্ণ যাহে**—ঐ বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করেই দেবরাজ বৃত্রা-সুরকে নিহত করেছিলেন। **বিমুখয়ে**—ইন্দ্রের বজ্রকেও প্রতিহত করে। **তেঁই**—সেই হেতু। **সর্বশুচিবরে**—অগ্নিদেবতার কৃপায়। **কৈলাস সদনে**—কৈলাসে মহাদেবের নিকট।

কহিলা উপেন্দ্রপ্রিয়া বারীন্দ্র নন্দিনী :
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি—
চন্দ্রশেখরের পদে কৈলাস শিখরে,
নিবেদন কর দেব এ সব বারতা ! ৯০
কহিও সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে।
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে। ৯৫
কহিও, বৈকুণ্ঠ পুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে ১০০
রাখে দূরে ?—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটা-
ধরে।
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা !" এতেক কহিয়া
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর পথে সুকেশিনী ১০৫
কেশববাসনা দেবী গেলা অধো দেশে,—
সোণার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে !
আনিলা মাতাল রথ ; চাহি শচীপানে

কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে ১১০
একান্তে : "চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি;
পরিমল সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার ! মৃণালের রুচি
বিকচ কমল গুণে, শুন, লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী, ১১৫
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিলা ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান ; সচকিতে জগৎ জাগিলা, ১২০
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা। ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত ;
পুরিল নিকুঞ্জ পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে !
বাসরে কুসুমশয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুল বধূ, গৃহকার্য উঠিলা সাধিতে ! ১২৫
মানস সকাশে শোভে কৈলাস শিখরী
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে।
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণ ফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি, পীত ধড়া
যেন। ১৩০

উপেন্দ্রপ্রিয়া—বিষ্ণুর প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী। **বারিন্দ্রনন্দিনী**—সমুদ্রগর্ভোত্থিতা লক্ষ্মীদেবী। **সুরনাথ**—ইন্দ্র। **চন্দ্রশেখর**—মহাদেব। **বসুন্ধরা সতী**—পৃথিবী। **না পারি সহিতে ভার**—অধর্মচারী রাবণের দুষ্কৃতিজনিত পাপভারের দুঃসহ পীড়ন সহ্য করতে না পারে। **অনন্ত ক্লান্ত এবে**—রাবণের দুষ্কৃতি সম্ভূত পাপ ভারে পৃথিবী ধারণ কারী অনন্ত বা বাসুকি নাগও ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন। **না হইলে নির্মূল সমূলে রক্ষঃপতি**—লক্ষ্মীদেবীর এই ভক্তদ্রোহী মনোভাব তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করেছে। **বিশ্বজটাধরে**—মহাজ্ঞানী মহাদেবকে। **ত্র্যম্বক**—ত্রি (তিন) অম্বক (নেত্র) যাঁহার, মহাদেব। **অম্বিকা**—দুর্গা। **অনম্বর পথে**—আকাশ পথে। **মাতলি**—ইন্দ্রের সারথি। **শচীকান্ত**—ইন্দ্র। **পরিমল সুধা**—সুমধুর গন্ধ। বিকচ—বিকশিত। **নতম্বিনী**—সুন্দরী। **দেবযান**—দেবরথ। **সচকিতে জগৎ জাগিলা**—অত্যুজ্জ্বল ইন্দ্ররথের দীপ্তিতে বিশ্ববাসী চমকিত হ'ল, তাদের নিদ্রা ছুটে গেল। **কৈলাশ শিখরী**—কৈলাস পর্বত। **ভবের ভবন**—মহাদেবের আবাসস্থল। **সুশ্যামাঙ্গশৃঙ্গধর**—শ্যাম তরুরাজি পরিশোভিত পর্বত। **পীতধড়া**—পীত বসন।

নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে,
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপু !
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ ভবনে।
রাজরাজেশ্বরী রূপে বসেন ঈশ্বরী ১৩৫
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজছত্র জয়া ! হায় রে কেমনে,
ভব ভবনের, কবি বর্ণিবে, বিভব ?
দেখ। হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে !
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে ১৪০
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা : "কহ, দেব, কুশল বারতা,

কি কারণে হেথা আজি তোমা দুইজনে ?
   করযোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি নিক্ষেপী
"কি না তুমি জান, মাতঃ অখিল জগতে ? ১৪৫
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি পদে। কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে। ১৫০
অবিদিত নহে মাতঃ তার পরাক্রম।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত ধামে
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি।
কহিলেন হরিপ্রিয়া : কাঁদে বসুন্ধরা
এ অসহভার সতী না পারি সহিতে; ১৫৫
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী—তব পদে এ সংবাদ, দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে !
দেব কুলপ্রিয় বীর রঘুকুল মণি। ১৬০
কিন্তু দেব কুলে হেন আছে কোন রথী,
যুঝিবে যে রণভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে !
কি উপায়ে কাত্যায়নী রক্ষিবে রাঘবে, ১৬৫
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি !"
   উত্তরিলা কাত্যায়ণী : "শৈবকুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু ১৭০
সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র ; তেঁই, দেব লঙ্কার এ গতি !"
কৃতাঞ্জলি পুটে পুনঃ বাসব কহিলা—
"পরম অধর্মাচারী নিশাচর পতি—
দেবদ্রোহী ! আপনি হে নগেন্দ্র নন্দিনি, ১৭৫
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি

নির্ঝর ঝরিত—নির্ঝর হইতে উৎসারিত। **বিশদ চন্দনে**—শ্বেত চন্দনে। **স্বরীশ্বরী**—ইন্দ্রানী শচী। **আনন্দ ভবনে**—কৈলাস পুরীতে। **বিজয়া, জয়া**—দুর্গার সখিদ্বয়। **অম্বিকা**—দুর্গা। **দম্ভোলি নিক্ষেপী**—বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ কারী ইন্দ্র। **কুমার**—মেঘনাদ। **পরন্তপ**—শত্রুপীড়নক্ষম। **বৈজয়ন্ত ধামে**—ইন্দ্রের প্রাসাদে। **হরিপ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী। **এ অসহভার**—রাবণকৃত পাপের দুঃসহ ভার। **বিশ্বধর শেষ**—পৌরাণিক প্রসিদ্ধি এই যে, সর্পরাজ অনন্ত বা শেষ আপনার মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন। **তিনিও আপনি**—লক্ষ্মীদেবী নিজেও। **দেবী আদেশিলা**—লঙ্কার রাজলক্ষ্মী আদেশ করলেন। **রাবণি**—রাবণের পুত্র মেঘনাদ। **বিশ্বনাশী কুলিশে**—ইন্দ্রের যে বজ্রাস্ত্র সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করতে সমর্থ, তাকেও। **কাত্যায়নী**—দেবী দুর্গাকে সম্বোধন। **অরাম করিবে ভব**—পৃথিবীকে রামশূন্য করবে। **শৈবকুলোত্তম নৈকষেয়**—নিকষার পুত্র রাবণ একজন শ্রেষ্ঠ শিবভক্ত। **ত্রিশূলী**—

মহাদেব। **তাপসেন্দ্র**—যোগিশ্রেষ্ঠ মহাদেব। **নিশাচর পতি**—রাক্ষসপতি রাবণ। **নগেন্দ্র নন্দিনি**—হিমালয় কন্যা পার্বতীকে সম্বোধন। **দরিদ্রের ধন**—রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট বনচারী—তাই তিনি দরিদ্র, সুতরাং কৃপার পাত্র।

কভু কি উচিত, মাতঃ সুশীল রাঘব
পিতৃসত্য রক্ষা হেতু, সুখ ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী বেশে নিবিড় কাননে। ১৮০
একটি রতন মাত্র আছিল তাহার—
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিব দাস ? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট। হায়, মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মনঃ! ত্রিশূলীর বরে ১৮৫
বলী রক্ষঃ, তৃণজ্ঞান করে দেবগণে!
পরধন, পরদার লোভে সদা লোভী,
পামর। তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ় দয়া তুমি কর, দয়াময়ি।"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা ১৯০
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে :
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবী কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক বনে বসি দিবানিশি
[কুঞ্জবন সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি]
কাঁদেন রূপসী শোকে! কি মনোবেদনা ১৯৫
সহেন বিধু বদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে।
আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে দেবী,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে ? নাশি মেঘনাদে
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে ; ২০০
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ শশাঙ্ক ধারিণি!
মরি. মা, শরমে আমি, শুনি লোক মুখে,
ত্রিদিব ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভব রণে।"
হাসিয়া কহিলা উমা : "রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী ২০৫
শচি!—তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে!
দুইজনে অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃকুল ; তিনি বিনা তব এবাসনা ২১০
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে ?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহাভয়ঙ্কর
ঘন ঘনাবৃত ; তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র! কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে ? ২১৫
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"
কহিল বিনীত ভাবে অদিতি নন্দন :
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তিদায়িনী
জগদম্বে, যায় যে, সে, যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব ? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ কুল, রাখ ২২০
ত্রিভুবন ; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা ;
হ্রাসো বসুধার ভার ; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির ; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্যরিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পুরিল ২২৫
পুরী ; শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল নিক্কণ সহ, মৃদু, যথা যবে

দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি।
টলিল কনকাসন। বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে ভবেশভাবিনী ২৩০
সুধিলা: "লো, বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা, কি হেতু মোরে পূজিছে
অকালে?

একটি রতন মাত্র—পত্নী সীতাই রামচন্দ্রের কাছে অমূল্য রত্ন সম। **পাতি মায়াজাল**—মারীচের স্বর্ণ মৃগের রূপ ধারণ। **পামর** দুরাত্মা। **বীণাবাণী**—ইন্দ্রানীর কণ্ঠস্বর বীণা ধ্বনির মত মধুর। **কুঞ্জবন সখী......যেমতি**—কুঞ্জবনের প্রিয় পাখী পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে যেমন করে দুঃখ প্রকাশ করে, তেমনি। **রূপসী**—সীতা। **শশাঙ্ক ধারিণি**—দুর্গাকে সম্বোধন। **জিষ্ণু**—সতত জয়শীল ইন্দ্র। **মঞ্জু নাশিনী**—শচীর এক নাম। ['মঞ্জুনাশী' শব্দটি স্ত্রীলিংগ। সুতরাং 'মঞ্জু নাশিনী' কথাটি ব্যাকরণ গত নয়] **বিরূপাক্ষ**—মহাদেব। **যোগাসন নামে শৃঙ্গ** কৈলাশ পর্বতের এই শৃঙ্গটি মধুসূদন কল্পিত। **যোগীন্দ্র**—মহাদেব। **পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা**—পক্ষিশ্রেষ্ঠ গরুড় যে সুউচ্চ দুর্গম শৃঙ্গে গমন করতে অসমর্থ, সেখানে ইন্দ্র কেমন করে যাবেন। **অদিতি নন্দন**—অদিতির পুত্র ইন্দ্র। **মঙ্গল নিক্কণ**—পূজাকালীন মঙ্গল ধ্বনি। **টলিল কনকাসন**—দেবী দুর্গা চমকিত হয়ে উঠলেন। **ভবেশ ভাবিনী**—শিবের চিত্তবিমোহিনী দুর্গা। **পূজিছে অকালে** অর্থাৎ শরৎকালে।

মন্ত্রপড়ি, খড়ি পাতি গণিয়া গগনে,
নিবেদিলা হাসি সখী: "হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।২৩৫
বারি সংঘটিত ঘটে, সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয় প্রদান তারে কর গো, অভয়ে!
পরম ভকত তব কৌশল্যা নন্দন ২৪০
রঘুশ্রেষ্ঠ; তারে তর বিপদে, তারিণি!
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী:
"দেবদম্পতীরে তুমি সব যথাবিধি,
বিজয়ে যাইব আমি, যথা যোগাসনে
(বিকট-শিখর) এবে বসেন ধূর্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদগামিনী
প্রবেশিলা হৈমগৃহে। দেবেন্দ্র বাসবে,
ত্রিদিবমহিষী-সহ সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।২৫০
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া আসি দোলাইল
তারাকারা ফুলমালা; কবরী বন্ধনে।
বসাইলা চিররুচি, চিরবিকশিত
কুসুম-রতন রাজী; বাজিল চৌদিকে২৫৫
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া
মোহিল কৈলাস পুরী, ত্রিলোক মোহিল
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি
হাসিলা মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন!
নিদ্রাহীন বিরহিনী চমকি উঠিলা, ২৬০
ভাবি প্রিয় পদশব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে! কোকিলকুল নীরবিল বনে।

উঠিলেন যোগী ব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা।
প্রবেশি স্বর্ণ গেহে, ভবেশ-ভাবিনী ২৬৫
ভাবিলা, "কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে ?
ক্ষণকাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।
যথায় মন্মথ সাথে, মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতে ছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়—২৭০
বায়ু তরঙ্গিনী রূপে, বহিলা নিমেষে।
নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে ! গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু পথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী ২৭৫
নমে ত্বিষম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরিপ্রিয়া পদে !
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র ; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,২৮০
কহ মোরে, বিধুমুখি ?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী—"ধর,দেবি, মোহিনী মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপুঃ, আনি
নানা আভরণ ; হেরি যে সবে, পিনাকী।
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি হেরি ২৮৫
মধু কালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা।"

খড়ি পাতি—গণনা করবার জন্য খড়ি দিয়ে মাটিতে ছক কাটা। **নগনন্দিনী**—হিমালয় কন্যা উমা। **দাশরথি**-দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। **বারি সংঘটিত**—বারি পূর্ণ। **নীলোৎপলাঞ্জলি**—কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, রামচন্দ্র নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর পূজা করেছিলেন। **তারিণী** ত্রাণকর্ত্রী। **দেবদম্পতীরে**—দেবরাজ ইন্দ্র ও শচী দেবীকে। **বিরাট শিখর**—সমুচ্চ দুর্গম শৃঙ্গ। **ধূর্জটি** মহাদেব"। **দ্বিরদগামিনী** - গজের মতো মন্থর গতি বিশিষ্টা। **ত্রিদিব মহিষী**—ইন্দ্রাণী। **চিররুচি**-চির সুন্দর। **চির বিকশিত**--যা চিরকাল প্রস্ফুটিত থাকে। **যোগিব্রজ**—যোগিবৃন্দ। **ভবেশ ভাবিনী**-শিব ভাবিনী দুর্গা। **মন্মথ**—মদন। **মন্মথ মোহিনী**—মদনের পত্নী রতি। **বরাননা**—সুশ্রীনয়না। **কামবধূ**—কাম দেবতা মদনের পত্নী রতি। **সরোজিনী**—পদ্ম। **ত্বিষাম্পতি দূতী**—সূর্যের দূতী উষা। **হরিপ্রিয়াপদে**—উমার চরণে। **সরসে নিশান্তে......হরিপ্রিয়াপদে**—দেবী ভবানী স্মরণ করিবামাত্রই রতি এসে অবনত মস্তকে ভবানীর চরণে প্রণাম জানাল। মনে হল যেন, প্রভাতে সরোবরে বিকশিত মনোহর কমল পুষ্পটি মৃদু বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে বিশ্বের মনোহারিণী সূর্য দূতী রূপসী উষার চরণ উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাল। **সুকেশিনী**—রূপসী রতি। **বর বপুঃ**—সুন্দর দেহ। **পিনাকী**--মহাদেব। **ঋতুপতি**---বসন্তদেব।

এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল; বিনানিলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবধ ভূষণে,
হীরক, মুকুতা, মনি খচিত; আনিলা ২৯০
চন্দন, কেশর সহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবন মোহিনী
সাজিলা নগেন্দ্র বালা; রসানে মার্জিত ২৯৫
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ বিকচিত রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মরহর প্রিয়া স্মরপ্রিয়া পানে, ৩০০
"ডাক তব প্রাণ নাথে।' অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতু বার!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী,
স্বদেশ সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিরে উল্লাসে! ৩০৫
কহিলা শৈলেশ সুতা; "চল মোর সাথে
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগী পতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—৩১০
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ দাসেরে?
স্মরিলে পূর্বের কথা, মরি মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষদোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি,
তোমার বিরহ-শোকে বিশ্বভার ত্যজি ৩১৫
বিশ্বনাথ, আরম্ভিলা ধ্যান; দেব পতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সেধ্যান ভাঙিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল ধনুঃ হানিনু কুক্ষণে
ফুল শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে ৩২০
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙ্গা পায়ে? হাহাকার রবে, ৩২৫
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!—
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;—
ক্ষম দাসে ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী; —৩৩০
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ। আমার বরে চিরজয়ী তুমি।
যে অগ্নি, কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ নাশ কারী ৩৩৫
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে।"
প্রণমিয়া কাম তব উমার চরণে,
কহিলা, অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল পদে,
কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী ৩৪০
বাহিরিবা কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে?
মুহূর্তে মাতিবে মাতঃ, জগত, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে।

বিনানিলা—বেণী রচনা করল। **ধনি**—সুন্দরী যুবতী নারী, এখানে রতিকে বোঝাচ্ছে। **কৌষেয় বসনে**—পট্টবস্ত্রে। **লাক্ষারস**—অলক্তক রসে অর্থাৎ আল্‌তা দিয়ে। **নগেন্দ্রবালা**—হিমালয় কন্যা পার্বতী। **রসানে মার্জিত** রসান এক রকমের পাথর বিশেষ যার দ্বারা ঘষলে সোণা আরও উজ্জ্বল হয়। রাসায়নিক দ্রব্য বিশেষকেও রসান বলা যেতে পারে। **নিজবিকচিত রুচি**—নিজের প্রস্ফুটিত কান্তি। **স্মরহরপ্রিয়া**—দুর্গা। **স্মর** কামদেব। **স্মরহর**—মহাদেব। **স্মরপ্রিয়া** রতি। **শৈলেশসুতা**-হিমালয় কন্যা উমা। **ত্রাসে**-ভয়ে। **বামদেব**—শিব। **বিভাবসু**—অগ্নি। **ভবেশ্বরি**-দুর্গাকে সম্বোধন। **ভবেশ্বরি ভালে**-মহাদেবের ললাট দেশে। **ক্ষেমঙ্করি**—হে মঙ্গলদাত্রী দুর্গে। **রঙ্গে**—আনন্দে। **অনঙ্গ**—হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন বলে দেবতা মদন 'অনঙ্গ' অর্থাৎ দেহহীন। **যে অগ্নিকুলগ্নে……কৌশলে**—যে তীব্র বিষ মানুষের প্রাণ নাশ করে, ভেষজ বিদ্যার বলে তাই আবার প্রাণদানকারী ঔষধে রূপান্তরিত হয়, তেমনি স্বর্গের দেবতা-বৃন্দের প্ররোচনায় অশুভ মুহূর্তে শিবের ধ্যান ভঙ্গ করতে গিয়ে মহাদেবের রোষাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন, আজ কিন্তু দেবী ভবানীর অনুগ্রহে সেই ললাট বহ্নিই কামদেবকে সমাদর প্রদর্শন করবে।

হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। ৩৪৫

সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতি সুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামৃত-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরে আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি, ৩৫০
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর অমৃত আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠ দেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে! ৩৫৫
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর!' অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া, ৩৬০
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায়, রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে
ঢাকিল বদন শশী! কিম্বা অগ্নিশিখা
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা!
কিম্বা সুধা ধন যেন, চক্র প্রসরণে, ৩৬৫
বেড়িলেন দেব চক্রে সুধাংশু মণ্ডলে।
দ্বিরদ-রদ নির্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা! সাথে মন্মথ, হাতে ফুলধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ খরতর ফুল শরে ভরা—৩৭০
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী।

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান, যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন মোহিনী
উতরিলা গজপতি। অমনি চৌদিকে ৩৭৫
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জলকান্ত যথা
শান্ত শান্তি সমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘ দল, তমঃ যথা উষার হসনে!

দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী, ৩৮০
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্য-জ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারু হাসিনী
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল শর।" দেবীর আদেশে, ৩৮৫
হাঁটু পাড়ি মীন ধ্বজ, শিঞ্জিনী টংকারি,
সম্মোহন-শরে শূর বিধিলা উমেশে !
শিহরিলা শূলপাণি ! লড়িলা মস্তকে
জটাজুট, তরু রাজি যথা গিরি শিরে
ঘোর মড় মড় রবে লড়ে ভূকম্পনে। ৩৯০
অধীর হইলা প্রভু ! গরজিলা ভালে
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃ স্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী কোলে, ৩৯৫
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে !
উন্মালি নয়নে এবে উঠিলা ধূর্জটি।
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

মথি জলনাথে—সমুদ্র মন্থন করে। **দিতিসুত যত**—দৈত্যগণ। **সুধামধু**—অমৃত। **শ্রীপতি**—বিষ্ণু। **ছদ্মবেশী হৃষীকেশে**—বিশ্ব বিমোহিনী স্ত্রীমূর্তিধারী বিষ্ণুকে। **কুচ-যুগ**—স্তন যুগল। **মলম্বা**—সোনার পাত। **অম্বর**—আবরণ। **অম্বিকা**—দুর্গা। **চারু অবয়বে**—সুন্দর দেহকে। **নলিনী**—পদ্ম। **সুধাংশুমণ্ডলে**—চন্দ্রকে। **দ্বিরদ-রদ-নির্মিত**—হস্তি দন্তি দ্বারা নির্মিত। **সুহাসিনী**—দুর্গা। **কৈলাস শিখরি শিরে**—কৈলাস পর্বতের উপরিভাগে। **ভৃগুমান**—উচ্চ সানু বিশিষ্ট। **ভৈরব নিনাদী**—প্রচণ্ড গর্জনকারী। **তমঃ যথা উষায় হসনে**—আরক্ত উষার আবির্ভাবে রাত্রির অন্ধকার যেমন করে নিঃশেষে বিদূরিত হয়। **কপর্দী**—কপর্দ অর্থাৎ জটাজুট-ধারী মহাদেব। **তপসী**—তপস্বী। **শম্বর-অরি** মদন। **শিঞ্জিনী টংকারি**—ধনুর জ্যা বা ছিলা আকর্ষণ করে। **লড়িলা**—নড়ে উঠল। **কেশরী কিশোর**—সিংহ শিশু। **মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা**—মহেশ্বর চক্ষু উন্মীলিত করলে ভবানী তাঁর মায়া মেঘের আবরণ সরিয়ে বিশ্ব বিমোহিনী মূর্তিতে শিবশংকরের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন।

মোহিত মোহিনী রূপে, কহিলা হরষে ৪০০
পশুপতি ; "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্র জননি !
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ? "হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা ;" এ দাসীরে ভুলি ৪০৫
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমনী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যুষে, প্রভু যায় চক্রবাকী ৪১০
যথা প্রাণ কান্ত তার !" আদরে ঈশান
ঈষৎ হাসিয়া, দেব অজিন আসনে
বসাইল ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল ; মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া; ৪১৫

বহিল মলয়-বায়ু; গাহিল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে!) কুসুমেষু বসি কুতূহলে, ৪২০
হানিলা, কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শর জাল;—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী
লজ্জা বেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু!
মোহন মূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে ৪২৫
কহিলা হাসিয়া দেব; 'জানিআমি, দেবি
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে;
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি?
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ৪৩০
কিন্তু নিজ কর্ম ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি! হায় দেবি, দেবে কি মানবে?
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি,
পাঠাও কামেরে, উমা দেবেন্দ্র সমীপে ৪৩৫
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি,
মায়া দেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্মুহুঃ চাহি ৪৪০
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণ বর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার কমল, কুমুদী,
মালতি, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে ৪৪৫
দেব দেব মহাদেবে মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইলা বিধুমুখী মদন মোহিনী,
অশ্রুময় আঁখি আহা! পতির বিহনে!
হেন কালে মধু-সখা উতরিল তথা। ৪৫০

পশুপতি—মহাদেব। **গণেন্দ্র জননী**—গণপতি কার্ত্তিকের মা দুর্গা। **মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর**—দুর্গা সিংহবাহিনী বলে 'মৃগেন্দ্র অর্থাৎ সিংহকে তাঁর কিঙ্কর বা দাস বলা হয়েছে। **ঈশান**—মহাদেব। **অজিন আসনে**—মৃগচর্মাসনে, **প্রফুল্লিল**—প্রস্ফুটিত হ'ল। **মকরন্দ লোভে**—ফুলের মধু লোভে। **শিলীমুখবৃন্দ**—শিলী অর্থাৎ হুল রয়েছে মুখে যাদের অর্থাৎ ভ্রমরগণ। **মাতি**—মত্ত হ'য়ে। **কুসুম-আসার**—পুষ্প বৃষ্টি। **উরসে**—বক্ষোদেশে। **সাজে মনসিজে**—মদন অর্থাৎ কামদেবের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। **কুসুমেষু**—কামদেব। কুসুম ইষু (বাণ) যাহার। **নিকষানন্দন**—রাবণ। **প্রাক্তনের গতি**—পূর্বকৃত কর্মের ফলোন্মুখতা। **মায়াদেবী নিকেতন**—মায়ার ভবনে। হিন্দু পুরাণে দেবী দুর্গা ও মায়া দেবী এক। কিন্তু মধুসূদন পার্বতী ও মায়া দেবীকে স্বতন্ত্র দেবী রূপে কল্পনা করেছেন। মায়া কুহকিনী। **মীন ধ্বজ**—কামদেব। **ঘন রাশি রাশি……মহাদেবীসহ**—স্বর্ণ বর্ণের মেঘ পুঞ্জ সুগন্ধ সমীরণে ভেসে চলেছে, ঐ সুরভিত বাতাস বুঝি সোণালি মেঘের নিঃশ্বাস। সমীরণ বাহিত মেঘমালা নিজেদের চলার পথে মলয় পবনের প্রিয় এত অজস্র সুগন্ধি পুষ্প চতুর্দিকে বর্ষণ করল যে সেই কুসুম বর্ষণে প্রেমালাপরত হরপার্বতী সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত হলেন। **দ্বিরদ-রদ-নির্মিত হৈমময় দ্বারে**- গজ দন্ত নির্মিত স্বর্ণ দ্বারে। **মদন মোহিনী**—রতিদেবী। **মধু সখা**—বসন্ত ঋতুর সখা মদন।

অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে,
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির নীরের বিন্দু শতদল দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয় শিখরে। ৪৫৫
পাই প্রাণধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া
(সরস বসন্তকালে সারী-শুক যথা)
কহিলেন প্রিয় ভাষে: "বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে? ৪৬০
বামদেব-নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব কথা যত! দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি! যেয়ো না, গো, আর তাঁর কাছে
মোর কিরে প্রাণেশ্বর। সুমধুর হাসে
উত্তরিলা পঞ্চশর: "ছায়ার আশ্রমে ৪৬৫
কে কবে ভাস্কর করে ডরায় সুন্দরি?
চল এবে যাই যথা দেবকুলপতি।"
সুবর্ণ আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি, রথে দেবরাজ রথী ৪৭০
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময় তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে; গভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।
কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী ৪৭৫
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথবরে,
সুরকুল রথীবর পশিলা দেউলে
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে
সৌর খরতর-কর জাল সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী ৪৮০
শক্তীশ্বরী। কর যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা; "আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনী।
আশীষি সুধিলা দেবী;-"কহ, কি কারণে
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি. "শিবের আদেশে, ৪৮৫
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।' ৪৯০
ক্ষণকাল চিন্তি দেবী কহিলা বাসবে,--
"দুরন্ত তারকাসুর, সুর কুলপতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকা কুল-বল্লভ সেনানী,
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে। ৪৯৫
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা ধীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ সৃজি রুদ্র তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক, মণ্ডিত
সুবর্ণে, ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ সুনাসীর ৫০০
ভয়ঙ্কর তূনীরে,—অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী পূর্ণ নাগলোক যথা।
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!" কহিল হাসিয়া।

শুকাইল অশ্রুবিন্দু……শতদল দলে—সূর্য দেবতার আবির্ভাবে যেমন পদ্মের শিশির বিন্দু শুকিয়ে যায়, মদনের আগমনে রতির দুচোখের অশ্রু কণা শুকাল। **বামদেব নামে**—মহাদেবের নাম শ্রবণে। **কিরে**—শপথ। **অগ্নিময়তেজঃবাজী**—অগ্নি সম তেজ যার এমন যে অশ্ব। **অকম্প চামর শিরে**—দ্রুত ধাবমান অশ্বের গ্রীবাদেশস্থিত কেশরাজিকে স্থির দেখায়। **অম্বরে**—আকাশ পথে। **চূর্ণি**

মেঘদলে—চলার গতিবেগে মেঘরাশিকে ছিন্ন বিছিন্ন করে। **সহস্রাক্ষ**—ইন্দ্র, **সৌর······স্বর্ণাসনে**—প্রদীপ্ত সূর্যের বিক্ষিপ্ত কিরণ মালা একত্রীভূত হলে যেমন অতি ভাস্বর দীপ্তির উদ্ভব হ'তে পারে মায়াদেবী যে স্বর্ণ নির্মিত আসনে সমাসীনা, তার দীপ্তিও সেইরকম উজ্জ্বল। **কুহকিনী শক্তিশ্বরী** অঘটন-ঘটন পটীয়সী শক্তির অধিকারিণী বলেই মায়া কুহকিনী। **কৃত্তিকা কুলবল্লভ সেনানী**—কৃত্তিকাগণের স্নেহাস্পদ প্রিয় পুত্র স্বরূপ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। **বৃষভধ্বজ**—বৃষভ চিহ্ন যাহার অর্থাৎ মহাদেব। **নিবাসে উহাতে কৃতান্ত**—মৃত্যু দেবতা যম স্বয়ং ওতে বাস করেন। **সুনাসীর**—ইন্দ্রকে সম্বোধন। সুনাসীর (সৈন্যাগ্র ভাগ) যাহার। **বিষাকর ফণী পূর্ণ নাগলোক যথা**—সর্পের আবাসভূমি যেমন দুরন্তর বিষধর সর্পে পরিপূর্ণ, এই তূণীরও তেমনি প্রাণঘাতী সর্পাকৃতি ভয়াল বাণ দ্বারা পরিপূর্ণ।

হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলি :
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ ৫০৫
রত্নময় ! দিবাকর পরিধি যেমতি.
জ্বলিছে ফলক বর, ধাঁধিয়া নয়নে।
অগ্নি শিখা সম অসি মহাতেজস্কর !
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে ?
শুন দেব" (কহিলেন পুনঃ মায়া দেবী) ৫১০
'ওই সব অস্ত্রবলে নাশিল তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে বলি,
মেঘনাদ মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায় যুদ্ধে যে বধিবে ৫১৫
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে ;
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস সংগ্রামে।
যাও চলি সুর দেশে, সুরদল নিধি !
ফুল কুল সখী ঊষা যখন খুলিবে ৫২০
পূর্বাশার হৈমদ্বার পদ্ম কর দিয়া
কালি, তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্র কেশরী
ইন্দ্রজিৎ ত্রাসহীন করিবে তোমারে
লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে !"
মহানন্দে দেব ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, ৫২৫
অস্ত্রলয়ে গেলা চলি ত্রিদশ আলয়ে।

বসি দেব সভাতলে কনক আসনে
বাসব, কহিলা শূর চিত্ররথ শূরে:
"যতনে লইয়া অস্ত্র যাও, মহাবলি,
স্বর্ণলঙ্কা ধামে তুমি। সৌমিত্রি-কেশরী ৫৩০
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে—তা দিবেন কহিয়া
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব কুল পতি, ত্রিদিব নিবাসী
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী তার ; পার্বতী আপনি ৫৩৫
হরপ্রিয়া সুপ্রসন্না তার প্রতি আজি ;
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি !
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী মনোরঞ্জন রঘুকুল মণি। ৫৪০
মোর রথে রথিবর আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কাপুরে,
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ, মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে. দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে ৫৪৫
বায়ুকুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলিগম্ভীর নাদে পূরিব জগতে।"
প্রণমি দেবেন্দ্র পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্তে চিত্ররথ-রথী।

জলিতেছে ফলকবর—উৎকৃষ্ট ঢালটি দীপ্তি পাচ্ছে। **ষড়ানন**—কার্ত্তিকেয়। **নাশিল তারকে**—তারকাসুরকে বধ করল। **ফুলকুল সখী উষা**—উষার আবির্ভাবে নিকুঞ্জে ফুলরাজি বিকশিত ও প্রফুল্লিত হয় বলে উষাকে' ফুলকুলের সঙ্গিনী কল্পনা করা হয়েছে। **পূর্বাশা**—পূর্ব দিকচক্রবাল। **পদ্মকর দিয়া**—পদ্মের ন্যায় সুকোমল করস্পর্শে। **লঙ্কার পঙ্কজ রবি যাবে অস্তাচলে**—মেঘনাদের মৃত্যু ঘটবে। **ত্রিদশ—আলয়ে**—দেবভূমি স্বর্গলোকে। **বাসব—**ইন্দ্র। **চিত্ররথ**—গন্ধর্ব বিশেষ। **বৈদেহী সতীরে**—সীতাকে। **বৈদেহীমনোরঞ্জন**—রামচন্দ্র। **দম্ভোলি গম্ভীর নাদে**—বজ্রের মত গম্ভীর শব্দে।

তবে দেব কুলনাথ, ডাকি প্রভঞ্জনে ৫৫০
কহিলা : "প্রলয় ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে ; বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারারুদ্ধ বায়ু দলে ; লহ মেঘ দলে
দ্বন্দ্ব ক্ষণ কাল বৈরী বারিনাথ সনে
নির্ঘোষে।" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি, ৫৫৫
ভাঙিলে শৃঙ্খল, লম্ফী কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরিগর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহল ; গিরি (দেখিলা) নড়িছে
অন্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন ৫৬০
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে।

দ্বন্দ্ব সংগ্রামে প্রবৃত্ত হত। **বৈরী**—সমুদ্র পবনের শত্রু। **লম্ফী**—যে লম্ফ দিয়ে চলে। **তিমিরাগারে**—অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে। **গিরিগর্ভে**—পর্বত গুহায় অভ্যন্তরে।

শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুংকারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী ; গর্জিলা জলধি ৫৬৫
তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ আবলী
কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণপ্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদল লয়ে। ৫৭০
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপাড়ি
মড়মড়ে মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার। যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড় তড়ে। ৫৭৫
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী -
রাজ আভরণ দেহে। শোভে কটি দেশে ৫৮০
সারসন, রাশিচক্রসম তেজোরাশি ;
ঝোলে তাহে অসিবর-ঝল ঝল ঝলে !
কেমনে বর্ণিবে কবি দেবতূণ, ধনুঃ,
চর্ম, বর্ম, শূল, সৌর করী টের আভা
স্বর্ণময়ী ! দৈববিভা বাঁধিল নয়নে ; ৫৮৫
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেব দূতপদে

রঘুবর জিজ্ঞাসিল : "হে ত্রিদিব বাসি,
ত্রিদিব ব্যতীত, তাহা কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা রূপে ! কেন হেথা আজি
৫৯০
নন্দন কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব হায় !" আশীষিয়া রথী,
৫৯৫
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে :
"চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি ;
চির অনুচর আমি সেবি অহরহ:
দেবেন্দ্র ; গন্ধর্বকুল আমার অধীনে ;
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
৬০০

তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ।
দেবেশ ! এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া-মহাদেবী
প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
৬০৫
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল মণি !
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া !"
কহিলা রঘু নন্দন : "আনন্দ সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্ব শ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !
৬১০
অজ্ঞ নর আমি ; হায় কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"

জাঙাল—বাঁধ। **তুঙ্গশৃঙ্গ……কল্লোলিল**—পর্বতের মত প্রকাণ্ড সমুদ্র তরঙ্গদল কল্লোল শব্দ করতে লাগল। **রণরঙ্গে**—যুদ্ধামোদে। **মন্দ্রে**—গর্জনধ্বনি সহ। **জীমূত**—মেঘদল। **হাসিল ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ চমকিত হল। **দম্ভোলি**—বজ্র। **পাবক উগরী**—বিদ্যুৎ বহ্নি উদ্গীরণ করে। **আসার**—জলধারা। **দিবাকর যেন অংশুমালী**—গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের দেহ উজ্জ্বল মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কারে ভূষিত ; সেই রত্ন সংকলিত আভায় দীপ্যমান গন্ধর্ব রাজকে উজ্জ্বল কিরণমালা শোভিত সূর্যের মত মনে হচ্ছে। **সারসন**—কটিবন্ধ। **সৌরকিরীটের আভা স্বর্ণময়ী**—সূর্য মণ্ডলের মত উজ্জ্বল মুকুটে দীপ্তি। **দৈববিভা**—স্বর্গীয় দীপ্তি। **চিত্ররথ**—ইন্দ্রের দূত চিত্ররথ। **ত্রিদিব**—স্বর্গলোক। **দেব কুলপ্রিয়**—হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যের favoured of the gods কথার প্রতিধ্বনি। **অভয়া** দেবী দুর্গা।

হাসিয়া কহিলা দূত : "শুন, রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র পালন,
ইন্দ্রিয় দমন, ধর্ম পথে সদা গতি ; ৬১৫
নিত্য সত্য-দেবী সেবা। চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌশিক বস্ত্র আদি বলি যত
অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি
অসৎ। এ সার কথা কহিনু তোমারে।

প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী ৬২০
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি।
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ
হাসিল কনক লঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
৬২৫

রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে,
আইল ধাইয়া পুনঃ রণক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী শকুনি
পিশাচ। রাক্ষস দল বাহিরিল পুনঃ
ভীম প্রহরণধারী মত্ত বীর মদে। ৬৩০

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গ :

শান্তিলা জলধি—প্রচণ্ড ঝড় থেমে গেল, সমুদ্র শান্ত মূর্তি ধারণ করল। **কৌমুদিনী**—জ্যোৎস্না। **অবগাহে দেহ রজোময়** সরোবরাদির স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জলে রজত কান্তি জ্যোৎস্না সুন্দরী যেন অবগাহন করতে লাগল। অর্থাৎ শুভ্র জ্যোৎস্না সরোবরের তরল জলে অবলুন্ঠিত হ'ল। **শিবা-শবাহারী**—মৃতদেহ ভক্ষণ কারী শৃগাল। **পিশাচ**—কাঁচা মাংসাহারী জীবগণ। **ভীম**—ভীষণ। **মত্ত বীরমদে**—প্রচণ্ড শক্তিতে মত্ত। **অস্ত্রলাভো**—স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, শচী, মহাদেব, পার্বতী, লক্ষ্মী, মায়াদেবী প্রভৃতির সহায়তায় লক্ষ্মণের দৈবী অস্ত্র লাভই এ সর্গের প্রধান বর্ণিত বিষয় বলে কবি এর নাম 'অস্ত্র লাভ' রেখেছেন। গ্রীক কবি হোমারও তাঁর 'ইলিয়ড' কাব্যে হেক্টর বধের জন্য বীর একিলিসের দৈব্য অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় সর্গের কথাবস্তু সংক্ষেপ

লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ কর্তৃক মেঘনাদের সৈন্যাপত্যে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে দিবাবসান ঘটল—স্বর্গমর্ত্যে রাত্রির আবির্ভাব হ'ল। সুরলোকপতি ইন্দ্র শচীসহ দেবসভায় সমাসীন, নৃত্যগীতবাদ্য ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত। এমন সময় সেখানে রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী এসে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গভূমিতে লক্ষ্মীদেবীর শুভাগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর করলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের ভক্তি-যত্নে আবদ্ধ হয়ে তিনি বহুকাল ধরে স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করছেন। কিন্তু বর্তমানে লঙ্কাপুরীতে অবস্থানের বাসনা তাঁর আর নেই। কেননা, রক্ষোরাজের দুষ্কৃতি ও অধর্মাচারের ফলে লঙ্কা পাপে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। ভাগ্যবিধাতা আজ তার প্রতি বিরূপ। তবু লক্ষ্মীদেবী রাবণকে পরিত্যাগ করতে পারছেন না। সে যাই হোক্ লঙ্কাসমরে রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ রথিবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেছে, একমাত্র জীবিত আছে রাবণপুত্র বীরযোদ্ধা মেঘনাদ। লঙ্কাপতি তাকেই সেনাপতি পদে বরণ করেছেন। আগামীকাল যুদ্ধে অমিতবিক্রম মেঘনাদ রামচন্দ্রকে আক্রমণ করবে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে অজেয়—এরূপ অবস্থায় মেঘনাদের করাল আক্রমণ থেকে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে রামচন্দ্রের রক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করবার অনুরোধ জানাবার জন্য লক্ষ্মীদেবী রাজসমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

ইন্দ্র বললেন, মেঘনাদ যে সমরে দুর্বার এ সত্যটি তার অবিদিত নয়, মেঘনাদের অতুল পরাক্রমে তিনি নিজেও সতত শঙ্কিত। কিন্তু এই ঘোর বিপদের দিনে একমাত্র বিশ্বনাথ শিব ছাড়া দেবকুলপ্রিয় শ্রীরামকে রক্ষা করবার শক্তিসামর্থ অন্য কারোর নেই—ইষ্টদেবতা অগ্নির বরে মেঘনাদ সর্বজয়ী। লক্ষ্মী দেবী তখন ইন্দ্রকে অবিলম্বে শিবের কাছে গমন করবার জন্য অনুরোধ জানালেন এবং আরো বললেন, শিবধামে পৌঁছে ইন্দ্র যেন মর্ত্যভূমির শোচনীয় অবস্থাটি শিবের গোচরীভূত করেন—দুরাচার রাবণের পাপভার বসুন্ধরা আর সহ্য করতে পারছেন না। এইসব কথা বলে রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী আবার লঙ্কায় ফিরে গেলেন।

মাতলি রথ সাজিয়ে নিয়ে এল, সুরপতি ইন্দ্র পত্নী শচীসহ শিবধাম কৈলাসে এসে উপস্থিত হলেন। দুজনে অশেষ ভক্তিভরে শিবানীর পদবন্দনা করলে শিবানী কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসার পর কৈলাসভূমিতে তাঁদের উপস্থিতির হেতু জানতে চাইলেন। তখন ইন্দ্র বললেন বিশ্ব চরাচরে কোন ঘটনা, কোন সংবাদই শিবানীর অবিদিত নয়। লঙ্কার রাজলক্ষ্মী স্বর্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে গেলেন যে দেবদ্রোহী রাবণ যুদ্ধমদে মত্ত হয়ে বীরশ্রেষ্ঠ পুত্র মেঘনাদকে সৈন্যাপত্যে বরণ করেছেন; আগামীকাল প্রভাতে মেঘনাদ ইষ্টদেবতার পূজা সমাপনান্তে সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করবে—দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রের বিপদ আসন্ন। এ ছাড়া লক্ষ্মী দেবীও পাপ পঙ্কিল

লঙ্কাপুরী ত্যাগ করতে চঞ্চলা হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীর শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাত হয়ে ইন্দ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় কৈলাসভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন। দেবকুলে এমন কেউ নেই, যিনি, দুষ্প্রধর্ষ রাবণির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'তে সমর্থ। শিবানী যদি কৃপা না করেন তবে আগামী প্রভাতে দুর্জয় মেঘনাদের হাতে শ্রীরামের বিনাস অবশ্যম্ভাবী।

সমস্ত কথা শুনে পার্বতী উত্তর করলেন, রাবণ শিবের 'পরম ভক্ত, তাই শিব তার প্রতি অশেষ মমত্বভাব পোষণ করেন। সুতরাং রক্ষোবংশের অকল্যাণজনক কোন কর্মে হস্তক্ষেপ করা পার্বতীর পক্ষে অসম্ভব। মহাদেব এখন তপোমগ্ন, তাই আজ লঙ্কার এই দুর্গতি। পার্বতীর কথা শুনে ইন্দ্র করযোড়ে দেবীকে বললেন, শক্তিস্পর্ধিত রাবণ ধর্মদ্রোহী হয়ে উঠেছে। পিতৃসত্য রক্ষা হেতু রামচন্দ্র রাজ্যসুখভোগ উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করে নিয়েছেন। দুষ্ক্রিয়াসক্ত রাবণ সেই ধর্মপ্রাণ শ্রীরামের পত্নী সীতাকে কৌশলে মায়াজাল বিস্তার করে হরণ করেছেন। মহাদেবের বরপুষ্ট হয়ে দুর্মতি রক্ষোরাজ আজ স্বর্গের দেবতাগণকেও তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে। এরকম দুরাচার রাবণের প্রতি দেবীর কৃপা প্রকাশের হেতু সত্যই অজ্ঞেয়। তারপর ইন্দ্রানী পার্বতীর কাছে রাবণকর্তৃক সীতাহরণ ও অশোকবনে বন্দিনী সীতার করুণ কাহিনী বিবৃত করলেন এবং ধর্মদ্রোহী রাবণ ও তার পুত্র মেঘনাদের নিধন ব্যবস্থা করতে দেবীর কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন।

তখন দেবী হাস্যমুখে উত্তর করলেন এ কাজ সম্পুর্ণ করা তাঁর সাধ্যাতীত। রাক্ষসকুল শিবের রক্ষিত। শিব ছাড়া তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করার শক্তি কারো নেই। শিব এখন যোগাসন শৃঙ্গে তপস্যায় নিরত রয়েছেন, সেই স্থানে ইন্দ্র কেমন করে পৌছবেন? তখন ইন্দ্র পার্বতীর কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন যে, পার্বতী নিজেই যোগাসন শৃঙ্গে গমন করে রক্ষঃকুলবিনাশের যেন আশু ব্যবস্থা করে দেন। তাহলে রামচন্দ্র আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন, রাক্ষসকুলের বিনাশে পৃথিবী পাপভারমুক্ত হবে।

এমন সময় হঠাৎ পার্বতীর কনকআসন কম্পিত হয়ে উঠলো। দেবীর চিত্ত সহসা চঞ্চল হয়ে উঠলো। সখী বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করে পার্বতী জানলেন, তাঁর প্রসাদে যুদ্ধে জয়লাভ বাসনায় দেবনির্ভর রামচন্দ্র নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়ে লঙ্কাপুরীতে তাঁর পূজা করছেন। এই ঘটনার পর ভক্তবৎসলা শিবানী আর স্থির থাকতে পারলেন না—বিজয়ার ওপর দেবদম্পতীর যথাযোগ্য সেবা যত্নের ভার অর্পণ করে তিনি যোগাসন শৃঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আপনার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবী মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন কোন্ বেশে শিবসন্নিধানে যাবেন। শেষে তিনি মদনপ্রিয়া রতিদেবীকে স্মরণ করলেন। স্মরণ মাত্রেই রতি কৈলাশে উপস্থিত হয়ে দেবীর চরণে প্রণতি জানালেন। রতির পরামর্শে মোহিনীমূর্তি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে যাওয়া স্থির হ'লে রতিদেবী পার্বতীকে ভুবনমোহিনী বেশে সজ্জিত করলেন।

এরপর পার্বতী রতিকে বললেন, কামদেবকে স্মরণ করতে। অমনি পুষ্পধন্বা মদন ভবানীসমীপে উপস্থিত হলেন। তখন ভবানী কামদেবকে তাঁর সঙ্গে যোগাসনশৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের যোগভঙ্গের সহায়তা করতে অনুরোধ করলেন। মহাদেবের কোপানলে আগে একবার মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন - তাঁরই কাছে আবার যেতে হবে শুনে রতিপতি মদন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পরে অবশ্য শিবানীর অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হ লে, সেখানে যেতে তাঁর আর কোন দ্বিধা রইল না। দেবী মোহিনীমূর্তি ধারণ করেছেন, সেই ভুবন মোহিনী বেশে জগতের বুকের ওপর দিয়ে তিনি যোগাসনশৃঙ্গে গমন করবেন. এটা রতিপতি সমীচীন বলে মনে করলেন না। কেননা ঐ বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্যরাশি দেখলে জগৎবাসী সকলেই রূপোন্মাদ হয়ে উঠবে। মদনের এই আশঙ্কাকে ভবানী অহেতুক মনে করলেন না—তিনি তখুনি স্বর্ণবর্ণ মায়া মেঘের আবরণে নিজদেহ আচ্ছাদিত করে মদন সমভিব্যাহারে দুর্গম যোগশৃঙ্গাভিমুখে যাত্রা করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা দুজনে নির্দিষ্ট স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। দেবী সামনে ধ্যানরত মহাদেবকে দেখতে পেলেন। পার্বতী তখন ধ্যানসমাহিত স্বামীর অঙ্গে ফুলশর নিক্ষেপ করতে কামদেবকে আদেশ করলেন। দেবী ভবানীর আদেশে মদন মহাদেবকে সম্মোহনবাণে বিদ্ধ করলে মহাদেবের তপোভঙ্গ হ'ল, তিনি হঠাৎ শিউরে উঠলেন, তাঁর ললাটস্থিত তৃতীয় নেত্রে বহ্নিশিখা জ্বলে উঠল। তখন শঙ্কাতুর কামদেব ভবানীর বক্ষোদেশে আত্মগোপন করলেন। মহাদেব নয়ন উন্মীলিত করলে ভবানী মায়ামেঘের আবরণ সরিয়ে ভুবনমোহিনী মূর্তিতে স্বামীর সামনে দাঁড়ালেন।

পার্বতীর ভুবনমোহিনী রূপশোভা মহেশ্বরকে মুগ্ধ করল। মোহিনীরূপে আবিষ্ট মহাদেব ভবানীকে সেই বিজন দুর্গম স্থানে একাকিনী আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে পার্বতী উত্তরে বললেন, যে বহুদিন পর্যন্ত তিনি স্বামীর দর্শনলাভ হতে বঞ্চিতা—স্বামীর দর্শনাভিলাষেই তিনি যোগাসনশৃঙ্গে এসেছেন। তখন শিবশঙ্কর প্রেমভরে পার্বতীকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, তিনি সবই অবগত আছেন। রক্ষোরাজ রাবণ তাঁর সেবক, এটা স্বীকার্য। কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাশের মুখে চলেছে। ভক্ত রাবণকে বিপন্ন দেখে শিব নিজ হৃদয়ে অশেষ বেদনা অনুভব করছেন সত্য। কিন্তু রাবণকে তার কৃতকর্মের জন্য ফলভোগ করতেই হবে—তার শোচনীয় বিনাশ অনিবার্য।

এরপর মহেশ্বর ভবানীকে বললেন, যেন অবিলম্বে মদনকে কৈলাসে ইন্দ্রের কাছে প্রেরণ করেন, আর ইন্দ্র যেন সত্বর মায়াদেবীর কাছে উপস্থিত হন। আত্মগোপনকারী কামদেব তখন উমার বক্ষঃস্থল থেকে বেরিয়ে অনতিবিলম্বে কৈলাসে পৌঁছলেন এবং বিরহকাতরা পত্নীকে মধুর প্রেমালাপে আশ্বস্ত করলেন। তারপর মদন ইন্দ্রসন্নিধানে উপনীত হয়ে তাঁর কাছে শিবের নির্দেশ জানালেন। দেবরাজ ইন্দ্রও আর কালবিলম্ব না করে দ্রুতগতিতে মায়াদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। স্বর্ণাসনে উপবিষ্টা শক্তিশ্বরী মায়াদেবী ইন্দ্রের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন শিবের আদেশেই

তিনি মায়ার সদনে এসেছেন। কী কৌশলে রামানুজ লক্ষ্মণ আগামীকাল প্রভাতে মেঘনাদকে সংগ্রামে নিহত করবেন, সেই কৌশল ইন্দ্র মায়াদেবীর কাছে জানতে চাইলেন।

এই কথা শুনে মায়াদেবী কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর শিবতেজ নির্মিত যে সব অস্ত্র প্রয়োগে দেব সেনানী কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেছিলেন মায়াদেবী সেই সব অতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ফলক, অসি, তূণীর, ধনু—সুরপতিকে দেখিয়ে বললেন, এদেরই প্রয়োগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে! কিন্তু শুধু অস্ত্র প্রয়োগ করে দেবতা কি মানব কেউই মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবে না—আরো কৌশল দরকার। যা সেই হোক্ মায়ার দেওয়া অস্ত্রগুলো যেন রাঘব শিবিরে লক্ষ্মণের কাছে পাঠান হয়। আগামীকাল মায়াদেবী সশরীরে উপস্থিত থেকে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত লক্ষ্মণকে রক্ষা করবেন।

ইন্দ্র মায়াদেবীর দেওয়া অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আনন্দিত চিত্তে সত্বর স্বর্গভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং গন্ধর্বপতি চিত্ররথকে ডেকে রাঘব শিবিরে ঐ দৈব অস্ত্রগুলো পৌঁছে দিতে আদেশ দিলেন। চিত্ররথ দৈবানুকূল্যের কথাও যেন রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন করেন এবং তাঁকে জানিয়ে দেন স্বর্গের অধিবাসী দেবদল রামচন্দ্রের মঙ্গল কামনা করেন এবং দেবী পার্বতীও তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না।

গন্ধর্বপতি চিত্ররথ দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রণতি জানিয়ে, সেই অস্ত্রাদি নিয়ে মর্ত্যাভিমুখে যাত্রা করলেন। পাছে চিত্ররথকে দেখতে পেয়ে লঙ্কার রাক্ষস সৈন্যদল কোনোরূপ গোলযোগ বাধান, সেইজন্য ইন্দ্র পবনদেবকে ডেকে লঙ্কাভূমিতে কিয়ৎক্ষণ প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। ইন্দ্রের নির্দেশে বায়ুপতি প্রভঞ্জন লঙ্কার ওপর প্রচণ্ডবাত্যা বইয়ে দিলেন, ঘনান্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হ'ল। ঝঞ্ঝামথিত সেই নিরন্ধ্র অন্ধকারে আত্মগোপন করে মায়াদেবী প্রদত্ত অস্ত্র নিয়ে চিত্ররথ লঙ্কায় রাঘব শিবিরে গমন করলেন।

দেবদূত চিত্ররথ রামচন্দ্রসমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আপনার পরিচয় দিলেন। তারপর রামচন্দ্রের হাতে দৈবঅস্ত্রাদি প্রদান করে বললেন, যেহেতু তিনি দেবকুলপ্রিয়, সেহেতু অনুজ লক্ষ্মণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র এই সব অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেছেন, এবং পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণ কি কৌশলে মেঘনাদকে সংগ্রামে নিহত করবেন, মায়াদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে তা লক্ষ্মণকে বলে দেবেন। এই শুভসংবাদ শ্রবণে রামচন্দ্রের হৃদয় আনন্দ ধারায় প্লাবিত হল। স্বর্গের দেবতাদের প্রতি তিনি নিজের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানালেন। তখন চিত্ররথ শ্রীরামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করে দেবপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। এই বার লঙ্কায় সেই ঝড় ঝঞ্ঝা থেমে গেল, নির্মল আকাশে দীপ্যমান চন্দ্র-তারকা আত্মপ্রকাশ করল এবং—

"রাক্ষস দল বাহিরিল পুনঃ
ভীম প্রহরণধারী মত্ত বীরমদে।"

দ্বিতীয় সর্গ সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

মহাদেব ও পার্বতীর অনুগ্রহে ইন্দ্র কর্তৃক রামানুজ লক্ষ্মণের দৈবী অস্ত্র লাভের ঘটনাই দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে। এই সর্গে মধুসূদনের কবি-কল্পনা স্বর্গলোকে নিবদ্ধ এবং স্বর্গের দেবদেবীগণই এর সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রমূলে বিরাজ করছেন। আলোচ্যমান সর্গে বর্ণিত ঘটনায় সঙ্গে রামায়ণের কোন সম্পর্ক নেই। রামায়ণে লঙ্কা যুদ্ধে স্বর্গের দেব-দেবী রাম লক্ষ্মণকে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন সাহায্য করেন নি। কিন্তু মধুসূদন সৃষ্ট এই সর্গে আমরা দেখতে পাই, দেবরাজ ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী দেবী, মদন, রতি, পার্বতী, মহেশ্বর, মায়াদেবী, গন্ধর্ব পতি, চিত্ররথ— এঁরা সকলেই প্রত্যক্ষ ভাবে লঙ্কা যুদ্ধে রামচন্দ্রকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। নিঃসন্দেহে মধুসূদন এখানে গ্রীক কবি হোমারের ভাব কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। হোমারের 'ইলিয়ড' কাব্যে দেবতারা যুধ্যমান দুই পক্ষেরই সাহায্যকারী ছিলেন। 'ইলিয়ড' কাব্যের চতুর্দশ সর্গ এবং কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গের কবিভাবনাকে সংমিশ্রিত করেই মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গটি রচনা করেছেন। গ্রীক দেবতন্ত্রের আদর্শে সমালোচ্য কাব্যের দেবদেবীর চরিত্র চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় ভারতীয় দেব দেবীর চরিত্রাদর্শ যে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

দ্বিতীয়ত মধুসূদন চিত্রিত রাবণ অনেকাংশে রামায়ণে অঙ্কিত রাবণ চরিত্রের বিপরীত। রাবণ চরিত্রের মাধ্যমে মধুসূদন একদিকে কীর্তন করেছেন মনুষ্য শক্তির মহিমা, অন্য দিকে দেখিয়েছেন দৈব নিগ্রহে সেই দুর্মদ ধর্মদ্রোহী শক্তির অনিবার্য পরাভব। কিন্তু পার্থিব বলদৃপ্ত, সহজ সুস্থ প্রাণধর্মের পরবশ রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করে বিশ্বের ন্যায় নীতিকে যে লঙ্ঘন করেছেন, সে কথাটি মেঘনাদ বধের কবি কখনও বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাই এই কাব্যের নানা চরিত্রের ভাষণের মধ্য দিয়ে রক্ষোরাজের ঐ বিশ্বনীতিদ্রোহিতার আভাসটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কিন্তু যদিও "ধর্মের চক্ষে রাবণ পাপী, এ কাব্যে আমরা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তই দেখি, পাপ দেখি না। কবি যেন পাপ হইতে মানুষকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন······অপর পক্ষে, রাম-বিভীষণ প্রভৃতির সমাজে এই পাপবোধ ধর্ম ভীরুতা ও দেবসেবার যে-ভাব কবি ঘটনায় ও চরিত্রে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা স্থানে স্থানে স্পষ্ট অশ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এ কাব্যের দেবতাগুলির চরিত্র ও কবির ঐ একই মনোভাবের পরিচয় দেয়। রাক্ষস পুরীর রাজলক্ষ্মী যিনি, তিনি দেবী বলিয়াই বিভীষণ অপেক্ষাও বিশ্বাসহন্ত্রী এবং হৃদয়হীন। অন্যান্য দেব দেবীরাও মানুষ অপেক্ষা ধর্মহীন—যেমন ভীতি বিহ্বল তেমনি স্বার্থপর।"

"সমগ্র কাব্যখানিতে রাক্ষসের নামে মানুষেরই বীর্য ও ঐশ্বর্য, তাহার প্রাণের প্রাবল্য ও বীরোচিত অহংকার উদাত্ত গীতচ্ছন্দে কীর্তিত হইয়াছে। কবি মানুষের

জন্য কোন নৈতিক মহত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা দাবী করেন নাই। এ কাব্যের নায়ক [রক্ষোরাজ রাবণ] সুস্থ সবল মানবধর্মের যে নীতি তাহাই পালন করে। রাবণ যে কী পাপ করিয়াছে তাহা সে জানে না। রাবণেরও ইষ্টদেবতা আছে, সে রামের চেয়ে বড় ভক্ত। সে নিজে যেমন সরল, অবোধ অবাধ প্রাণ শক্তির আধার, তাহার ইষ্টদেবতা মহাদেবও তেমনি আত্মভোলা, আশুতোষ—ক্রোধে রুদ্র, স্নেহে অন্ধ। সে সেই দেবতার নিকটে কোন গোপন সাহায্য বা ষড়যন্ত্রের আশ্বাসে নিজের ভয় ও দুর্বলতা দমন করিতে চায় না, দারুণ দুর্যোগের দিনেও তাঁহার প্রতি রাবণের অটল বিশ্বাস। এ ভক্তি বীরের ভক্তি, ইহার মধ্যে দীনতা বা কাঙ্গালপনা নাই।" এ হেন যে রাবণ, সমালোচ্য কাব্যে বিদ্বেষপরায়ণ, স্বার্থপর, ষড়যন্ত্রকারী অনেক দেব চরিত্র অপেক্ষা তুলনায় সে শ্রেষ্ঠ।

তৃতীয়ত: মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের নানা চরিত্র ও ঘটনায় গ্রীক কবি হোমার এবং ভারতীয় কবি কলিদাসের ভাব কল্পনার প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সর্গে মধুসূদন বিশেষ করে হোমারের কাব্য ভাবনার দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছেন। "গ্রীক মহাদেবী জুনোর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, ট্রয় যুদ্ধে তাঁহার ভক্ত গ্রীকগণ ট্রোজানদিগকে নিহত করিয়া জয় লাভ করুন। কিন্তু সর্বদর্শী ভক্ত বৎসল জুপিটার প্রসন্ন থাকিতে দেব কি মানব. কাহারো দ্বারা ট্রোজান দিগের অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল না। জুনো সে জন্য পতিকে [জুপিটারকে] বিমোহিত করিয়া স্বীয় কার্যোদ্ধার করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি গ্রীকরতি অ্যাফ্রোদিতি কর্তৃক মোহিনী বেশে সজ্জিতা হইয়া অলিম্পাস পর্বত হইতে আইডা-পর্বতের উদ্দেশ্যে গমন করিলেন, পথে নিদ্রাদেব সমনস্‌কে [somnus] সঙ্গে লইলেন। সমনস্ পূর্ব বিপদ স্মরণ করিয়া কামদেবের মতোই মহারুদ্র জুপিটারের সম্মুখে যাইতে ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু জুনো তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। ['vain are thy fears' প্রভৃতি কথাগুলি বলিয়া]; উভয়ে মেঘাবৃত আকাশপথে অলক্ষ্যে গমন করিলেন, নিদ্রাদেব সমনস্ আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। জুনো পতিকে বিমোহিত করিয়া প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিলে পর, সমনস্ আপন শক্তি প্রয়োগে জুপিটারকে গাঢ় নিদ্রাভিভূত করিয়া বার্তা লইয়া সমুদ্রদেব নেপচুনের নিকট প্রস্থান করিলেন। ক্রুর-স্বভাবা জুনো অবসর বুঝে দুর্ভাগা ট্রয়বাসীদের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। মধুসূদন ইলিয়ডের এই ঘটনার সঙ্গে কুমারসম্ভবের মদনভস্ম বৃত্তান্ত পরিবর্তিত আকারে সংমিশ্রিত করে মেঘনাদ বধের দ্বিতীয় সর্গ রচনা করেছেন।

কিন্তু তিনি কুমারসম্ভবের হর-পার্বতী চরিত্রের মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নি। মেঘনাদ বধের মহাদেব ও পার্বতী গ্রীক পুরাণের কামাতুর জুপিটার ও নৃশংস জুনো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও কালিদাস কুমারসম্ভবে হর-পার্বতীর যে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করেছেন, মধুসূদনের কাব্যে তার নামমাত্র লক্ষিত হয় না। মহাদেব যখন ধ্যানস্থ হতেন তখন সহস্র কামদেবেরও সাধ্য হ'ত না যে তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় মহাদেবের তপোভঙ্গ কুমারসম্ভবে নেই।

"কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের কী কঠোর আত্মসংযমই না প্রকাশ করিয়াছেন, মধুসূদনের হর ধ্যান ভঙ্গে ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না। কামদেবের অস্ত্রাঘাত মাত্র তাঁহার কল্পিত মহাদেব [মুহূর্ত পূর্বে তপঃ সাগরে নিমগ্ন, বাহ্যজ্ঞান হত] অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাসলীলায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই চিত্রে মধুসূদন কেবল সংযমী মহাদেবের চরিত্র-মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই ভগবতীর চরিত্রের হীনতা সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমার সম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তিনি পবিত্র চিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য তাঁহার তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পার্বতীর বিন্দু মাত্র অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদ বধের পার্বতী আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান মগ্ন করিয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণী-গণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধর্মিনী নামের আদর্শস্বরূপা, তাঁহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সংগত হয় নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র এই হরধ্যান ভঙ্গ বর্ণনা করিতে যাইয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আরো কালিমালিপ্ত। পূর্ববর্তী সুপরিচিত কবির অঙ্কিত চিত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই মধুসূদন এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।" মধুসূদনের দেবতা চরিত্রের ওপর হিন্দুর লৌকিক সাহিত্য অর্থাৎ মঙ্গল কাব্য ইত্যাদি এবং গ্রীক পুরাণের দেবদেবীরই যে ছায়া পাত হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

"হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ সম্বন্ধে মধুসূদন তাঁহার মনোভাব পত্রাবলীর মধ্যে এই রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন—Though as a jolly christian youth, I don't care a Pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancerstos. এবং It is my ambition to engraft the exquisite graces of the greek mythology on our own. কিন্তু এ বিষয়ে কার্যতঃ তিনি হিন্দু পুরাণে নয়, গ্রীক পুরাণের দিকেই ঝুঁকিয়াছেন, এবং এই দুইয়ের মধ্যে কল্পনার সৃষ্টি ধর্মসুলভ সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। হিন্দু দেবদেবীর লৌকিক চরিত্র চিত্রে আমাদের সাহিত্য ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে গ্রীক-আদর্শের মহাকাব্য বা আখ্যান রচনা করা দুরূহ হইত না। কিন্তু কবির কল্পনা এই লোক সাহিত্যের ভূমিতে বিচরণ করিবে না—সংস্কৃত কাব্য পুরাণের ছাপ না থাকিলে সে-কল্পনার ক্লাসিক কৌলিন্য নষ্ট হয়, অথচ খাঁটি বাংলা লৌকিক দেবদেবী চরিত্রই গ্রীক কল্পনার উপযোগী। আমাদের শীতলা, মনসা, মঙ্গল চণ্ডীকেই একটু মাজিয়া-ঘষিয়া লইতে পারিলেই ভালো হইত, তাহা না করিয়া তিনি সংস্কৃত কাব্য পুরাণকে এই উপ-পুরাণের সঙ্গে মিলাইতে যাইয়া রসাভাস ঘটাইয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহার ধৈর্যের অভাব, এখনও তিনি তাঁহার কবিশক্তিকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে পারেন নাই।"

॥ সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর ॥

প্রশ্ন ১। 'গাইব, মা, বীররসে ভাসি মহাগীত'—কবির এই বাসনা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে কতোদূর সফল হয়েছে দেখাও।

উত্তর 'মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভেই কবি মধুসূদন দেবী সরস্বতীকে সম্বোধন করে বলেছেন,

> উর তবে, উর দয়াময়ি
> বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীর রসে ভাসি,
> মহা গীত ; উরি, দাসে দেহ পদ ছায়া।

আপাতদৃষ্টিতে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য বীররস প্রধান মনে হলেও কাব্য রসের বিচারে এটিকে করুণ রসের কাব্য বলাই সঙ্গত। মেঘনাদ বধের কাব্যসৌন্দর্য যথার্থ উপভোগ করতে হলে বাল্মীকির রাম-লক্ষ্মণকে যেমন ভুলতে হবে, তেমনি বাল্মীকির রাক্ষসকেও ভুলতে হবে। এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে মেঘনাদ বধের মূল ঘটনা রামায়ণ মহাকাব্য থেকে গৃহীত হলেও, আর্য রামায়ণ মধুসূদনের 'মহাগীত' রচনার প্রধান প্রেরণাস্থল নয়। বাল্মীকির সাহচর্য যত দূর সম্ভব, মধুসূদন পরিহার করেছেন। তিনি হোমারের প্যাগান আদর্শ (Paganism) ও দেবযন্ত্র (Divine machinery) এবং গ্রীক ট্রাজেডিতে বর্ণিত অদৃষ্টবাদটিকে আশ্রয় করে মেঘনাদ বধ কাব্যের কায়া নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। দেবতার ইচ্ছার কাছে, নিয়তির ষড় যন্ত্রের সম্মুখে, মানুষের সমস্ত পৌরুষ বীর্য যে নিষ্ফল—রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি মধুসূদন অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন।

মেঘনাদবধের নায়ক নিদারুণ অদৃষ্ট নিয়তি-নাগিনী পাশ বদ্ধ, অপরিহার্য ভাবে মৃত্যু-কবলোন্মুখ রাবণ। লঙ্কাপুরীর হাহাকার ইন্দ্রজিতের দৈব নিয়োজিত বিনাশ রাবণের জীবন নাট্যের অন্তিমাঙ্কের চূড়ান্ত পূর্ব দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এরপর রাবণের জীবনের শেষ দৃশ্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান বলে শিল্প ফলশ্রুতির আদর্শেই তা কাব্যক্ষেত্রে পরিহৃত হয়েছে। মানব জীবনের অপরিহার্য নিয়তির ফলশ্রুতিই মেঘনাদ বধ কাব্য-তরুর সকল গৌণ মুখ্য রসধারা, ঘটনা পল্লব ও শাখা প্রশাখার মূল কাণ্ড—কাব্য তরুর-করুণ রসাত্মক স্থায়ী ভাবের মেরুদণ্ড। 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'-এ অদৃষ্টবাদ না ধরলে কবি কখনো বাল্মীকিশিষ্য ভারতবর্ষের চিত্তে রাবণের প্রতি কারুণ্য সহানুভূতিরূপ রসনিষ্পত্তি সিদ্ধ করতে পারতেন না। সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে কিনা জানা নেই, যার কান্নাতেই আরম্ভ, কান্নাতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাপ্তি। সমগ্র কাব্যটি জুড়ে, পাত্রপাত্রিগণ অপরিহার্য দৈবদুঃখের মহাপাশে পড়ে কেবল ছটপট এবং হাহুতাশ করেছে। রাম লক্ষ্মণের জন্য, সীতা অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ

করে চিত্রাঙ্গদা ও মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা স্বামীশোকে, রাবণ সর্বনাশী অদৃষ্টের বজ্রপীড়নে নিষ্পেষিত হয়ে ক্ষোভে, রোষে ও নিরন্তর দুঃখে বিধাতাকে অভিযোগপূর্বক মর্মচ্ছেদী হাহাকার তুলেছে। অথচ এই কান্না কোনোদিকেই মনুষ্য হৃদয়ের কিছুমাত্র অবসাদকর হয় নি।

মেঘনাদবধ কাব্যের মুখ্যরস কোনটি, উপরি-উক্ত কথাগুলি থেকেই সহজে বোঝা যাবে। মহিমান্বিত প্রতাপশালী রাবণের দুরদৃষ্টজনিত হৃদয় যন্ত্রণা ও মর্মঘাতী শোক-বিলাপ সহৃদয় পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেবে মহাবীর হার্কিউলিসের সুতীব্র আর্তনাদ, মহাপুরুষ ফাইলেক্‌টেটের অসহ্য হাহাকার, আর মহামহিম প্রমিথিউসের বুকফাটা ক্রন্দন। লক্ষ্য করতে হবে দুঃখদীর্ণ রাবণ ক্রন্দন করেছেন, কিন্তু তাতে রক্ষোরাজের আত্মার এতটুকু দৌর্বল্য প্রকাশ পায় নি। অদৃষ্টের নির্যাতনে ক্ষত বিক্ষত হয়েও রাবণ দৈববলে বলীয়ান রাঘবের কাছে আত্মসমর্পণের কথা চিন্তা করেন নি, মহানিপাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁর গর্বিত শির উন্নত রয়েছে—পরাজয়ভিক্ষা অপেক্ষা মৃত্যুই বরং বীরপুরুষদের কাছে অধিকতর বরণীয়। রাবণের নিঃসীম সহন শক্তি, অবিচল চিত্তস্থৈর্য মানবের অপরাজেয় পৌরুষ বীর্যের প্রতিই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। রাবণের বিলাপ মানুষের মরণ বিজয়ী আত্মার গৌরবশ্রীকেই উজ্জ্বলতর করে তুলেছে।

গ্রন্থের প্রারম্ভে কবির প্রতিশ্রুতি গ্রন্থশেষে রক্ষিত হয়নি। বীর রস যে গ্রন্থের অঙ্গীরস নয় তা এখন সহজেই অনুমেয়। হয়তো মধুসূদনের সংকল্প ও সজ্ঞান অভিপ্রায় ছিল, রামায়ণে বর্ণিত ঘটনা-বিশেষকে অবলম্বন করে তিনি হোমারের ইলিয়ড-জাতীয় একখানি বীর রস প্রধান মহাকাব্য রচনা করবেন। বস্তুত কবির সেই অভিপ্রায় কিন্তু সিদ্ধ হয়নি। বর্তমান কাব্যখানির মুখ্য রস-'করুণ'। বীরবাহুর মৃত্যুতে এই কাব্যের আরম্ভ, মেঘনাদের মৃত্যুতে কাব্যটির পরিসমাপ্তি। কাব্যখানির আদ্যন্ত একটি করুণ শোক বিলাপ ধ্বনি গুঞ্জিত হয়েছে। বিবদমান পক্ষের অস্ত্র-ঝনৎকার; সকল উৎসাহ উদ্দীপনা ওই করুণ সুরটির অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে। নিয়তি-কবলিত মানব ভাগ্য ও মানব জীবনের কারুণ্যের দিকটিকেই কাব্যে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন বলে মেঘনাদ বধ বিনির্মল করুণ রসের আধার হয়েছে। প্রথম সর্গ থেকেই আমরা এর পরিচয় পাই। বীরবাহুর পতনের পর রাক্ষসরাজ রাবণের শোক বিলাপের মধ্যেই লঙ্কাপুরীর আসন্ন ধ্বংসের নিশ্চিত আভাস রয়েছে। এই মহানিপাতের রূপটি কী ভয়ঙ্কর, ভাগ্যহত রাবণের স্বজনবিয়োগ যন্ত্রণা কী ভয়াবহ! বিধি নির্যাতিত রাবণের শতধাবিদীর্ণ হৃদয়ের মর্মভেদ হাহাকার ধাপে ধাপে চরমে উঠেছে। প্রথম সর্গেই দেখি রক্ষোরাজ পত্নী চিত্রাঙ্গদার কি বক্ষবিদীর্ণকারী ক্রন্দন—চিত্রাঙ্গদার অভিযোগে রাবণের প্রচণ্ড মর্ম-বেদনা করুণ রসেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বস্তুতঃ কবি যে বীররস প্রধান কাব্য রচনা করছেন না এ সত্যটি তাঁর নিজেরও অজ্ঞাত ছিল না। একখানি পত্রে বন্ধুকে তিনি লিখেছেন—"You must not judge of the work as a regular Heroic poem, I never meant it such. It

is a story, a tale, rather heroically told." আবার অন্যত্র—"Do not be frightened, my dear fellow ; I won't trouble my readers with Viraras." আসল কথা, এই কাব্যের কায়া গঠন আদর্শটি Classic হলেও, কবির romantic প্রবৃত্তি একে বীররস প্রধান খাঁটি মহাকাব্য হয়ে উঠতে দেয় নি।

প্রশ্ন ২। শ্রীমধুসূদন প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর : মধুসূদনের আর একটি স্মরণীয় কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন। এই নতুন ছন্দটি বাংলা কবিতাকে কী আশ্চর্য গতিস্বাচ্ছন্দ্য দান করেছে, বাংলা কবিতার শক্তি সম্ভাবনাকে কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছে তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন তাঁরাই যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপ ও অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে যথার্থ পরিচিত। মধু-প্রবর্তিত অমিত্রছন্দের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা স্বল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। আমরা এখানে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধর্ম ও মর্মের কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা করব।

কৃত্তিবাস কাশীরাম দাস—ভারতচন্দ্র প্রমুখ বাঙ্গালী কবির প্রযুক্ত পুরাণো পয়ারের 'চরণ'কে আশ্রয় করে মিল্টনেরBlank verse-এর আদর্শে মধুসূদন এই অমিত্রাক্ষর ছন্দটি গড়েছিলেন। প্রাচীন পয়ার ছন্দই যে অমিত্রাক্ষরের মূল ভিত্তি বা উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে মধুসূদনের হাতে এই পয়ারেরই বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে। তবে মধুসূদন দত্তের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দটি সম্পূর্ণ অভিনব বস্তু—বাংলা কাব্যে এর সমধর্মী ছন্দ কোথাও দেখা যাবে না। নিজের পরিকল্পনাকে অবাধে লীলায়িত করবার প্রেরণায়, কাব্যছন্দকে স্বাধীন গতি ভংগীদানের প্রয়োজনেই, মধুসূদন মিত্রাক্ষরের বেড়ী ভেঙে অমিত্রাক্ষর নির্মাণ করলেন।"

ছন্দটির নাম 'অমিত্রাক্ষর'। কিন্তু নামটির মধ্যে এই ছন্দটির স্বরূপগত পরিচয় নিঃশেষে ধরা পড়ে না। কারণ পদান্ত অক্ষরের অমিত্রতা অর্থাৎ মিলের অভাব এর আসল লক্ষণ নয়। অমিত্রাক্ষরের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-এর তরঙ্গিত ছন্দ প্রবাহ বা ছন্দস্পন্দ। পুরানো পয়ারের "চরণকে লইয়া মধুসূদন তাঁহার ছন্দকে তরঙ্গিত, এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দ প্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের তট সীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহা ঐ তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড়ো রহস্য।" বিচিত্র ভাবানুভূতিকে কাব্যে রূপায়িত করবার ক্ষেত্রে ছন্দের এই প্রবহমাণতার প্রয়োজন যে কতখানি সাধারণের পক্ষে তা বুঝে ওঠা একটু কঠিন। সুতরাং বিষয়টিকে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার।

মধুসূদনের পূর্ববর্তী বাঙালী কবিগণকে ছন্দের বাহ্য বন্ধনের কাছে একরকম দাসত্ব স্বীকার করতে হয়েছে। প্রাচীন পয়ার, লাচাড়ী প্রভৃতি ছন্দে ভাবের নির্বাধ প্রবাহ ছিল না। কারণ মিল ও চরণের নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর সীমায় ভাবকে নিবদ্ধ রাখতে হ'ত। অক্ষর বৃত্ত বা সর্ব সাধারণের পরিচিত পুরনো পয়ার ছন্দটির কথাই ধরা যাক।

পয়ারে এক একটি চরণে চোদ্দটি অক্ষর এবং এর মাত্রা সংখ্যাও চোদ্দ। এতে এক চরণের শেষের ধ্বনি পরবর্তী চরণের শেষের ধ্বনির সঙ্গে মিলে যায়। এই অন্ত্য মিল অর্থাৎ অক্ষর ধ্বনির মধ্যে মিত্রতা রয়েছে বলেই একে বলা হয় মিত্রাক্ষর। একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ?
আমি যদি কই, তবে হবে গণ্ডগোল।

এখানে 'বোল' এর সঙ্গে 'গোল' এর মিল—এরা পরস্পর মিত্রাক্ষর। কিন্তু এই মিলটিই পয়ারের একতম বৈশিষ্ট্য নয়, এর আরও লক্ষণীয় বিশিষ্টতা আছে। পয়ারের প্রতি চরণের চোদ্দটি মাত্রাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, অর্থাৎ এর দুটি পর্ব। প্রথম পর্বের মাত্রা সংখ্যা আট, দ্বিতীয় পর্বের ছয়। আবার এক ঝোঁকে প্রথম আট মাত্রা উচ্চারণ করবার পর সামান্য বিরাম ও শেষের ছ'মাত্রার পর পূর্ণ বিরাম। কবিতার এই বিরাম চিহ্নকে বলে "যতি"। বাংলা কবিতায় 'যতি'র গুরুত্ব অনেকখানি। উপরে উদ্ধৃত চরণ দুটির ছন্দোলিপি করলে পয়ারের পদক্ষেপ বা চালটি বোঝা যাবে—

| | | | | i | | | | | | | |
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়া টি র বোল ॥ = ১৪ মাত্রা
| | | | | ৗ | | | | | | | | ॥
আমি য দি ক ই ত বে হ বে গ ণ্ড গো ল ॥ ? ১৪ মাত্রা

এই চরণ দুটিকে আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদের এক একটি চরণে এক একটি ভাব অর্থাৎ বক্তব্য সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, প্রথম চরণের ভাবটি দ্বিতীয় চরণের মধ্যে প্রসৃত হয়নি। সহজ কথায় দুটি চরণই সম্পূর্ণাঙ্গ দুটি বাক্য হয়ে উঠেছে, এরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রাচীন পয়ারের গঠনই এই রকম—প্রত্যেকটি চরণ স্বয়ংসম্পূর্ণ। অতএব, ফল দাঁড়াচ্ছে এই, পয়ার ছন্দে প্রতি চরণের চোদ্দ অক্ষরের মধ্যে এক একটি ভাবকে নিঃশেষে সমর্পণ করতে হবে, পরবর্তী চরণে টেনে আনা চলবে না।

পয়ারের ঐ রকম গঠনরীতি কবির পক্ষে খুব বড় একটা বাধা। প্রতি পদে পরিমিত অক্ষরের গণ্ডীর দিকে দৃষ্টি রাখতে হলে ভাবাবেগের স্বাধীন গতিভংগী ব্যাহত হতে বাধ্য। মধুসূদন পয়ারের এই নিগড়টিকে ভাঙ্গবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা। আগেই বলা হয়েছে, পদান্ত মিলের অভাবটুকু এই ছন্দের খুব বড় কথা নয়। কেন না, প্রাচীন পয়ারের মিল তুলে দিলেও তা যেমন অমিত্রাক্ষরে পরিণত হবে না, তেমনি আবার অমিত্রাক্ষরে মিল সংযোজিত করলেও তা পুরাতন পয়ারে রূপান্তরিত হবে না। তার কারণ উভয় ছন্দের প্রকৃতিই বিভিন্ন। চরণে যতি ও ছেদের বিন্যাস পদ্ধতিটি বুঝে নিতে পারলে এ দুটি ছন্দের বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরা পড়বে। যতির দিক দিয়ে পয়ারের সঙ্গে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের কোন পার্থক্য নেই। উভয় ছন্দেই চরণে চাল আট + ছয় মাত্রার যোগে, উভয় ছন্দেই প্রত্যেক

চরণের মোট মাত্রাসংখ্যা চোদ্দ এবং চরণে যতির অবস্থানও একই রকম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

| | | | | | | | | | | | | | | |

ত ব প দ চি হ্ন ধ্যান । ক রি দিবা নিশি ॥ =৮+৬

পশিয়াছে কত যাত্রী । যশের মন্দিরে, ॥*

দমনিয়া ভব দম । দুরন্ত শমনে— ॥

অমর ! * * শ্রীভর্তৃহরি ;* । সুরী ভবভূতি ॥

শ্রীকণ্ঠ ; * ভারতে খ্যাত । বর পুত্র যিনি ॥

ভারতীর, কালিদাস । সুমধুর ভাষী, ॥*

মুরারি-মুরলী-ধ্বনি— । সদৃশ মুরারি ॥

মনোহর ; * কীর্তিবাস, । কৃত্তিবাস কবি ॥

এ বঙ্গের অলঙ্কার । **

উপরের ছন্দোলিপিতে দাঁড়ির মত একটি লম্বাটান অর্ধযতির, দুটি লম্বা টান যতির, একটি তারকা চিহ্ন উপচ্ছেদের ও দুটি তারকাচিহ্ন পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন। যতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যাবে, অমিত্রাক্ষরের কাঠামো পয়ারের কাঠামোর সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু ছেদের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রকৃতি ভিন্নতর। চরণে যতি বসে উচ্চারণের ঝোঁক অনুযায়ী, ছেদ বসে অর্থানুযায়ী। পয়ারে পূর্ণযতি ও পূর্ণচ্ছেদ এক সঙ্গে বসে, কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ছন্দে যতি ও ছেদ সর্বক্ষেত্রে মিলে যায় না অর্থাৎ একত্রে বসে না। মধুসূদন ছেদকে যতি থেকে বিযুক্ত করে নিয়ে ভাবের রূপায়ণকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। ফলে ছন্দের মধ্যে প্রবহমাণতা দেখা দিল— ভাবের চরণ থেকে চরণান্তরে ছুটে চলার বাধা অপসৃত হল। এই প্রবহমাণতাকে ছন্দহিল্লোল নামে অভিহিত করা যেতে পারে এবং ঐ ছন্দহিল্লোলই অমিত্রাক্ষরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। অমিত্রছন্দের "প্রত্যেক চরণের শেষে মিলের খাতিরে থামিতে হয় না, প্রত্যেক চরণেই কবি এক একটি ভাবের অবসান ঘটান নাই। একটি তরঙ্গ যেমন রাজহংসকে তরঙ্গান্তরে চালিত করে, তেমনি করিয়া কবি ভাবকে ছত্র হইতে ছত্রান্তরে অবাধে লইয়া গিয়াছেন। যেখানে ভাবের অবসান হইয়াছে সেখানে ছেদ পড়িয়াছে। পড়িবার সময় ছেদ ও যতি উভয়ের মর্যাদা রাখিয়া পড়িতে হয় তাহার ফলে এই অপূর্ব হিল্লোলের সৃষ্টি।" উপরে যে কাব্যাংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তার দিকে তাকালে আমাদের এই কথাগুলির সত্যতা প্রমাণিত হবে। প্রাচীন পয়ার ছন্দে নিয়মিত যতি-বিন্যাসজনিত ঐক্য ছিল, কিন্তু কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না। ছেদের নিপুণ বিন্যাসের সহায়তায় মধুসূদন পয়ারের উপাদান অবলম্বনে বৈচিত্র্যপূর্ণ একটা নতুন ছন্দ নির্মাণ করলেন।

নিজের প্রবর্তিত ছন্দে মধুসূদন মিল প্রয়োগ করেন নি—অমিত্রছন্দের পক্ষে চরণে অন্তামিল অনাবশ্যক। কবি অমিত্রাক্ষরের মিল তুলে দিলেন বটে, কিন্তু সেই অভাব পূরণ করলেন যুক্তাক্ষর সমন্বিত শব্দের নিপুণ সংযোজন দ্বারা। সংস্কৃত কাব্যচ্ছন্দে কোন মিল নেই, কিন্তু যুক্তাক্ষর ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশে এমন একটা অদ্ভুত ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, যাতে মিলের অভাবটুকু উপলব্ধিই করা যায় না। এই ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দ (rhythm অমিত্রাক্ষরের খুব বড় একটা ঐশ্বর্য। এমন সুমহান সংগীত-ধ্বনি অন্য কোন বাংলা ছন্দে দৃষ্ট হবে না। চরণের মধ্যে অজস্র যুক্তাক্ষর, অনুপ্রাস, যমক, ইত্যাদির প্রযোগে মধুসূদন উদাত্ত মধুর ছন্দ সংগীত সৃষ্টি করেছেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আরো একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য-"ইহার verse paragraph বা পদ্য পঙক্তিব্যূহ······এই verse paragraph এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সংগীত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে। নতুবা, কেবল চরণের মধ্যে যতিস্বাচ্ছন্দ্যের [ছেদবিন্যাসের] স্বাধীনতার গুণেই ওই একছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই verse paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে কিন্তু তিনটি বা চারিটি পঙক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরামযুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা সংগীত সংগতির সহায়ে একটি ভাব একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যানে যে পূর্ণ ছন্দরূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পঙক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনি সকলে একটি এককেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সংগতি রক্ষা করিয়া থাকে।" কাব্যের সুরে কান মেলাতে পারলেই এই পঙক্তিব্যূহ বস্তুটির যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়বে। পঙক্তিগুলি বারবার পাঠ করে একে কানের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। পংক্তিব্যূহের একটা দৃষ্টান্ত—

হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদযে
দুঃখতমোবিনাশিনী। কুজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শবরী
তারাদলে লয়ে সঙ্গে উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারাতেজে,
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব তারাবলী।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন একটি ছন্দ যার দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই সাগর কল্লোল থেকে তটিনীর কলধ্বনি পর্যন্ত সকল সুরে ঝঙ্কৃত করা যায়; বিশেষ করে জীবন ও জগতের যাবতীয়

প্রত্যক্ষ রসরূপের অনুভূতিকে মানব কণ্ঠেরই বিচিত্র কাব্যব্যঞ্জনায়, ভাষায়, ছন্দে প্রকাশ করা যায়। মধুসূদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝংকার থাকলেও তা খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি বা উচ্চারণ রীতির ছন্দ। এর চরণও পয়ারের চরণ। অতএব Blank Verse-কে যেমন ইংরাজী National Verse বলা হয়ে থাকে এই অমিত্রাক্ষরকে তেমনি আধুনিক বাংলার সেইরূপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যেতে পারে। মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় বস্তুর মতো মেঘনাদ বধের ছন্দটিও মধুসূদনের প্রোজ্জ্বল কবিকীর্তি।

প্রঃ ৩। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষারীতি ও বাগ্‌ভঙ্গি সম্পর্কে তোমার ধারণা পরিস্ফুট কর।

উত্তর—কাব্যকে বলা হয় ভাবের বাণী বিগ্রহ। এই বাণীমূর্তি নির্মাণের প্রধান উপকরণ ভাষা। ভাষাকে আশ্রয় করেই ভাব রসরূপতা লাভ করে। ছন্দিত ভাষার সৌন্দর্যে ও বাণী বিন্যাস কৌশলেই কবির ভাবকল্পনা চিত্তহারী হয়ে ওঠে। ভাষা কেবল কাব্যের বহিরঙ্গ রূপ মাত্র নয়। ওটি একদিকে যেমন কাব্যের রসাত্মক কলেবর, অন্য দিকে তেমনি কবি-পুরুষেরই কণ্ঠস্বর। মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দোসংগীতে, প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে আমরা বীরাচারী মধুসূদনের স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরই যেন শুনতে পাই—Style is the man—কথাগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করি।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন নবযুগের প্রবর্তক। যুগান্তকারী কাব্যপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়ে ছন্দ ও ভাষা পর্যন্ত তাঁকে এক রকম নতুন ক'রে গড়ে নিতে হয়েছিল। এই নতুন ছন্দে নতুন ভাষায় মধুসূদন বাঙালীকে যে মহা সঙ্গীত শুনিয়েছেন তা অশ্রুতপূর্ব। ভাবের এমন প্রকাশ সুষমা, ভাষার এমন পৌরুষশ্রী, কল্পনার এমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে এর আগে কোথাও দেখা যায় নি। এতদিন বাঙালীর পরিচয় ছিল বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবির কোমল কান্ত পদাবলীর সঙ্গে, ভারতচন্দ্র-ঈশ্বর গুপ্তের যমক-অনুপ্রাস কণ্টকিত কাব্যরীতির সঙ্গে। শেষোক্ত কবি দু'জনের প্রতি পাশ্চাত্য সাহিত্যমন্ত্রে দীক্ষিত মধুসূদনের তেমন কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ভারতচন্দ্রকে তিনি বলতেন—'কৃষ্ণচন্দ্রের সেই লোকটি', আর ঈশ্বর গুপ্তকে বলতেন—'বুড়ো ঈশ্বর গুপ্ত'। স্বয়ং ভারতচন্দ্র ও তাঁর অনুগামী কবিবৃন্দ এক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে যে একটা দূষিত কাব্যরীতির প্রবর্তক এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। মধুসূদন স্বরচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যে ভাষার কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্য সাহিত্যে এই কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। "মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাই আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম কবিভাষা অর্থাৎ ভাষা এখানে সর্ব প্রকারে কবির নিজস্ব প্রয়োজনের অধীন হইয়াছে ; ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে, ধ্বনি ও রূপ ব্যঞ্জনায় তাহাকে কবির কল্পনা অনুযায়ী যে বেশ-বিন্যাস করিতে হইয়াছে, তাহাতে তাহার

অভ্যস্ত রুচি ও রীতি-সংস্কারকে অনেকাংশে বর্জন করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে ভাষা শুধুই ভাষামাত্র নাই, একটি স্বতন্ত্র কবিভাষায় পরিণত হইয়াছে।” মধুসূদনের প্রযুক্ত ভাষার মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য রসজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবার নয়। মধুসূদন বাংলা কবিতার ভাষার সংস্কার সাধন করে এর জড়তা মোচন করেছেন। তিনি যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তার মধ্যে যে শালীনতা ও দৃঢ়বদ্ধতা রয়েছে, যে সংযমের পরিচয় আছে এবং ওতে যে ক্লাসিক আভিজাত্যের রূপটি ফুটেছে, বাংলা কাব্য সাহিত্যে তা কেবল বিরলদৃষ্ট নয়—অদৃষ্টপূর্ব। মধুসূদন যে শুধু classical literature এর অনুরাগী পাঠক ছিলেন তা নয়, নিজের সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যেও তিনি classical রচনা ভংগীটিকে যথার্থ রক্ষা করেছেন।

মেঘনাদবধের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন, কবি অপ্রচলিত, দুরূহার্থক ও শ্রুতিকটু শব্দ প্রয়োগ করে তাঁর কাব্যখানিকে কণ্টকিত করে তুলেছেন। কিন্তু কোন্ গূঢ়তর কারণে কবি এরকম শব্দ প্রয়োগ করেছেন তা তাঁরা ভেবে দেখেছেন বলে মনে হয় না। মেঘনাদবধ আদ্যন্ত অমিত্রছন্দে রচিত। এই একটি মাত্র ছন্দের মাধ্যমে বহু বিচিত্র ভাব কল্পনা ও হৃদয়ানুভূতিকে বাণীরূপ দান করতে হয়েছে বলে মধুসূদনের ভাষারীতি এবং বাগ্‌ভংগীটিও একটি স্বতন্ত্র মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। সমগ্র মেঘনাদ বধ কাব্যে দশ বারটির বেশী শ্রুতিকটু শব্দ দৃষ্ট হবে না। ‘অপ্রচলিত’ ও দুরূহার্থক’ শব্দ বলতে ঐ সমালোচকগণ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে মেঘনাদ বধের কবি কেন আর্য ভাষা সংস্কৃতের আশ্রয় নিলেন তা ভেবে দেখবার বিষয়।

মধুসূদন উদাত্ত ‘মহাগীত’ গাইবার উদ্দেশ্যেই মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেছিলেন। যে-কাব্যকে ‘মহাগীত’ হয়ে উঠতে হবে তার পক্ষে ভাষা ও ছন্দের সংগীতগুণ অপরিহার্য। এইজন্য মধুসূদনকে ছন্দো সংগীত ও শব্দ সংগীতের দিকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়েছিল। এই দ্বিবিধ সংগীত ও ভাবানুগত পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়োজনে মধুসূদন এক রকম বাধ্য হয়ে আর্য ভাষা সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রকৃত বাংলা শব্দের মধ্যে অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘতা নেই, অক্ষরের লঘু গুরু প্রভেদ এতে একরকম বিলুপ্ত। স্বরধ্বনির লীলাবৈচিত্র্যহীন খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগে ছন্দকে হিল্লোলিত, শব্দকে ধ্বনি তরঙ্গিত করে তোলা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় অভিজাত সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মধুসূদনের গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং যুক্তাক্ষরবহুল সংস্কৃত শব্দের প্রতি কবির প্রীতিপক্ষপাত নিরর্থক নয়।” যেখানে গাম্ভীর্য সৃষ্টি করিতে হইবে, পৌরুষ-সবলতা প্রকাশ করিতে হইবে, যেখানে রাজশ্রী গরিমা প্রকাশ করিতে হইবে, মাইকেল সাধারণত সেখানেই ওইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন।” কেবল বাক্যের অর্থের দ্বারা সূক্ষ্ম সুকুমার ভাবকে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, এর জন্য সংগীত স্পন্দনের প্রয়োজন। সংস্কৃত ভাষা স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংগীতে পরিপূর্ণ—শব্দের এমন ধ্বনি-ঐশ্বর্য খুব কম ভাষাতেই দেখা যায়। “সংস্কৃত ছন্দে বিচিত্র সংগীত

তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হ্রস্বতা এবং যুক্তাক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি ও তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।" এই কথা গুলো থেকে বোঝা যাবে, কেন মধুসূদন তাঁর ভাষায় এত অজস্র তৎসম শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ভাব ও ছন্দের সুষমা সংগতি রক্ষার জন্য ছন্দোসংগীতের বৈচিত্র্য সাধনের জন্য কবিকে প্রচুর অপ্রচলিত শব্দ এবং নামধাতুর প্রয়োগ করতে হয়েছে—এমনকি অনেক সময় ব্যাকরণকে পর্যন্ত লঙ্ঘন করতে হয়েছে।

মধুসূদনের কবিভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ, এতে যমক-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য সবিশেষ লক্ষণীয়। ভাষাকে মাধুর্যপূর্ণ, ছন্দের প্রবাহকে কল্লোলিত করবার প্রয়োজনবোধে এবং ভাবের রূপ সৃষ্টির প্রেরণায় শব্দালঙ্কারের প্রতি তিনি এতখানি অনুরাগ দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষা উপমা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, সমাসোক্তি, অতিশয়োক্তি, রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কারের ঐশ্বর্যেও মণ্ডিত। মধুসূদনের শব্দচয়ন, শব্দ যোজনা, বাগ্‌বিন্যাস ইত্যাদির মধ্যে প্রভূত কাব্যকলা ও কবিত্বের পরিচয় সুপ্রকট। আবার অজস্র সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করলেও, তাঁর প্রযুক্ত ভাষায় খাঁটি বাংলা শব্দের ব্যবহারও বিরলদৃষ্ট নয়। অভিজাত সংস্কৃত শব্দ ও প্রাকৃত বাংলা শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে তিনি সংগীত স্পন্দিত যে কবি-ভাষার সৃষ্টি করেছেন, সুসংহতি সুষমা ও কৌলিন্য গরিমায় তা অতুলনীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। অমিত্রচ্ছন্দে রচিত মেঘনাদ বধের ভাষা কেবল শ্রবণীয় নয়, প্রেক্ষনীয়ও বটে। ওই ভাষা ধ্বনি তরঙ্গে আন্দোলিত, শব্দের রূপৈশ্বর্যে বিলসিত। "মেঘনাদবধ শুধু একটি কাব্য নয় —সে একটা ভাষা। তাহার যাহা কিছু দোষগুণ সব লইয়া সে এতই অনন্যসাধারণ যে, তাহার দূরতম প্রতিধ্বনি ও সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি বাংলা কাব্য সাহিত্যে আর কোথাও নাই। মেঘনাদ বধের গঠন রীতিই শুধু ক্লাসিক্যাল নয়, এই কাব্যের ভাষা ভংগীটিও ক্লাসিক্যাল। এমন যত্নকৃত বাগ্‌বন্ধ, বিশেষ করিয়া, ভাষার এমন সংযম বাংলা সাহিত্যের অন্য কোথাও দেখা যায় না—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও নয়। যেটুকু স্বেচ্ছাচার তাঁহার ভাষায় লক্ষিত হয় তাহাও রস সৃষ্টির প্রয়োজনে।"

তবে 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি যে একেবারে ত্রুটিশূন্য এমন কথা বলা ঠিক নয়। কবির প্রযুক্ত ছন্দে যতি পাতনের ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় প্রমাদ ঘটেছে। ফলে ছন্দের সংগীত প্রবাহে অযথা বাধার সৃষ্টি হয়েছে; কোথাও বা দূরান্বয়ের জন্য বাগর্থের অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে, কোথাও বা শ্রুতিকটু শব্দের ব্যবহার ভাষার সংগীত সুষমা ক্ষুন্ন করেছে। অলঙ্কারের যথেচ্ছ প্রয়োগ কোন কোন স্থানে কাব্যের ভূষণ না হয়ে রসসৃষ্টির পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে; নামধাতুর আতিশয্যও ভাষাকে কিছুটা পীড়িত করেছে। তবুও আমরা বলব, মধুসূদনের ছন্দোরীতি ও বাণীরচনকৌশল তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। অভিনব প্রকাশভংগী বা style এর মহিমার জন্যই মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে যুগোত্তীর্ণ স্রষ্টার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মিল্টনের মহাকাব্য সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেছেন—"What has made the poem live is not the story nor the construction nor the characterisation ; not these things, though all are factors in the greatness of the poem—but the incomparable elevation of the style, the shaping spirit of imagination and the mere majesty of the music." এই কথাগুলি মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। বাংলা সাহিত্যে কোন কাব্যকে যদি যথার্থ মহাকাব্য নামে চিহ্নিত করা যায় তবে তা 'মেঘনাদ বধ'—এর রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

প্রঃ ৮। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে এই সর্গের যে নামটি দেওয়া হয়েছে তার যৌক্তিকতা বিচার কর।

উত্তর : কবি মধুসূদন প্রথমে কবিতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির করুণা প্রার্থনা করে ও মধুকরী কল্পনা দেবীকে আহ্বান করে কাব্য আরম্ভ করেন। স্বর্ণ লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পাত্রমিত্রসহ রাজসভায় উপবিষ্ট। রক্ষোরাজের অপূর্ব সুন্দর সভাগৃহ বিস্ময়কর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে। কিন্তু দেবদুর্লভ সম্পদ প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও লঙ্কার অধিপতি রাবণের হৃদয় আজ মর্মচ্ছেদী শোকবেদনায় ক্লিষ্ট, সভামধ্যে তিনি নির্বাক হয়ে বসে আছেন। কারণ ভগ্নদূত মকরাক্ষ রক্ষোরাজের বীর পুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ বহন করে নিয়ে এসেছে।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদে রাবণ শোকাকুল হলে সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ তাকে সান্ত্বনা প্রদান করবার অভিপ্রায়ে নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। মায়াচ্ছন্ন পৃথিবীতে সব কিছুই তো নশ্বর—পৃথিবীর সুখ দুঃখ মায়ারই লীলা। কিন্তু তবুও মানুষের হৃদয় যন্ত্রণা সর্বদা যুক্তির পথে চলে না, প্রিয়বস্তু, প্রিয় জনকে হারালে সমস্ত অন্তর মর্মঘাতী বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। তাই রাবণ আজ শোকার্ত। কথঞ্চিত আত্মসংবরণ করে রক্ষোরাজ মকরাক্ষকে পরম বীর্যশালী পুত্র বীরবাহুর সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। রাবণের আদেশে ভগ্নদূত আবেগপূর্ণ ভাষায় অমিত বীর্যের অধিকারী বীরবাহুর বিস্ময়কর শৌর্য বীর্য ও রণ কৌশলের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করল। বীরত্বের কাহিনী শুনে রাবণ তাঁর প্রাসাদ শিখরে উঠে প্রিয় পুত্র বীরবাহুর অন্তিমশয্যায় শয়ন পর্যবেক্ষণ করলেন। সংগ্রাম ভূমির প্রেত মূর্তি, শ্মশান দৃশ্য দেখে রক্ষোরাজের হৃদয় আবার শোকাকুল হ'য়ে উঠল, পুত্রের বিচ্ছেদজনিত অসহ্য মর্ম যাতনায় তিনি হাহাকার করে উঠলেন। দূরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সমুদ্র আজ সেতু বন্ধন রূপ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। এ দৃশ্য তাঁকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে।

রণক্ষেত্র প্রদর্শন করে রাজসভায় রাবণ ফিরে এলে বীরবাহু জননী রাণী চিত্রাঙ্গদা পুত্র শোকে আর্তনাদ করতে করতে সহচরীগণসহ রাজসভায় প্রবেশ করলেন। পুত্রহারা জননীর আকুল ক্রন্দনে সভা গৃহে যেন শোকের ঝড় বয়ে গেল। রক্ষোরাজ শোকাকুলা পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। চিত্রাঙ্গদা তো বীর মাতা—যে পুত্র বীর কর্মের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তার জন্য শোকের কোন হেতু নেই। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা অভিযোগ করলেন রাবণের দোষেই আজ তাঁর এই অবস্থা। রাজ্য জয়ের জন্য রামচন্দ্র যুদ্ধ করতে আসেন নি। রাবণ সীতা হরণ করেছেন বলেই আজ এই যুদ্ধের আয়োজন।

একদিকে পুত্রশোকের বেদনা অন্যদিকে পত্নীর সুতীব্র গঞ্জনা—পুত্রহন্তার প্রতি প্রদীপ্ত ক্রোধে রাক্ষসরাজ রাবণের সকল চিত্ত জ্বলে উঠল। তিনি স্থির করলেন, নিজেই যুদ্ধযাত্রা করবেন। দেখতে দেখতে হাজার হাজার রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হ'ল, সুগম্ভীর রণবাদ্যে দিগদেশ প্রতিশব্দিত হ'তে লাগল। রণোন্মত্ত সৈন্যদলের বীরপদভরে কনকলঙ্কা কেঁপে উঠল। রাক্ষসসেনার প্রচণ্ড কোলাহল সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তুলল। কেশবিন্যাসরত সমুদ্রপত্নী বারুণী এতে চমকিত ও বিচলিত হয়ে উঠলেন। তাঁর সখী মুরলা জানালো যে সমুদ্রের এই বিক্ষুব্ধতা—চঞ্চলতার কারণ রক্ষোরাজ রাবণের সৈন্যদের পদভার ও গর্জন কোলাহল। মুরলা তখন লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত লক্ষ্মীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট বারুণীর কথা নিবেদন করল এবং যুদ্ধের সংবাদ সবিস্তারে জানতে চাইল। রক্ষোকুল-রাজলক্ষ্মী তখন বিষাদক্লিষ্ট কণ্ঠে মুরলাকে জানালেন যে রাবণের কুকর্মের জন্য আজ লঙ্কাপুরী ধ্বংসন্মুখ। তিনি শীঘ্রই লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করে যাবেন।

এরপর তাঁরা দুজনে রক্ষোরমণীর ছদ্মবেশে মন্দিরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়ালেন এবং দেখলেন অগণিত রাক্ষস সেনার সংগ্রাম অভিযান। লক্ষ্মীদেবী বিভিন্ন বীর যোদ্ধার পরিচয় প্রদান করেছিলেন মুরলার কাছে। অসংখ্য বীর রথীদের মধ্যে মেঘনাদকে দেখতে না পেয়ে মুরলা তার কারণ জিজ্ঞাসা করার লক্ষ্মীদেবী জানালেন বোধ হয় মেঘনাদ লঙ্কার বাহিরে প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে রত। হয়তো লঙ্কার এই বিপদের কথা তাঁর জানা নেই। তাই লক্ষ্মীদেবী মুরলাকে বিদায় দিয়ে মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষার বেশ ধারণ করে প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাদকে বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানালেন এবং এও জানালেন যে লঙ্কা বীরশূন্য দেখে রাবণ নিজেই সৈন্য চালনা করে যুদ্ধে যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। সুতরাং অনতিবিলম্বে মেঘনাদের লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যকর্তব্য।

তাঁর কথা শুনে বেদনায়, আত্মগ্লানিতে, ক্ষোভে রোষে মেঘনাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। লঙ্কার এই অবস্থায় তিনি বিলাসব্যসনে মত্ত! রোষভরে মেঘনাদ বিলাস

সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করলেন। বীরবেশে সজ্জিত হলেন এবং পত্নীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রক্ষোরাজ রাবণ যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় মেঘনাদ সেই স্থানে উপনীত হয়ে পিতৃচরণে প্রণাম করে যুদ্ধে সৈনাপত্য প্রার্থনা করলেন। রাবণ এই সংঘাতিক যুদ্ধে প্রথমে মেঘনাদকে পাঠাতে রাজী হন নি, পরে মেঘনাদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি রাজী হলেন এবং পুত্র মেঘনাদকে যথাবিধি সেনাপতি পদে বরণ করলেন।

কবি প্রথম সর্গটির নামকরণ করেছেন 'অভিষেক'। এই সর্গটি কাব্যের মূল কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। বীরকুলচূড়ামণি বীরবাহুর পতনের পর কবি তাঁর প্রিয় বীর কেশরী ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকেই প্রত্যক্ষভাবে লঙ্কার সংগ্রাম ক্ষেত্রে অবতীর্ণ করবার জন্য রক্ষোরাজ রাবণকে দিয়ে যথাবিধি তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করালেন। রাক্ষসকুলভরসা ইন্দ্রজিতের সৈনাপত্য-গ্রহণে সকল লঙ্কাবাসীর চিত্তে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি হ'ল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের কবিদিগের চিত্ত-বন-ফুল-মধু আহরণ করে মধুকবি যে মধুচক্র রচনা করেছেন, তা অভিনব ও উপাদেয়। করুণ রস এবং বীররসের উদ্বোধনে কবি কতখানি নিপুণ ছিলেন বর্তমান সর্গটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। একদিকে শোকবজ্রদীর্ণ রাবণের বিষাদমলিন মূর্তি, সন্তান-শোক-কাতরা চিত্রাঙ্গদার আর্তনাদ, অন্যদিকে রুদ্ধবীর্য রক্ষোরাজের আত্মস্ফূর্তির দুর্জয় কামনা, তাঁর পৌরুষ-বীর্য-ঐশ্বর্যের পরিচয়, সেতু শৃঙ্খলিত সমুদ্রের প্রতি তাঁর উক্তি এবং বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গের বর্ণনা কবির অত্যুৎকৃষ্ট কবি প্রতিভার পরিচয় বহন করে। আলোচ্য সর্গের প্রথম ভাগে লঙ্কেশ্বরের যে প্রবল প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের বিয়োগান্ত পরিণতিটি দ্বিগুণ বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রছন্দের মৃদংগ নির্ঘোষ, শব্দধ্বনিসঞ্জাত উদাত্ত গম্ভীর সঙ্গীত-তরঙ্গ, কবি কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব কবিভাষা, বিচিত্র অলঙ্কারমণ্ডিত রসোদ্বেল বাক্য সংযোজনা, উচ্চতর কবিকল্পনাসম্ভূত অভিনব বাগভঙ্গী, ভাষার সংহতি সুষমা ও কৌলিন্য গরিমা, নিরতিশয় যত্নকৃত বাগবন্ধ এবং সর্বোপরি কবির ক্লাসিক সংযম যে কোন বিদগ্ধ পাঠককে মুগ্ধ করবে।

প্রশ্ন ৫। মেঘনাদবধ কাব্যের সূচনায় রাবণের রাজসভার যে আড়ম্বরময় বর্ণনা আছে, তার পরিচয় দাও এবং এই বর্ণনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর—

কনক আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ, নতভাবে বসে চারিদিকে।

কাঞ্চন সৌধকিরীটিনী লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পাত্র মিত্র সহ রাজসভায় সমাসীন— স্বর্ণময়ী লঙ্কাভূমির শোভাসৌন্দর্য জগতে অতুলনীয়, অনির্বচনীয়। রক্ষোরাজের এই অপূর্বসুন্দর সভাগৃহ তাঁর বিস্ময়কর ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করছে। রাবণের সভাগৃহ স্বচ্ছ স্ফটিক দ্বারা নির্মিত। তার ওপর বিভিন্ন রত্নরাজি খচিত রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন মানস সরোবরে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের সারি সারি স্তম্ভ সভাগৃহের উচ্চ স্বর্ণনির্মিত ছাদকে ধারণ করে আছে। মনে হচ্ছে যেন অনন্তনাগ বাসুকি তার অজস্র মণিদীপ্ত অগণিত ফণার ওপর বিশাল পৃথিবীকে সযত্নে ধারণ করে আছে। চতুর্দিকে পদ্মরাগ, মরকত হীরা, মুক্তাখচিত ঝালর দোদুল্যমান। সেই রত্নসমূহ থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি যেন বিদ্যুৎ চমকের মত ক্ষণে ক্ষণে দীপ্তি পাচ্ছে। সুদৃশ্য চামর আন্দোলিত করে সুনয়না কিংকরীবৃন্দ ব্যজন করছে। যিনি রক্ষোরাজের ছত্র ধারণ করে আছেন, তার নয়ন-বিমোহন সৌন্দর্য বিলসিত দেহের দিকে তাকালে মনে হয় যেন অঙ্গধারী দেবতা মদনই সেই সভাগৃহে ছত্রধর রূপে বিদ্যমান। রক্ষোরাজ রাবণের রাজসভার দ্বার যে দৌবারিক রক্ষা করছে তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন মহাদেবের মত ভয়ঙ্কর মূর্তি, ভীষণ দর্শন। লঙ্কাপতি রাবণের দুর্নিবার প্রতাপে লঙ্কাভূমিতে চির বসন্ত বিদ্যমান, তাই সেখানে বসন্ত বায়ু অবিরত প্রবহমান। বৃন্দাবনের কুঞ্জ কাননকে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি জাত মধুর স্বর তরঙ্গ যেমন অনুরণিত করে তুলত, দূর থেকে বায়ুবাহিত নানাবিধ মৃদু বাদ্য ধ্বনি রাবণের সভাগৃহটিকে তেমনি গুঞ্জিত করে তুলেছে। রাবণের সভাগৃহের সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যের তুলনায় ময়দানব রচিত ইন্দ্রপ্রস্থের সেই বিশ্রুত সভাগৃহটিও একান্ত তুচ্ছ।

'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রথমেই রাবণের বিপুল শক্তি, ঐশ্বর্যপূর্ণ বিরাট রাজ সভার বর্ণনা রাবণের রাজকীয় মহিমাকে সমুন্নত করে তুলেছে। সুপরিপাট্য বর্ণনার গুণে রাবণ যে কত শক্তিশালী, তাঁর ঐশ্বর্য যে কত বিরাট তা অত্যন্ত অল্প পরিসরের মধ্যে বোধগম্য হয়েছে। রাবণ রাজা যে সাধারণ রাজা নন, তাঁর বিপুল বৈভবের তুলনায় বনবাসী রাম-লক্ষ্মণ যে অত্যন্ত সামান্য তা সহজেই অনুমেয়। কাব্যের শেষে আমরা দেখি এত বৈভব থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যের পরিহাসে রাবণের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এখানে আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে। রাবণের রাজ-সভার যে বর্ণনা দেওয়া আছে পৃথিবীর কোথাও তার তুলনা মেলে না। কবি নিজেই জানিয়েছেন ইন্দ্রপ্রস্থে ময়দানব নির্মিত সভাগৃহও এর সৌন্দর্যের তুলনায় কিছুই নয়। "এ হেন সভায় বসে, রক্ষঃকুলপতি, বাক্যহীন পুত্র শোকে।" এক দিকে বিরাট ঐশ্বর্য, অপর দিকে পুত্রশোকে বাক্যহীন রক্ষোরাজ রাবণ। এই বৈপরীত্য সৃষ্টি বাস্তবিকই এক অপূর্ব সাহিত্যিক নিদর্শন। শুধু তাই নয়, রাবণের এই শোক জর্জরিত বিষাদ মলিন মূর্তিটিই পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিক্ষণ বিরাজ করতে থাকে। এই কাব্যে পৌরুষ বীর্যের জয় গাথা তার নিষ্ফল পরিণাম ও মর্মান্তিক পরাভবের কাহিনীর অন্তরালে একেবারে চাপা পড়ে গেছে। কবি রাবণের বিপুল

ঐশ্বর্য ও অমিতপরাক্রম ঘোষণা করেও তার দুর্বল অবসন্ন শোককাতর মূর্তিটিই আমাদের চোখের সম্মুখে স্থাপন করেছেন। স্নেহ মমতার পারবশ্য ও তজ্জনিত হৃদয়-দৌর্বল্য রাবণের শোচনীয় পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

প্রঃ ৬। 'মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত বারুণী-মুরলা-সংবাদ ও রমা-মুরলা সংবাদ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর এবং মেঘনাদের বধ প্রসঙ্গে এই সংবাদের গুরুত্ব নির্দ্ধারণ কর।

উত্তর—রক্ষোরাজ রাবণের বীর পুত্র বীরবাহু যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। রাবণ বিষাদ ক্লিষ্ট হৃদয়ে রাজসভায় সমাসীন। এমন সময় রাণী চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় এসে পতিকে তীব্র গঞ্জনা দিতে লাগলেন এবং তাঁর আকুল ক্রন্দনে রাজসভায় শোকের ঝড় বইল। একদিকে পুত্রশোকের বেদনা, অন্যদিকে পত্নীর সুতীব্র গঞ্জনা—পুত্র হন্তার প্রতি প্রদীপ্ত ক্রোধে রাক্ষসরাজ রাবণের সকল চিত্ত জ্বলে উঠল। তিনি নিজেই যুদ্ধ যাত্রার কঠোর সঙ্কল্প করলেন। দেখতে দেখতে হাজার হাজার রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হল, সুগম্ভীর রণ বাদ্যে দিগ্‌দেশ প্রতিশব্দিত হ'তে লাগল, রণোন্মত্ত সৈন্য দলের বীর পদ ভরে কনক লঙ্কা কেঁপে উঠল।

পৃথিবী কাঁপল, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল অকূল নিতল সমুদ্র। গভীর সাগরতলে যেখানে সমুদ্র পত্নী বারুণী কেশ বিন্যাস করছিলেন রাক্ষস সেনার প্রচণ্ড কোলাহল, তাদের বীর পদক্ষেপ সে স্থানকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। সমুদ্রের এই আকস্মিক বিক্ষুব্ধতায় ও চাঞ্চল্যে বারুণী চমকিত বিচলিত হয়ে ভাবলেন, দেবতা প্রভঞ্জন বুঝি দুষ্ট বায়ু কুলকে সঙ্গে নিয়ে আবার সমুদ্র তরংগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ প্রবল ঝটিকার আবির্ভাবেই বুঝি সমুদ্রের এই আকস্মিক বিক্ষোভ। কিন্তু সখী মুরলা বারুণীকে জানাল যে, সমুদ্রের এই বিক্ষুব্ধতা-চঞ্চলতা ঝটিকার আবির্ভাবজনিত নয়, রক্ষোরাজ রাবণের অগণিত সেনাবৃন্দের পদ ভরে ও গর্জন কোলাহলেই পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠেছে—সমুদ্র গর্ভেও তাই এই প্রচণ্ড আলোড়ন। লঙ্কার সমর বৃত্তান্ত বিশদ ভাবে অবগত হবার জন্য বারুণী তখন সখী মুরলাকে কনক লঙ্কা-নিবাসিনী লক্ষ্মীর কাছে প্রেরণ করলেন।

মুরলা লঙ্কাপুরীতে অবস্থিত লক্ষ্মী সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে বারুণীর কথা নিবেদন করল এবং রামচন্দ্র ও রক্ষোরাজ রাবণের যুদ্ধ সংবাদ সবিস্তারে জানতে চাইল। তখন রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী বিষাদ ক্লিষ্ট কণ্ঠে মুরলাকে বললেন, লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ দিন দিন হীন বীর্য হয়ে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে ; লঙ্কা নগরী আজ প্রায় বীরশূন্য হয়েছে—ভীমাকৃতি কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে মরেছে, অকম্পন নিহত হয়েছে, মহাবলী বীরবাহুও জীবিত নেই—রামচন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রামে আরো কত কত রাক্ষস প্রাণ হারিয়েছে। পুত্রহীনা মাতা, পতিহীনা নারীর মর্মচ্ছেদী হাহাকারে লঙ্কার আকাশ বাতাস প্রতিশব্দিত হচ্ছে—লঙ্কাপুরীতে কমলার অবস্থান অসম্ভব হয়ে উঠেছে, বীরশূন্য এই স্বর্ণ লঙ্কা তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করে যাবেন।

এই মুহূর্তে কোন্ কোন্ রাক্ষসবীর যুদ্ধার্থ বহির্গত হবার জন্য সজ্জা করেছে, মুরলা তা জানতে চাইলে লক্ষ্মী দেবী বললেন মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালে তিনি যথার্থ বৃত্তান্ত জানাতে পারবেন। তার পর তাঁরা দুজনে রক্ষোরমণীর ছদ্মবেশে মন্দিরের দ্বার দেশে এসে দাঁড়ালেন। রাজ পথে তাঁরা দেখলেন অগণিত রাক্ষস সেনার সংগ্রাম অভিযান। মুরলা তখন ঐ সকল রক্ষোবীরের পরিচয় জানতে চাইলে লক্ষ্মী দেবী তাকে রাক্ষস সেনানী বৃন্দের পরিচয় দিতে লাগলেন। এদের মধ্যে দেখা গেল বীরূপাক্ষ, কালনেমি, তালজংঘা, প্রমত্ত প্রভৃতি সুবিখ্যাত রাক্ষস বীরদলকে। এই অভিযানে বীরাগ্রগণ্য মেঘনাদকে দেখতে না পেয়ে মুরলা কমলাকে তার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে লক্ষ্মীদেবী বললেন বোধ হয় মেঘনাদ পত্নী প্রমীলার সঙ্গে লঙ্কার বহির্ভাগে অবস্থিত প্রমোদ উদ্যানে রয়েছেন। লঙ্কাভূমির আসন্ন বিপদের কথা হয়তো এখনো তাঁর কর্ণগোচর হয় নি। হায়, নিজ দোষেই রক্ষোরাজ নিজের এবং স্বর্ণ লঙ্কার বিনাশ ডেকে আনলেন।

"পাপে পূর্ণ স্বর্ণ লঙ্কা: কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি ?"

লক্ষ্মী দেবী এই কথা বলে মুরলাকে বিদায় দিয়ে মেঘনাদকে সংবাদ প্রদানের জন্য প্রমোদ কাননোদ্দেশে যাত্রা করলেন।

বারুণী-মুরলা কথোপকথন এবং রমা-মুরলা কথোপকথন রামায়ণে নেই। এটি মধুসূদনের স্বকপোল কল্পিত। তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাহিনীর অবতারণা করেছেন। মেঘনাদ রয়েছেন প্রমোদ কাননে। তিনি যুদ্ধের খবর কিছুই জানেন না। তাঁকে যুদ্ধের খবর জানিয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাকে যোগদান করানোর জন্যই মধুসূদন এই কৌশল অবলম্বন করেছেন। বীরবাহুর মৃত্যুর পরই রাবণ নিজে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু মেঘনাদ জীবিত থাকতে রাবণের যুদ্ধ যাত্রা শোভা পায় না। তাই মেঘনাদকে যুদ্ধের প্রয়োজনেই কৌশলে আনানো হয়েছে। দ্বিতীয়ত রাবণের কৃতকর্মের জন্য সমগ্র লঙ্কা আজ ধবংসোন্মুখ। লঙ্কার রাজলক্ষ্মীও যে লঙ্কা ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন, এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে তা জানানো হয়েছে। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের যে করুণ পরিণতি দেখানো হ'তে চলেছে তারই সূচনা আমরা এই অংশে দেখতে পাই। সুতরাং বারুণী-মুরলা সংবাদ ও মুরলা-কমলা সংবাদ এর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। যোগীন্দ্রনাথ বসু মশাই বলেছেন, "মেঘনাদ বধের এই বারুণী চরিত্র হিন্দু পুরাণানুমোদিত নহে। হোমারের থেটিস (thetis) হইতে মিলটন্ তাঁহার 'কোমাস' (Comus) কাব্যের স্যাব্রিনার (Sabrina) আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেলের বারুণী চরিত্র এই স্যাব্রিনা চরিত্রের অনুসরণে রচিত। সমুদ্রের সঙ্গে সময় প্রিয় বায়ু দলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের ইওলাস য়্যাণ্ড উইণ্ডস্ [Aeolus and wind] হইতে গৃহীত।"

প্রঃ ৭। প্রথম সর্গের চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বর্ণনের ক্ষেত্রে কবি মধুসূদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য সাহিত্যের কাছে কতখানি ঋণী, তা সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা কর। এই কাব্যঋণ কবির মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে কি না তা বল।

উত্তর ঃ রামায়ণের একটি খণ্ডাংশকে মূল বিষয় বস্তুরূপে অবলম্বন করে মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ কাব্য' নামে এক নতুন কাব্য রচনা করেন যার মধ্যে রামায়ণী কথার মূল স্রোতে প্রাচী ও প্রতীচীর নানা কবির ভাব কল্পনা উপধারার মতো এসে মিশেছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গটির ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবিকে বহুবার মহাভারত এবং পুরাণের আশ্রয় নিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে "বাল্মীকির কবিত্ব লাভ", "হর কোপা নলে ভস্মীভূত কামদেব" প্রভৃতি প্রসঙ্গ কিংবা পাণ্ডব শিবিরে প্রহরারত শূলপাণির উল্লেখ করা যেতে পারে।

কাব্যখানি পাঠ করবার সময় আমরা দেখতে পাই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণে মধুসূদন প্রত্যেকটি সর্গশেষে সংস্কৃত ভাষায় পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে পুরুষ রূপেই কল্পনা করেছিলেন, সেই জন্য মেঘনাদ বধ কাব্যের পূর্বে 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মধু কবির এই কাব্যে ব্যাস বাল্মীকি-ভবভূতি অপেক্ষা হোমার, ভার্জিল ও মিল্টনের প্রভাব বেশী।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গের প্রারম্ভে কবি বাগ্দেবী বীণাপাণি ও 'কল্পনা'র যে আহ্বান সংগীত উচ্চারণ করেছেন, তা হোমার, মিল্টন প্রভৃতি ইউরোপীয় কবির Muse বন্দনা বা Invocation এর অনুরূপ। মধুসূদনের বীণাপাণি ও কল্পনা দেবীর সঙ্গে পাশ্চাত্য কবির সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী Muse দেবীর কোন পার্থক্য নেই। কবির রচিত বারুণী-মুরলা সংবাদ প্রসঙ্গটির উপরও পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে। বারুণী চরিত্র বিদেশী কাব্য থেকে অনুকরণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। হোমারের জলদেবী 'থেটিস' থেকে মিল্টন তাঁর Comus কাব্যের Sabrina চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। মধুসূদনের বারুণী চরিত্র মিল্টনের Sabrina এর আদর্শে পরিকল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ু দলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক-পুরাণের Aelous and Winds এর আদর্শে কল্পিত। বারুণীর সখী মুরলার নামটি কবি সম্ভবতঃ ভবভূতির 'উত্তর রাম চরিত' থেকে গ্রহণ করেছেন।

"মুরলার সহিত কথোপকথনের পর লঙ্কার রাজলক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রীর বেশধারণ করিয়া মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং মেঘনাদকে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ ও রাবণের যুদ্ধোদ্যমের সংবাদ জানাইলেন। মেঘনাদের প্রমোদ কাননের যে চিত্র কবি প্রথম সর্গে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার সহিত ইতালীর কবি ট্যাসোর Jerusalem Delivered কাব্যের Armida এর প্যারাডাইসের সাদৃশ্য আছে।

মেঘনাদ বধ কাব্যে মেঘনাদ লঙ্কাপুরীর বহির্ভাগে অবস্থিত প্রমোদ উদ্যানে পত্নী প্রমীলার সহিত বিলাসে মগ্ন—ট্যাসোর কাব্যে রাইনাল্ডো (Rinaldo) মায়াবিনী আর্মিডার প্রেমে আবদ্ধ। মেঘনাদবধে প্রেমোন্মত্ত মেঘনাদকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিতে গিয়াছিলেন স্বয়ং লঙ্কার রাজলক্ষ্মী, মেঘনাদের ধাত্রী প্রভাষা রূপে,—আর ট্যাসোর কাব্যে প্রেমোন্মত্ত রাইনাল্ডোকে যুদ্ধার্থ আর্মিডার প্রমোদ ভবন হইতে আনিতে গিয়াছিল চার্লস এবং ইউবার্ডো [Charles ও Ubardo]। প্রথম সর্গে মেঘনাদ ও প্রমীলার বিদায় চিত্রটি হোমার কৃত ইলিয়াডে হেক্টর ও তৎপত্নী এ্যাণ্ডো মেকীর বিদায়-চিত্রের অনুরূপ। প্রমীলার কাতর মিনতি ইলিয়াডের বীর যোদ্ধা হেক্টরের পত্নী এ্যাণ্ডো মেকীর অনুনয়ের কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিবে। আবার ট্যাসোর কাব্যেও পলায়িত রাইনাল্ডোর জন্য আর্মিডা এমনি ভাবেই খেদোক্তি করিয়াছিলেন।”

এখন প্রশ্ন হতে পারে, দেশ বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক নানা কবির ভাব কল্পনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করায় মধুসূদনের প্রতিভার মৌলিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে কি না। উত্তরে আমরা বলব, এতে কবির মৌলিকতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নি। প্রতিভার আশ্চর্য স্বীকরণ বলে মধুসূদন জগতের বিভিন্ন কবির বিভিন্ন ভাবরাজি আত্মসাৎ করে যে কাব্য রচনা করেছেন, তা কাশীদাসের নয়, রঙ্গলালের নয়, ট্যাসোর নয় কিংবা ভার্জিল অথবা হোমারের নয় এ কবির সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ নানা দেশীয় কবির কল্পনার তিল তিল সমবায়ে গঠিত হয়েছে। ট্যাসো, হোমার, ভার্জিল, কাশীরাম, কৃত্তিবাস কাব্য দেহ নির্মাণ উপযোগী উপকরণ প্রদান করেছেন বটে তবে এ কাব্য মধুসূদনের মৌলিক প্রতিভার সর্বোত্তম সৃষ্টি। প্রসঙ্গত সমালোচকের নিম্নোক্ত মূল্যায়ণ স্মর্তব্য :—

“ভাষা ও ভাবের অভ্যুন্নতি তীক্ষ্ণতা এবং পরিস্ফুট বস্তুবাদ (objectivity) বিষয়ে মধুসূদন একদিকে যেমন হোমারের শিষ্য ছন্দের প্রবাহ শক্তি বিষয়ে যেমন ভার্জিল ও মিল্টনের শিষ্য, রচনার সাবলীলতা, রমণীয় মধুরতা বিষয়ে যেমন ট্যাসোর অনুগামী, ভাববস্তুর সমুচ্চ বিভাবনা বিষয়ে যেমন দান্তের সমধর্মী—তেমনি অন্যদিকে, কাব্যে আত্মপ্রকাশ এবং ব্যক্তিবাদ (Subjectivism) বিষয়েও মধুসূদন পেত্রার্ক হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বায়রণাদির মন্ত্রেই দীক্ষিত। আবার ইহাদের সংগেই আমাদের শ্রীহর্ষ-কালিদাস ও ভবভূতি এবং কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভাষা ও রসাদর্শের অপরূপ সংগতি করিয়া অনির্বচনীয় স্বাভাবিকতা এবং পরিপূর্ণ সারল্যময় ব্যক্তিত্বেই মধুসূদন দাঁড়াইয়া আছেন।”

প্রশ্ন ৮। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ অবলম্বনে রাবণ চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদনের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দাও।

উত্তর—মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকৃত নায়ক রক্ষোরাজ রাবণ, মেঘনাদ নয়। এই কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবি রাবণ চরিত্র এবং রাবণের ভাগ্যকেই সযত্নে

রূপায়িত করে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন। কবি নিজেই বলেছেন—The idea of Ravana elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে ত্রিলোকবিজয়ী, অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট এই রাবণেরই পৌরুষ-বীর্য-ঐশ্বর্য, এবং তাঁর মহাদম্ভের মর্মান্তিক পরাভবের কাহিনীই উদাত্ত গম্ভীর ছন্দোসংগীতে কীর্তিত হয়েছে। "কবির কল্পনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাবণের ভাগ্য লইয়া ব্যাপৃত আছে, মেঘনাদ ট্রাজেডিকে বিশেষভাবে পুষ্ট করিয়াছে এবং এই ট্রাজেডির দিকটায় জোর দিবার জন্যই মেঘনাদের মৃত্যুই এ কাব্যের প্রধান ঘটনা—কিন্তু সমগ্র কাব্য সেই ঘটনা হইতে বড়। মেঘনাদ চরিত্র রাবণ চরিত্রে যুক্ত না হইলে কবি কল্পিত মানব জীবন ও মানব ভাগ্যের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।" রাবণ কাঞ্চন-সৌধ কিরীটিনী লঙ্কার অধীশ্বর—তাঁর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য অপরিসীম, আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা অমেয়, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বিস্ময়াবহ। কিন্তু তবু জীবন তাঁর নিয়তি নির্যাতিত, ভাগ্য বিড়ম্বিত, দৈবাহত। তাই এতখানি পৌরুষবীর্য, এতখানি আত্মশক্তি ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকা সত্ত্বেও পদে পদে তাঁর পরাজয় ঘটল—ভাগ্যের প্রতিকূলতাকে প্রতিরোধ করতে তিনি সমর্থ হলেন না।

তাঁর দুরদৃষ্টবশেই শূলী/শম্ভুনিভ ভাই বীর কুম্ভকর্ণ সংগ্রামে প্রাণ হারাল, বীরবাহু সমরে নিপাতিত হল, অতিকায় প্রভৃতি রক্ষোবীর যুদ্ধে একে একে মৃত্যু বরণ করল। রোষে ক্ষোভে শোকে বেদনায় তাঁর সমস্ত হৃদয় আজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। মন্ত্রৌষধি স্তম্ভিতবীর্য বিষধরের মতই রক্ষোরাজ আজ ক্ষণে ক্ষণে গর্জন করেছেন, কিন্তু বনবাসী ভিখারী রাঘবকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার শক্তি তাঁর নেই—শক্তিস্পর্ধী রাবণের এই যে অবস্থা, তা যেমন করুণ, তেমনি শোকাবহ। নিষ্করুণ দৈব বিড়ম্বনা. নিদারুণ পুত্রশোক আর স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা লঙ্কেশ্বর রাবণকে আজ একান্ত কাতর করে তুলেছে। "এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, বাক্যহীন পুত্রশোকে –"রাবণের এই যে শোক-বিষাদ ক্লিষ্ট মূর্তি, এইটিই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের চোখের সামনে বিরাজ করতে থাকে।" "একদিকে আত্মস্ফূর্তির দুর্জয় কামনা, অন্যদিকে আত্মক্ষয়কারী স্নেহ প্রীতির পারবশ্য, মানুষের প্রকৃতিগত এই দ্বন্দ্ব ও দুরবস্থা" -যা মানবতার নিদান, তাই রাবণ চরিত্রকে লক্ষণীয় বিশিষ্টতা দান করেছে।

মধুসূদনের কল্পিত রাবণ রামায়ণের দুষ্ক্রিয়াসক্ত রাক্ষস মাত্র নন—শৌর্যবীর্যের মহিমায় তাঁর চরিত্র মণ্ডিত· তিনি প্রতাপশালী সম্রাট, স্নেহশীল পিতা ও ভ্রাতা, প্রেম-পরায়ণ স্বামী, অসীম শক্তিধর যোদ্ধা, স্বদেশ প্রেমিক বীর, নিষ্ঠাবান সরলস্বভাব ভক্ত। তাঁর প্রতি সমগ্র রাক্ষস কুলের অনুরাগ ও বশ্যতা এখনো অটুট, একমাত্র বিভীষণ ছাড়া রক্ষোবংশে রাবণের কোন শত্রু নেই। কিন্তু ভগিনী শূর্পনখার অপমানে আপনার রাজশ্রী ও প্রতাপশ্রীকে অপমানিত মনে করে এর প্রতিশোধ গ্রহণমানসে পাবক শিখারূপিনী জানকীকে লঙ্কার হৈমগৃহে এনে তিনি বিশ্বনীতি ও ন্যায় ধর্মকে যে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন, তাঁর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অবশ্য সীতা হরণ ঘটনাকে

রাবণ কোনরূপ পাপ কার্য বলে মনে করেন নি। রক্ষোরাজ আপন শক্তির অপ্রমেয়তা সম্পর্কেই সচেতন –পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের এতটুকু ভাবনা তাঁর চিত্তকে বিব্রত আলোড়িত করে না। দুর্জয় শক্তিবীর্যের দ্বারা সুরক্ষিত বলে রাবণ ভয়শূন্য, সংশয়হীন। কিন্তু বীরবাহু ও কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর তাঁর সেই সুচিরকালের আত্মবিশ্বাসও টলে উঠেছে। এতদিনে তিনি বুঝতে পেরেছেন ভাগ্যবিধাতা তাঁর প্রতিবিমুখ, নিষ্করুণ নিয়তির হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। তাই মহানিপাতের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মহাদম্ভী রাবণ ইন্দ্রজিৎকে বলেছেন—

'হায় বিধি বাম মম প্রতি !
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?

কিন্তু পরম শক্তিধর "রাবণের পরাজয় বাহিরে নয়, ভিতরে। তাহার বল-বীর্য ঐশ্বর্যের পরিণাম যতই শোকাবহ হোক, তাহার অপেক্ষাও ঘোরতর দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার হৃদয় রাজ্যে। তাই এ কাব্যে যুদ্ধের আয়োজন সত্ত্বেও যুদ্ধ নাই ; কেবল একটি মাত্র সর্গে [সপ্তম সর্গ] যুদ্ধ বর্ণনা আছে ; পুত্রহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাবণই সেই একবার যুদ্ধ করিয়াছে, মেঘনাদ যুদ্ধ করিতে পারে নাই। অসংখ্য সাগরসম রাঘবীয় চমূ লঙ্কার পুরপ্রাচীরের বাহিরে এ কাব্যের নিতান্ত বহিরংগরূপেই বিরাজ করিতেছে। ……এ কাব্যে রাবণের ঐশ্বর্যের অভ্রভেদী চূড়া নয়, তাহার অন্তরের লতাপুঞ্জের কুঞ্জবিতান ভাঙিয়া পড়িতেছে ! রাবণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত যে-যাতনা ভোগ করিতেছে, সে অনুশোচনার জ্বালা নয়, পরাজয় জ্বালাও নয়—আত্মীয় বিয়োগের জ্বালা। রাক্ষস পুরীর গোষ্ঠীপতি রাবণ সর্বপরিজনহীন নিঃসংগতার ভয়াবহ অবস্থা কল্পনা করিয়া নিরতিশয় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। কাব্যের প্রথম সর্গে রাবণের যে হাহাকার, ইহাই চরম হইয়া উঠিয়াছে শেষ সর্গে। সেখানে কবি সিন্ধুকূলের শ্মশানে, রাবণের অন্তঃপুরীর অসীম রিক্ততাকে, তাহার হৃদয়ের শ্মশানকেই উন্মুক্ত করিয়া সেই জীবন নাট্যের যবনিকা পাত করিয়াছেন।" রাবণের জীবন নিয়তি নির্যাতিত মানব ভাগ্যেরই প্রতীক। রাবণের প্রকৃতিতে, রাবণের চরিত্রে কবি মধুসূদনের নিজ জীবনের কিছুটা আভাস আছে–ইংরাজী সমালোচনা সাহিত্যে একে বলা হয়েছে "Romantic self-representation." বা "Imaginative self-identification" রাবণের শোক বিলাপ পাঠককে নিশ্চয়ই মধুসূদনের আত্মবিলাপ' এর কথা মনে করিয়ে দেয়।

প্রঃ ৯। তোমার পঠিত সর্গের অনুসরণে মেঘনাদ চরিত্রের আলোচনা কর।

উত্তর—মেঘনাদ সম্বন্ধে মধুসূদনের মনোভাব একটি চিঠিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে : "So you must wait for a few years. In the meantime, I am going

to celebrate the death of my favourite Indrajit." অন্যত্র কবি লিখছেন "Let me hear what favour the glorious son of Ravana finds in your eyes. He was a noble fellow, but for the scoundrel Bibhisan would have kicked the monkey-army into the sea." ইন্দ্রজিতের চরিত্র মধুসূদনের কল্পনাকে কতখানি উদ্দীপিত করেছিল, উক্ত উক্তিটি থেকে তার কিছুটা আভাস মেলে। বাল্মীকির মেঘনাদ এক জায়গায় বলেছেন, "আর সকলে দেবগণকে স্তবস্তুতির দ্বারা তুষ্ট করিয়া ঈপ্সিত বর মাগিয়া লয়, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার কাম্য বস্তু আদায় করিয়া থাকি।" ইন্দ্রজিতের এই অতুলনীয় শৌর্য বীর্যই মধুসূদনকে একান্ত মুগ্ধ করেছিল। মেঘনাদের আত্মশক্তি প্রদীপ্ত পৌরুষ যে কোনো কবির কল্পনাকেই সঞ্জীবিত করবে সন্দেহ নেই।

প্রথম সর্গের একেবারে শেষের দিকে পাঠকের সঙ্গে মেঘনাদের সাক্ষাৎ ঘটে। ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশ ধারিণী রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী ও পিতা রাবণের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রজিতের চরিত্র স্বরূপ অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রগাঢ় স্বদেশপ্রীতি, দুর্জয় সাহস, অশেষ শক্তি জনিত সুগভীর আত্মপ্রত্যয়, গভীর পত্নীপ্রেম, সরল পিতৃ-ভক্তি, অনির্বাণ আত্মসম্মান বোধ এবং বীরোচিত আত্মগ্লানির প্রকাশে মেঘনাদের ভাষণ সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর চারিত্রিক শুচিতা ও সৌন্দর্য, নব যৌবনের স্ফূর্তি-জনিত অন্তরের অবারিত শক্তি স্পন্দন প্রত্যেক পাঠকের চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। এমন অপাপবিদ্ধ, সরল, সতেজ ও করুণ চরিত্র সাহিত্যজগতে বিরলদৃষ্ট।

মেঘনাদকে আমরা যখন প্রথম দেখি তখন তিনি প্রমোদ-কাননে সুন্দরীদের সঙ্গে বিলাস ব্যসনে মত্ত। সেই অবস্থায় যখন তিনি শুনলেন যুদ্ধের ভয়ঙ্কর অবস্থা, শুনলেন বীরবাহু নিহত, তখনই "ছিঁড়িলা কুসুম দাম রোষে মহাবলী মেঘনাদ।" সমগ্র লঙ্কা যখন বিপদের সম্মুখে, তখন তিনি কিনা প্রমোদ উদ্যানে বিলাসে ব্যাপৃত? দুঃখে ক্ষোভে তিনি বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। আত্মধিক্কারে যে অগ্নি হৃদয় মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ওঠল তার তেজ আমৃত্যু উজ্জ্বল হয়ে রইলো। তিনি স্থির, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিতে অটুট, তাই ক্ষিপ্ত না হয়ে তিনি ধীর স্থির ভাবে পত্নীর কাছে বিদায় নিয়ে পিতার চরণে প্রণাম করে যুদ্ধে যাবার আয়োজন করলেন, আত্মবিশ্বাসের অসাধারণ দৃঢ়তায় রাম লক্ষ্মণকে বেঁধে আনবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রেষ্ঠ বীরের যে যে গুণ থাকা প্রয়োজন তার সব গুলিই আমরা দেখতে পাই মেঘনাদের মধ্যে। "এই মেঘনাদ-কবির favourite Indrajit—রামায়ণের মেঘনাদের বীর্যাঙ্কুর হইতে কবির মনে জন্মলাভ করিলেও, ইহা মধুসূদনেরই কবি চিত্ত-ফুলবন-মধুর নির্যাস। এ চরিত্র নিদাঘ দিবার মতো দীপ্ত ও নির্মল, কোনো খানে মেঘ বা কুয়াশার লেশ মাত্র নাই। ইহার অন্তঃকরণে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব, প্রশ্ন-সংশয় নাই, নৈরাশ্য নাই; প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রস্ফুট কুসুমে কোথাও চিন্তা কীট প্রবেশ করে নাই। আর্য রামায়ণের মেঘনাদের সেই দৃপ্ত পশুবল, মধুসূদনের মেঘনাদে অপর সকল মহৎ গুণের

সমবায়ে এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে—মায়ের দুলাল, পিতার নয়ন মণি, পত্নীর কণ্ঠ হার, শত্রুর দুঃস্বপ্ন এই মেঘনাদ সলিল-অগ্নি মরুতের সন্নিপাতে মেদুর মেঘ কান্তির মতো নয়নমনোহর হইয়াছে। মেঘনাদের বীরত্বের মূল উপাদান হইয়াছে তাহার নিরতিশয় ভয়শূন্যতা, শক্তি মদমত্ততা নয়, অসীম বাহুবল ও হৃদয় বলের অমোঘতার বিশ্বাসই ইহার কারণ। আরও কারণ, মেঘনাদ ক্রূরতা বা কপটতায় বিশ্বাস করে না, জগৎকে সে আত্মবৎ বীরধর্মী মনে করে—হিংস্র ব্যাঘ্র বা সর্পের ভয় সে করে না।

রাবণের মনে বিধি-নামক যে দুর্জ্ঞেয় বিরুদ্ধ শক্তির চেতনা জন্মিয়াছে, তাহার মনে সে চেতনাও নাই। মনের সারল্য ও প্রাণের এই নির্ভীকতাই তাহার কর্তব্যকে সরল করিয়াছে। কোন্‌টা পাপ কোন্‌টা পুণ্য, কাহার পাপ কে ফলভোগ করিবে —এ সকল ভাবনা তাহার নাই। অতি সহজ সুস্থ হৃদয় বৃত্তির বশে সে ভালবাসে, ভক্তি করে, যুদ্ধ করে; তাহার ধর্ম বিচার-বিতর্কের ধর্ম নয়, তাহা স্বাভাবিক ধর্ম— পৌরুষের ধর্ম। মেঘনাদের মনে যেমন কোনো অস্বাভাবিকতা নাই, তেমনি লক্ষ্মণের মতো স্বপ্ন দৈব বা অতিপ্রাকৃতের কোনো বালাই তাহার কাহিনীর সংগে জড়িত হইয়া নাই—সে সম্বন্ধে কবির কল্পনার এই সাবধানতা উল্লেখযোগ্য। এ চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদনের ক্লাসিকাল কাব্য সংস্কারই জয়ী হইয়াছে।" রাবণ চরিত্রের সঙ্গে মেঘনাদ-চরিত্রের তুলনা করলে এই সত্যটি পরিস্ফুট হবে। "মেঘনাদ যেন কবি কল্পনার সহজ সুস্থ দিবালোক—প্রাণের স্বাস্থ্য ও মনের অকপট বিশ্বাসে সে জীবন সমুজ্জল। রাবণ মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার—তাহাতে প্রাণের স্বাস্থ্যহানি ও মনের বিশ্বাস ভংগই প্রকট।" উভয় চরিত্র পরস্পর পরস্পরের ওপর সুন্দর আলোকপাত করেছে।

প্রশ্ন ১০। চিত্রাঙ্গদা চরিত্র পরিকল্পনার সম্ভাব্য উৎসের উল্লেখ সহ চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের বিশ্লেষণ কর এবং এই চরিত্রটি মেঘনাদবধ কাব্যের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর—স্বল্প পরিসরের মধ্যে মধুসূদন রাবণমহিষী চিত্রাঙ্গদার যে চরিত্র চিত্রটি-অঙ্কন করেছেন, তা একদিকে যেমন মনোজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনি করুণ রসের নির্ঝর। ঋষিকবি বাল্মীকির রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কোন উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই চরিত্রটির উল্লেখমাত্র দেখা যায়, সেখানে এই চরিত্রটি কবি কল্পনার বর্ণাঢ্য আলোক সম্পাতে এমন প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি। মধুসূদনের হাতে চিত্রাঙ্গদা চরিত্র নারী-সুলভ কোমল হৃদয়বৃত্তি ও প্রদীপ্ত তেজস্বিতার সৌন্দর্যে অতিশয় উন্নত হয়ে ফুটে উঠেছে। পুত্রশোকের মর্মান্তিক বেদনা এই নারীকে স্পষ্টবাদিনী করে তুলেছে। রাবণকে তার দুষ্কৃতির জন্য সাক্ষাৎভাবে অভিযুক্ত করেছে পুত্রশোকাতুরা রাণী

চিত্রাঙ্গদা। শুধু করুণ রসের স্ফুরণ নয়, রক্ষোরাজ রাবণের হৃদয় যন্ত্রণাকে পরিস্ফুট করে তোলবার জন্য চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের অবতারণায় প্রয়োজন ছিল। মেঘনাদবধ যে রাবণের পাপের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী. চিত্রাঙ্গদার স্পষ্টোচ্চারিত ভাষণের মধ্য দিয়েই তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রটি মেঘনাদবধের পাঠককে গ্রীক নাটকের কোরাস এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি-সমালোচক মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের যে স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তাই সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণীয় বলে মনে হয়।

"চিত্রাঙ্গদাকে আমরা কাব্যে একবার মাত্র দেখিতে পাই—সেই একবারের যে দেখা তাহাতেই চিত্রাঙ্গদার সেই মূর্তি আকস্মিক বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো আমাদের নেত্রপটে মুদ্রিত হয়ে যায়। রাবণের বিরাট রাজসভা মধ্যে পুত্রশোকাতুরা রোরুদ্যমানা বীরবাহু-জননী সখিগণ সঙ্গে প্রবেশ করিল। সেই অবস্থাতেও কবি তাহার যে রূপলাবণ্যের আভাস দিয়াছেন, তাহাতে বুঝি সে রাবণের মহিষী হইলেও এখনো বিগতযৌবনা নহে। এই চিত্রাঙ্গদা রাবণের একাধিক মহিষীর একজন, এবং রাবণের সহিত তাহার বয়সের ব্যবধানও অল্প নহে। বহুপত্নীক স্বামীর প্রতি এরূপ পত্নীর যে মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি।আজ রাবণের মত পুরুষের সম্মুখে এই অতিশয় অসমবয়সী স্নেহানুগ্রহধন্যা নারীর সেই অভ্যস্ত আচরণও বিচলিত হইয়াছে। স্বামী নয়—পুত্রই ছিল তাহার একমাত্র আপন বস্তু, আজ সেই পুত্রের বিয়োগে তাহার অন্তর ও বাহিরের সকল আব্রু যেন খসিয়া গিয়াছে। পুত্রশোকে অধীর হইলেও রাবণ সিংহাসনে রাজমহিমায় আসীন। সেই সিংহাসনের তলে দীন প্রজার মতো দাঁড়াইয়া চিত্রাঙ্গদার যে অভিযোগ :

একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুলমণি······
কহ, কোথা রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
··· কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙালিনী আমি, আমার সে ধনে?

তাহাতে চিত্রাঙ্গদার শুধুই শোক নয়, তাহার সমগ্র জীবন—স্বামীর সহিত তাহার সম্পর্ক, তাহার অসহায় একক অবস্থার দুঃখ মুহূর্তে আমাদের হৃদয় গোচর হয়। রাবণের বিশাল পুরীতে এই অবহেলিতা নারীর একটি মাত্র সম্বল ছিল—তাহার সেই পুত্র। রাবণের সুখঃদুখ তাহার সুখঃদুখ নয়—পুত্রের মৃত্যুতে তাহার যাহা হইয়াছে, তাহাতে স্বামীর সহিত ব্যবধান কিছুমাত্র ঘুচে নাই। তাই রাবণ যখন বলিয়া উঠে—

এক পুত্র শোকে তুমি আকুল, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি।

তখন সে স্বামীকে সম দুঃখে দুঃখী মনে করে না; বরং ইহাই ভাবিয়া আরও অধীর হয় যে শতপুত্র যাহার—একমাত্র পুত্রের মৃত্যুশোক সে বুঝিবে কেমন করিয়া? সে সত্যকার রাজমহিষী নয় রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল সে বুঝে না, রাবণের ভাবনার অংশ ভাগিনী সে নয়। তাই দেশ রক্ষার্থে বীরপুত্র প্রাণ দিয়াছে, এ সান্ত্বনা তাহার সান্ত্বনা নয়। নিজের পুত্র হানির মর্মান্তিক ক্ষোভে, রাবণের উপস্থিত বিপদ তাহাকে কিছু মাত্র ব্যাকুল করে না, রাবণের শোকেও তাহার সহানুভূতি নাই। যাহার জন্য তাহার সর্বস্ব গিয়াছে, সেই রাবণের কোন সান্ত্বনা বাক্যে সে আশ্বস্ত হইবে না; রাবণের পাপকেই সে বড় করিয়া দেখিতেছে। বিধাতার ন্যায়দণ্ডকে বুক পাতিয়া লইবার মতো ধীরতা, কিংবা তাহার আঘাতে পাপীর যে যন্ত্রণা, তাহা নিজেও বক্ষে অনুভব করিবার মতো প্রেম কোনোটই তাহার নাই। তাই শোকে মুহ্যমানা বিবশা রাবণ বধূর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডলে যেন বিধাতার রোষানলকেই প্রদীপ্ত হইতে দেখি। যখন তাহার মুখে এই জ্বালাময় বাক্য স্রোত বহির্গত হয়—

> কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
> কোথা সে অযোধ্যা পুরী?······
> তব হৈম সিংহাসন আশে
> যুঝিছে কি দাশরথি? ···তবে দেশ-রিপু
> কেন তারে বল, বলি?···
> কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
> লঙ্কা পুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম ফলে
> মজালে রাক্ষস কুলে, মজিলা আপনি!

—তখন জীবনের একটা মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতা, এবং নারী পুরুষ ঘটিত সংসার নাট্যের একটি নিদারুণ পরিহাস-রস যেমন আমাদিগকে অভিভূত করে তেমনই একটি মাত্র দৃশ্যের অতিক্ষুদ্র পরিসরে, একটি নারীর জীবন ও চরিত্র অতি গভীর রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজগৃহবন্দিনী রূপসী চিত্রাঙ্গদার দুঃখ ও অভিমান, স্বামিস্নেহবঞ্চিতা পুত্রহারা রমণীর নৈরাশ্য পীড়িত তেজস্বিনী মূর্তি, তাহার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ সুন্দর চোখে আহত নারী হৃদয়ের বহ্নিবিভাস আমাদের মানসপটে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে।"

প্রশ্ন ১১। ভগ্নদূতের মুখে রামচন্দ্র ও বীরবাহুর যুদ্ধের যে বর্ণনা পাওয়া যায় নিজের ভাষায় তা বিবৃত করো। ভগ্নদূত শব্দের অর্থ কি? এই ভগ্ন দূতের নাম কি?

উত্তর—কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী, লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ পাত্র মিত্র সহ রাজসভায় সমাসীন—স্বর্ণময়ী লঙ্কার শোভা সৌন্দর্য জগতে অতুলনীয়। কিন্তু দেবদুর্লভ সম্পদ প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও লঙ্কাধিপতি রাবণের হৃদয় আজ মর্মচ্ছেদী শোকবেদনায় ক্লিষ্ট, সভামধ্যে তিনি নির্বাক হয়ে বসে আছেন। তাঁর সম্মুখে ভগ্নদূত দণ্ডায়মান। সে বহন করে এনেছে রক্ষোরাজের বীরপুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ। রাবণের বুকে পুত্র

শোকের মর্মান্তিক বেদনা বজ্রাঘাতের মত বাজছে। সচিব শ্রেষ্ঠ সারণ তাঁকে সান্ত্বনা প্রদান করবার পরে রক্ষোরাজ কথঞ্চিত আত্মসংবরণ করে ভগ্নদূতকে পরম বীর্যশালী পুত্র বীরবাহুর সংগ্রাম ক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন।

প্রণমি রাজেন্দ্র পদে, কর যুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায় লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর-বীরতা ?"

রাবণের আদেশে ভগ্নদূত আবেগপূর্ণ ভাষায় অমিত বীর্যের অধিকারী বীরবাহুর বিস্ময়কর শৌর্য বীর্য ও রণ কৌশলের কথা বর্ণনা করতে আরম্ভ করল। বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু প্রচণ্ড শক্তিতে ভীম বিক্রমে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। দেখে মনে হল যেন মদমত্ত হস্তী প্রচণ্ড বিক্রমে নল বনে প্রবেশ করেছে। তার সেই ভৈরব হুংকারের কথা স্মরণ করলে এখন ও যেন হৃদয় থর থর করে কাঁপে। সে হুংকার মেঘের গর্জন, সমুদ্রের কল্লোল, বজ্রের নির্ঘোষকেও ছাড়িয়ে যায়। তাঁর ধনুকের জ্যা আকর্ষণ-জনিত ভয়ঙ্কর শব্দে যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে ওঠে। অন্যান্য বীরবৃন্দকে সাথে নিয়ে মত্ত হস্তীর বিক্রমে যখন তিনি রণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন বীরবৃন্দের পদক্ষেপ জনিত ধূলি উর্ধ্বে উত্থিত হয়ে গগন আচ্ছন্ন করল ; মনে হল সমগ্র আকাশ বুঝি মেঘে আবৃত হল। বীরবাহু ও অন্যান্য রথীবৃন্দের অত্যুজ্জ্বল তীর সকল শন্‌শন্ করে আকাশদেশে ছুটতে লাগল—মনে হচ্ছিল যেন, মেঘাবৃত আকাশে বিদ্যুৎ শিখা মুহুর্মুহু ঝলসিত হয়ে উঠেছে।

এই রূপে শত্রু মধ্যে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার

"কত ক্ষণ পরে
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব—
কনক মুকুট শিরে. করে ভীম ধনু,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত !"

এই পর্যন্ত বলার পর ভগ্নদূত অধোমুখে নীরবে ক্রন্দন করতে লাগল। সভাসদ সকলেই শোকে অভিভূত হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল। অশ্রুময় আঁখি তুলে রাবণ বললেন,

কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমন নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?

ভগ্নদূত পুনরায় আরম্ভ করল। দশরথপুত্র রামচন্দ্র সিংহের ন্যায় রক্তবর্ণ চক্ষে প্রচণ্ড বিক্রমে বীরবাহুর প্রতি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। ভীষণ বিক্রমে দুই যোদ্ধা একে অপরকে আক্রমণ করলেন। মনে হল যেন প্রচণ্ড নির্ঘোষে সমুদ্রের সঙ্গে বায়ু দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ। চতুর্দিকে অগ্নি শিখার মত তরবারি ঝলকিত হ'তে লাগল। সমুদ্র

কল্লোলের মত গম্ভীর শব্দে রণশঙ্খ ধ্বনিত হতে লাগল। এই প্রচণ্ড যুদ্ধে দেশরক্ষার্থে রামচন্দ্রের হাতে প্রাণ দিলেন লঙ্কার বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহু। ভগ্নদূত অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলল যে পূর্ব জন্মে সে নিশ্চয়ই কোনো পাপ কার্য করেছে। তাই সে শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়ে বীর গৌরব অর্জন করতে পারল না—বেঁচে মরাই তার পক্ষে ভাল ছিল। কিন্তু ভীরুতা বা কাপুরুষতার বশবর্তী হয়ে সে রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নি এবং সে প্রমাণ তার অঙ্গেই লেখা রয়েছে—শত্রুর অস্ত্র তার বক্ষস্থলই বিদ্ধ করেছে। সে যদি প্রাণ ভয়ে পলায়ন করত, তাহলে শত্রুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তার পৃষ্ঠ দেশকেই ক্ষতবিক্ষত করত। ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সে বেঁচে গেছে। বীর সন্তানের বীরত্বের কাহিনী শুনে বীর পিতার অন্তরদেশ আনন্দ-বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হারানো বীর্যকে তিনি যেন পুনর্বার ফিরে পেলেন।

যে দূত কোন দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে আসে, অথবা যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরাজয় বার্তা বহন করে এনে রাজসমীপে জ্ঞাপন্ করে, তাকে ভগ্নদূত বলে। এখানে ভগ্নদূতের নাম মকরাক্ষ।'

প্রশ্ন ১২। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার কথোপকথনের বিবরণ দাও। ঐ কথোপকথন অবলম্বনে চিত্রাঙ্গদা চরিত্র বিচার কর।

উত্তর—বীরপুত্র বীরবাহুর মত্যুতে রক্ষোরাজ রাবণ শোকাহত। প্রচণ্ড শোক কিছুটা সংবরণ করে যে সমরক্ষেত্রে প্রিয়পুত্র বীরবাহু অন্তিম শয্যায় শায়িত, তা দর্শন করবার জন্য রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে রণক্ষেত্র দর্শন করে রাবণ রাজসভায় ফিরে এসেছেন এমন সময় শ্রুতিগোচর হল মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি ও তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ। সকলে দেখল বীরবাহু জননী রাণী চিত্রাংগদা পুত্রশোকে আর্তনাদ করতে করতে সহচরীগণসহ সেই সভাস্থলে প্রবেশ করলেন।

আলু থালু, হায়, এবে কবরী বন্ধন !
আভরণ হীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুম রতন হীন রণ সুশোভনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি নিশার শিশির
পূর্ণ পদ্ম পর্ণ যেন।

পুত্রহারা জননীর আকুল ক্রন্দনে সভাগৃহে শোকের ঝড় বয়ে গেল। পাত্র মিত্র সভাসদ সকলেই অপরিসীম মর্মবেদনায় ক্রন্দন করে উঠল।

রক্ষোরাজ শোকাকুলা পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যে দেশ-বৈরীকে বিনাশ করার জন্য বীরবাহু মৃত্যু বরণ করেছে; চিত্রাঙ্গদা তো বীরমাতা

—যে পুত্র বীরকর্মের জন্য হত হয়েছে, বীর জননীর পক্ষে তার জন্য শোকের কোন হেতু নেই। রক্ষোরাজের এই সান্ত্বনা বাক্যে শোকপীড়িতা চিত্রাঙ্গদার হৃদয় বেদনা কিন্তু প্রশমিত হল না। উত্তরে তিনি বললেন, দেশবৈরীকে যুদ্ধে বিনাশ করে রণক্ষেত্রে যে প্রাণ বিসর্জন দেয়, সে সত্যই ভাগ্যবান, আর তার জননীও যথার্থ ভাগ্যবতী। কিন্তু রামচন্দ্র স্বর্ণ লঙ্কার সিংহাসন লোভে লঙ্কা নগরী আক্রমণ করেন নি। লঙ্কায় যে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, তার প্রধান হেতু রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ। রাক্ষসরাজ রাবণই এই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী—রাবণের পাপ-কর্মের জন্যই বীরবাহুকে সমর ক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গ করতে হয়েছে। সুতরাং পু্ৎহারা জননীর শোকের সান্ত্বনা কোথায়?—"হায় নাথ, নিজ কর্মফলে মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি"—এই শোক বাণী উচ্চারণ করে রোরুদ্যমানা চিত্রাঙ্গদা অন্তঃপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

[এর পর ১০ নং প্রশ্ন দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন ১৩। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ থেকে প্রমোদ উদ্যানের বর্ণনা দাও এবং সেখানে মেঘনাদ চরিত্র কি রকম ফুটেছে তা আলোচনা কর।

উত্তর : রক্ষোরাজ রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলে প্রথমে রাবণ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন, পরে প্রতিহিংসা বশে নিজেই যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। ফলে :

টলিল কনক লঙ্কা বীর পদ ভরে,
গর্জিলা বারিশ রোষে ;—

সমুদ্রের চাঞ্চল্যে বারুণী দেবী চমকিত হন এবং সখী মুরলার মুখে রাবণের যুদ্ধোদ্যোগ বার্তা শ্রবণে রক্ষকুল-রাজলক্ষ্মীর কাছে মুরলাকে প্রেরণ করেন। লঙ্কায় রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে মুরলার কথোপকথন এবং যুদ্ধোদ্যোগ দর্শনের পর মুরলাকে বিদায় দিয়ে মেঘনাদের প্রমোদ কাননের উদ্দেশ্যে রাজলক্ষ্মী গমন করেন। মেঘনাদের ধাত্রীমাতার নাম প্রভাষা। লক্ষ্মী সেই প্রভাষার বেশ ধারণপূর্বক প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হলেন।

মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান অতীব রমণীয় স্থান। স্বর্গের ইন্দ্রপুরীকেও যেন সৌন্দর্যে হার মানিয়ে দেয়। চারিদিকে অপূর্ব সুন্দর বৃক্ষরাজি শাখায় শাখায় কোকিলের কুহুধ্বনি, ফুলে ফুলে ভ্রমর দলের গুঞ্জরণ, পাতায় পাতায় বসন্ত কালীন বাতাসের মর্মধ্বনি। সেই প্রমোদ কাননে স্বর্ণ প্রাসাদের স্বর্ণদ্বারে নির্ভয়ে ভীম-রূপী বামাদল পরিভ্রমণ রত, তাদের হস্তে শরাসন, পৃষ্ঠ দেশে তূনীর সহ বেণী দোদুল্য-মান, তূণে রক্ষিত শর যেন মণিময় ফণী। বিকশিত পদ্মফুলের ওপর সূর্যের প্রোজ্জ্বল কিরণ মালা যেমন শোভা পায়, সেই প্রমোদ উদ্যানস্থিত নারীগণের উন্নত স্তন

যুগলের ওপর স্বুবর্ণ কবচের দীপ্তি তেমনি শোভিত। তুণে যে শর রয়েছে তা স্তুতীক্ষ্ণ ; কিন্তু ঐ স্বুন্দরী নারীবৃন্দের কটাক্ষশর তীক্ষ্ণতর। তারা সকলে ইতস্তত ভ্রমণ করছে, বসন্ত ঋতুতে মাতংগিনী যেমন কামোন্মাদনায় পরিভ্রমণ করে এই সমস্ত রূপসী রমণীকুল তেমনি মেঘনাদের সঙ্গে রয়েছে। দক্ষ বালাদলের সঙ্গে চন্দ্র যেমন স্বুখে ভ্রমণ করেন, মেঘনাদও তেমনি প্রমদাকুলের সঙ্গে মনের আনন্দে প্রমোদ উদ্যানে বিহারে রত।

লঙ্কার রাজলক্ষ্মী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষার রূপ ধারণ করে প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হয়ে মেঘনাদকে বীরবাহুর নিধন সংবাদ জানালেন এবং বললেন, লঙ্কায় বীর সেনাপতির অভাবে শোকবেদনা বিদ্ধ রাক্ষস অধিপতি রাবণ নিজেই এবার সসৈন্যে যুদ্ধাযাত্রার উদ্যোগ করছেন।

রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে মেঘনাদ একান্ত বিস্ময়বোধ করলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, নিশাযুদ্ধে তাঁরই শরাঘাতে রামচন্দ্রের প্রাণ বিনাশ ঘটেছে। প্রভাষার ছদ্মবেশ ধারিণী কমলা তাঁকে বললেন যে এতে বিস্ময় বোধ করার কিছুই নেই ; রাম মায়া শক্তির অধিকারী ; মায়ার অতি লৌকিক প্রভাবেই আবার সে পুনর্জীবিত হয়েছে। অনতিবিলম্বে মেঘনাদের লঙ্কাভূমিতে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যকর্তব্য।

বীরচূড়ামণি প্রিয়ভ্রাতা বীরবাহু নিহত, স্বর্ণলঙ্কা আসন্ন বিনাশের পথে ধাবিত, বীর সেনাপতির অভাবে দীর্ণ হৃদয় পিতাকে অবশেষে যুদ্ধ যাত্রা করতে হচ্ছে —আর মাতৃভূমির এই চরম বিপদ মুহূর্তে তিনি রমণীকুল পরিবেষ্টিত হয়ে বিলাস ব্যসনে আত্ম নিমজ্জন করেছেন ! বেদনায়, আত্মগ্লানিতে ক্ষোভে, রোষে রাক্ষসকুল-ভরসা ইন্দ্রজিতের সকল অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। রোষভরে তিনি বিলাস-সজ্জা দূরে নিক্ষেপ করলেন, বীরবেশে সজ্জিত হলেন এবং রথে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন। পত্নী প্রমীলা স্বামীর বিচ্ছেদ আশংকায় কাতরা হলে মেঘানাদ তাঁকে বললেন, সমরে শত্রুদলকে মুহূর্তে বিনাশ করে তিনি অবিলম্বে প্রমোদ কাননে প্রত্যাবর্তন করবেন। এই কথা বলে তিনি পত্নীর কাছে বিদায় গ্রহণ করে লঙ্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন।

প্রথম সর্গের একেবারে শেষের দিকে পাঠকের সঙ্গে মেঘনাদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ধাত্রী প্রভাষার ছদ্মবেশধারিণী রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মীর ও পিতা রাবণের সঙ্গে কথোপ-কথনের মধ্যদিয়ে ইন্দ্রজিতের চরিত্র স্বরূপ অনেকটা উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রগাঢ় দেশ প্রীতি, দুর্জয় সাহস, অশেষ শক্তি জনিত সুগভীর আত্মপ্রত্যয়, গভীর পত্নীপ্রেম, সরল পিতৃ ভক্তি, অনির্বাণ আত্ম সম্মান বোধ এবং বীরোচিত আত্মগ্লানির প্রকাশে মেঘনাদের ভাষণ স্বুন্দর ও হৃদয় গ্রাহী। তাঁর চারিত্রিক শুচিতা ও সৌন্দর্য, নব যৌবনের স্ফূর্তি-জনিত অন্তরের অবারিত শক্তি স্পন্দন প্রত্যেক পাঠকের চিত্তকেই সহজে আকর্ষণ করে। এমন অপাপবিদ্ধ, সরল, সতেজ ও করুণ চরিত্র সাহিত্য জগতে বিরল দৃষ্ট ।

প্রশ্ন ১৪। "কেমনে পড়েছে রণে বীরচূড়ামণি বীরবাহু দেখার জন্য রাবণ প্রাসাদ শিখরে উঠে যে সব দৃশ্য দেখে "আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক আসনে সভাতলে—সেই সব দৃশ্যের বর্ণনা দাও। সেই সময়ে রাবণের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়েছে তার পরিচয় দাও।

উত্তর : প্রিয় পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রক্ষোরাজ রাবণ অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়লেন। পরে কথঞ্চিত শান্ত হয়ে ভগ্নদূত মকরাক্ষকে পরম বীর্যশালী পুত্র বীরবাহুর সংগ্রামক্ষেত্রে নিধন ঘটনা বর্ণনা করতে বললেন। বীর পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে বীর পিতার অন্তর আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল, হারানো বীর্যকে তিনি যেন পুনর্বার ফিরে পেলেন। যে সমরক্ষেত্রে প্রিয়পুত্র বীরবাহু অন্তিম শয্যায় শায়িত, তা নিজ চোখে দর্শন করবার জন্য স্বর্ণলঙ্কার অধীশ্বর রাবণ প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে তিনি দেখলেন, কাঞ্চন সৌধ-পরিশোভিতা মনোহরা লঙ্কাপুরী তার অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত রয়েছে। পুষ্পবনের মাঝখানে স্বুবর্ণনির্মিত সৌধরাজি, পদ্মফুল দ্বারা সুশোভিত সরোবর, অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ফোয়ারা, নানা রত্নরাজিতে সুশোভিত মন্দির চূড়া, বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত বিপণি সকল রাক্ষসরাজের নয়নকে পরিতৃপ্ত করল। তিনি আরও দেখলেন সুদূর বিস্তৃত উন্নত প্রাচীরের ওপর বিবিধ অস্ত্রধারী শত শত রাক্ষস সেনা ঘুরে বেড়াচ্ছে, নগরের বাহিরেও অগণিত রাক্ষস সেনাকে দেখা যাছে, দেখা যাচ্ছে হস্তী অশ্ব, রথ, রথী পদাতিক প্রভৃতি সমরসজ্জা। দেখলেন পূর্বদ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে বীর নীল, দক্ষিণদ্বারে শক্তিমান অথচ সর্পের মত ভয়ঙ্কর অঙ্গদ, উত্তর দ্বারে রয়েছেন সুগ্রীব এবং পশ্চিম দ্বারে স্বয়ং রামচন্দ্র দ্বার অবরোধ করে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে মিত্র বিভীষণ, ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সহচর হনুমান। গভীর অরণ্যে ব্যাধ যেরকম সিংহকে চতুর্দিক দিয়ে জালে বেষ্টন করে, শত্রুসৈন্যরা সমস্ত লঙ্কাপুরীকে সেইভাবে বেষ্টন করে আছে। অদূরে রণক্ষেত্র পুঞ্জীভূত শবে আকীর্ণ, মাংসাশী পশুপক্ষীর উন্মত্ত চিৎকারে প্রতিশব্দিত। শকুন, শৃগাল, কুকুর পিশাচের দল উন্মত্ত হয়ে চতুর্দিকে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তারা কেউ উন্মত্ত আনন্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করছে। আবার কেউ বা রক্ত শোষণ করছে। সংগ্রামক্ষেত্রে মাঝখানে পড়ে রয়েছে মৃত অশ্ব ও হস্তীদল। চতুর্দিকে রথ চূর্ণবিচুর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে, মৃত সৈনিকদের বিচ্ছিন্ন হস্তপদাদি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। সৈনিকদের অস্ত্রশস্ত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। কোথাও রয়েছে বর্শা, তলোয়ার, ধনু, শর, আবার কোথাও পড়ে রয়েছে অস্ত্রাধার, মণিময় মুকুট, উষ্ণীষ। এই সব দৃশ্য দেখে মনে হয় কৃষক কর্তৃক শস্য কর্তিত হবার পর তা যেমন ক্ষেত্রে ইতস্তত: পড়ে থাকে, এই যুদ্ধক্ষেত্রে রাম কর্তৃক নিহত

রাক্ষসবাহিনী ঠিক সেইভাবে পড়ে আছে। সংগ্রাম ভূমির প্রেতমূর্তি, শ্মশান দৃশ্য দেখে রক্ষোরাজের হৃদয় আবার শোকাকুল হয়ে উঠল, পুত্রের বিচ্ছেদজনিত অসহ্য মর্মযাতনায় তিনি হাহাকার করে উঠলেন।

কিছুক্ষণ আক্ষেপ করে রাবণ দূরে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁর উচ্চ প্রাসাদশীর্ষ থেকে দূরে দিগন্তপ্রসারী নীল সমুদ্রের বুকে রামচন্দ্র-নির্মিত শিলাময় সেতুবন্ধ নিরীক্ষণ করলেন। দূর থেকে সেই সেতুর কৃষ্ণ বর্ণ প্রকাণ্ড প্রস্তরগুলিকে নীল আকাশের কোলে স্থির নিশ্চল মেঘ খণ্ডের মত দেখাচ্ছিল। তরঙ্গ-উদ্বেল সফেন সমুদ্র অসংখ্য ফণাধারী নাগরাজ বাসুকীর মতই প্রতিভাত হচ্ছে। এরূপ সেতু বন্ধন অদৃষ্ট পূর্ব। যে বিশাল সমুদ্র দুর্লংঘ্য পরিখার মত রাবণের স্বর্ণ লঙ্কাকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে এতদিন রক্ষা করে এসেছে, সে আজ ভিখারী রাঘব নির্মিত সেতু দ্বারা শৃঙ্খলিত। আজ তাকে বিদ্রূপ করে রাবণ বলছেন সমুদ্র আজ কি অপূর্ব সুন্দর মালা পরেছ। যে সমুদ্র নানা রত্নের আকর তারই গলে আজ কালো পাথরের মালা। এটি ধারণ করে সমুদ্র নিজেকে লজ্জিত, ধিক্কৃতবোধ করছে না কেন? কে কোথায় শুনেছে পশুরাজ সিংহ সামান্য পাখী ধরা ফাঁদে ধরা পড়েছে। পাখীধরা ফাঁদে ভীম পরাক্রমশালী কেশরীকে আবদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু অতীব আশ্চর্যের বিষয়, এই সামান্য শিলাখণ্ডে গড়া সেতু দ্বারা তুচ্ছ মানব রামচন্দ্র জলদলপতি সমুদ্রের চরণ শৃঙ্খলিত করল। সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মিত হওয়ায় লঙ্কাপুরীতে শত্রুর প্রবেশ সহজ হয়েছে। এই ভাবে শত্রুকে সহায়তা করে সমুদ্র আজ লঙ্কার প্রতি নির্দয়তা প্রকাশ করেছে। প্রচণ্ড শক্তির আধার সমুদ্রকে সম্বোধন করে রাবণ বলছেন যে সমুদ্র যেন শৃঙ্খলিত বিজিতের মত দাসত্ব স্বীকার না করে; তার সকলশক্তি আহরণ করে সেতুবন্ধন যেন ছিন্নভিন্ন করবার প্রয়াস পায়।

সেতু শৃঙ্খলিত সমুদ্রকে সম্বোধন করে ধ্বংসপথযাত্রী রাবণ যে খেদোক্তি করেছেন, তা কবিকল্পনার প্রসারে, ছন্দোস্পন্দে, শব্দের ধ্বনি তরংগে, অলঙ্করণ সৌন্দর্যে এবং সর্বশেষে মহামানী রাক্ষোরাজের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে, কবির নিগূঢ় দৃষ্টি ক্ষেপণের কুশলতায় অপূর্ব সুন্দর রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

প্রঃ ১৫। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ কি নামে অভিহিত হয়েছে? এই সর্গের বিষয় বস্তু সংক্ষেপে বিবৃত করে নামকরণের সঙ্গতি প্রদর্শন কর।

উত্তর: স্বর্গের দেবতা ইন্দ্র, শচী, মহাদেব, পার্বতী, লক্ষ্মী মায়াদেবী প্রভৃতির সহায়তায় লক্ষ্মণের দৈবী অস্ত্রলাভ এ সর্গের প্রধান বর্ণিত বিষয় বলে কবি এই সর্গের নামকরণ করেছেন "অস্ত্রলাভ"।

লঙ্কার অধীশ্বর রাবণ কর্তৃক মেঘনাদের সৈন্যাপত্যে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হলে দিবাবসান ঘটল, স্বর্গে মর্ত্যে রাত্রির আবির্ভাব হল। সুরলোক পতি ইন্দ্র শচীসহ দেবসভায় সমাসীন, এমন সময় সেখানে রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী এসে উপস্থিত হলেন এবং জানালেন, রাবণের ভক্তি-যত্ন-সেবায় আবদ্ধ হয়ে তিনি বহুকালাবধি স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করেছেন। কিন্তু বর্তমানে লঙ্কাপুরীতে অবস্থানের বাসনা তাঁর আর নেই। কেননা রক্ষোরাজের দুষ্কৃতি ও অধর্মাচারের ফলে লঙ্কা পাপে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে। সে যা হোক্‌ লঙ্কা সমরে রাক্ষসকুলের শ্রেষ্ঠ রথিবৃন্দ মৃত্যুবরণ করেছে, একমাত্র জীবিত আছে রাবণপুত্র বীর যোদ্ধা মেঘনাদ। আগামীকাল যুদ্ধে অমিতবিক্রমে মেঘনাদ রামচন্দ্রকে আক্রমণ করবে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সমাপন করে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে অজেয়— এরূপ অবস্থায় মেঘনাদের করাল আক্রমণ থেকে দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে রামচন্দ্রের রক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করবার অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্যেই লক্ষ্মী দেবী দেবরাজ সমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

ইন্দ্র সব শুনে বললেন, এই ঘোর বিপদের দিনে একমাত্র বিশ্বনাথ শিব ছাড়া দেবকুল প্রিয় শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষা করবার শক্তি সামর্থ্য অন্য কারো নেই—ইষ্টদেবতা অগ্নির বরে মেঘনাদ সর্বজয়ী। লক্ষ্মীদেবী তখন ইন্দ্রকে অবিলম্বে শিবের নিকট গমন করবার অনুরোধ জানিয়ে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইন্দ্র শচীসহ কৈলাসভূমিতে গমন করে পার্বতীর চরণ বন্দনা করলেন এবং জানালেন লঙ্কার রাজলক্ষ্মী স্বর্গভূমিতে উপস্থিত হয়ে জানিয়ে গেলেন যে আগামী কাল লঙ্কাযুদ্ধে মেঘনাদ ইষ্টদেবতার পূজা সমপনান্তে রামচন্দ্রকে অক্রমণ করবে। সুতরাং দেবকুল প্রিয় রামচন্দ্রের বিপদ আসন্ন। লক্ষ্মীদেবীও পাপপঙ্কিল লঙ্কাপুরী ত্যাগ করতে চঞ্চলা হয়ে উঠেছেন। এখন শিবানী যদি কৃপা না করেন তবে আগামী প্রভাতে দুর্জয় মেঘনাদের হাতে শ্রীরামচন্দ্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সব কথা শুনে পার্বতী উত্তর করলেন, রাবণ শিবের পরম ভক্ত, তাই রক্ষোবংশের অকল্যাণকর কোন কাজ করা পার্বতীর পক্ষে অসম্ভব। মহাদেব এখন তপোমগ্ন, তাই আজ লঙ্কার এই দুর্গতি। ইন্দ্র জানালেন শিব এখন যোগাসনশৃঙ্গে তপস্যায় নিরত আছেন। সেই দুর্গমস্থানে ইন্দ্রের পৌঁছোন অসম্ভব; তখন সুরপতি পার্বতীর কাছে এই বলে প্রার্থনা জানালেন, তিনি নিজেই যেন যোগাসনশৃঙ্গে গমন করে রক্ষঃকুলবিনাশের ব্যবস্থা করে দেন—এতে রামচন্দ্র আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন।

এমন সময় অকস্মাৎ পার্বতীর কনক আসন কম্পিত হ'ল, দেবীর চিত্ত সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল। সখী বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র তাঁর পূজা করছেন। এরপর দেবী আর স্থির থাকতে না পেরে যোগাসনশৃঙ্গে যাবার

জন্য প্রস্তুত হলেন। মোহিনী মূর্তি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে যাওয়া স্থির হ'লে রতি দেবী শিবানীকে ভুবনমোহিনী বেশে সজ্জিত করলেন। এরপর ভবানী কামদেবকে স্মরণ করলে কামদেব উপস্থিত হলেন। তিনি কামদেবকে তাঁর সঙ্গে যোগাসন শৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গের সহায়তা করবার জন্য বললেন। পূর্বে একবার মহাদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তাই কামদেব ভীত হয়ে পড়লেন। কিন্তু শিবানীর অভয় বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে তিনি যেতে রাজী হলেন। তখন স্বর্ণবর্ণ মায়ামেঘের আবরণে নিজদেহ আচ্ছাদিত করে পার্বতী মদন সমভিব্যাহারে দুর্গম যোগাসন শৃঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

যোগাসন শৃঙ্গে পৌঁছে ভবানীর আদেশে মদন মহাদেবের অঙ্গে ফুলশর নিক্ষেপ করলেন—মহদেবের তপোভঙ্গ হ'ল—ভবানী মায়ামেঘের আবরণ সরিয়ে ভুবন মোহিনী মূর্তিতে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। দেবীকে একাকিনী সেই দুর্গমস্থানে আসার কারণ জানতে চাইলেন মহেশ্বর, দেবী জানালেন, স্বামীর চরণ দর্শাভিলাষেই তিনি যোগাসন শৃঙ্গে এসেছেন। তখন শিবশঙ্কর প্রেমভরে পার্বতীকে আপন পার্শ্বে বসিয়ে বললেন, দেবীর মনের কথা, শচীসহ ইন্দ্রের কৈলাসে আগমন এবং রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল বোধন—এ সমস্ত ঘটনা তিনি সম্যক অবগত আছেন। রক্ষোরাজ রাবণ তাঁর সেবক বটে, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাশের মুখে ধাবমান—তার শোচনীয় বিনাশ অনিবার্য। অতঃপর মহেশ্বর ভবানীকে বললেন, যেন অবিলম্বে মদনকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান এবং ইন্দ্র যেন সত্বর মায়াদেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হন। মদনের কাছে ইন্দ্র সংবাদ পেয়ে দ্রুতগতিতে মায়াদেবী সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ নিধনের উপায় জানতে চাইলেন।

এই কথা শুনে মায়াদেবী কিয়ৎক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। এরপর শিবতেজ নির্মিত যে সব অস্ত্র প্রয়োগে দেবসেনানী কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেছিলেন, মায়াদেবী সেই সব অতি ভাস্বর অস্ত্র - ফলক, আসি, তূনির, ধনু --সুরপতিকে দেখিয়ে বললেন, এদের প্রয়োগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে। কিন্তু কেবল তৈরী অস্ত্র প্রয়োগ করেও দেবতা কি মানব, কেউই মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবে না-আরও কৌশল প্রয়োজন। সে যাই হোক্, মায়া প্রদত্ত অস্ত্রগুলি ইন্দ্র যেন রাঘর শিবিরে লক্ষ্মণের কাছে প্রেরণ করেন। আগামীকাল মায়াদেবী সশরীরে উপস্থিত থেকে মেঘনাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত লক্ষ্মণকে রক্ষা করবেন। দেবরাজ তখন সন্তুষ্ট হয়ে মায়া প্রদত্ত অস্ত্রাদি নিয়ে স্বর্গভূমিতে ফিরে গন্ধর্বপতি চিত্ররথকে ডেকে রাঘব শিবিরে ঐ দৈব অস্ত্রগুলি পৌঁছে দিতে আদেশ দিলেন।

এরপর ইন্দ্র পবনদেবকে লঙ্কাভূমিতে কিছুক্ষণ প্রবল ঝঞ্ঝাব্যাত্যা সৃষ্টি করতে অনুরোধ করলেন। এই অবসরে চিত্ররথ রামচন্দ্রের হস্তে দৈব অস্ত্রাদি প্রদান করে বললেন, পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণ কী কৌশলে মেঘনাদকে নিহত করবেন, মায়াদেবী স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তা লক্ষ্মণকে বলে দেবেন। । এই শুভ সংবাদ শ্রবণে রামচন্দ্রের

হৃদয় আনন্দধারায় প্লাবিত হল, দেবতাদের প্রতি তিনি নিজের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন।

দ্বিতীয় সর্গের নাম "অস্ত্রলাভ"। বাসববিজয়ী মেঘনাদের নিধন কার্য লক্ষ্মণের হাতেই সম্পন্ন হবে। অথচ মেঘনাদ সমরে একরূপ অজেয় বললেই হয়। এই যে দেবনরত্রাস ইন্দ্রজিৎ, তাঁকে যিনি বধ করবেন, তিনি অসামান্য বীর যোদ্ধা হবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু মেঘনাদের নিধনকারীকে কেবল অমিত শক্তিধর হলেই চলবে না। যে ইন্দ্রজিৎ একরকম অমর তাঁকে নিহত করবার জন্য দেব অস্ত্রের প্রয়োজন, দেবতার সহায়তার প্রয়োজন। এই ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণকে দিব্য অস্ত্রবলে বলীয়ান করবার জন্য ইন্দ্র ও অন্যান্য দেব-দেবীগণকে আলোচ্য মান সর্গে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এই কারণে, এই সর্গের 'অস্ত্র লাভ' নামকরণটি সার্থক। কিন্তু আমরা দেখি শেষ পর্যন্ত এই অস্ত্র লাভের প্রয়োজন থাকে নি। এ জন্য এই সর্গে কবির অভিপ্রায় স্পষ্টই অনুবিধ বলে প্রতীয়মান হয়। হোমারের মহাকাব্যের নজির ও তথা ইউরোপীয় কাব্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে কবি এখানে স্বর্গভূমি ও দেব দেবীগণের বৃত্তান্ত তাঁর মহাকাব্যের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছেন—এবং সেই সুযোগে, বাংলা কাব্যের দেব দেবীগণের সঙ্গে মানব সংসারের একটা নতুন সম্পর্কের যে চিত্র, তারই রস সঞ্চারিত করে, কল্পনার নিরঙ্কুশতার মাহাত্ম্য কবি ঘোষণা করেছেন। এখানে কবির শুধু কাব্য সৃষ্টি নয়, তদানীন্তন বাংলা কাব্যের জড়তা মোচন ও কবি-কল্পনার অধিকার বিস্তার করার একটা সংস্কারক মনোভাব আমরা দেখতে পাই।)

প্রঃ ১৬। মেঘনাদকে বধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র কি ভাবে সংগৃহীত হয় তার বিবরণ দাও। এই অস্ত্রগুলি মূলে কাকে হত্যা করার জন্য নির্মিত হয়েছিল ?

উত্তর : যে দিন রক্ষোরাজ রাবণ মেঘনাদকে সৈন্যপত্যে অভিষিক্ত করলেন, সেই দিন সন্ধ্যায় স্বর্গে দেবেন্দ্রের রাজসভায় রক্ষঃকুল রাজ-লক্ষ্মীর আগমন ঘটল ও লঙ্কার ঘটনা সম্পর্কে দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্যক জ্ঞাত করান হল। রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী জানালেন যে মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ শেষ করে যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে তখন সে সমরে অজেয়—এরূপ অবস্থায় মেঘনাদের করাল আক্রমণ থেকে দেব কুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। এই ভয়ঙ্কর সঙ্কট মুহূর্তে রামচন্দ্রের রক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করবার অনুরোধ জ্ঞাপনার্থেই লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হয়েছেন।

সব কিছু শোনার পর দেবরাজ জানালেন, একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়া শ্রীরামচন্দ্রকে রক্ষা করবার ক্ষমতা আর কারো নেই। লক্ষ্মী দেবী তখন ইন্দ্রকে শীঘ্রই মহাদেবের কাছে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লঙ্কায় ফিরে এলেন।

শচীদেবীকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র কৈলাশে গিয়ে দেবী পার্বতীর চরণ বন্দনা করলেন এবং রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে সকল বার্তা জ্ঞাপন করেছিলেন তা দেবী পার্বতীকে ইন্দ্র জানালেন। এখন শিবানী যদি কৃপা না করেন তবে আগামী প্রভাতে দুর্জয় মেঘনাদের হাতে শ্রীরামচন্দ্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সব কথা শুনে পার্বতী জানালেন রাবণ শিবের পরম ভক্ত, তাই শিব তার প্রতি অশেষ মমত্ব ভাব পোষণ করেন। সেই কারণে রাবণের কোন ক্ষতি করা শিবাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। পার্বতীর কথা শুনে ইন্দ্র করযোড়ে দেবীকে বললেন, শক্তি-স্পর্ধিত রাবণ ধর্মদ্রোহী হ'য়ে উঠেছে। পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু রামচন্দ্র রাজ্য সুখভোগ উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করেন। দুষ্ক্রিয়াসক্ত রাবণ সেই ধর্মপ্রাণ শ্রীরামের পত্নী সীতাকে কৌশলে মায়াজাল বিস্তার করে হরণ করে। মহাদেবের বরপুষ্ট হয়ে দুর্মতি রাবণ আজ স্বর্গের দেবতা গণকেও তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করছে। এহেন দুরাচার রাবণের প্রতি দেবীর কৃপা প্রকাশের হেতু সত্যই দুর্জ্ঞেয়। দেবী জানালেন শিব ব্যতীত এ ব্যাপারে তাঁর করবার কিছুই নেই। শিব এখন যোগাসন শৃঙ্গে তপস্যায় রত।

যোগাসন শৃঙ্গের দুর্গম স্থানে ইন্দ্রের পৌঁছানো অসম্ভব। তাই ইন্দ্রের অনুরোধ, দেবী পার্বতী যেন নিজেই সেখানে গমন করে শিবকে সন্তুষ্ট করে রক্ষঃকুল বিনাশের ব্যবস্থা করেন।

হঠাৎ পার্বতীর কনক আসন কম্পিত হল, দেবীর চিত্ত সহসা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সখী বিজয়াকে প্রশ্ন করে জানলেন, লঙ্কাপুরীতে রামচন্দ্র তাঁর আরাধনা করছেন। এর পর দেবী আর স্থির থাকতে না পেরে যোগাসন শৃঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মোহিনী মূর্তি ধারণ করে স্বামীর তপোভঙ্গ করতে যাওয়া স্থির হ'লে রতি দেবী শিবাণীকে ভুবনমোহিনী বেশে সজ্জিত করলেন। এর পর দেবী কামদেবকে তাঁর সঙ্গে যোগাসন শৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের ধ্যান-ভঙ্গে সাহায্য করার জন্য বললেন। কামদেব আগে একবার মহাদেবের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তাই তিনি এ কথা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পার্বতী তাঁকে অভয় বাণী প্রদান করলে তিনি আশ্বস্ত হয়ে যেতে রাজী হলেন। তখন স্বর্ণ বর্ণ মায়া মেঘের আবরণে নিজ দেহ আচ্ছাদিত করে পার্বতী মদনের সঙ্গে দুর্গম যোগাসন শৃঙ্গে যাত্রা করলেন।

সেই দুর্গম স্থানে পৌঁছে মহাদেবের দর্শন পেয়ে ভবানীর আদেশে মদন মহাদেবের অঙ্গে ফুলশর নিক্ষেপ করলেন—তাঁর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটল, সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী মায়া মেঘের আবরণ সরিয়ে ভুবনমোহিণী মূর্তিতে স্বামীর সম্মুখে দাঁড়ালেন। মহাদেব দেবীর আগমন হেতু জানতে চাইলে দেবী জানালেন স্বামীর চরণ দর্শনের নিমিত্তই তিনি এখানে এসেছেন। তখন মহাদেব পার্বতীকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, দেবীর মনের কথা, শচীসহ ইন্দ্রের কৈলাশে আগমন, এবং রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকাল বোধন—এ সমস্ত ঘটনাই তিনি অবগত আছেন। রক্ষোরাজ রাবণ তাঁর সেবক বটে, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির ফলেই সে আজ সবংশে বিনাশের মুখে ধাবমান। মহাদেব

আরো জানালেন দেবী যেন অবিলম্বে মদনকে ইন্দ্রের নিকট পাঠান এবং ইন্দ্র যেন সত্বর মায়া দেবীর সন্নিধানে উপস্থিত হন। মদনের কাছে ইন্দ্র সংবাদ পেয়ে দ্রুত গতিতে মায়াদেবী সন্নিধানে উপস্থিত হলেন এবং লক্ষ্মণ কর্তৃক মেঘনাদ নিধনের উপায় জানতে চাইলেন।

কিছুক্ষণ চিন্তার পর মায়াদেবী অতি ভাস্বর অস্ত্র—ফলক, অসি, তূনীর, ধনু,—ইন্দ্রকে দেখিয়ে বললেন, এদের প্রয়োগে মেঘনাদ সংগ্রামে নিহত হবে। কিন্তু কেবল অস্ত্র প্রয়োগ করে দেবতা কি মানব, কেউই মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবে না—আরও কৌশলের প্রয়োজন আছে। সে যাই হোক, মায়া প্রদত্ত অস্ত্রগুলি ইন্দ্র যেন রাঘব শিবিরে লক্ষ্মণের কাছে প্রেরণ করেন। আগামীকাল মায়াদেবী সশরীরে উপস্থিত থেকে মেঘনাদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত লক্ষ্মণকে রক্ষা করবেন। দেবরাজ তখন সন্তুষ্টচিত্তে মায়াপ্রদত্ত অস্ত্রাদি নিয়ে স্বর্গভূমিতে ফিরে গন্ধর্বপতি চিত্ররথকে ডেকে রাঘব শিবিরে ঐ দৈব অস্ত্রগুলি পৌঁছে দিতে আদেশ দিলেন।

এই অস্ত্রগুলি মূলে তারকাসুরকে বধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় এই অস্ত্রগুলির সাহায্যে তারকাসুরকে বধ করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৭। পার্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ করে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করার ঘটনা বর্ণনায় মধুসূদনের কবি দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে, তার স্বরূপ নির্ধারণ কর। এই বর্ণনা অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট এ কথা বলা যায় কি?

উত্তর মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আমরা দেখি পার্বতী মোহিনী বেশ ধারণ করে যোগাসনশৃঙ্গে ধ্যানরত মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁর তপোভঙ্গ করেন। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দেবতা ও মুনি ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ ভারতীয় ঐতিহ্য সম্মত। কাজেই এখানে দেবী পার্বতী যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করেছেন তাতে ভারতীয় পুরাণশাস্ত্র লঙ্ঘিত হয়নি। ধ্যানমগ্ন মহাদেবের যে চিত্র আমরা এখানে দেখতে পাই তাও সম্পূর্ণ পুরাণ সম্মত। দেবতা মদনের সহায়তায় পার্বতী কর্তৃক মহাদেবের তপোভংগ দৃশ্যটি মদনভস্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদনের চিত্রিত হরপার্বতী হোমারের কামপরবশ জুপিটার ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি জুনোর থেকে যদিও মহান তথাপি কবির হাতে কালিদাসের অঙ্কিত হর-পার্বতীর চরিত্র মহিমা অনেকখানি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কালিদাস উমা-মহেশ্বরের যে চরিত্র চিত্র রূপায়িত করেছেন, ভাব সৌন্দর্যে সাহিত্য ক্ষেত্রে তা অতুলনীয়। কালিদাসের মহেশ্বর সংযমী, যোগিশ্রেষ্ঠ—উমা তপস্বিনী। কিন্তু মধুসূদনের লেখনীতে মহাদেবের সেই কঠিন সংযম এবং উমার তপস্যার ভাবটি রক্ষিত হয় নি।

মধুসূদন যে কালিদাসের শিব-দুর্গা চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে,

কিংবা তাঁর বিধর্মী মনোভাবের জন্যই উমা-মহেশ্বরকে কামপরতন্ত্র করেছেন এরূপ ভাববার কারণ নেই। কবির শিল্প বুদ্ধি প্রখর ছিল, তাঁর সৌন্দর্য চেতনাও কম গভীর ছিল না। তথাপি যে তাঁর হাতে কালিদাসের হর-পার্বতীর চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এর একমাত্র কারণ গ্রীক দেবতার সঙ্গে পুরাণের হিন্দু দেব চরিত্রের সংমিশ্রণ। হিন্দু দেবতা বা পুরাণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন, Though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduisum, I love the grand mythology of our ancestors. তবুও বলা যায়, গ্রীক পুরাণই কবি শ্রীমধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল বেশী। It is my ambition to engraft the exquisite graces of the greek mythology on our own. অথচ মধুসূদন গ্রীক পুরাণ ও হিন্দু পুরাণকে সমন্বিত করতে পারেন নি।

"কালিদাস সংযমী মহেশ্বরের কী কঠোর আত্মসংযমই না প্রকাশ করিয়াছেন, মধুসূদনের হর ধ্যান ভঙ্গে ইহার কিছুই লক্ষিত হয় না। কামদেবের অস্ত্রাঘাত মাত্র তাঁহার কল্পিত মহাদেব [মুহূর্ত পূর্বে তপঃ সাগরে নিমগ্ন, বাহ্য জ্ঞান হত] অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ভগবতীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বিলাস লীলায় প্রবৃত্ত হইলেন! এই চিত্রে মধুসূদন কেবল সংযমী মহাদেবের চরিত্র মহত্ত্ব নষ্ট করেন নাই, ভগবতীর চরিত্রেরও হীনতা সাধন করিয়াছেন। মহাদেবের তপোবিঘ্ন সম্বন্ধে কুমার-সম্ভবের পার্বতী সম্পূর্ণ নিরপরাধা। তিনি পবিত্র চিত্তে, মহাদেবের পূজার জন্য তাঁহার তপস্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য পার্বতীর বিন্দু মাত্র অপরাধ ছিল না। কিন্তু মেঘনাদ বধের পার্বতী আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এক জঘন্য উপায়ে স্বামীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যিনি স্বয়ং তপশ্চারিণী গণের অগ্রগণ্যা এবং জগতে সহধর্মিনী নামের আদর্শ স্বরূপা, তাঁহার চরিত্র এরূপ ভাবে চিত্রিত করা মধুসূদনের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। তাঁহার পূর্ববর্তী কবি ভারতচন্দ্র এই হর ধ্যান ভঙ্গ বর্ণনা করিতে যাইয়া যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আরো কালিমালিপ্ত। পূর্ববর্তী সুপরিচিত কবির অঙ্কিত চিত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং গ্রীক পুরাণের জুপিটার ও জুনোকে আদর্শ করিতে যাইয়াই মধুসূদন এই রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।"

প্রশ্ন ১৮। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ অবলম্বনে মধুসূদনের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা

প্রশ্ন ১৯। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীর পরিকল্পনায় মধুসূদনের উপরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব আলোচনা করে এই সর্গে মধুসূদনের কোন মৌলিকতা আছে কিনা দেখাও।

উত্তর—মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বর্ণিত হয়েছে মহাদেব ও পার্বতীর অনুগ্রহে ইন্দ্র কর্তৃক লক্ষ্মণের জন্য অজেয় অস্ত্রলাভ। এই সর্গের প্রায় সব ঘটনাই ঘটেছে স্বর্গ লোকে এবং স্বর্গ ভূমির দেবদেবীগণই এই সকল ঘটনার অভিনেতা ও অভিনেত্রী। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে ইন্দ্রজিতের নিধন ব্যাপারে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ রাঘব পক্ষে সক্রিয় সহায়তা করেন নি। কিন্তু হোমারের ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন বর্তমান কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে সুরলোকের দেবদলকে ইন্দ্রজিতের হত্যাকাণ্ডে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়েছেন। রক্ষোরাজ রাবণ যে দিন মেঘনাদকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন, সেই দিন রাত্রেই রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে নিপাতিত করবার জন্য তাদের দৃষ্টির অন্তরালে স্বর্গ ভূমিতে চলছিল দেবতাদের গোপন চক্রান্ত। ভক্তদ্রোহিনী রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মীর প্ররোচনায় দেবরাজ ইন্দ্র ও তৎপত্নী শচীদেবী কৈলাশে মহাদেব পার্বতীর সন্নিধানে গিয়েছেন। দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্য পার্বতী মোহিনীমূর্তি ধারণ করে মীনকেতন সমভিব্যাহারে যোগাসন শৃঙ্গে গিয়ে মহাদেবের তপোভঙ্গ করেছেন; পার্বতীর রূপে মুগ্ধ মহাদেব ইন্দ্রজিতের নিধন উপায় পত্নীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তারপর মায়াদেবী ও বিভীষণের সহায়তায় নিকুম্ভিলা যজ্ঞালয়ে লক্ষ্মণ দৈবী অস্ত্রে মেঘনাদকে তস্করের মত হত্যা করেছেন।

স্বর্গের দেবদেবীর এই চরিত্র চিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে মধুসূদন হোমারের কাব্যভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কবির চিত্রিত হর পার্বতী গ্রীক পুরাণের জুপিটার এবং তাঁর পত্নী জুনোর চরিত্রাদর্শেই কল্পিত। মধুসূদনের অঙ্কিত রতি ও মদনের ওপর সৌন্দর্যাধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী আফ্রোদিতি (Aphrodite) ও নিদ্রাদেব সমনাস্ (Somnus) এর ছায়াপাত হয়েছে। ইলিয়াডে বর্ণিত আছে ট্রয়বাসীদিগের প্রতি জুপিটারের প্রীতিপক্ষপাত দেখে গ্রীসীয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না জুনো মনোরম সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে আইডা (Ida) পর্বতস্থিত জুপিটারের সমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং আপনার ভুবন মোহন সৌন্দর্যের মোহমন্ত্রে স্বামী জুপিটারকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করে ট্রয়বাসীদের সর্বনাশ সাধন করেছিলেন। মধুসূদনের কল্পিত কৈলাশ ও যোগাসন শৃঙ্গ পাঠককে হোমারের অলিম্পাস ও আইডা পর্বতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই স্বর্গের পরিকল্পনা বিষয়ে মধুসূদন বন্ধুকে একটি পত্রে লিখেছেন, **you will no doubt, be reminded of the fourteenth Iliad and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it—Juno's visit to Jupiter, on mount Ida.** ইলিয়াড কাব্যের চতুর্দশ সর্গের ও কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গের কতিপয় ঘটনার ছায়া অবলম্বনে মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গটি রচিত।

দেবতা মদনের সহায়তায় পার্বতী কর্তৃক মহাদেবের তপোভঙ্গ দৃশ্যটি মদন-ভস্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদনের চিত্রিত হর-পার্বতী হোমারের কামপরবশ জুপিটার ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি জুনো হতে যদিও মহান, তথাপি কবির হাতে কালিদাসের অঙ্কিত হরপার্বতীর চরিত্র মহিমা অনেকখানি যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার

উপায় নেই। কালিদাস, উমা-মহেশ্বরের যে চরিত্র চিত্র রূপায়িত করেছেন, ভাব সৌন্দর্যে সাহিত্যক্ষেত্রে তা অতুলনীয়। কালিদাসের মহেশ্বর সংযমী; যোগিশ্রেষ্ঠ—উমা তপস্বিনী। কিন্তু মধুসূদনের লেখনীতে মহাদেবের সেই কঠিন সংযম ও উমার তপশ্চর্যার ভাবটি রক্ষিত হয় নি।

মধুসূদন যে কালিদাসের শিবদুর্গা চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে, কিংবা তাঁর বিধর্মী মনোভাবের জন্যই, উমা-মহেশ্বরকে কামপরতন্ত্র করেছেন—এরূপ ভাববার কারণ নেই। কবির শিল্পবুদ্ধি প্রখর ছিল, তার সৌন্দর্যচেতনাও কম গভীর ছিল না। তথাপি যে তাঁর হাতে কালিদাসের হরপার্বতীর চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এর একমাত্র কারণ গ্রীকদেবতা পুরাণের সঙ্গে হিন্দু দেব চরিত্রের সংমিশ্রণ। হিন্দুদেবতা পুরাণের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীলই ছিলেন। এ সম্বন্ধে একটি পত্রে তিনি লিখেছেন—
Though as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. তবুও মনে হয়, গ্রীক পুরাণই মধুসূদনকে প্রভাবিত করেছিল বেশী। It is my ambition to engraft the exquiste graces of the greek mythology on our own. অথচ মধুসূদন গ্রীকপুরাণ ও হিন্দু পুরাণকে সমন্বিত করতে পারেন নি। যোগসমাধিভঙ্গের পর উমামহেশ্বরকে প্রেমোন্মত্ত করে তুললে উভয়ের চরিত্র অনেকটা ত্রুটিযুক্ত হয়। মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবি ভরতচন্দ্রের হাতে শিবচরিত্র আরো বেশী কালিমা যুক্ত হয়েছে।

আখ্যায়িকা অংশকে পল্লবিত করবার জন্য মধুসূদন হোমারের কবিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। মহাদেবের তপোভঙ্গ করবার উদ্দেশ্যে পার্বতী কামদেবতার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। দেবীর এই অনুরোধের উত্তরে দেবতা মদন যে কথাগুলো বলেছেন, তার সঙ্গে জুনোর প্রতি সমনাসের উক্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হোমারের চিত্রিত প্যালাস (pallas) দেবীর সঙ্গে শক্তীশ্বরী মায়াদেবীর সাদৃশ্য আছে। গ্রীক জীবনাদর্শ ও গ্রীকদেবতাপুরাণ মধুসূদনের কবি কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সুতরাং "His (মধুসূদনের) excursion into the worlds of Greek myths and of foreign poets was inspired by the idea of giving 'free scope to his inventive powers', and of fitting their beauties into the framework of his epic." প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গের ক্ষুদ্র দু একটি ঘটনা ও চরিত্র বর্ণন বিষয়ে মধুসূদন কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাছে ঋণী। তবে এ কাব্যখানি রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় সাহিত্য অপেক্ষা ইউরোপীয় সাহিত্যের নিকটই কবির ঋণ সমধিক। মেঘনাদবধে হোমারপ্রমুখ পাশ্চাত্য কবিগণের ভাবধারা, পাশ্চাত্য পুরাণ, বিদেশী ভাব ও তদনুযায়ী কল্পনা এবং বিদেশী কাব্যরীতির প্রভাব স্বল্প নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রঃ ১। "বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি,"

—কখন কার উদ্দেশ্যে কে একথা বলেছেন? চরণারবিন্দ শব্দটির অর্থ কি?

উত্তর—মেঘনাদবধ কাব্য রচনার প্রথমেই দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে কবি মাইকেল মধুসূদন এইকথা বলেছেন। 'চরণারবিন্দ' শব্দটির অর্থ চরণরূপ পদ্মফুল।

প্রঃ ২। "তোমার পরশে
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষধরে!"

—এখানে কার পরশের কথা বলা হয়েছে? কথাটি বলার অর্থ কি?

উত্তর—এখানে বাগ্‌দেবী সরস্বতীর স্পর্শের কথা বলা হয়েছে। সরস্বতীর স্পর্শের মধ্যে এমন একটি পরমাশ্চর্য শক্তি রয়েছে যার প্রভাবে প্রাণনাশক বিষবৃক্ষও চিত্তহারী সুরভিবিশিষ্ট চন্দন তরুর গুণ সৌন্দর্যে ভূষিত হয়।

প্রঃ ৩। "গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"

—কে কাকে কখন একথা বলেছেন? 'গৌড়জন' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার সময় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কল্পনা' দেবীকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলেছেন। গৌড়জন শব্দের গৌড় অর্থাৎ বঙ্গ দেশের অধিবাসী।

প্রঃ ৪। "ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা ধরেন আদরে
ধরারে।"

—উক্তিটির সার্থকতা কোথায়?

উত্তর—সুবর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণ যে সভাগৃহে সমাসীন, নানা রত্নবিমণ্ডিত স্তম্ভ-শ্রেণী তার বিশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করে আছে। এই দেখে মনে হচ্ছে যেন অনন্তনাগ বাসুকী (ফণীন্দ্র) তার অজস্র মণিদীপ্ত অগণিত ফণার উপর বিশাল পৃথিবীকে অবলীলাক্রমে ধারণ করে আছে।

প্রঃ ৫। "ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা,
হর কোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে!"

—ছত্রধরকে কেন এখানে এভাবে তুলনা করা হইয়াছে?

উত্তর—হর-পার্বতীর মিলন উদ্দেশ্যে মহাদেবের তপোভঙ্গ করতে গিয়ে মদন হর কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন। সেই অবধি তিনি অনংগ। কিন্তু রাক্ষস-রাজের ছত্রধরের নয়ন-বিমোহন সৌন্দর্য বিলসিত দেহের দিকে তাকালে মনে হয় যেন অংগধারী দেবতা মদনই সেই সভা গৃহে ছত্রধর রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

প্রঃ ৬। "ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ-মূরতি
পাণ্ডব শিবির দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি।"

—দৌবারিকের সঙ্গে শূলপাণির তুলনা করার কারণ কি?

উত্তর—মহাভারত পাঠে জানা যায়, কুরু পাণ্ডবের মধ্যে যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছিল, তখন ত্রিশূলধারী মহাদেব পাণ্ডবদের শিবির দ্বার রক্ষা করতেন। মহাদেবের সেই রুদ্র মূর্তি অতীব ভয়াল। রক্ষোরাজ রাবণের সভাদ্বার যে দৌবারিক রক্ষা করছে, সেও রুদ্রেশ্বরের মত ভয়ঙ্কর মূর্তি, ভীষণ দর্শন। এই তুলনার দ্বারা দ্বাররক্ষকের মূর্তির ভয়ঙ্করত্বই সূচিত হয়েছে।

প্রঃ ৭। "মনোহর যথা
বাঁশরী স্বর লহরী গোকুল-বিপিনে।"

—এখানে কার সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর—বৃন্দাবনের বনভূমিতে কিশোর কৃষ্ণ যে বংশী-ধ্বনি করতেন তা সুমধুর, চিত্তহারী। বৃন্দাবনের কুঞ্জকাননকে শ্রীকৃষ্ণের বংশী ধ্বনি জাত মধুর সুরতরঙ্গ যেমন অনুরণিত করে তুলত, দূর থেকে বায়ুবাহিত নানাবিধ মৃদু বাদ্য-ধ্বনি রাবণের সভা গৃহটিকে তেমনি গুঞ্জিত করে তুলছে।

প্রঃ ৮। "নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত।"

—কাকে লক্ষ্য করে কে এই উক্তিটি করেছেন? কোন্ 'বারতা'র কথা এখানে বলা হয়েছে? 'নিশার স্বপন সম' বলার কারণ কি?

উত্তর—ভগ্নদূত মকরাক্ষকে লক্ষ্য করে রক্ষোরাজ রাবণ এই কথাগুলি বলেছেন। এখানে 'বারতা'টি হচ্ছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ। রাত্রের স্বপ্নে এমন সব অসম্ভব ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, জাগ্রত অবস্থায় যা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। এখানে বীরবাহুর নিধন ঘটনা সত্য হলেও রাবণের কাছে তা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। এ ঘটনা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না—এ যেন স্বপ্নবৎ অলীক। সামান্য মানবের হাতে বীরবাহুর মত বীরের মৃত্যু কি করে সম্ভব?

প্রঃ ৯। "ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী-তরুবরে?"

—কোন্ প্রসঙ্গে কে এ কথা বলেছেন? এ কথা বলার কারণ কি?

উত্তর ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শুনে রাবণ এ কথা বলেছেন। এ কথা বলার কারণ হল ঘটনাটি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। কোমল ফুলের পাপড়ি দ্বারা কঠিন সুবিশাল শিমূল বৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব কার্য, রাজ্যভ্রষ্ট বনচারী সামান্য মানব রামচন্দ্রের পক্ষে বীরাগ্রগণ্য পরম শক্তিমান বীরবাহুকে নিহত করাও তদ্রূপ অসম্ভব ব্যাপার।

প্রঃ ১০। "এ দুরন্ত রিপু
তেমনি দুর্বল. দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর!"

—কে কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেছেন? তাঁর দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কি?

উত্তর—ভগ্নদূত মকরাক্ষের মুখে বীরপুত্র বীরবাহুর নিধন সংবাদ শ্রবণে রক্ষোরাজ রাবণের এই উক্তি। রাবণকে এখানে একটি ছিন্নশাখা মহামহীরুহ রূপেই চিত্রিত করা হয়েছে। বনের মধ্যে কাঠুরিয়া একে একে মহীরুহের সহস্র-শাখাকে কেটে পরে সমূলে সেই বিরাট তরুর বিনাশ সাধন করে, রক্ষোরাজ রাবণের অবস্থাও তদ্রূপ। লঙ্কা সমরে ভিখারী রাঘব রামচন্দ্র দুর্বার শক্তিবলে রক্ষোরাজের ভ্রাতা পুত্র ইত্যাদিকে নিহত করে তাঁকে নিরন্তর দুর্বল করে তুলেছে।

প্রঃ ১১। "কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুইরে অভাগী,
কালপঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে!"

—উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হয়েছে, কাকে 'ভুজগ' বলা হয়েছে? 'কালকূটে ভরা' বলার কারণ কি?

উত্তর—উক্তিটি রক্ষোরাজ রাবণের। রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা হয়েছে। এখানে রামচন্দ্রকে 'ভুজগ' অর্থাৎ সর্প বলা হয়েছে। বিষধর সর্প যেমন মারাত্মক শক্তিধর রামচন্দ্রও তেমনি ভয়াবহ। শূর্পণখা প্রথমে রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করতে চেয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হবার ফলেই এই লঙ্কাযুদ্ধের সূচনা।

প্রঃ ১২। "কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি।"

—কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কে এই কথা বলেছেন? উক্তিটির মধ্য দিয়ে বক্তার চরিত্রের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

উত্তর—লঙ্কায় ভীষণ সমরে রক্ষোরাজ রাবণের ভ্রাতা, বীরপুত্র বীরবাহু ও অন্যান্য বীর সৈন্যগণ একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে দেখে ক্ষোভে দুঃখে রাবণ এই কথাগুলি বলেছেন। দৈবাহত রাবণের এই বিলাপ একান্ত করুণ, অতীব মর্মস্পর্শী। রাবণ কেবল প্রবল-প্রতাপান্বিত সম্রাট নন, তিনি স্নেহদুর্বল মানবও। স্নেহ মমতার পারবশ্য স্বীকার করেন বলেই তাঁর বেদনা-বিদ্ধ হৃদয়ের নিঃসীম শূন্যতা ও তাঁর মর্মচ্ছেদী হাহাকার পাঠকের চিত্তকে এতখানি স্পর্শ করে।

প্রঃ ১৩। "অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে।"

—কোন্ পরিস্থিতিতে কে কাকে এই কথা গুলি বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর—বীরপুত্র বীরবাহুর মৃত্যুতে রক্ষোরাজ রাবণ যখন অত্যন্ত শোকাহত, সেই সময়ে তাঁর সচিবশ্রেষ্ঠ সারণ এই কথাগুলি রাবণকে বলেছিলেন। সমুচ্চ শৃঙ্গ যখন বজ্রের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, তখনও কিন্তু পর্বত বেদনায় কাতরতা প্রকাশ করে না। সুতরাং বীরবাহুর মৃত্যুতে পর্বত সদৃশ রাবণের অধীর হওয়া শোভা পায় না।

প্রঃ ১৪। "ডমরুধ্বনি শুনি কাল ফণী
কভু কি অলস ভাবে নিবাসে বিবরে?"

—কোন্ প্রসঙ্গে কার এই উক্তি? উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর—যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহু, কী অসীম সাহসিকতার সঙ্গে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, মকরাক্ষের মুখে সেই কথা শোনার পর রক্ষোরাজ রাবণ এই উক্তি করেছেন। ডমরু ধ্বনি শ্রবণ করলে বিবরস্থিত দুরন্ত কাল ফণী যেমন পরম উৎসাহে বিবর ত্যাগ করে বাইরে ছুটে আসে, তেমনি দূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্বের ব্যাখ্যান শুনে সংগ্রাম প্রিয় রাবণের বীর হৃদয় বিপুল উৎসাহে আন্দোলিত হয়ে উঠল।

প্রঃ ১৫। "কিংবা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে উর্দ্ধ ফণা—
ত্রিশূল সদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।"

—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। কার সম্পর্কে কথাগুলি বলা হয়েছে?

উত্তর—বালিপুত্র অংগদ শত্রুর কিরূপ আতংকজনক, এই কথাগুলি তাই প্রকাশ করছে। বিষধর সাপ যখন খোলস পরিত্যাগ করে, তখন সে হীন-

বীর্য দুর্বল হয়ে পড়ে। পরে শীত ঋতুর অবসানে পুনরায় নব চর্মে যখন আচ্ছাদিত হয়, তখন সে নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং পরম গর্ব ভরে দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা সঞ্চালিত করে উদ্যত ফণা নিয়ে চতুর্দিকে আহার অন্বেষণের জন্য ভ্রমণ করে। এই রকম বিষধর সর্প যেমন সকলের মনে আতংকের উদ্রেক করে তেমনি দুরন্ত অংগদ প্রতিপক্ষের মনে ভয়ের সঞ্চার করছে।

প্রঃ ১৬। "কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদ রঞ্জন
শশাংক।"

—কার সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে? কেন?

উত্তর—রামচন্দ্র সম্পর্কে এ কথা বলা হয়েছে। জ্যোৎস্নাবিহীন চন্দ্র যেমন শোভা সৌন্দর্য হীন, নিষ্প্রভ, জানকীবিহীন রামচন্দ্রকেও সেরূপ মলিন বিষন্ন দেখাচ্ছে।

প্রঃ ১৭। "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ।"

—কে কাকে সম্বোধন করে এ উক্তি করেছেন? কেন?

উত্তর—সমুদ্রকে সম্বোধন করে রাবণ এই উক্তিটি করেছেন। রামচন্দ্র সমুদ্রের ওপরে সেতু নির্মাণ করেছেন। কৃষ্ণবর্ণ শিলা নির্মিত সেতুর প্রতি দৃষ্টিপাত করে সমুদ্রকে রাবণ বিদ্রূপ করছেন। শিলা রাশি গ্রথিত সেতুকে যদি 'মালা' বলা যায়, তা হলে সে মালা সুন্দর নিশ্চয়ই নয়, বরং বেমানান। সমুদ্রাধিপতি বরুণের একটি নাম 'প্রচেতস্'। এরই সম্বোধনে 'প্রচেতঃ'। এখানে সমুদ্রকেই প্রচেতঃ বলা হয়েছে।

প্রঃ ১৮। "তরুর কোটরে রাখে শাবক যেমতি
পাখী।"

- কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন? কেন?

উত্তর—চিত্রাঙ্গদা রক্ষোরাজ রাবণকে এই কথাগুলি বলেছেন। শাবকের পক্ষে তরু-কোটর একান্ত নিরাপদ আশ্রয়। রক্ষঃকুলপতি রাবণও চিত্রাঙ্গদা-পুত্র বীরবাহুর পরম আশ্রয়স্থল ছিল। কিন্তু বীরবাহু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। তাই চিত্রাঙ্গদার এই আক্ষেপ।

প্রঃ ১৯। "কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।"

—উক্তিটি কার? কাকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে? এখানে কার সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে? উক্তিটির তাৎপর্য কি?

উত্তর—উক্তিটি রাণী চিত্রাঙ্গদার। রক্ষোরাজ রাবণকে উদ্দেশ্য করে উক্তিটি করা হয়েছে। এখানে কাকোদর অর্থাৎ সর্পের সঙ্গে রামচন্দ্রের এবং প্রহারকের সঙ্গে রাবণের তুলনা করা হয়েছে। উক্তিটির তাৎপর্য হল রাবণ যদি সীতা হরণ না করতেন, তা হলে রামচন্দ্র কখনই লঙ্কা আক্রমণ করতেন না।

প্রঃ ২০। "কি কারণে, কহ, লো সজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?"
—কাকে উদ্দেশ্য করে কে এই উক্তিটি করেছেন? জলেশ পাশী কে? তাঁর অস্থিরতার কারণ কি?

উত্তর—বারুণী তাঁর সখী মুরলাকে এই কথাগুলি বলেছেন। জলেশ পাশী অর্থ পাশঅস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। রাবণ যখননিজেই যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন, তখন চারিদিকে মহাকোলাহল সৃষ্টি হল, সৈন্যদের পদভারে পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল, সমুদ্র মধ্যেও বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। তারই ফলে বরুণদেব অস্থির হয়ে উঠলেন।

প্রঃ ২১। যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃকান্তিছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে।
এখানে রজঃশব্দের অর্থের সঙ্গে আভিধানিক পার্থক্য দেখাও। 'সফরী আর 'বিভাবসু' শব্দদ্বয়ের অর্থ লেখ। (ক. বি, ১৯৮৩) পংক্তিকয়টির অর্থ লেখ।

উত্তর—রজঃ কথাটির আভিধানিক অর্থ ধূলি। কিন্তু মধুসূদন এখানে রজত অর্থে প্রয়োগ করেছেন। 'সফরী' অর্থ পুঁটি মাছ। 'বিভাবসু' অর্থ সূর্য। কবি কল্পনা করছেন রূপসী সফরী যে মাঝে মাঝে জলের ওপর দিকে ওঠে, তা শুদ্ধ আপন দেহের রজতশুভ্রচ্ছটার বিলাস জ্যোতির্ময় সূর্যকে দেখাবার জন্য।

প্রঃ ২২। "যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উক্তিটির অর্থ বুঝিয়ে দাও।

[ক. বি. ১৯৮৫]

উত্তর—উক্তিটি রক্ষোরাজকুললক্ষ্মীর। বারুনীর ইচ্ছা অনুযায়ী রাম-রাবণের যুদ্ধের বার্তা মুরলা শুনতে চাইলে কমলা এই কথাগুলি বলেন। নিরন্তর প্রচণ্ড বেগশালী তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্রের তটভূমি প্রতিদিন যেমন করে ভেঙে ধ্বসে পড়ে, রক্ষোরাজ রাবণও তেমনি তার অধর্মাচার হেতু দিন দিন শক্তিহারা হয়ে আসন্ন ধ্বংসের মুখে ধাবিত হচ্ছে। (যাদঃপতি অর্থ সমুদ্র, রোধঃ অর্থ তীর চলোর্মি অর্থ—তরঙ্গমালা)

প্রঃ ২৩। "প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"—উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর—উক্তিটি মুরলার কাছে করেছেন রক্ষোকুলরাজলক্ষ্মী। লক্ষ্মীদেবী বলতে চেয়েছেন যে, রামচন্দ্রের ধর্মপত্নী সীতাকে হরণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ যে ধর্মদ্রোহিতা করেছেন, তাঁর এই পূর্বকৃত পাপের ফলস্বরূপ রক্ষোবংশের বিনাশ ঘটবে।

প্রঃ ২৪। "এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননী,
কোথায় পাইলে তুমি শীঘ্র কহ দাসে।"

—কে কাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন? 'অদ্ভুত বারতা'টি কি?

উত্তর—প্রশ্নটি মেঘনাদ করেছিলেন তাঁরই ধাত্রীমাতা প্রভাষার ছদ্মবেশধারিনী রক্ষোরাজকুললক্ষ্মীকে। অদ্ভুত বার্তাটি হল রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর নিধন। একবার মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিলেন। মেঘনাদ মনে করেছিলেন এতে রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু হয়েছে। সেইজন্য এখন রামচন্দ্রের হাতে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ মেঘনাদের কাছে অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে।

প্রঃ ২৫। "হায়, বিধি বাম মম প্রতি;
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,—
কে কবে শুনেছে, লোকে মরি পুনঃ বাঁচে?"

—উক্তিটি কার? কথাগুলির তাৎপর্য কি?

উত্তর—উক্তিটি মেঘনাদকে উদ্দেশ্য করে রক্ষোরাজ রাবণের। শিলা জলে ভাসাল অথবা মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, অবিশ্বাস্য অতিপ্রাকৃত ঘটনা। কিন্তু রক্ষোরাজের প্রতি ভাগ্যের বিরূপতা হেতু অসম্ভব ব্যাপারও আজ সম্ভব হয়ে উঠেছে। মেঘনাদ যে রামচন্দ্রকে শরাঘাতে নিহত করেছেন সেই তুচ্ছ মানব রামচন্দ্র পুনর্জীবন লাভ করেছে। আসন্ন ধ্বংসের মুখোমুখি দাড়িয়ে আজ তিনি বেশ স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন দৈব রোষের কাছে মর্ত্যবাসীর বিপুল শক্তির আস্ফালন সত্যই নিষ্ফল।

প্রঃ ২৬। যাও তবে' সুরনাথ, যাও ত্বরা করি
চন্দ্রশেখরের পদে কৈলাস শিখরে,
নিবেদন কর দেব, এ সব বারতা।

সুরনাথ কে? উক্তিটি কার? চন্দ্রশেখর কে? কোন্ সব 'বারতা' তাঁকে নিবেদন করতে বলা হচ্ছে?

উত্তর—সুরনাথ হচ্ছেন ইন্দ্র। উক্তিটি লক্ষ্মীদেবীর। চন্দ্রশেখর হচ্ছেন মহাদেব। লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রকে বলছেন কৈলাশে মহাদেবকে যেন সত্বর জানান হয় যে

আগামী কাল লঙ্কা যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং তিনি দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্রকে রক্ষা না করলে রামচন্দ্রের ধ্বংস সুনিশ্চিত।

প্রঃ ২৭। কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে? —জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।

—উক্তিটি কার? তাঁর এই কথা বলার কারণ কি?

উত্তর—উক্তিটি লক্ষ্মীদেবীর। লক্ষ্মীদেবী শিবের কন্যা। তিনি বলতে চাইছেন, কোন স্নেহশীল পিতাই নিজকন্যাকে স্বামীর কাছ থেকে দূরে রাখেন না। বৈকুণ্ঠপুরীই লক্ষ্মীদেবীর স্বামী বিষ্ণুর বাসস্থান। কিন্তু মহাদেব আপন ভক্ত রাবণের সমৃদ্ধি কামনায় লঙ্কাধামে লক্ষ্মীকে কতকাল আবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ রাবণের প্রতি মহাদেব যতদিন তুষ্ট থাকবেন ততদিন লক্ষ্মীদেবীর লঙ্কাপুরী ত্যাগ করা সম্ভব নয়। এ সব কথার সহজতম অর্থ হচ্ছে' সত্বর রাক্ষস বংশের বিনাশ ঘটুক এটাই রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মীর ঐকান্তিক কামনা।

প্রঃ ২৮। করযোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি নিক্ষেপী।

—দম্ভোলি নিক্ষেপী কে? তিনি কার নিকট করযোড় করেছেন?

উত্তর—বজ্রাস্ত্র-নিক্ষেপকারী ইন্দ্র। তিনি দেবীপার্বতীর নিকট করযোড় করছেন।

প্রঃ ২৯। পরম-অধর্মচারী নিশাচরপতি—দেবদ্রোহী।

—কে কার নিকট এই উক্তিটি করেছেন? কার সম্পর্কে কেন এই উক্তিটি করা হয়েছে?

উত্তর—ইন্দ্র পার্বতীর কাছে এই উক্তিটি করেছেন। রাবণ সম্পর্কে এই কথাগুলি বলা হয়েছে। স্বর্গের দেবকুল যে ধর্মের ধারক ও পোষক রাবণ সেই ধর্মকে আঘাত করেছেন বলেই দেবদ্রোহী বলা হয়েছে, অর্থাৎ রামচন্দ্রের ধর্মপত্নীকে অপহরণ করেই রাবণ দেবদ্রোহী হয়ে উঠেছেন।

প্রঃ ৩০। সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতিদূতী উষার চরণে,
নমিলা মদনপ্রিয়া হরপ্রিয়া পদে।

—অর্থলেখ—সরসে, সরোজিনী' ত্বিষাম্পতি। উপরিউক্ত অংশটিতে যে তুলনা দেওয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যা কর।

উত্তর—সরসে অর্থ সরোবরে। সরোজিনী অর্থ পদ্ম। ত্বিষাম্পতি অর্থ সূর্য। দেবী পার্বতী স্মরণ করা মাত্রই রতি এসে অবনত মস্তকে দেবীর চরণে প্রণাম জানাল। মনে হল যেন প্রভাতে সরোবরে বিকশিত মনোহর কমল পুষ্পটি মৃদু বাতাসের স্পর্শে আন্দোলিত হয়ে বিশ্বের মনোহারিণী সূর্যদূতী রূপসী

উষার চরণ উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাল। এখানে পদ্মের সঙ্গে রতির এবং উষার সঙ্গে পার্বতীর তুলনা করা হয়েছে। উপমা প্রয়োগে মধুসূদন কতখানি কুশলী ছিলেন, আলোচ্যমান অংশটি তার পরিচয়বাহী। রতি এবং উমা দুজনেই রূপসী কিন্তু উভয়ের সৌন্দর্যের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। পার্বতীর রূপ সৌন্দর্যের মধ্যে যে সুগভীর মহিমা রয়েছে তা রতির মধ্যে নেই। সেই কারণে পদ্মের সঙ্গে রতির এবং উষার সঙ্গে পার্বতীর উপমা সুন্দর ও সার্থক।

প্রঃ ৩১। চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে,
অনঙ্গ!

—কে কাকে কখন এ কথা বলেছেন? অনঙ্গ নামের তাৎপর্য কি?

উত্তর—যোগাসনশৃঙ্গে মহাদেবের ধ্যান ভাঙার জন্য যখন পার্বতী গমনেচ্ছু তখন তিনি কামদেব মদনকে এই কথাগুলি বলেছেন।

একবার হরকোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন বলে দেবতা মদন অনঙ্গ অর্থাৎ দেহহীন।

প্রঃ ৩২। "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে, তোমা, গণেন্দ্র জননী?

—কে কাকে এই উক্তিটি করেছেন? 'গণেন্দ্র জননী' কেন বলা হয়েছে?

উত্তর— মহাদেব পার্বতীকে এই কথাগুলি বলেছেন। গণপতির মাতা পার্বতীকে গণেন্দ্র জননী বলা হয়েছে।

প্রঃ ৩৩। এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি।

—কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন? যোগীন্দ্রের বিরলে থাকার ধারণ কি?

উত্তর—দেবী পার্বতী মহাদেবকে এই কথাগুলি বলেছেন। যোগীন্দ্র মহাদেব যোগাসনশৃঙ্গে বিরলে বসে তপস্যায় রত ছিলেন।

প্রঃ ৩৪। ছায়ার আশ্রয়ে
কে কবে ভাস্কর করে ডরায় সুন্দরি?

–কে কাকে এই কথাগুলি বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য কি?

উত্তর—রতিপতি মদন প্রিয়তমা পত্নী রতি দেবীকে এই কথাগুলি বলেছেন। যে-মানুষ তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে সে কখনো উত্তপ্ত রৌদ্রে ক্লিষ্ট হয় না। সেই রকম দেবী পার্বতীর স্নেহশীতল ও পরম নির্ভর আশ্রয়ে ছিলেন বলেই দেবতা মদন শিবশংকরের নেত্রবহ্নির ভয়ে শঙ্কিত হন নি।

প্র: ৩৫। আনন্দ সাগরে
ভাসিনু, গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে !

—উক্তিটি কার ? গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ কে ? শুভ সংবাদটি কি ?

উত্তর—উক্তিটি শ্রীরামচন্দ্রের। গন্ধর্বশ্রেষ্ঠ হলেন চিত্ররথ। রামচন্দ্রের কাছে শুভ সংবাদটি হচ্ছে এই যে স্বর্গের দেবতাবৃন্দ রামচন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং স্বয়ং দেবী পার্বতী তাঁর প্রতি সুপ্রসন্না।

প্র ৩৬। এ সার কথা কহিনু তোমারে।

— কে কাকে বলেছেন ? সার কথাগুলি কি ?

উত্তর চিত্ররথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথাগুলি বলেছেন। দেবতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতে হলে রামচন্দ্রকে কোন্ কোন্ কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে, চিত্ররথ তারই নির্দ্দেশ দিয়েছেন। দরিদ্রপালন, ইন্দ্রিয় দমন, ধর্মপথে সর্বদা গতি, নিত্য সত্যকথা বলা ও সত্যাচরণ করা এইগুলি হ'ল জীবনের সার কথা।

সোনার-তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"ঘন বর্ষা, ভরা নদী, সঞ্চিত ধান, দ্রুত বহমান তরী প্রাণে যে আকুলতা সঞ্চার করে তাহার সহিত মানবহৃদয়ের অতি চিরন্তন ও গভীর বেদনা মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব রাগিনী সৃজন করিয়াছে............"

রবীন্দ্রমানস প্রসঙ্গে

রোমাণ্টিক মনোভাব কী এবং রবীন্দ্রনাথে ওই মনোভাব কীরূপে প্রকাশিত হয়েছে :—

রোমাণ্টিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে এটি এক ধরনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যা বিস্ময়রস ও সৌন্দর্যবোধের সংযোগে (Strangeness added to beauty) গড়ে ওঠে। ইংরাজি সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং বিশেষত শেলির কবিতায় এই নূতন মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। বস্তু বা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে তার অন্তরস্থ কোন কাল্পনিক রহস্যময় ধর্মকে সত্য ব'লে গ্রহণ করা এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষত্ব। বস্তুর বাস্তবতার সঙ্গে এর একটা বিরোধও দেখা যায়। প্রকৃতির বাস্তব রূপকে অতিক্রম ক'রে তার এক বিশেষ জীবনধর্ম কল্পনা ও মানবমনের সঙ্গে এই প্রকৃতির সম্পর্ক কল্পনা রোমাণ্টিকতার একটা লক্ষণ। যা আছে, যা পাওয়া গেছে তাতে পরিতৃপ্ত থাকে না রোমাণ্টিক চিত্ত। কল্পনায় সুদূর অতীত আর অনাগত ভবিষ্যৎ এক হয়ে যায়। এ এক ধরনের অতৃপ্তিবোধ—অপ্রাপনীয় কোন আদর্শের প্রতি আগ্রহ। শ্রীরবীন্দ্রের যৌবনে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে এ মনোভাব তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'আজি শরত-তপনে প্রভাত-স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতায় একটি অনির্দেশ্য বিরহ ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি কল্পনা করেছেন, কোন্ অজানা স্বপ্নের দেশে এক ছায়াময়ী বিদেশিনী রয়েছেন—যিনি নিরন্তর কবিকে ব্যাকুল ক'রে তোলেন। এরপর 'মানসী' কাব্যেও কবির এই অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা বারবার ধরা পড়েছে। তবে 'সোনারতরী' কাব্যেই এটি চরম স্ফূর্তিলাভ করেছে। এই পর্বে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যমূর্তির বিরহে ব্যাকুল হ'য়ে কবি বলেছেন :—

বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ভাবিয়া তোমারে কহিব অধীর—
"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।"

"সমুদ্রের প্রতি" কবিতায় রোম্যাণ্টিক মনোভাবের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :—

আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাত ব্যথাভরে,
তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলস্য সুদূর তরে
উঠিছে মর্মর স্বর। মানব হৃদয় সিন্ধু-তলে
যেন নব মহাদেশ সৃজন হতেছে পলে পলে
আপনি সে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অনুভব তারি

ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি,
আকার-প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।"

এই সময়ে লেখা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ রোম্যাণ্টিক বিষণ্ণতা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

'ভাবুক লোকমাত্রই অনুভব করিয়াছেন, আমরা মাঝে মাঝে একপ্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ, অপ্রখর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র .....জোৎস্না, সংগীত, বসন্তবায়ু, সুগন্ধের, ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন ব্যাকুল হয় কি কারণে?"

প্রাচীন কাব্য মোটামুটি বস্তুগত ও চিত্রধর্মী ছিল। বস্তুর অন্তর্গত রহস্যের সন্ধান তখন কবিদের বিশেষ অনুপ্রাণিত করে নি। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে চিত্রধর্মিতা ও রহস্যভাবুকতা একই সঙ্গে স্থান লাভ করেছে। তাঁর 'মেঘদূত' ও 'শকুন্তলা'-য় মানবমনের অহেতুক বিষণ্ণতার কথা উল্লিখিত হয়েছে ঃ

"তং—মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহন্যথাবৃত্তি চেতঃ—
কিংবা,
"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দাম্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোহপি জন্তুঃ"

রোমাণ্টিক বিষাদের স্বরূপ সম্পর্কে 'মেঘদূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন এই প্রসঙ্গে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ—

'আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে। সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই।'

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি ও অনির্দেশ্য সৌন্দর্যপ্রীতি ঃ

প্রকৃতি-পর্যায়ের কবিতার মোটামুটি দুটো রূপ আমরা কবিদের কাব্যে লক্ষ্য করি। একটাতে প্রকৃতি দূরে থেকে মানুষের হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার করে, কখনো তার শান্ত সৌম্য প্রভাব দ্বারা মানুষকে মণ্ডিত করতে চায়, অথবা অনির্দেশ্যভাবে বিহ্বল করে মানুষের চিত্তে অনন্তের আভাস এনে দেয় এবং ঐহিকতা-মুক্ত করে।

তখন প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান করে না, প্রেরণা-বিশেষের জনক হয়ে পড়ে। আর একটাতে গাছপালা, জীবজন্তু স্বরূপে অবস্থান করেই মানুষের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ বন্ধনে আবন্ধ হয়। এই দ্বিতীয় রূপে প্রকৃতি এবং মানুষ একই বিশ্বসৃষ্টিলীলার বিভিন্ন অংশ, এবং প্রকৃতি জড় বা অচেতন নয়, তা মানুষেরই মত জীবনময়। মানুষের কাজ হল এই মূক অথচ প্রাণবান, বিচিত্র ও বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে আত্মিক মিলন সাধন করা। একটাতে বিহ্বল ভাবাবেশে প্রকৃতিকে প্রাণময় মনে করা, আর-একটাতে স্বতঃসিন্ধ সত্য হিসাবে এর জীবনযাত্রা গ্রহণ করে অগ্রসর হওয়া। এর প্রথমটি

মোটামুটি পাশ্চাত্য এবং দ্বিতীয়টি মোটামুটি প্রাচ্য আদর্শ বলে অভিহিত করলে অসংগত হবে না।... রবীন্দ্রনাথে এই দুই ভাবাদর্শের সমন্বয় দেখা গেলেও নিসর্গের সঙ্গে জন্মান্তরীণ নিবিড় ঐক্য উপলব্ধিই তাঁর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন।

কবির এই জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যসূচক মনোভাব 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। পরবর্তীকালে লেখা চৈতালী'র একটি কবিতায় প্রকৃতি প্রতিবেশের সঙ্গে যুক্ত এই নিগূঢ় জন্মান্তরীণ আত্মীয়তা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে :—

আমি যেন মিলে গেছি সকলের মাঝে,
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে
পশু পাখি পতঙ্গ সম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে—মাতৃস্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

মানসী-তে প্রকৃতি স্বরূপে অবস্থান করেই কবিকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' প্রকৃতির এই স্বরূপাবস্থান নেই। সেখানে প্রকৃতি কবির মিলনবিরহজনিত উচ্ছ্বাসের উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে মাত্র। বাল্যকালের রচনা বনফুল ও কবি কাহিনীতে অবশ্য এক প্রকারের প্রকৃতিপ্রীতি বিদ্যমান কিন্তু তা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা বিহারীলালের অনুকরণসূত্রে গঠিত। 'মানসী'-র কয়েকটি কবিতা আলোচনা করলে দেখা যায়, কবির এই প্রকৃতিপ্রীতি সহসা উদিত হয় নি। এর পশ্চাতে প্রথমে একটা সংশয় ছিল। এই সংশয় সমগ্র সৃষ্টির রূপ সম্পর্কে, যেমন :—

"পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই
বিষম সংশয় [সিন্ধু তরঙ্গ]

অথবা,

"মনে হয় সৃষ্টি যেন বাঁধা নাই নিয়ম-নিগড়ে" [নিষ্ঠুর সৃষ্টি]

অন্ধসৃষ্টি লীলার একদিকে যে ধ্বংসের মূর্তি ফুটে উঠেছে, কবিকে তা ক্ষণিকের জন্য আচ্ছন্ন করলেও তিনি একমাত্র প্রকৃতিপ্রীতির বশেই এই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন এবং অব্যবহিত পরেই 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় ধ্বংসের উপর প্রেমকেই মৃত্যুঞ্জয় সত্য বলে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন :—

'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হুহু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে

পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।.........
তবু প্রেম বলে
'সত্য-ভঙ্গ হবে না বিধির। আমি তাঁর
পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার
চির-অধিকার লিপি।'

......কবির এই প্রাথমিক যুগের প্রকৃতিপ্রীতি আরো সহজ ও স্পষ্টভাবে উৎসারিত হয়েছে 'প্রকৃতির প্রতি' কবিতায়। 'শত শত প্রেম-পাশে টানিয়া হৃদয়, এ কী খেলা তোর' থেকে আরম্ভ করে 'প্রাণমন পসারিয়া ধাই তোর পানে, নাহি দিস ধরা' প্রভৃতির মধ্যে কবি প্রকৃতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ আমাদের গোচরে এনেছেন।......'কুহুধ্বনি' কবিতায় পল্লীর সঙ্গে বিজড়িত এই প্রকৃতির মানবজীবনের উপর অসীম প্রভাব বর্ণিত হয়েছে :—

যেন কে বসিয়া আছে বিশ্বের বক্ষের কাছে
যেন কোন্ সরলা সুন্দরী
যেন সেই রূপবতী সংগীতের সরস্বতী—
সম্মোহন বীণা করে ধরি।

কবি ক্রমশঃ তাঁর এই মনোভাবের সঙ্গে এ দেশের চিরন্তন মায়াবাদের তুলনা করেছেন এবং দৃঢ়কণ্ঠে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দ্বৈতের বা বহুত্বের এই ভ্রান্তিকে অতিক্রম করে নয়, একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেই তিনি বেঁচে থাকতে চান।

এই সুখে দুঃখে শোকে
বেঁচে আছি দিবালোকে
নাহি চাহি হিম শান্ত অনন্তযামিনী।

'সোনার তরী'তে যখন কবির প্রকৃতিপ্রীতি সুগভীর বিশ্বাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির মর্তপ্রীতি ও মানবানুরাগে পরিণত হয়েছে, তখন কবি স্পষ্টভাবে মায়াবাদকে অস্বীকার করলেন।

বিশ্বের তাবৎ বস্তুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে নিগূঢ় আত্মীয়-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তা অন্য কোন কবির মধ্যে দেখা যায় না। প্রকৃতির কবি ও পূজারী ওয়ার্ডসওয়ার্থ বসুন্ধরা সম্পর্কে এরূপ কোন আত্মীয়ভাব পোষণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রোমান্টিক মনোভাবের যেন একটি পরিণাম লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতকে প্রারব্ধ কাব্যরাজ্যের এই নূতন মনোভাব যেন রবীন্দ্রনাথে পরিণাম লাভের জন্য অপেক্ষা করছিল।

'মানসী' কাব্যের 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় কবির বিশ্বাত্মবোধের বাসনা প্রথম প্রকাশিত হ'ল। তারপর 'সোনারতরী' কাব্যের 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় এই বাসনা সম্যক পরিস্ফুট হয়ে সুগভীর মর্তপ্রীতির জন্ম দিয়েছে। এই বোধের স্বরূপ হল কল্পনাশক্তির বশে নিখিলের সমস্ত বস্তুর সঙ্গে কবি-আত্মার নিগূঢ়-যোগ স্থাপন করা। এই ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বকীয়।

এই বিশিষ্ট কল্পনা যে কবিতাগুলিতে প্রকাশলাভ করছে তাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা অবশ্যস্মরণীয়। এক, এগুলির মধ্যে মর্তকে একটি জীবন্ত সত্তারূপে গ্রহণ করা হয়েছে। দুই, পূর্বোক্ত প্রকৃতিপ্রীতির ব্যাকুলতাই বিশ্বকে সমগ্রভাবে আত্মস্থ করার ব্যাকুলতা এনে দিয়েছে। তিন, এই ব্যাকুলতার ফলে পৃথিবী ও মানুষকে নির্বিচারে ভালোবাসার প্রেরণা কবির চিত্তে জেগেছে। চার, এই ব্যাকুলতার স্বরূপ অভিনব এবং তা কবিকল্পলোকের বস্তু। পুরাণ বা উপনিষদে কথিত কোন তত্ত্বের মধ্যস্থতায় কবি বিশ্বকে গ্রহণ করেছেন না, এ বাসনা কবিহৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত।

অহল্যার মধ্যস্থতায় কবি প্রথম এই ব্যাকুলতার স্বাদ অনুভব করলেন, এবং কল্পিত গোপন প্রাণকেন্দ্র থেকে যে জীবনরসধারা নির্গত হচ্ছে তার সঙ্গে নিজেকে মিলিত করার আগ্রহ ব্যক্ত করলেন :—

জীবধাত্রী জননীর বিপুল বেদন,
মাতৃধৈর্যে মৌন মূক সুখ দুঃখ যত,
অনুভব করেছিলে স্বপনের মতো
সুপ্ত আত্মা মাঝে ?……
মাতৃ অঙ্গে সেই কোটিজীবস্পর্শ-সুখ
কিছু তার পেয়েছিলে আপনার মাঝে ?

পৃথিবীকে জীবন্ত মাতৃসত্তারূপে কবি এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। কবিতাটির শেষে কবি সদ্যঃ চেতনপ্রাপ্ত অহল্যার যে-বিস্ময়ের বর্ণনা দিয়েছেন, সে-বিস্ময় ব্যাকুলতা কবিচিত্তের—অহল্যার মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে মাত্র :—

তুমি বিশ্বপানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়
বিশ্ব তোমাপানে চেয়ে কথা নাহি কয় ;
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্যতীরে
চির-পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।

ওই বিস্ময়ের বশে কবি পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যুগান্তরব্যাপী-অচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন অনুভব করেন। এই অশ্রুতপূর্ব সংগীত তিনি আমাদের শোনালেন 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় :—

মনে হয়, যেন মনে পড়ে,
যখন বিলীনভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধরে
ঐ তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে।

মানুষের আবির্ভাব পৃথিবীতে হলেও কবির কল্পনায় সে পৃথিবীর অনাত্মীয়। অথচ তৃণতরুলতা বা ইতর প্রাণী মাটির কাছাকাছি আছে বলেই তারা যেন ধরিত্রীর

আত্মীয়। বহুজন্মপূর্বে কবি যেন তৃণতরুলতা রূপে এমন কি অপ্রাণ রূপেও পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। মানুষ-জীবন লাভের পর সেই আত্মীয়তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কবির এই অভিনব কল্পনা—বসুন্ধরার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার অতি প্রবল আগ্রহ এবং অন্যথায় আক্ষেপ—'বসুন্ধরা' কবিতাটির বিষয়বস্তু।

......ঐ কবিতায় দেখা যায়, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্পর্শক্রমে আগত সৌহৃদ্যের বাসনা প্রবল বিরহ ভাবনায় ও মিলনের আগ্রহে কবিকে অস্থির করে তুলছে। তাই, কবি কোন সংশয়ের অবকাশ না রেখেই বলেছেন :—

আমারে ফিরায়ে লহো, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চলতলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই—

তারপর কবি বসুন্ধরার বহুবিচিত্র প্রকৃতি এবং জীবনধারার যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যেভাবে বিরহবিলাপে মুখর হয়েছেন তার পরিচয় দান সহজসাধ্য নয়। নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তিতে তার আভাসমাত্র দেওয়া যেতে পারে :—

তাই আজি কোনোদিন শরৎ-কিরণ
পড়ে যবে পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র 'পরে,
নারিকেল দলগুলি কাঁপে বায়ুভরে
আলোকে ঝিকিয়া জাগে মহাব্যাকুলতা
মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা
মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে
জলেস্থলে অরণ্যের পল্লবনিলয়ে,
আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে
অব্যক্ত আহ্বান রবে শতবার করে
সমস্ত ভুবন। সে বিচিত্র সে বৃহৎ
খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবৎ
শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার
সঙ্গীদের নানাবিধ আনন্দ খেলার
পরিচিত রব।

কবির এই বাসনা যে জন্মান্তরীণ সৌহার্দ্যক্রমে আগত স্থির রোমাণ্টিক বাসনা এ সম্পর্কে আর সংশয় নেই। অথচ এই এক বাসনার দুই বিভিন্ন প্রকাশ তাঁর এই সময়কার কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটি হচ্ছে—সৌন্দর্যব্যাকুলতা বা নিরুদ্দেশ, সুদূরশায়ী, বস্তুর অতীত কোন সৌন্দর্যসত্তার প্রতি আকর্ষণ; আর একটি—বসুন্ধরার তাবৎ প্রাণের প্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। একটি সৌন্দর্যবিরহ, অপরটি নিসর্গ বিরহ—উভয়ই কল্পনামূলক। নিসর্গ থেকে সৌন্দর্যস্পৃহা, আবার নিসর্গ

থেকেই বিশ্বাত্মবোধের বাসনা—মূলত এই এক রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ কবির এ-যুগের সমস্ত কবিতা পরিব্যাপ্ত করে বিদ্যমান।

কাল্পনিক নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-বিরহের স্বরূপ :

'সোনার তরী' কাব্যরচনাকালে কবি তাঁর মনোভাবের বিশ্লেষণ নিজেই একটি পত্রে করেছেন—'আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।' কবির মর্ত্যপ্রীতিমূলক সোনার তরীর কবিতাগুলিতে এবং 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি 'চিত্রা'র কবিতায় প্রথমোক্ত মনোভাব এবং সোনার তরী-র 'সোনার তরী', 'মানসসুন্দরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'চিত্রা'র 'জ্যোৎস্না রাত্রে', উর্বশী' প্রভৃতি কবিতায় কবির দ্বিতীয়োক্ত মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। একদিক থেকে এমন কথা বলা যায় যে, কবির সৌন্দর্য অভিলাষ 'মানসী'র সুরদাসের প্রার্থনা' ও 'মেঘদূত' কবিতা থেকে আরম্ভ করে সোনার তরীর নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে চিত্রায় স্থির সৌন্দর্যসাধনায় পরিণতি লাভ করেছে।

"সৌন্দর্য-প্রেরণার মধ্যে যে একটি নিরুদ্দেশ আকর্ষণের প্রবলতা আছে তা 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় তেমন পরিস্ফুট হয়নি। মানসীর 'মেঘদূত' কবিতায় এর প্রবলতা এবং 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় এই ব্যাকুলতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে।...'মেঘদূত' কবিতার উপসংহারের তীব্র আর্তিই এই কবিতার মর্মকথা। 'মেঘদূত' কবিতার অকারণ বিরহমূলক উপসংহারের পঙ্‌ক্তিগুলি এই :

> ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান —
> কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ॥
> কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ;
> কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।
> সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে
> মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
> রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে,
> জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।

এরই ব্যাখ্যায় 'মেঘদূত' গদ্যরচনায় কবি লিখলেন :

মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরাজ কবি [ম্যাথু আর্নল্ড] বলিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।'

উপরে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলিতে যে সুগভীর যে বেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে, তা একালের সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক সমস্ত কবিতাগুলির মধ্যেই সুলভ। 'সোনার তরী'তে এক অপরিচিত বিদেশিনী এসে কবির সৌন্দর্যবাসনা জাগরিত করে কবিকে তীব্র

বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ করে গেলেন। কবি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন মাত্র, তাঁর সঙ্গে সশরীরে মিলন ঘটল না। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোটো সে তরী' প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে এই তীব্র কাল্পনিক সৌন্দর্যবিরহই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।' 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'য় কবি যদিচ এক তরণীতে বিদেশিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন, এই চঞ্চলগামিনীর সঙ্গে নিজ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মিলন ঘটাতে পারলেন না কারণ, তা অসম্ভব। বিরহই এই প্রকৃতি, বিরহেই এই কল্পনার স্থিতি।...এই সময়ে কবিকে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'মানসী' কাব্যের মধ্যে 'একটা প্রবল despair ও resignation এর ভাব দেখেছিলেন' বলে জানিয়েছেন।

"যাই হোক, নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলির উপসংহারে কবির তীব্র বেদনা বিচ্ছুরিত হয়েছে। অর্থাৎ 'মেঘদূত' কবিতায় ঐ 'সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে' অথবা অন্য আর একটি কবিতায় 'নাই, নাই—কিছু নাই, শুধু অন্বেষণ' এই ভাবই 'সোনার তরী', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' প্রভৃতি কবিতায় সুপ্রকট।

কিন্তু সৌন্দর্যপ্রেরণামূলক কবিতাগুলির মধ্যে এ ছাড়া অন্যবিধ মিলও আছে যা থেকে এদের সগোত্রত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির বেদনার পশ্চাতে রয়েছে একটি ছায়াচ্ছন্ন মেঘালোকের, অথবা অস্ফুট উষার অথবা ধূসর সন্ধ্যার আধ আলো আধ অন্ধকার অস্পষ্ট প্রাকৃতিক পটভূমিকা। মেঘদূতের মতো সোনার তরী কবিতায়ও মেঘান্ধকার দিবসের বর্ণনা রয়েছে :

পর পারে দেখি আঁকা তরুছায়া মসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা প্রভাতবেলা।

'নিদ্রিতা' ও 'সুপ্তোত্থিতা' কবিতায়—

শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্বতটে হতেছে নিশিভোর

অথবা,—

একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার।

প্রভৃতির মধ্যে এই কুহেলিকাময় প্রকৃতির চিত্র রয়েছে। কিন্তু এ-বিষয়ে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'ই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতাটি ব্যাপ্ত করেছে সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যার রহস্যময় প্রাকৃতিক চিত্র। 'পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন অস্তাচলে' অথবা 'আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা' প্রভৃতি সন্ধ্যার বর্ণনার সঙ্গে কবিহৃদয়ের হতাশ্বাস সম্পূর্ণ মিলে গেছে। মানসসুন্দরীও কবির কাছে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে।...কখনো বা 'ঝিলিমিলি' আলোছায়া লয়ে বকুলতলায় অথবা 'নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে' এর আবির্ভাব। কবিতাগুলির অভ্যন্তরে সব কটিতেই বিদেশযাত্রার ও অপরিচিত বিদেশিনীর কথা আছে। তা ছাড়া, এই কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে স্বর্ণবর্ণের কল্পনা রয়েছে। আমাদের মনে হয়, স্বর্ণবর্ণই হল এই সময়কার বিশিষ্ট

সৌন্দর্যকল্পনার দ্যোতক কবি-মানসের সংকেত। কাব্যখানির নাম 'সোনারতরী', ঐ নামাঙ্কিত কবিতার ধানও সোনার। মানসসুন্দরী'তে :

সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; ঊষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ;

নিরুদ্দেশ যাত্রায় :

আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ-আলোক পড়িবে ঢাকা।

অথবা,- - তারি'পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি'পরে পড়ে সন্ধ্যা কিরণ।

'নিদ্রিতা'য় একটি ঘরে রত্নদীপ জ্বালা।

'মানসসুন্দরী' এবং 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পারস্পরিক সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ; 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় বিদেশিনীর সঙ্গে তরীতে যাত্রার যে কল্পনা বর্ণিত হয়েছে 'মানসসুন্দরীতেও তা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন :

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, ইত্যাদি।

আবার, 'অভয় আশ্বাসভরা নয়ন বিশাল হেরিয়া ভরসা পাই' এবং 'হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন কথা না বলে— উভয়ত্র একই কল্পনা। মোটের উপর সৌন্দর্য-সম্পর্কিত কবিতাগুলি কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেরণা ও কল্পনা বহন করছে যা দিয়ে অন্য কবিতা থেকে এদের অনায়াসে পৃথক করা যায়। এই বিশিষ্ট নিরুদ্দেশ কল্পনা পরবর্তী 'চিত্রা' কাব্যে স্থির সৌন্দর্যসাধনায় রূপান্তর লাভ করেছে।" [অধ্যাপক ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস]

'সোনার তরী' কাব্যের পরবর্তী কাব্যগুলিতে রোমাণ্টিক কাব্যকার শ্রীরবীন্দ্রের মনোভাব :

'সোনার তরী' থেকে 'চিত্রা'য় এসে পূর্বোক্ত রোমাণ্টিক ভাবব্যাকুলতাগুলি মোটামুটি একটা পরিণত অবস্থায় পেঁাচেছে। সোনার তরী-র নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-বিরহের তীব্রতা চিত্রায় কতকটা প্রশমিত হয়েছে বটে, কিন্তু কবির ব্যাকুলতার সমাপ্তি হয় নি। 'চিত্রা'র প্রথম কবিতাটিতে দেখা যায়, কবি সৌন্দর্যসত্তাকে দুরূপে দেখতে চান— একটি 'চঞ্চলগামিনী'র রূপে, আর এক, 'প্রশান্ত-হাসিনী'র রূপে। দ্বিতীয়োক্ত ধ্যানাবস্থায় সৌন্দর্যময়ীর নিম্নলিখিত রূপ ফুটে উঠেছে :

একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত-শয়নে,

একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে
চারিদিকে চিরযামিনী।

দেখা যায়, জ্যোৎস্নারাত্রে, পূর্ণিমা, উর্বশী প্রভৃতি কবিতায় সৌন্দর্যময়ীর বিচিত্র রূপ অঙ্কন করে কবি কতকটা তৃপ্তি লাভ করেছেন। এখানে সর্বত্র সৌন্দর্যময়ীর আবির্ভাবের পশ্চাতে পূর্ণিমা নিশীথিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 'চিত্রা' কাব্যে সোনার তরী-তে দৃষ্ট মর্তপ্রীতির গভীরতাও লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়া, 'চিত্রা'য় মর্তপ্রীতি বাস্তব-মানবপ্রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'এবার ফিরাও মোরে' নামক বিখ্যাত কবিতাটি কবির এই বাস্তব মানবপ্রীতি এবং দুঃখদুর্যোগের মধ্য দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পরিণামের পথে কবির অভিসারের অভিলাষ প্রকাশ করছে। এই দুর্গম বাস্তব পথে যাবার মুখে কবির জীবন-দেবতার বা নিজ গতিশীল ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি। জীবনদেবতা সম্পর্কে রচিত কয়েকটি কবিতায় কবি আত্মনিরীক্ষণ করেছেন বা নিজ self সম্পর্কে কবিত্বময় ধারণায় উপনীত হয়েছেন। কবি তাঁর সৌন্দর্য উপলব্ধি, বাস্তব জীবনবোধ ও কাব্যরচনা নিয়ে যে গতি ও পরিণামের পথের যাত্রী তা জীবন-দেবতা সম্পর্কিত কয়েকটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন। 'চিত্রা'র পর আর এইভাবে কবির আত্মনিরীক্ষণের প্রয়োজন হয় নি, জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী সম্বন্ধেও কবিতা রচনার তেমন অবকাশ ঘটে নি।

'চিত্রা-র' পর 'চৈতালি' কাব্যে পদ্মা ও পল্লীপ্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে। চৈতালি-তে কালিদাস ও তাঁর তপোবনপ্রীতি রবীন্দ্রনাথেও সংক্রমিত হয়েছে। কবি এখন থেকে ধীরে ধীরে সংস্কৃতসাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করছেন এবং 'কল্পনা' কাব্যে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রেম ও সৌন্দর্যের সারবস্তু নিজ ভাবে ও ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন। 'ক্ষণিকা'য় কবি ক্ষণিকতাবিলাসী হয়ে পড়েছেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ কবিকে ক্রমশ প্রচীন ভারতকে অবলম্বন করে অভিনব জাতীয়তার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছে। ফলে 'কথা ও কাহিনী'র চিত্ররূপময় অপূর্ব কবিতাগুলি আমরা পেয়েছি। অতঃপর কবি ধীরে ধীরে ভারতীয় জাতীয়ত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করে ভারতের ধর্মানুভূতির মধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং 'নৈবেদ্য কাব্যে ভারতীয় ধর্মাদর্শ প্রকাশ করে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন।

'নৈবেদ্য'র পর প্রকৃতিরসভাবুকতার মধ্য দিয়ে কবি অরূপানুভূতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করেছেন। 'উৎসর্গ' কাব্যে দেখা যায়, বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন আনন্দময় শুদ্ধ রসোপলব্ধির প্রতি কবির আগ্রহ, যেমন :

মোর কিছু ধন আছে সংসারে—
বাকি সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আমার আশার অতীত
ওগো কোথা তুমি পরশচকিত
কোথা গো স্বপন-বিহারী।

এই রসোপলব্ধি থেকে ক্রমশ কবি একটি কল্পিত সত্তাকে আহ্বান করতে পেরেছেন—'সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। 'খেয়া'তে স্পষ্টত রবীন্দ্রনাথ বাউলধর্মী মনোভাব নিয়ে জীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেছেন, বস্তুজগতের প্রয়োজন সম্পর্ক-ত্যাগের দ্বারা অরূপ উপলব্ধির তত্ত্ব বিবৃত করেছেন এবং প্রকৃতিরসভাবুকতা থেকে অরূপভাবুকতায় প্রয়াণ করতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের অরূপভাবুকতা প্রকৃতিভাবুকতা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কাব্যজীবনের প্রথম পর্বে 'মানসী 'সোনার তরী'-যুগে যে কল্পনামূলক মর্তভাববিহ্বলতা কবিকে চঞ্চল বিরহভাবনায় ব্যাকুল করেছে, তাই ধীরে ধীরে কবিকে অরূপরসলোকে নিয়ে গেছে। 'খেয়া' কাব্যের—

আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।

—প্রভৃতি পঙ্‌ক্তিতে নিসর্গসৌন্দর্যের মাধ্যমে আগত একটি সত্তার অনুভূতি কবির চিত্তে জাগ্রত হয়েছে, দেখা যায়। 'শারদোৎসবে'-এ এই অনুভূতি আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সেখানে শারদীয় প্রকৃতির রূপদর্শনে বিহ্বল কবি গেয়ে উঠেছেন:

আমার নয়ন-ভুলানো এলে
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

সেখানে সন্ন্যাসী ও বালকের একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে রূপের মধ্যে রূপাতীত, পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে অপার্থিব রহস্যময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন। 'গীতাঞ্জলি'-কাব্যখানিতেও অরূপ বার বার অনির্বচনীয় নিসর্গপ্রীতিরসের মধ্যে কবির মানসে আবির্ভূত হয়েছে।

কবি নিজের কাব্যজীবনের মধ্যভাগে যে অরূপরসলোকে প্রবেশ করলেন, এর মূল্য তাঁর কাব্যে অপরিসীম। অরূপভাবুকতার এই অধ্যায়টি তাঁর কাব্যপ্রবাহের বিচ্ছিন্ন একটি অধ্যায় নয়। এর সঙ্গে মানবীয়তাবোধ ও জীবনবোধ নিবিড়ভাবে যুক্ত রয়েছে, এবং তাঁকে পরিণামে জীবনসত্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে।

অরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমাদের প্রাচীন ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রের অনুভূত এই অরূপ প্রকৃতি ও জীবনের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত একটি লীলাময়—বিশুদ্ধ কাব্যরসলোকে আস্বাদ্য সত্তা বিশেষ—অতএব শাস্ত্রের বস্তু নহে, কাব্যোপলব্ধির বস্তু। রবীন্দ্রনাথের অরূপ-উপলব্ধির বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যেমন প্রাকৃতিক কমনীয়তার মধ্যে [যেমন শারদোৎসব] অরূপের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তেমনি, প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যেও। বরঞ্চ দুঃখ-দুর্যোগের মধ্যেই এই অরূপ তাঁর কাছে অধিকতর সত্যভাবে ধরা দিয়েছে। 'খেয়া'র 'আগমন' কবিতায় অরূপের এই দুঃখময় রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

বজ্র ডাকে শূন্যতলে, বিদ্যুতের ঝিলিক ঝলে,
ছিন্ন শয়ন টেনে এনে আঙিনা তোর সাজা।
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল দুঃখরাতের রাজা॥

প্রকৃতির ভয়ংকর রূপের মধ্যে কবি যার প্রকাশ দেখলেন, তাকে ক্রমশ মানুষের সর্ববিধ দুঃখবরণের প্রেরণা-রূপে লক্ষ্য করলেন। এরই ফলে একালে 'রাজা', 'ডাকঘর' প্রভৃতি নাটক রচিত হল এবং 'গীতাঞ্জলি.' 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র সর্বনাশকে নির্ভয়ে বরণ করা, মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং অজানার পথে ছুটে চলার বাণী প্রকাশিত হল। অরূপকে অবলম্বন করে কবি মানুষ সত্য—এই দৃঢ় ধারণায়ও উপনীত হলেন, এবং এরই ফলে 'গীতাঞ্জলি'র বিখ্যাত মানবপ্রীতিবিষয়ক কবিতাগুলি ['হে মোর চিত্ত', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' প্রভৃতি কবিতা] যেমন রচিত হল, তেমনি, 'অচলায়তন-এ মানবসত্যবিরোধী কুসংস্কারের প্রতি তীব্র বিদ্রোহ জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ অরূপ রসে নিমগ্ন হয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক মনোভাবের কবিরূপে দেখা দিলেন।

'গীতাঞ্জলি' 'বলাকা'য় ও 'ফাল্গুনী' নাট্যে রবীন্দ্রনাথ কুসংস্কারমুক্তি এবং জীবনের অবিরাম চলার কথা প্রকাশ করলেন। 'গীতালি'র 'যাত্রী' কবিতায় কবির দুঃখ-বরণের উৎসাহ সম্যক প্রকাশ পেয়েছে এবং 'বলাকা' ও 'ফাল্গুনী'তে মৃত্যুর দ্বারা নবায়মান, জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া সর্বদা অগ্রসরণশীল, জীবনকেই কবি যথার্থ জীবন বলে মনে করেছেন। মনে রাখতে হবে, কবির প্রথম-জীবনের সুদূরাভিলাষী রোমাণ্টিক কবিচিত্ত এবং ভয়ংকর-সুন্দর অপরূপের ভাবুকতাই কবিকে ধীরে ধীরে এই বৈরাগ্যময় জীবনবোধে প্রবর্তিত করেছে। নিজের অনুভূতিতে গতির সুর উপলব্ধি করে কবি বিশ্বের সৃষ্টির মধ্যে এই গতির স্পন্দন লক্ষ্য করলেন এবং এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসকে সত্যরূপে গ্রহণ করে বললেন :

ওগো নটী চঞ্চল অপ্সরী
অলক্ষ্য সুন্দরী
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যু-স্নানে বিশ্বের জীবন।

'বলাকা,' 'ফাল্গুনী' ও 'গীতালি'তে যে জীবনভাবুকতা প্রকাশ পেয়েছে ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁর দর্শনের তুল্য হলেও কবি এই দর্শনের তত্ত্বকে অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করেন নি, নিজ অনুভূতির উপরে নির্ভর করে কাব্যই লিখেছেন। 'বলাকা' কবিতার 'হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোথা অন্য কোনোখানে—এটা তত্ত্বের অনুবাদ নয় কবিহৃদয়ের উপলব্ধ একটি সত্য। সেইজন্য 'বলাকা'র রচনার পশ্চাতে 'রাজা' 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির বিশিষ্ট অরূপ ভাবুকতার কথা চিন্তা করতে হবে। কবি যে-অনুভূতির বলে :

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার, ভেসে যাবার ভাঙবারই আনন্দে রে।

অথবা,

আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,

তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়।

এরূপ উক্তি করতে পারেন, তার কথা চিন্তা করতে হবে এবং 'চঞ্চলা' কবিতার ঃ

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

প্রভৃতি উপলব্ধির সঙ্গে 'সোনার তরী' কাব্যের 'বসুন্ধরা'র কাল্পনিক ও আশ্চর্য জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের কথাটি অন্বিত করে দেখতে হবে।

'ফাল্গুনী ও গীতিরসময় ঋতুনাট্যগুলিতে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি-রসাশ্রিত মুক্ত জীবনই যথার্থ জীবন। ঋতুপর্যায়ের আবর্তনের সঙ্গে নটরাজের লীলার সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে পারলেই লৌকিক বন্ধন থেকে মুক্তিজনিত আনন্দলাভ করা যায়।

'বলাকা' রচনার পর 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নামক বিশিষ্ট দুটি নাটকে সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে প্রকটিত অমানবীয় ভাবের উপর কবির বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায়, এবং তখন থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত লেখা কাব্যে কখনো পৃথিবীপ্রীতি, কখনো মানবপ্রীতি, কখনো গতিশীল জীবনের প্রতি আগ্রহ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বোঝার জন্য 'সোনার তরী-পর্বে'র অতিপ্রবল সুদূরগামী রোমান্টিক অনুভূতির স্বরূপ সম্যকরূপে হৃদয়ংগম করতে হবে। যে কল্পনার বলে তিনি বসুন্ধরার সহিত নিগূঢ় আত্মীয়তার কথা ব্যক্ত করেছেন ও অপ্রাপনীয় সৌন্দর্যের পশ্চাতে ধাবমান হয়েছেন তার সঙ্গে তাঁর অরূপ ও অরূপমিশ্রিত জীবনকল্পনা, প্রকৃতিলীলার মধ্যবর্তী নটরাজের বাম ও দক্ষিণ পদক্ষেপ মিলিয়ে নিতে হবে।

'সোনার তরী'-কাব্যপাঠের স্বল্পাক্ষর ভূমিকা ঃ

মানসী-র পর 'সোনার তরী'র আত্মপ্রকাশ—মাঝখানে পনেরো মাসের ব্যবধান। এই কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলি লিখিত হয় ১২৯৮ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণের মধ্যে। কবির বয়স তখন ত্রিশ হইতে বত্রিশ বছর।

'মানসী' কাব্যের শেষাংশ রচনার সময় থেকেই কবির চিত্তে নিরুদ্দেশ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ তীব্র হচ্ছিল, বসুন্ধরার সহিত মিলনের ব্যাকুলতাও দেখা গিয়েছিল। এই দুই বিভিন্ন মনোভাব 'সোনার তরী'তে অতিশয় প্রবল হয়ে প্রকাশলাভ করল।

বাহিরের ঘটনা-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পদ্মাতীরে বাস তাঁর এই সময়কার কবিমানস এবং পরবর্তী কাব্যজীবনকে অনেকখানি নিয়মিত বা প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন ১৮৯০ এর আগস্ট মাসে। 'বিলাত থেকে ফিরবার কয়েক মাসের মধ্যে তাঁকে জমিদারির কার্যভার গ্রহণ করে উত্তরবঙ্গে যাত্রা করতে হল।...জীবনের দিক থেকে এই ঘটনাটি খুবই বড়ো। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিশিয়ে এমন নিবিড়ভাবে পাবার সুযোগ ইতঃপূর্বে হয় নি। প্রকৃতি ও মানুষে মিলে বিশ্বের সৃষ্টি সৌন্দর্য সম্পূর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকে প্রকৃতিকে জেনেছেন, কিন্তু মানুষকে নিবিড়ভাবে পাবার সুযোগ লাভ করেন নি। জমিদারি পরিদর্শন ও পরিচালনা করতে এসে তিনি হাসিকান্না সুখদুঃখভরা মানুষকে দেখতে পেলেন। উত্তরবঙ্গে বাস করতে এসে বাঙলার অন্তরের সঙ্গে তাঁর যোগ হল...পদ্মা তাঁর কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি নূতন সৌন্দর্য দান করল।' বস্তুত, পদ্মাই কবির নিবিড় প্রকৃতিপ্রীতি ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য-ভাবনাকে পূর্ণভাবে স্ফুরিত করে একটি পরিণামের পথে নিয়ে গেছে। রবীন্দ্রকবিজীবনে পদ্মানদী ও বোলপুর-শান্তিনিকেতনের প্রভাব অসামান্য। 'সোনার তরী' রচিত হওয়ার বহুকাল পরে এই গ্রন্থখানির সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে কবি লিখেছেন :

"বাঙলাদেশের নদীতে-গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নূতনত্ব চলন্ত বৈচিত্রের নূতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাঙলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ—তার ভাষা চিনি, তার সুর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দর মহলে, আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে যে উদ্বোধন তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়। সে-ধারা আজো থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম।

আমি শীত গ্রীষ্ম-বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বৎসর ধরে পদ্মার আতিথ্য নিয়েছি—বৈশাখের খর রৌদ্রতাপে, শ্রাবণের মুষলধারাবর্ষণে। পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের ছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারায় বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি। সেই সংকল্পের সূত্র আজো বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হলো আমার জীবনে। আমার বুদ্ধি, কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল সোনার তরীতে।—ইত্যাদি

মানবী-প্রেয়সীকে মানুষ যেমন করে ভালোবাসে পদ্মার প্রতি রবীন্দ্রের ভালোবাসা অনেকটা তদ্রূপ—নদীকে কবি প্রায় ব্যক্তিরূপেই দেখেছিলেন। 'সোনার তরী'র কবিতাগুচ্ছের অনেকগুলি কবিতা এহেন পদ্মার তীরে বসে লেখা। এই পদ্মাবাসকালে রবীন্দ্রনাথ উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির অবারিত প্রসন্নতার সান্নিধ্যে এসেছিলেন. লোকালয়ের মধুময় স্পর্শ লাভ করেছিলেন। নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবসংসারের এতখানি নিকট-সংস্পর্শে এর পূর্বে কবি কখনো আসেন নি। "সোনার তরী'র চিত্ররূপময় কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, পদ্মানদীর সংগীতমুখর কলধ্বনি এবং নদীর উপরে ভাসমান উড়ন্ত মেঘের মায়ামধুরিমা দিয়েই ওইসব রচনা তৈরী হয়েছে। যেন পদ্মার বুকের বাণীই কবির মনকে এমন উচ্ছ্বসিত, এমন অনর্গল করে তুলেছ, যেন এই তটিনী পদ্মাই তাঁর ছন্দে মিশিয়ে দিয়েছে আপনার অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমা। বাঙলার পল্লীপ্রকৃতির অজস্র সরস শ্যামলিমা 'সোনার তরী'র স্তরে স্তরে সঞ্চিত। চিত্রগৌরবে এবং ধ্বনিলাবণ্যে এই কাব্যখানি সত্যই অসাধারণ।

প্রকৃতির সংসার ও মানবসংসারকে কবি এমন নিবিড়ভাবে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারতেন না, যদি না তিনি পদ্মার আতিথ্য গ্রহণ করতেন। নিসর্গসৌন্দর্যের স্বপ্নলোক আর মর্তজীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার বহু-বিচিত্র আলিম্পন—'সোনার তরী'তে উভয়েরই স্বচ্ছ বিম্বন আমরা দেখতে পাই। মৃত্তিকার বুকে মানুষ বেঁধেছে তার ক্ষণকালের নীড়, সেই নীড়ের চতুস্পার্শ্বে রূপময়ী প্রকৃতি ছড়িয়ে রেখেছে অফুরন্ত আনন্দ-সৌন্দর্যের পসরা। মানুষে-প্রকৃতিতে মিলে কী সুন্দর এই জীবন! চোখ দিয়ে দেখে নিতে পারলে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলে ওই জীবনের উৎসমূলে আনন্দের চিরন্তনী নির্ঝরিণীর সাক্ষাৎ মেলে। এর সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন, 'সোনার তরী'র কবিতাগুলির মধ্যে তার পরিচয় আছে। নিসর্গসৌন্দর্যের মধু-মদিরা পান করে কবি কখনো অসীমের দিকে স্বপ্নাভিসার করেছেন, বাস্তবসংসারের কোলাহলকে বহুদূর পিছনে ফেলে রেখেছেন, কখনো মানবজীবনের প্রতি প্রবল অনুরাগের বশে একেবারে মাটির ধূলার উপরে স্থির হয়ে বসেছেন। কখনো তিনি যথার্থ এই বাস্তব পৃথিবীর কবি কখনো এক অবাস্তবমনোরম স্বপ্নজগতের অধিবাসী। একদিকে 'মানবসুন্দরী,' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা,' 'সোনার তরী' প্রভৃতি কবিতায় অপরদিকে 'যেতে নাহি দিব,' 'পরশ পাথর,' 'বৈষ্ণব কবিতা' ইত্যাদি রচনায় প্রকৃতিপ্রীতি, মানবপ্রীতি ও সৌন্দর্যপ্রীতি অজস্রধারায় উৎসারিত হয়েছে। প্রগাঢ় জীবনাসক্তি এবং দুর্নিবার সৌন্দর্যপিপাসাসঞ্জাত রোম্যান্টিক কল্পনাবিহার, উভয় সুরই পাশাপাশি এতে বেজেছে। এ-দুটি সুর পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একে অন্যের সম্পূর্ণতার সহায়ক। এ প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

"আমি সত্য বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ-বিরহমিলন-পূর্ণ ভালোবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ-আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয়, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয় উদাসীন গৃহত্যাগী, নিরাকারের অভিমুখী ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয়, সাকারে জড়িত...। স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতায়, আর এক জন অসম্পূর্ণের দ্বার অভিমুখী। যে ভালোবাসে সে অভাব-দুঃখ পীড়িত মানুষকে ভালোবাসে.

সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক, আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী তার অনন্ত তৃষ্ণা মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে—অপূর্ণ এবং পূর্ণ– যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।

রবীন্দ্রকাব্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন উপরে কথিত দুইটি ধারাই শ্রীরবীন্দ্রের সমস্ত কাব্যসৃষ্টিতে ওতপ্রোত হয়ে আছে। বাস্তবজীবনপিপাসা এবং সৌন্দর্য তৃষ্ণার নিরন্তর দ্বন্দ্ব কবি প্রতিভাকে একটি বিশেষ পরিণামের অভিমুখে অগ্রসর করে দিয়েছে। প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশের কালে এই মানসিকদ্বন্দ্ব থেকে কবি কিছুটা মুক্তি পেয়েছিলেন।

সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও জীবনতৃষ্ণা উভয়ই রবীন্দ্রনাথে প্রবল। প্রথমটির প্রেরণায় 'সোনার তরী'র কবি আমাদের এই মৃত্তিকার সংসার থেকে এক অমর্তলোকে উধাও হয়ে গেছেন। সে এক স্বতন্ত্র জগৎ—সম্পূর্ণ কল্পনার সৃষ্টি। সেই দূর স্বর্গে উঠে গিয়ে কবি মাটির পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন, মৃত্তিকার উপর ছড়িয়ে দিয়েছেন সোনার কল্পনার মুঠোমুঠো আবির কুমকুম—লৌকিক সংসার মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে নয়নাভিরাম রহস্যময় স্বপ্নমূর্তি ধারণ করেছে। এই স্বপ্নের দেশে সোনার তরীর নেয়ের সঙ্গে আচম্বিতে কবির সাক্ষাৎকার ঘটে, এখানে অপরিচিতা রূপসী বিদেশিনী তার নিরুদ্দেশ যাত্রার সঙ্গিনী। অর্ধ পরিচয়ের রহস্যময়তা এক অলৌকিক সত্তার চকিত স্পর্শজনিত পুলকমিশ্র অনুভূতি, সেই সত্তার কাছে আত্মনিবেদনের আকুতি, প্রকৃতির অন্তরবাসিনী সৌন্দর্যস্বরূপিণীকে প্রেমে বাঁধবার আকুল আগ্রহ এই কবিতাগুলির প্রতিটি ছত্রে স্পন্দিত হয়েছে। 'সোনার তরী'তে যে কবিমানস দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে উঠছে, কবি-আত্মার পূর্ণ জাগরণ ঘটছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

জীবনীশক্তির প্রেরণায় যে কবিতাগুলির উদ্ভব রূপরসের বৈচিত্র্যে ও বাণীবৈচিত্র্যে সেগুলিও কবির নির্বারিত প্রাণোল্লাসের পরিচয় দিয়েছে। মানবহৃদয়ের মাধুর্য কবিকে মুগ্ধ করেছে মনুষ্যজীবনের সুখদুঃখের আলোছায়ার খেলার প্রতি তিনি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। মানবের স্নেহ-প্রীতি-প্রেম ভালোবাসার আন্দোলনে কবিচিত্ত সতত আন্দোলিত। এই প্রবল জীবন-অনুরাগের পরিচয় সবচেয়ে বেশী ফুটেছে 'যেতে নাহি দিব', কবিতাটিতে। স্নেহপ্রেমের রসে এই জীবন কত মধুর অথচ ইহার নশ্বরতাও অবশ্যস্বীকার্য। আমরা আমাদের প্রিয়জনকে চিরকাল নিজেদের কাছে ধরে রাখতে চাই, কিন্তু পারি না ; বলি—যেতে নাহি দিব, কিন্তু হায় তবু যেতে দিতে হয়—সকলেই তো একে একে চলে যায়, অন্তর বিমথিত করে বের হয়ে আসে কেবল একটি সকরুণ দীর্ঘশ্বাস। তথাপি মনুষ্যহৃদয়ে প্রেমের আকর্ষণ প্রবল তা উচ্চকণ্ঠে মৃত্যুকে—সৃষ্টির অমোঘ নিয়তিকে—অস্বীকার করতে চায়। মানবহৃদয়ের সুতীব্র হাহাকার প্রকৃতির সংসারকেও কারুণ্যে অভিষিক্ত করে—প্রেম স্নেহের দুর্বলতা যে অন্তর ধর্ম—এক পরম বেদনার সম্পর্কে দুইটি সংসারই যেন নিবিড়ভাবে কবিতাটির করুণ মধুর রস সর্বজনের উপভোগ্য।

প্রকৃতির প্রেমে ও মানুষের প্রেমে কবি ধন্য। এই লৌকিক সংসারেই অখণ্ড অনির্বচনীয় আনন্দ লভ্য, স্পর্শে জীবন সোনা হয়ে যায়—তখনই রূপ ধরে মহানন্দময়

মুক্তির। সুতরাং পরশ পাথর-এর সন্ধানে সংসার ছেড়ে যাবার কোনো প্রয়োজন হয় না। সংসারকে উপেক্ষা করলে মানবিক সত্যকে অস্বীকার করলে জীবন ব্যর্থতায় ভরে উঠতে বাধ্য। বাস্তবকে পরিহার করে যারা আদর্শের পিছনে ঘুরে বেড়ায় পরিণামে তারা পায় বিরাট শূন্যতা। 'বৈষ্ণব কবিতা'র মধ্যে এই জীবনপ্রীতি, এই মানবিকতার সুরটি বেজেছে। মানবীয় প্রেম ও অধ্যাত্ম-প্রেমকে কবি স্বতন্ত্র করে দেখতে পারেন নি। কবির দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো ভেদ নেই। মানবপ্রেম যখন অনন্তস্বরূপতা লাভ করে তখন তা আধ্যাত্মিক হয়ে ওঠে। পার্থিব প্রেমের মধ্যে অসীমের রহস্য লুকানো রয়েছে। যেখানে অসীমতার উপলব্ধি সেখানেই অপরূপ সুন্দর ঈশ্বরের আবির্ভাব। সুতরাং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে যে প্রেমের মালিকা আমরা প্রিয়জনের কণ্ঠে দোলাই আমাদের অজ্ঞাতসারে তাই পূজার ফুল হয়ে লীলার সময় ভগবানের চরণে গিয়ে পৌঁছোয়। প্রেম এবং সৌন্দর্যই স্বর্গমর্ত্যের মধ্যে সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। কবি রবীন্দ্রের মানবিকতা ও মর্ত্যমমতা মাটির মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করেছে, ফলে প্রেম আর পূজার মধ্যে সমস্ত পার্থক্য ঘুচে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক কবিমানস ও কবিস্বপ্নের আশ্চর্যসুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাই তিনটি কবিতায়—'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'পুরস্কার'। ভাবনা-কল্পনার ঐশ্বর্যে ও প্রকাশভঙ্গির চমৎকারিত্বে এ কয়টি কবিতা অত্যুজ্জ্বল মণির মতো ঝলমল করছে। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির রসপরিণাম বিষয়ে কোনো কোনো পাঠকের হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু রসোত্তীর্ণ শিল্পসৃষ্টি হিসাবে 'বসুন্ধরা' ও 'পুরস্কার' নিঃসন্দেহে অনবদ্য। কবিহৃদয়ের এমন অবাধ উৎসার প্রকৃতির রূপরস সম্ভোগের এমন সুতীব্র অভিলাষ বিশ্বসৃষ্টির অনন্ত রূপপ্রবাহকে বিপুল এক মহাসংগীতে তর্জমা করে তাকে উৎকর্ণ হয়ে শুনবার অধীরতা, সর্বানুভূতির এমন কাব্যময় প্রকাশ এতখানি গীতরসবিহ্বলতা কবির খুব কম রচনাতেই লক্ষিত হয়। উপরে কথিত তিনটি কবিতার ভিতর দিয়ে এক অভিনব বিশ্বাত্মবোধের পরিচয় ঘটেছে। এই নূতন বিশ্ববোধ বা সর্বানুভূতির মূলে রয়েছে কবির নিবিড় প্রকৃতিপ্রেম।

'বসুন্ধরা' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা-দুটিতে প্রকৃতির সঙ্গে কবির জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তা সম্পর্কের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতিকে যে কবি এতখানি ভালবাসেন তার কারণ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর 'অন্তর্গূঢ় নড়াচলচলের যোগ' রয়েছে। সমুদ্রের জঠরদেশ থেকে পৃথিবী যখনো নিষ্ক্রান্ত হয় নি, তখনো সেই ভ্রূণরূপী পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কবি সমুদ্রমাতার অঙ্গীভূত ছিলেন। তাই তো সমুদ্রের অস্ফুট ভাষা তিনি বুঝতে পারেন, সেজন্যই তো বিশ্বপ্রকৃতি মনকে এমন ভাবে আকর্ষণ করে। প্রকৃতিতান্ত্রিক কবি প্রকৃতিকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে এক নূতন অদ্বৈতবাদে পৌঁছেছেন—নিসর্গের সত্তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে তিনি অভিন্ন মনে করেন। রোম্যান্টিক কল্পনাপ্রসূত এই অদ্বৈতবাদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে লক্ষনীয় বিশিষ্টতা দান করেছে। মর্তপ্রীতির অজস্র উচ্ছ্বলনে, রবীন্দ্র কবিধর্মের নির্বাধ প্রকাশে, সাংগীতিক প্রেরণার যাদুময় স্পর্শে 'পুরস্কার' অনির্বচনীয় চারুতা লাভ করেছে। আজন্ম শিল্পী রবীন্দ্রনাথের কাব্যমন্ত্রকে চিনে নিতে হলে সকলকেই এই কবিতাটির

প্রভৃতি দুটি নিবন্ধ করতে হবে। 'পুরস্কার' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি. সোনার তরীর উত্তম একটি কবিতা।

'বর্ষাযাপন' কবিতায় বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক কাব্যভাবনার বিশিষ্ট পরিচয় মেলে। এতে বর্ষাপ্রকৃতির চিত্ররূপ ও ভাবময় রূপ উভয়েরই চিত্তহারী বর্ণনা আছে। প্রকৃতিলোকের বর্ষা কবিচিত্তকে যে শুধু পুলকিত করে তা নয় তা অন্তরলোকেও রস-বর্ষার উদ্বোধন ঘটায় এবং কল্পনাকে অতীতচারী করে তোলে, হৃদয়ে স্বপ্নবিধুরতার সৃষ্টি করে। 'দুই পাখী' কবিতাটিতেও কবির রোমান্টিক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। নিজের ক্ষুদ্র অহং-এর গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বের উদার বিশাল প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়ে মুক্তির অসীম আনন্দ-আস্বাদনের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বর্তমান—একটি বদ্ধ, অপরটি মুক্ত। উভয়ের সমন্বয়েই মানবজীবনের সম্পূর্ণতা—দুই পাখিতে এরূপ একটি ভাবসত্য কবি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। এই ভাবসত্যটি কবির পরবর্তী কালের রচনায় সীমা ও অসীমের মিলনতত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। 'সোনার তরীর' আর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 'ঝুলন'। তত্ত্বাশ্রয়ী হলেও এর অন্তর্লীন রসের আবেদন সর্বজনীন। কেবল আরাম, কেবল সুখসম্ভোগ আর বিলাস-আলস্যে আমাদের অন্তরতর প্রাণসত্তা অসাড় হয়ে পড়ে তখন প্রাণবধূকে নিবিড়ভাবে আর আমরা পাই না। এরূপ অবস্থায় দুঃখবেদনার প্রবল আঘাতে তাকে উদ্বোধিত করা হয়। এই আঘাত সংঘাতের প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে কবির বড়ো-জীবনে জেগে ওঠবার আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে 'ঝুলন' কবিতাটিতে। 'শৈশবসন্ধ্যায়' দেখতে পাই সান্ধ্যপ্রকৃতির দূরবিস্তার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কবি মানবজীবনে নিরবিচ্ছিন্ন গতির আভাস পেয়েছেন। কবির নিজের শৈশব মহাকালের মহাপ্রান্তরে হারিয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে শৈশব বিদায় নেয় নি তাই, এ সংসারে জীবনের সরল আনন্দময়তা অদ্যাবধি তেমনি সজীব রয়েছে।

পার্থিব প্রেম ও নিসর্গসৌন্দর্যের রসতৃষ্ণা কবির মধ্যে কতখানি প্রবল হয়ে উঠেছে 'সোনার তরী'র কবিতাগুচ্ছ পাঠ করিলে তা সহজে অনুভূত হয়। জগৎব্যাপী অফুরন্ত প্রাণের লীলা দেখে কবি বিস্মিত ও বিহ্বল হয়েছেন। সেই প্রাণ-সৌন্দর্য প্রেমে নিরন্তর বিকিরিত হচ্ছে, বিপুল সংগীত রাগিণীর মধ্যে দিয়ে নিত্য প্রকাশ লাভ করছে। মানবসংসার ও প্রকৃতির সংসারে প্রবেশ করে কবি যে প্রেমের মাধুর্য ও সৌন্দর্য আহরণ করেছেন, এই কাব্যখানির প্রত্যেকটি কবিতার বাণীদেহ থেকে তা বিচ্ছুরিত হয়ে পাঠকচিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। রবীন্দ্র-কবির হৃদয়কৃতি এখানে অনিরুদ্ধ সংগীত প্রবাহে ভেসে চলেছে, বিচিত্র রূপের চমক জাগিয়েছে, মাঝে মাঝে ক্ষণসুন্দর চিরসুন্দরের চকিত আভাস দিয়েছে।

কবির অবস্থান যে এখন রসচৈতন্যলোকে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। কবিশক্তির বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে বলেই 'সোনার তরীর' কবিতাগুলি এমন অপূর্ব রূপশ্রী ধারণ করেছে। এমন হৃদয়োল্লাস এমন রসাবেশ এমন অকপট আত্মপ্রকাশ সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে বড়ো বেশি চোখে পড়ে না। 'সোনার তরী' 'চিত্রার' জীবনে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ কবি। এখানে তেমন কোনো তাত্ত্বিক ভাবনা নেই, চিত্তের দ্বন্দ্ব নেই।

সৌন্দর্যপিপাসু কবির দৃষ্টি এখানে যথার্থ একমুখী। রসের নিবিড় আবেশে কবি রূপকে কখনো সুরে ধ্যান করেছেন, সুরকে কখনো রূপের সীমায় বেঁধেছেন। রবীন্দ্রকাব্য যে মূলত সংগীতাত্মক, 'সোনার তরী'র প্রায় কবিতার মধ্যে তার সাক্ষ্য আছে।

এই কাব্যে কবির কল্পনার বিশালতা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি, লক্ষণীয় ছন্দের উপরে তাঁহার বিস্ময়কর আধিপত্য বিস্তার। নব-নব ছন্দ উদ্ভাবনে কবির উৎসাহ অক্লান্ত। মাত্রিক ছন্দ ও বিজোড় মাত্রার ছন্দের প্রয়োগে সাফল্য তাঁর অসামান্য। আমাদের বিশ্বাস, মানসী ও সোনার তরীর পর রবীন্দ্রনাথ তেমন উল্লেখনীয় কোনো নূতন ছন্দ [বলাকার মুক্তবন্ধ ছন্দ এবং আরো পরবর্তীকালের গদ্যছন্দ ছাড়া] আবিষ্কার করেননি, পুরানো ছন্দকেই নূতন রূপ দিয়েছেন মাত্র। অবশ্য পুরাতনকে নূতনের বেশে সজ্জিত করাও, এক রকমের সৃষ্টিক্রিয়া যা অবশ্যই প্রশংসাই। ভাবনা কল্পনা ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকে বিচারে সোনার তরীকে রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ কবিপ্রতিভার উজ্জ্বল জয়স্তম্ভ বলা যেতে পারে। এই সোনারতরীর গতি কখনো সুখদুঃখ আনন্দ বেদনায় আন্দোলিত মানবসংসারের দিকে কখনো অলক্ষ্য বাস্তবাতিশায়ী সৌন্দর্যের স্বর্ণদিগন্তের অভিমুখে। কবির সুবর্ণতরণীর নেয়ে অপরিচিতা, বিদেশিনী হলেও আমরা ওই নাবিকাকে চিনি—বিশ্বায়ত ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্যসত্তাই হল তা একমাত্র পরিচয়।

সোনার তরী---নাম কবিতা

ভূমিকা : শ্রদ্ধেয় কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন যে আলোচ্যমান কবিতার প্রথম অংশে কবিজীবনের একটা সংকট লগ্ন একটি চিত্রের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে। কবিমানসের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেছেন :

"এই কবিতা রচিত হইয়াছিল কবিজীবনের একটি বিশেষ লগ্নে—তখন মনে আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্ব জাগিয়াছে। সে অবস্থা এইরূপ : জীবনের রঙ্গভূমি হইতে দূরে বাস করিয়া, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নির্জনে তিনি এতদিন ধরিয়া কবিতার যে ফসল উৎপন্ন করিয়াছেন সেই ফসল এক্ষণে পাকিয়াছে, এবং একটা কবি জীবনের পক্ষে তাহা অল্প নহে। এই 'সোনার তরী' কাব্যেই একাধিক কবিতায় কবির কাব্যকল্পনার অসীমতা এবং তজ্জন্য ক্লান্তিবোধ ও সমাপ্তি-বাসনা আছে। এখন সেই মানব সংসারে ফিরিয়া সেইখানে বাস করিবার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়াছে—কিন্তু ওই সোনার ধানগুলির কী হইবে? কে-বা তাঁহাকে সেই 'বাঁকাজল' বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষেতখানি হইতে ওপরের গ্রামে পৌঁছাইয়া দিবে?

এই যে মনোভাব এবং তাহার ফলে ওই আকাঙ্ক্ষা, ইহার খুব সহজ ব্যাখ্যা কবির সেই কালের অন্তর-ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই' হইতে 'এবার ফিরাও মোরে' পর্যন্ত কবির ওই কামনা যে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অন্তত মাঝে মাঝে তাঁহাকে উন্মনা করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। তারপর 'কড়ি ও কোমল' 'মানসী' এবং 'সোনার তরী'র কাব্যধারায় একটা ক্রমপরিণতি ও পূর্ণতার লক্ষণ আছে,—সে বিষয়ে কবিও আত্মমানসে আশ্বস্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার অপর দিকও আছে।

...'সোনার তরী'তে অর্থাৎ কালজয়ী যশের তরণীতে তাঁহার কবিতাও স্থান পাইবে—এ ভরসাও যেমন আছে, তেমনি অপরদিকে 'গগনে গরজে মেঘ' এবং চারিদিকে বাঁকাজল' কবিকে বড়ই নিরুৎসাহ করিয়াছে।

...এ পর্যন্ত কবিতার যে ব্যাখ্যা তাহা কবির বাহিরের জীবন হইতেই আমরা নির্ণয় করিতে পারি। ইহার পরে যে ঘটনা উহাতে বর্ণিত হইয়াছে তাহা কবির নিজ-অন্তরের ইতিহাস। সেই অবস্থায় কবি স্বপ্ন দেখিতেছেন—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Reverie—'সোনার তরী' বাহিয়া ওই যে পুরুষটিকে আসিতে দেখিতেছেন এবং 'দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে'—উনি তাঁহার অন্তরের সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—যিনি কখনো নারী কখনো পুরুষ রূপে কবির হৃদয়াসনে বসিয়া তাঁহার সমগ্র কবিচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ ও কাব্যরচনায় প্রাণিত করেন। এই দেবতাকেই কবি তাঁহার কবি-জীবনের আদি হইতে কখনো ভিতরে কখনো বাহিরে বরণ ও বন্দনা করিয়াছেন। আজ তাঁহাকেই তিনি ওই নূতনরূপে—যাহা তাঁহারই দান তাহারই গ্রহীতারূপে—দেখিতে পাইলেন।

ওই অকালবৈরাগ্য ও অবসাদের অবস্থায় তিনি যখন তাঁহার সেই কর্ম হইতে

অবসর লইতে এবং সেই বহুযত্ন ও বহুসাধনায় পরিপক্ব কাব্য-ফসলগুলি কাহারো জিম্মায় রাখিয়া যাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন, তখন স্বপ্নে সেই বাসনা যতটুকু যেভাবে পূর্ণ হইতে দেখিলেন, তাহা একটি চমৎকার নাটকীয় ভঙ্গী ধারণ করিয়াছে। নাটকীয় এইজন্য যে, উহাতে কবির যেন কোন অভিপ্রায় বা সজ্ঞান প্রেরণা নাই—তাহার অর্থ তিনি নিজেও সবটা বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ় ও নিরাশ্বস্ত হইয়াছেন। কবিতাটির ওই অংশ এই কারণেই হেঁয়ালির মতো…। তাহাতে যে গৌরবময় সিদ্ধিলাভের ইঙ্গিত আছে, তাহা যেন কবিরও অজ্ঞাতসারে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে।… স্বপ্নের এই অংশে কবির আত্মাভিমান চরিতার্থ হইয়াছে। তারপর সেই স্বর্ণ তরণীর কর্ণধাররূপী কবির অন্তর পুরুষ তাঁহার অপর কামনা পূর্ণ করিলেন না—সেই তরীতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে সেই ফসলের ক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিলেন না। সেই পুরুষ কবিকে, যে অভিপ্রায়তেই হোক, ওই যে উদ্ধার করিলেন না, তাহার অর্থ, তিনি তাঁহাকে ছুটি দিলেন না। প্রকারান্তরে জানাইয়া গেলেন যে, এখনো ওই ক্ষেত্রখানিতে তাঁকে বহুতর ও মহার্ঘতর ফসল ফলাইতে হইবে—এখনি ছুটি কোথায়? কবিকে সেই পুরুষ যেন বলিয়া গেলেন :

'Say not now thy task is ended,
Sing the lovely, Pure and true,
Sing until thy song is blended
With the sing for ever new.'

কবি তখন বুঝিতে না পারিয়া ওই যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন :

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

—ওই মোহ, ভবিষ্যৎ গৌরবের এতবড় ইঙ্গিত সত্ত্বেও, সাময়িক হৃদয়-বৈকল্যের ওই বিমূঢ়তা—কী সুন্দর হইয়াছে! এই কবিতায় যাহার গূঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে, কবি যেন তাহা নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রকাশ করিয়াছেন।"

* * *

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে মোহিতলাল রবীন্দ্রের তৎকালীন মানসসংকটের আলোকে এই কবিতাটির ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হ'য়ে শেষপর্যন্ত 'জীবন দেবতা'র অবতারণা না ক'রে পারেন নি।

কিন্তু জীবন দেবতাতত্ত্ব আরোপ না করেও কবিতাটির সুসংগত একটি অর্থ আবিষ্কার কঠিন কাজ নয়। বলা বাহুল্য, এই কবিতাটি সৌন্দর্যস্বপ্নাতুর কবি রবীন্দ্রের কমনীয় একটি সোনার স্বপ্ন—'মেঘদূত'-এর কবি কালিদাসের অলকাস্বপ্নের মতো। এর মূল সুর সৌন্দর্যবিরহ; দুর্লভ সুদূরের জন্য একটা নিঃসীম আর্তি এতে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটিতে কবি ভাবলোক-বিহারী বিদেহী সৌন্দর্য দেবতার কাছে প্রেমাবেশে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করেছেন। বর্ষার দিন, আকাশে মেঘ ডাকছে, নদী কূলে কূলে পূর্ণ, নদীতীরে 'একখানি ছোট ক্ষেত'-এ কবি আছেন। সেই

মেঘান্ধকারে পরপারে গ্রামখানি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। 'মেঘে-ঢাকা প্রভাতবেলা'য় কবি জাগতিক দৃশ্য দেখছেন। চারিদিকে একটা কোমল স্বপ্ন তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। ধীরে ধীরে হৃদয়ে ঘনাচ্ছে কী রহস্যময় অনুভূতি। . এরূপ অবস্থায় কবির চোখে একটি অলৌকিক দৃশ্য ভেসে উঠল—তিনি যেন চকিতে দেখতে পেলেন পাল-তোলা একখানি সেনা'র তরণী ভেসে আসছে। নেয়ের মুখে গানের সুর গুঞ্জিত হচ্ছে—ওই মুখটি কবির চেনা চেনা মনে হয়। কবির আহ্বানে নেয়ে কূলে তরী ভেড়ায়—কবি হৃদয়ানুভূতির সোনার ফসল উজাড় ক'রে তাতে তুলে দেন। অতঃপর কবির প্রার্থনা—'এখন আমারে লহ করুণা করে—' কিন্তু কবির এই প্রার্থনা পূরণ হয় না—মুহূর্তের মধ্যে তরীখানি দূর দিগন্তে মিলিয়ে যায়।

কোন একজন সমালোচক এই কবিতাটিতে প্রেম-সৌন্দর্যের উপাসক কবি বিহারীলালের একটি গানের দুইটি পংক্তির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন :—

'সেই গানটি (সোনার তরী নয়নে নাচে নাচে, পা না দিতে ডুবে আচম্বিতে) হইতে কবির মনে যে অস্পষ্ট আইডিয়া জাগিয়াছিল, সেটি এমন একটা আদর্শ (Ideal) যাহাতে পা দিতে না দিতেই তাহা আচম্বিতে ডুবিয়া যায় ; তাহার উপরে আমাদের পার্থিব জীবনের ভার মোটেই চাপানো যায় না—অথচ তাহাকে না পাইলে আমাদের প্রাণ বাঁচে না।'

শ্রীরবীন্দ্রের প্রেমভাবনা ও সৌন্দর্যচেতনার বিশিষ্টতা এই কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কবি স্বয়ং এই কবিতাটিকে তত্ত্বমুখী বলে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। তিনি বলেছেন : 'কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যাকে ধিক্। কবিতার রস এই ব্যাখ্যার উপরেই যদি নির্ভর করে তবে ইহা বৃথাই রচিত হইয়াছিল। ...কেবল বর্ষা নদীর চর, কেবল মেঘলা দিনের ভাব একটা ছবি, একটা সংগীত মাত্রই যদি হয় তাহাতে ক্ষতি কী? ...ভরা পদ্মার উপরকার ওই বাদলাদিনের ছবি 'সোনার তরী' 'কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন্ন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।'

অন্যত্র কবি ভিন্ন মনোভাব প্রদর্শন করে বলেছেন :—

'মহাকাল প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, মানুষ তাহার কাছে নিজের সমস্ত কৃত কর্মকীর্তি সমর্পণ করিতেছে, এবং মহাকাল সেই সমস্তই গ্রহণ করিয়া এক কাল হইতে অন্য কাল—এক দেশ হইতে অন্য দেশে—বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, সেগুলিকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু মানুষ যখন মহাকালকে অনুরোধ করিল যে 'এখন আমারে লহ করুণা করে' তখন মানুষ নিজেই দেখিল যে—

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।

মহাকাল মানুষের কর্মকীর্তি বহন করিয়া লইয়া যায়, রক্ষা করে, কিন্তু স্বয়ং কীর্তিমান মানুষকে সে রক্ষা করিতে চায় না।'

দার্শনিক কবি আরও বলেছেন :—

"মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা বেষ্টিত। ...যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্যফল তা সে এই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে।'

এই মহাকাল তত্ত্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত অধ্যাপক ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয় :—

'কবিভাষ্য শিরোধার্য করেও সবিনয়ে বলা যায়, আমাদের পাঠকমন যেন এই গুরু-গম্ভীর তত্ত্বটিকে কিছুতেই তৃপ্তির সঙ্গে অনুমোদন জানাতে পারে না। কবিতাটির পদলালিত্য, এর পংক্তিতে পংক্তিতে চিত্ররচনার কোমল নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি এর অন্তর্নিহিত একটি গভীর সৌন্দর্যব্যঞ্জনা আমাদের ভাবলোকে যে-আলোড়ন উপস্থিত করে, সেটিকে নিছক কঠিন তথ্যসম্ভৃত বলে মনে করতে আমরা পীড়িত হই।
'সোনার তরী' মূলত জীবনপ্রেম এবং সৌন্দর্যসাধনার কাব্য—সেদিক থেকেও নাম-কবিতাটির কবি-কথিত ব্যাখ্যা সুর সামঞ্জস্যের বিচ্যুতি ঘটায়।

...মানসীর পাতায় পাতায় এই সত্যটিই রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন যে, প্রেমকে সাংসারিকতার বন্ধনে বাঁধলেই তার অপমৃত্যু—বল্লভাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করলেই অনিবার্য তিক্ততা। তার চাইতে ঈপ্সিতাকে মুক্তি দেওয়া যাক ধ্যানের ও গানের আকাশে—ভাবাভিসারের মধ্য দিয়েই সেই অন্তর রঙ্গিনীর সঙ্গে আনন্দ-মিলন ঘটুক। 'সোনার তরী' পর্বেও এই উপলব্ধির অনুরণন অনিবার্যভাবে এসে পড়তে পারে। না আসা অস্বাভাবিকও বটে, কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রেমকল্পনার এইটিই অসন্দিগ্ধ ধ্রুবপদ।

'সোনার তরী' কবিতায় যে মানুষটি জীবনের ছোট ক্ষেতে ফসল ফলিয়েছে এতকাল-নিজের অশ্রুবাদলঘন দুর্দিনে সে বসে ভাবছিল, এই পুঞ্জ পুঞ্জ সঞ্চয় তার কী কাজে লাগবে। ব্যাকুল চিত্তে তার প্রশ্ন জাগছিল, এই বেদনার্ত বিহ্বল মুহূর্তে নিজের এই রাশীকৃত আহরণ কাকে নিবেদন করবে সে—বলবে সব লহো জীবনবল্লভ।

এমন সময় গানের সুর ছড়িয়ে সে এলো 'সোনার তরী'তে। ক্ষণিকের জন্যে নোঙর ফেলল কবির জীবনকূলে, এবং তাকে সর্বস্ব নিবেদন করে দেওয়ার আকুল আনন্দে কবি বলে উঠলেন : 'যত চাও তত লও তরণী পরে।'

আমরা তো এমনিভাবেই প্রেমের হাতে নিজের সব কিছু নিঃশেষে তুলে দিতে চাই। পরমাকাঙ্খিতের কাছে নিজেকে রিক্ত করে দেওয়ার যে অপরিসীম উল্লাস—প্রেমিক মাত্রেই সে উল্লাসের আস্বাদন জানে—সমাজ, ধর্ম থেকে শুরু করে রাজসিংহাসন পর্যন্ত সে অর্ঘ্য দেয় 'তন্দিন তুচ্ছে।' কিন্তু তারপর? 'এখন আমারে লহো করুণা করে।'
...যে তরণী গানে গানে প্রেমে প্রেমে বোঝাই হয়ে গেছে, সেখানে ব্যক্তি মানুষটির

আর জায়গা হবে না : "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।" ব্যক্তির ভার ওপরে চাপিয়ে দিতে গেলেই ভরাডুবির সম্ভাবনা—যেমন হয়েছে 'নিষ্ফল কামনা'র : 'ভালোবাসো, চেয়ো না তাহারে।'

তাই, জীবনবল্লভা কবির সবই নিয়ে গেছেন—তাঁর প্রেম, তাঁর কামনা-কল্পনা, তাঁর স্বপ্ন তাঁর সংগীত, কিন্তু ব্যক্তির ভার নিতে পারেন নি। যেমন নিতে পারে নি 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য তার অমিতকে। সেজন্যই মনে হয়, যদি সজ্ঞানভাবে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় মহাকালতত্ত্ব এনেও থাকেন, তবু তাঁর নির্জ্ঞান মনে প্রেমকল্পনার একটি অন্তঃসলিলা ধারা বয়ে গেছে এবং কবির অজ্ঞাতেই তার কলধ্বনি বেজে উঠছে এর কান্ত-শান্ত বিন্যাসে-এর সৌন্দর্যব্যঞ্জনায়।"

॥ বিষয়বস্তু ॥

পিতার আদেশে শিলাইদহে জমিদারী দেখাশোনা করার সময় বোটে বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ। এই কবিতাটি লিখিত হয় ১২৯৮ সনের ফাল্গুন মাসে। কবির বয়স তখন ৩১ বৎসর। 'মানসী' কাব্যে জীবন ও জগত সম্পর্কে কবিমনের যে দ্বন্দ্ব ছিল তা উত্তীর্ণ হয়েছেন। কবি বলতে চান তাঁর মানস ক্ষেতে অনেক সোনার ফসল তিনি ফলিয়েছেন। জীবন ও জগতের সঙ্গে তার সম্পর্কটি কবি অনুধ্যান করতে উন্মুখ। প্রকৃতির অসমান্য দান তাঁর অন্তরে যে তীব্র আনন্দের উৎসব ঘটিয়েছে তার প্রকাশ কবিতাটিতে।

কবি সোনার ফসল নিয়ে নদীতীরে একা বসে আছেন কোন প্রতীক্ষায়। অবশেষে এই প্রতীক্ষার অবসান হয়। আসে অচিনদেশের নেয়ে। কবি যেন এই নেয়েকে চেনেন। কবির অন্তরদেবতাই গান গেয়ে তরী বেয়ে এগিয়ে আসে। পরবর্তী কালে 'চিত্রা' কাব্যে যে জীবনদেবতার কথা কবি বলেছেন সেই জীবনদেবতারই পূর্বাভাস এখানে পাই। কবি সেই অন্তর দেবতাকেই তীরে তরী ভিড়িয়ে সমস্ত সোনার ফসল গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। কবির একান্ত ব্যাকুলতায় কাছে এই নতুন আগন্তুক ধরা দেয়। কবি কাব্যের সোনার ফসল সকলই উৎসর্গ করেন অন্তরদেবতার কাছে। কিন্তু কবির ব্যক্তিসত্তা স্পষ্টরূপে এই অধরা অন্তরদেবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না। কবির ব্যাকুল আহ্বানে তরী ভিড়ালেও কবির স্থান সে তরীতে তখনো হ'ল না। কবি অন্তরের সকল শ্রেষ্ঠ ফসল থরে বিথরে সাজিয়ে দিলেন। ছোট তরী কবির বাণীসাধনার সোনার ফসলে ভরে গেল। কিন্তু কবি ছোট নৌকায় ঠাঁই পেলেন না। শিল্পী সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতা কবিকে পীড়া দেয়। তিনি বলেন—

শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী ॥

মহাকা
কীর্তিমান মান
দার্শনিক ক

কাতর প্রার্থনা মাঝি পূরণ করল না। শ্রাবণ দিনের আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ হয়। শূন্য নদীকূলে কবি পড়ে রইলেন।

কবিতার অন্তর্লীন ভাবসত্য ঃ

বর্ষণমুখর কোন এক মেঘান্ধকার প্রভাতে কবির স্পর্শকতার চিত্তে একটি অনির্দেশ্য ব্যথার রাগিনী ঝংকৃত হয়ে উঠল। মানবমনের ওপর নিসর্গপ্রকৃতি তার রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করে। বর্ষার দিনে অজানা এক গভীর বেদনায় কবিমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অনির্দেশ্য ও অনির্ণেয় বস্তুর জন্য কবিমনের তীব্র ব্যাকুলতা কবিতাটিতে ধরা পড়েছে। মর্ত্যলোকের কবি অমর্ত্যলোকের বিদেশিনীর জন্য উৎকণ্ঠা অনুভব করেন। আজকের মেঘান্ধকার প্রভাতে যেন তাকে প্রত্যক্ষ করলেন।

সে যেন নিজের মনেই তরণী বেয়ে চলেছে। তাকে কবির চেনা মনে হলেও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না। স্বপ্নাবিষ্ট কবির চিত্ত ব্যাকুলভাবে তাকে আহ্বান করতে থাকে। কল্পনায় তার সঙ্গে মিলন ঘটে। কিন্তু বাস্তব মিলন হয় না - কল্পনার মানসী তো বাস্তবে ধরা দেয় না। সৌন্দর্যাভিলাষী কবি কল্পনার দ্বারা তাকে স্পর্শ করেন মাত্র। কিন্তু কল্পনা দীর্ঘস্থায়ী নয়। তাই কবির বিদেশিনী মুহূর্তে কবিকে অগাধ শূন্যতার মধ্যে ফেলে অন্তর্ধান করে আর কবিচিত্ত তীব্র হতাশায় ভরে ওঠে। জীবনের বিশেষ কোন শুভ মুহূর্তে সুন্দর দেবতার চকিত স্পর্শ আমরা পাই। সৌন্দর্যদেবতার সঙ্গে কল্পমিলনের লগ্নে কবির অন্তরে যে ভাবানুভূতি জাগে তা যক্ষযুবকের অলকাস্বপ্নের সঙ্গে তুলনীয়।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

[প্রথম স্তবক] গগনে গরজে………কূলে একা বসে আছি

কবিতাটিতে অপূর্ব ধ্বনিমাধুর্য প্রকাশিত। সেই সঙ্গে একটি বিষাদের সুর ধ্বনিত। একটি নিসর্গ-সৌন্দর্য রেখায়িত। **ঘনবরষা**; শ্রাবণ দিনের একটা ছবি প্রকাশিত। **নাহি ভরসা ঃ** কবিমানসের রোমান্টিক বিষাদময়তা এবং তজ্জনিত আস্থাহীনতা। **ধান কাটা হল সারা ঃ** বর্ষায় ধান কাটা হয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তর ঃ "ছিলাম তখন পদ্মার বোটে। জলভারনত কাল মেঘ আকাশে, ওপারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি। বর্ষার পরিপূর্ণ পদ্মা খরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক খেয়ে ছুটছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিয়েছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙি নৌকা হু হু স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ঐ অঞ্চলে ঐ চরের ধানকে বলে ডালি ধান। আর কিছুদিন হলেই পাকত।।" **খরপরশা ঃ** খর স্পর্শ যার অর্থাৎ খরস্রোতা।

[দ্বিতীয় স্তবক] একখানি ছোট ক্ষেত ঃ এখানে ক্ষেত বলতে জীবনের কর্মক্ষেত্রকে বোঝান হয়েছে। **আমি একেলা ঃ** অনির্দেশ্য সৌন্দর্যবিরহ কবিকে একাকী করেছে। **চারিদিকে……করিছে খেলা ঃ** নদী বক্রগতিতে ক্ষেতের চারিদিক ঘিরে ধরেছে। **পরপারে……প্রভাতবেলা ঃ** বর্ষার প্রাকৃতিক চিত্র ও পরিবেশ বর্ণিত। প্রকৃতি ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত। কালো মেঘে নদীর অপর পার অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে। **তরুছায়া ঃ** প্রতিচ্ছবি।

[তৃতীয় স্তবক] গান গেয়ে……চিনি উহারে : কোন প্রত্যক্ষ চিত্র নয়। সৌন্দর্যরসাবিষ্ট কবি অনুভব করছেন যেন কোন 'বিদেশিনী' এসেছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে চেনা-অচেনার মধ্যবর্তী জীবনদেবতা ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্যসত্তার চকিত প্রকাশ হিসাবেই এই বিদেশিনীর আগমন। কবি এঁকে পরবর্তীকালে জীবনদেবতারূপে চিনতে পেরেছিলেন। ভরাপালে চলে যায় ইত্যাদি : রহস্যময়ী বিদেশিনীর আগমনের চিত্র।

[চতুর্থ স্তবক] কোন্ বিদেশে : কবির অজ্ঞাত দেশে অর্থাৎ সৌন্দর্যের দেশে চলে যায় বিদেশিনী। বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে : কবির কল্পিত সৌন্দর্য-প্রতিমার সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা বর্ণিত। কবি এই সৌন্দর্য-প্রতিমাকে কূলে তরী ভিড়াতে বলেছেন কোন প্রয়োজনের তাগিদে নয় অপার্থিব আনন্দ লাভের জন্য। যারে খুশী তারে দাও : সৌন্দর্য কারো ব্যক্তিগত অধিকারে নয়। ব্যক্তিজীবনের গণ্ডী দিয়ে তাকে আবদ্ধ করা যায় না। সৌন্দর্য সম্ভোগের অধিকার সার্বজনীন। ক্ষণিক হেসে : কবি কল্পনানেত্রে সৌন্দর্যরসসত্তার হাসি ও মাধুর্য অনুভব করেন। আমার সোনার ধান : এটি কোন রূপক নয়। কল্পিত সুন্দরী বিদেশিনীর সহিত মিলনের আর্তি দ্যোতিত। পরে কবির সঙ্গে কল্পনায় এই বিদেশিনীর মিলন ঘটেছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ মিলন ঘটেনি। কারণ তা অসম্ভব।

[পঞ্চম স্তবক] যত চাও……তরণী পরে : ভাবলোকে মিলনের মাধ্যমে কবি সর্বস্ব দান করলেন। সাংসারিক প্রয়োজন ত্যাগ করলেই এই রসস্বরূপা সৌন্দর্যময়ীর পরিচয় সম্ভব। এতকাল নদীকূলে……ছিনু ভুলে : 'যাহা' বলতে এখানে কবির অন্তরের সুকুমার অনুভূতি ও সোনার স্বপ্নের কথা বলা হয়েছে। সারাজীবন ধরে কবি এই অনুভূতির সোনার স্বপ্ন রচনা করেছেন। এখন আমারে লহ করুণা করে : সৌন্দর্যময়ীর সহিত কল্পলোকে মিলনে অপরিতুষ্ট কবি সশরীরে বাস্তবে তার সঙ্গে মিলন প্রার্থনা করলেন। কবির ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সৌন্দর্যরসপিপাসা এখানে প্রকাশিত।

[ষষ্ঠ স্তবক] ঠাঁই নাই……গিয়েছে ভরি : তরীতে বিদেশিনীর পাশে কবির স্থান হল না। কারণ এই রসস্বরূপা সৌন্দর্যময়ীর আভাস পান কবি কিন্তু স্পর্শ পান না। তাই কবির অন্তরে তীব্র বিরহবেদনা। এ বেদনা কেবল কবির ব্যক্তিগত বেদনা নয়, সমগ্র মানবের নিত্যকালের বেদনা।

শ্রাবণ গগন ঘিরে……ঘুরে ফিরে : কবির বিরহমথিত চিত্ত প্রকৃতির বর্ণনার মধ্য দিয়া প্রকাশিত। বর্ষাপ্রকৃতির এই চিত্র কবির বিরহের ইঙ্গিত বহন করে। কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকৃতির উপর আরোপিত। শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি : বাস্তব সংসারে আমরা সকলেই বিরহী। কবির সঙ্গে কল্পনায় ক্ষণিক মিলন হলেও ঐ সৌন্দর্যসত্তা তাঁর অনাবৃত থেকে যায়। তাই কবির তৃপ্তিহীন সৌন্দর্যাভিসার এবং পরিণামে বিরহের করুণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ।

॥ রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ॥

প্রশ্ন ১। 'সোনার তরী' কবিতাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য্যের পরিচয় দাও।

উত্তর ঃ—'সোনার তরী' কবিতাটিতে কবির রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রীতি ও বিরহবেদনা প্রকাশিত। একদিন শ্রাবণের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রভাতে কবি নদীর কূলে একা বসে আছেন। নদীর তীব্র স্রোত বয়ে চলেছে। এমন সময় প্রবল বর্ষণ দেখা দিল। একটি ছোট খেতের মাঝে কবি একলা অবস্থান করেছেন. আর চারিদিকে নদীর জল বক্রগতিতে খেতটিকে ঘিরে ধরেছে। নদীর পরপারে তরুশ্রেণী ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রামখানি মেঘে আবৃত। এমন সময় কবির মনে হ'ল যেন কেউ গান গেয়ে তরী বেয়ে এগিয়ে আসে কবির দিকে। দূর থেকে এই সৌন্দর্যময়ীকে দেখে কবির চেনা মনে হয়। কিন্তু কবির দিকে দৃকপাত না করে সে এগিয়ে যায়। কবি তখন ব্যাকুল প্রার্থনায় জানতে চান সেই বিদেশিনীর প্রকৃত পরিচয়। তাই কবি ব্যাকুল আবেদন জানান যাতে এই বিদেশিনী তীরে তরী ভিড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য থামে।

অবশেষে কবির অনুভূতিতে সেই রসস্বরূপা সৌন্দর্যময়ী ধরা দেন। কবি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সকল অনুভূতি সহ ধরা দেন এই বিদেশিনীর কাছে। কবির এই ক্ষণিক প্রাপ্তি কবিকে আনন্দে আত্মহারা করে। কবি তাকে স্পষ্টরূপে ধরার প্রয়াস করেন। কিন্তু তা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই মুহূর্তের এই ক্ষণিক মিলন বিরহের ব্যাকুল বেদনায় পর্যবসিত হয়। কবি যখন বিদেশিনীর সোনার তরীতে নিজের স্থান চান তখনই এই বিদেশিনীর চকিত পরশ অবলুপ্ত হয়।

কবি নিঃসীম বিরহ বেদনা বহন ক'রে একা শূন্য নদীকূলে পড়ে থাকেন। ক্ষণিক মিলনের পর বিরহের অপরিতৃপ্তি কবিকে অবসন্ন করে। ঘনঘোর প্রকৃতির ও শ্রাবণের ঘন কাল মেঘ কবির এই বিরহের ইঙ্গিত বহন করে।

কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে কবিতাটির ধ্বনিময়তা। প্রকৃতির যে পটভূমি কল্পিত তা যেন আমাদের কাছে ছবির মত দেখা দেয়। শ্রাবণ প্রভাতের ঘন কালো পরিবেশ এবং তার মাঝে একটি ছোট খেত কবির অন্তরের একাকীত্ব ও নির্জনতা স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলে। জীবনের বিচিত্র জটিলতার মধ্যেও কবি মানসিকভাবে যে একাকী তা স্পষ্ট রূপ লাভ করে।

কবি মানসিক অনুভূতির সোনার ফসল ফলিয়েছেন। আধ-চেনা বিদেশিনী অন্যমনে নদী বেয়ে এগিয়ে আসেন। সেই বিদেশিনীকে পাওয়ার আকাঙ্খা ও আকুলতাটি অপূর্ব ধ্বনিসুষমায় ব্যঞ্জিত ঃ—

ওগো তুমি কোথা যাও কোন বিদেশে ?
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।

কবিতাটির মধ্যে কবির অন্তরের আর্তি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাই ভাব, ভাষা, ধ্বনি ও চিত্রকল্পগুলি মনোরম। নিজস্ব জীবনের সকল অনুভূতি ও ভাবাবেগ নিঃশেষে দান ক'রে দেওয়ার পর কবি সোনার তরীতে একটু স্থান পেতে চান। সেটিও মনোরম ভঙ্গীতে প্রকাশিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবির ব্যথাতুর হৃদয় স্থান না পাওয়ার বেদনার ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই শ্রাবণ প্রভাতের বিষণ্ণ বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর হৃদয়ের এই বেদনার ইঙ্গিত সূচিত করেছেন। প্রকৃতিতে কবি তার বিষণ্ণতা আরোপ করেছেন।

কেবল কবির ব্যক্তিগত হৃদয়ের কথা নয়, এই বিরহ বেদনা শাশ্বত মনাবাত্মার অন্তরের কথা। আমরা সকলেই অধরা অদেখা সৌন্দর্যময়ী সত্তার সঙ্গে মিলন আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব। কিন্তু কল্পলোকবাসিনী এই বিদেশিনী ক্ষণিকের স্পর্শ দিলেও বাস্তবে তাকে পাওয়া যায় না। মানবাত্মার এই চিরন্তন বেদনাটি অভিনব কাব্যচমৎকারিত্বে 'সোনার তরী' কবিতার মধ্যে প্রকাশিত। সেই কারণে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য মনোরম।

প্রশ্ন ২। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার ক'রে দেখাও যে কাব্যটির নাম 'সোনার তরী' রাখা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

উত্তর ঃ—কোন সাহিত্যবস্তুর নামকরণ নানা উপায়ে হয়ে থাকে। কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানত কেন্দ্রীয় ভাবকে অবলম্বন করে নামকরণ করা হয়। সমগ্র কাব্যগ্রন্থ যদি একটি বিশেষ ভাবের দ্যোতনা করে তাহলে সেই ভাববস্তুর ইঙ্গিতবহ নাম দেওয়া হয়। কখনও বা কবিতাটির প্রথম পংক্তি অনুসারেও কবিতার নামকরণ করা হয়।

'সোনার তরী' কবিতায় কেন্দ্রীয় ভাব হচ্ছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য সম্পর্কে কবিমনের নিঃসীম বিরহ। সোনার তরী যে বহন করে আনে সেই আধ-চেনা বিদেশিনী সোনার তরীর নেয়ে। সেই কারণে কবিতাটির নামকরণ সোনার তরী করা হয়েছে। কবি এই বিদেশিনীর সাময়িক সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তারপরই ঘটেছে অনন্ত বিরহ। সেই দিক থেকে সোনার তরী সেই সৌন্দর্য সত্তারই ইঙ্গিত বহন করে। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যই দ্যোতিত হয়েছে 'সোনার তরী'র মধ্যে। সেই কারণে কবিতাটির নামকরণ সার্থক।

কিন্তু সোনার তরী কাব্যগ্রন্থে দুইশ্রেণীর কবিতা দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের বিরহজনিত কবিমনের তীব্র-বেদনা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলিতে আছে প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের প্রতি কবির তীব্র আকর্ষণ। কবি মনে করেন যে এই পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ আছে। সোনার তরী কবিতাটি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। অতএব দুইপ্রকার ভাবধারা কবিতাগুলিতে থাকায় সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের নামকরণ মূলভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

তবে একথা সত্য যে কবির অন্তরের একটি বিরহবেদনা সকল কবিতার মধ্যেই প্রকাশিত। প্রথম শ্রেণীর কবিতাগুলিতে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের অপ্রাপ্তিজনিত বিরহ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলিতে বসুন্ধরার সহিত জন্মান্তরীণ সম্পর্কের

অভাবজনিত বিরহ। অতএব 'সোনারতরী' কবিতাটিকে এই বিরহ বেদনার প্রকাশক প্রথম কবিতা হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কবি মনে করেন তার চৈতন্যময় সত্তা যুগে যুগে বসুন্ধরার সকল চেতন অচেতন সত্তার মাধ্যমে অনন্তকাল ধরে প্রসারিত হয়ে এসেছে। অতএব কবির চৈতন্যসত্তার সঙ্গে এই মাটির পৃথিবীর কোথাও কোন বিচ্ছেদ ছিল না। অথচ আজ মাটির সঙ্গে কবির অন্তরের সেই বন্ধনটি ছিন্ন হয়েছে। তাই কবিকে বসুন্ধরার সকল সৌন্দর্য তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু বসুন্ধরার সঙ্গে অদ্বয় সত্তায় মিলে যাওয়ার কোন উপায় তাঁর নেই।

এই সার্বজনীন বিরহ সমগ্র সোনারতরী কাব্যের মূল সুর। তাই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ সার্থক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৩। 'সোনার তরী' কবিতাটিতে ঈশ্বরতত্ত্ব নাই, মহাকালতত্ত্ব নাই, জীবনদেবতাতত্ত্ব নাই,—ইহাতে যদি কোন তত্ত্ব থাকে তবে তাহা সৌন্দর্যতত্ত্ব।—মন্তব্যটি বিচার কর। [ভূমিকা দ্রষ্টব্য]

।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ।।

১। 'একখানি ছোট খেত আমি একেলা'

—এখানে ছোট খেত বলতে কবি কিসের ইঙ্গিত করেছেন ?

উত্তর :—কবি অনুভব করেন তাঁর একাকিত্ব। মনে মনে প্রত্যেকে আমরা একা। কবিও তাই মনে করেন। খেত বলতে সংসারের কর্মক্ষেত্র। এই কর্মক্ষেত্রে তিনি কাব্যসম্ভারের সোনার ফসল সৃষ্টি করেন। কিন্তু তা গ্রহণ করবার কেউ নেই। তাই তিনি নিজেকে ছোট খেতের মধ্যে একলা বা নিঃসঙ্গ মনে করেছেন। এই নিঃসঙ্গ-বেদনা রোমাণ্টিক কবির বৈশিষ্ট্য। নিঃসঙ্গতাজনিত বেদনা কবিকে সৃষ্টি উন্মুখ করে। কারণ সৃষ্টির উৎসই বেদনা।

২। "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে"।

কবি কাকে দেখেন ? কবির কেন মনে হয় যে তিনি তাকে চেনেন ?

উত্তর :—'সোনার তরী'র নাবিকের ছদ্মবেশে কবির অন্তরদেবতাকে তিনি অস্পষ্টভাবে দেখতে পান। এই অন্তর দেবতার সঙ্গে তাঁর সারাজীবন ধরে বিরহ-মিলনের খেলা চলেছে। পরবর্তীকালে কবি এই অন্তরদেবতাকে 'জীবন দেবতা' আখ্যা দিয়েছেন।

এই সৌন্দর্যময়ীর অধিষ্ঠান তাঁর অন্তরে। তাই কবির কাছে তা নিজেরই অপর সত্তা। তাই কবির নিকট সে পরিচিত হয়েও অপরিচিতের অবগুণ্ঠণে আবৃত।

আধ-চেনার মধ্যে অবস্থিত বলে কবি সম্পূর্ণরূপে এখনো চিনতে পারেন না। চেনেন বলে মনে হয় মাত্র।

৩। কবি সোনার তরী বেয়ে কাকে আসতে দেখলেন? তাকে তিনি কি বলেছিলেন?

উত্তর ঃ কবি সোনার তরী বেয়ে তাঁরই অন্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আসতে দেখলেন। সেই দেবী যেন নাবিকের বেশে কবির কাছে আবির্ভূত হলেন।

কবি তাঁকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁর সকল কাব্যসৃষ্টি রূপ সোনার ফসলগুলি গ্রহণ করেন। কবির সৃষ্টি সেই দেবী গ্রহণ করলেন।

৪। সোনার তরীর নাবিক কবির আবেদনে তার কাছে এসেছিলেন কি? পরে কি ঘটল?

উত্তর ঃ—সোনার তরীর নাবিক কবির অন্তরের সৌন্দর্যরসময়ী অধিষ্ঠাত্রীদেবী ছাড়া আর কেউ নয়। কবির আন্তরিক আহ্বানে সেই দেবী চকিত পরশ দিতে কবির কাছে ধরা দিয়েছিলেন।

কবির কাব্যানুভূতির সোনার ফসল সেই দেবী সোনার তরীতে গ্রহণ করলেন। কবি যখন বাস্তবে তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে চাইলেন অর্থাৎ সোনার তরীতে আপনাকে স্থান দিতে চাইলেন তখন সেই দেবী কবিকে পরিত্যাগ করলেন। কবি পুনরায় নিঃসঙ্গ ও একক হলেন।

৫। 'সোনার তরী' ও 'সোনার ধান' কি কি সংকেত সূচিত করে?

উত্তর ঃ—কবি অন্তরদেবতা বা মানসীকে সোনার তরীতে অধিষ্ঠিত বলে কল্পনা করেছেন। এই তরীকে অনেকে কবির সাধন তরী বলেছেন। আর সোনার ধান বলতে কবির অনুভূতিলব্ধ ভাবসমৃদ্ধ কাব্যসম্ভারকে বোঝান হয়েছে

৬। "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী"—উক্তিটি কার? কোন প্রসঙ্গে কেন একথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ—কবি যখন সোনার তরীতে নিজের স্থান চাইলেন তখন কবির অন্তরদেবতা এই কথা বলেছেন। কবি জীবনের সঞ্চয় অন্তরদেবতাকে দান করলেন। পরিবর্তে চাইলেন তাঁর সঙ্গে বাস্তব মিলন। তখনই কবি প্রত্যাখ্যাত হলেন। কারণ এই অধরাকে ধরার প্রচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখিত উক্তিটি করা হয়েছে।

৭। শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী॥

শূন্য নদীর তীরে বলতে কি বোঝানো হয়েছে? কে পড়ে রইলেন? 'যাহা ছিল' বলতে কি বোঝ?

উত্তর ঃ—কবিজীবনের ছোট খেতের সকল সোনার ফসল জীবনদেবতার সোনার তরীতে নিঃশেষে ভরে দিয়েছেন কবি। কবির আর তো কিছুই ছিল না। তাই

শূন্যহস্তে নদীর তীরে একা পড়ে রইলেন। কারণ সোনার তরীতে কবির নিজের স্থান হয় নি।

কবির সৌন্দর্য রসপিপাসু চিত্ত অনুভূতির জগতে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করেছিল তারই প্রতি এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কবি নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করলেন অন্তরদেবতাকে চকিত দর্শনে। পরিবর্তে নিজের স্থান চাইলেন সেখানে। কিন্তু অন্তরদেবতার সঙ্গে চকিত মিলন কখনও স্থায়ী হয় না। তাই কবি বিরহের সুতীব্র বেদনা অনুভব করলেন। 'যাহা ছিল' বলতে কবির অনুভূতিরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বোঝান হয়েছে।

॥ যেতে নাহি দিব ॥

ভূমিকা—

"সোনার তরী"র পূর্বে রচিত 'মানসী" কাব্যের কয়েকটি কবিতায় কবি সৃষ্টিকে নিষ্ঠুর এবং সংসারের ধ্বংসলীলাকে 'জড়ের নর্তন' বলে অভিহিত করেছেন। আবার কয়েকটি কবিতায় প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। যেমন,

"হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তোরে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

অথবা,

"জড়দৈত্য শক্তি হানে, মিনতি নাহিক মানে,
প্রেম এসে কোলে টানে, দূর করে ভয়।
এই দুই দেবতার দ্যূতখেলা অনিবার
ভাঙা-গড়াময়
চিরদিন অন্তহীন জয়-পরাজয়।"

কবির এই সংশয়াত্মক মনোভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছে এবং "যেতে নাহি দিব" কবিতায় কবির এই উপলব্ধি জেগেছে যে জগতে ধ্বংসলীলা সত্য হলেও প্রেম অধিকতর সত্য। কবিতাটিতে কবির মর্তপ্রীতি বা নিসর্গপ্রেম সুন্দরভাবে রেখায়িত হয়েছে। আলোচ্য কবিতাটির সঙ্গে 'দরিদ্রা' নামক সনেটকল্প রচনাটির ভাবসাদৃশ্য চোখে পড়ে। 'মানসী' পর্বে নিসর্গপ্রকৃতির নির্বিকার ঔদাসীন্য ও নিষ্ঠুরতা কবিচিত্তে

বেদনা বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু "সোনার তরী"র যুগে নিসর্গপ্রকৃতি নির্দয়া নয়—অক্ষমা, দরিদ্রা, স্নেহময়ী। আপনার লক্ষকোটি সন্তানের মর্মব্যথা ও অপার দুঃখ দূর করার ক্ষমতা তার নেই বলে নিজেও সে ব্যথিতা, বিষণ্ণা। ম্রিয়মানা বসুমতীকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন :

'দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে,
বেদনা কাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্মমাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।

প্রসঙ্গত "ছিন্নপত্র"-এ প্রকাশিত কবির নিম্নলিখিত উক্তি অনুধাবনযোগ্য :—

"পৃথিবীর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে হচ্ছে—আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই ; আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করিতে পারি না ; আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি না ; জন্ম দিই—মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনে।"

আলোচ্যমান কবিতায় কবি মানবহৃদয় ও বিশ্ব প্রকৃতিকে আশ্চর্য কল্পনাশক্তির যোগে এক বেদনার সূত্রে গ্রথিত করেছেন। চারবছরের যে ছোট কন্যাটি পিতার বিদায়মুহূর্তে অবুঝের মতো বলেছিল—'যেতে আমি দিব না তোমায়'—সেই কন্যাটি যেন স্নেহতুরা 'অক্ষমা' বিশ্বপ্রকৃতিরই প্রতিরূপ ; 'যেতে নাহি দিব' কথাগুলি যেন জননী বসুন্ধরারই অন্তরের বাণী। নিজ শিশুকন্যার হৃদয়কাতরতাকে কবি নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রসৃত করে দিয়েছেন :—

"......................ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাদ্যন্ত রবে—
'যেতে নাহি দিব'! যেতে নাহি দিব!' সবে
কহে—"যেতে নাহি দিব।"

কিন্তু পৃথিবীর কণ্ঠে প্রেমের এত বড়ো অধিকার ঘোষণা শুনে অলক্ষ্যে "মৃত্যু হাসে বসি।"

"জন্মিলে মরিতে হবে"—এ ধরণের চিন্তা থেকে মনে বৈরাগ্যভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জীবনপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নশ্বরতা দেখে 'মোহমুদ্গর' রচনা করেন নি, 'শূন্যবাদ' প্রচারে অগ্রসর হন নি, মৃত্যু বিচ্ছেদের অমোঘ নিয়তি মেনে নিয়ে সংসারকে দ্বিগুণ আসক্তিতে আঁকড়ে ধরেছেন। মরণপীড়িত প্রেমের অপরাজেয়তা ঘোষণা করে আশ্বস্ত হয়েছেন। চতুষ্পার্শ্বের অস্থিরতার মধ্যেও একটা স্থির বস্তুর অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছেন, যার নাম প্রেম :—

"চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া,
অশ্রু বৃষ্টি ভরা কোন্ মেঘের সে মায়া'

জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তিই কবিকে ভারতীয় মায়াবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করেছে—পৃথিবীর নশ্বরতা প্রচারের পরিবর্তে নিয়তি পরাজিত মানবহৃদয়ের মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্তি দিয়েছে।

ভাবসত্য : এ কবিতাটি ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্তিক জোড়াসাঁকোয় রচিত। 'সোনার তরী' পর্বের দীর্ঘ কবিতাগুলির মধ্যে এটি একটি। জীবন জগৎ সম্পর্কে কবির মনে এখনো কোন দার্শনিক তত্ত্ব প্রাধান্য বিস্তার করে নি। কেবল অন্তরের তীব্র আবেগ ও অনুভূতিতে এই বিশ্বজগৎ ধরা দিয়েছে। বিশ্বজীবন কবিকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনি এই প্রকৃতির মধ্যে তিনি আত্মলীন হয়ে যেতে চান। সংসারের তুচ্ছ সুখ দুঃখের মধ্যে কবি জড় জগতের বিধ্বংসী রূপটিকে অনুভব করেছেন। অপরদিকে মানবমন প্রেম ভালবাসার জোরে এই জড় শক্তির ধ্বংস রোধ করতে চায়। মানুষের এই চিরন্তন আর্তি অর্থাৎ ভালবাসার সম্পদকে ধরে রাখার প্রবল ইচ্ছা পরিণামে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তথাপি মানুষের অন্তরের বিশ্বাস শিথিল হয় না। একদিকে এই জীবন ও জগতে যেতে না দেবার আর্তি ধ্বনিত হচ্ছে অন্যদিকে চিরন্তন নিয়মে মৃত্যু ও ধ্বংস এসে সকলকে অনিবার্য ভাবে গ্রাস করে চলেছে। জীবন ও জগতের এই দ্বিবিধ সত্যই 'যেতে নাহি দিব' কবিতার আলম্বন বিভাব।

মানুষের জীবন সম্পর্কে বিচ্ছেদ যেমন সত্য তেমনি ব্যক্তিজীবনে আশা আকাঙ্খাও সমান সত্য। এ দুইএর পরস্পর বৈপরীত্য কবিমনে বেদনার সঞ্চার করেছে। তাই এই কবিতাটিতে জীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন তা ব্যক্তিজীবন থেকে সমষ্টিজীবনে উত্তীর্ণ। চার বছরের মেয়ের ভালবাসার দাবী 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনির সুর মূর্ছনা ব্যপ্ত হয়েছে সমগ্র চরাচরে। নদ-নদী-অরণ্য সমগ্র প্রকৃতিতে এই একটি সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। যে ভালবাসে সে তার ভালবাসার দাবীতে আপনজনকে যেতে দিতে চায় না। তবুও সমগ্র প্রকৃতি জগৎ ও মানুষের কর্মজগৎ অনন্ত চলার পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। এই অনন্তচলমানতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মানবজীবনের ক্ষেত্রেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা প্রিয়জনকে ছেড়ে দিতে চায় না। বারবার স্নেহের দাবী, ভালবাসার দাবী সে জানায়। এই দাবী রক্ষা করা যায় না। তথাপি এই প্রেম-প্রীতির দাবী বলিষ্ঠ। জগতের স্বাভাবিক নিয়মকে অস্বীকার করে সে তার দাবী জানাতে ভোলে না। রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের এই ভালবাসার দাবীকে বিশ্বজননীতার রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাছে মনে হয় সমগ্র প্রকৃতিতে 'যেতে নাহি দিব' ধ্বনি উচ্চারিত গভীর প্রেম-প্রীতি ভালবাসার সুরমূর্ছনায়। ব্যক্তিজীবন থেকে প্রকৃতি জীবনে অনুভূতির সঞ্চারই কবিতাটির অন্তর্লীন ভাবসত্য।

॥ সারাংশ ॥

পুজোর ছুটি শেষ হয়েছে। দূরপ্রান্তে কর্মক্ষেত্রে চলে যেতে হবে। দুয়ারে গাড়ি প্রস্তুত। নিস্তব্ধ নিঝুম মধ্যাহ্ন। রাত্রির নির্জনতা গ্রাস করেছে সমগ্র মধ্যাহ্নকে। ফিরে যেতে হবে কর্মক্ষেত্রে। তাই ভৃত্যগণ ব্যস্ত বাঁধাছাঁদা করার জন্য।

দীর্ঘপ্রবাসে স্বামীর প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র নিয়ে বাঁধাছাঁদা করতে গিয়ে চার বছরের শিশুকন্যাটির যত্ন করা হয় নি। পর্বত প্রমাণ জিনিষপত্র বোঝা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু গৃহিণীর সাথে তর্ক করা কেবল বাক্যের অপব্যয় মাত্র। কারণ গৃহিণী তাতে কর্ণপাত করেন না। সমস্ত সমাপন হওয়ার পর অশ্রু ছলছল চোখে বিদায়ের পালা সাঙ্গ হয়।

কিন্তু চারিবছরের শিশুর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে অন্তর ব্যথিত হয়। শিশুর দাবী সে ঘোষণা করেছে "যেতে নাহি দিব"। শিশুর এই স্নেহ-অধিকার ছিন্ন করা কষ্টকর হলেও বিদায় দিতেই হয়।

শিশুর আপাত-সামান্য এই দাবী সমগ্র বিশ্বের চিরন্তন দাবী। বিশ্বচরাচর প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। জড়ের এই পরিবর্তনের মধ্যেও কিন্তু প্রেম পরাভব মানে না। মানুষ কেবল বলতে থাকে আমি যাকে ভালবাসি সে কখনো আমার থেকে দূরে যেতে পারে না। মৃতপুত্রকে কোলে নিয়ে মাতা বিধির বিধান ভাঙার দুর্ভার প্রতিজ্ঞা করে। ছিন্নমূল তরুশ্রেণীকে বসুন্ধরা সোহাগে আবৃত করে রাখে। মানুষের ভালবাসা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর কাছে পরাভব স্বীকার করেও অন্তরের দাবী ঘোষণা ক'রে চলেছে। মৃত্যুকে সে অস্বীকার করে আর মৃত্যু বসে বসে হাসছে এই গর্বকথা শুনে। মানুষের এই গর্বের মধ্যেই অস্তিত্বের স্বাক্ষর। মরণ পীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করে আছে অনন্ত সংসার। ক্ষুদ্র তৃণকেও মাতা বসুমতী যেতে দিতে চান না। অনন্ত চরাচরে সবচেয়ে গভীর ও পুরাতন ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব।' সম্মুখ ঊর্মিকে পশ্চাতের ঢেউ বারবার বলে 'যেতে আমি দিব না তোমায়'। কিন্তু কাল স্রোতের অমোঘ নিয়মে অনন্তকাল ধরে সব কিছুর পরিবর্তন হয়ে চলেছে। আর শিশু কন্যার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে কবি উপলব্ধি করেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবমনের ব্যথা-ক্রন্দন গীতি—যেতে না দেওয়ার করুণ সুরমূর্চ্ছনা।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি : নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরের প্রকৃত রূপ। চতুর্দিকে নীরবতার মধ্যে হেমন্তমধ্যাহ্নকে যেন নীরব রাত্রির মত মনে হয়। **পূজার ছুটির শেষে :.........যেতে দিতে হ'ল**—এই অংশটি বিদায় যাত্রার বাস্তব ও করুণ দৃশ্য। **কোথা হতে কী শকতি পেয়ে :** কবি বলতে চান ছোট চার বছরের মেয়ের মধ্যে ধরে রাখার ইচ্ছা একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এই স্নেহের গর্ব বিশ্বের বিধানকেও লঙ্ঘন করতে চায়। **সংগ্রাম করিবি ইত্যাদি :** মহাকালের শক্তির কাছে মানুষ যে অত্যন্ত অসহায় তা বিবৃত হয়েছে।

মর্মের প্রার্থনা : কাতরোক্তি সহকারে কেবল প্রার্থনা করা চলে, গর্বসহকারে এরূপকথা বলা চলে না যে—যেতে দিব না। কিন্তু প্রেমের প্রাবল্যহেতুই এইরূপ উক্তি করা হয়েছে। **চলিতে চলিতে পথে, ইত্যাদি :** বসুন্ধরার শান্ত করুণ রূপের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। **ফেলিছে নিশ্বাস :** ধরণীর মধ্যেও একটি বিষাদের

ছবি লক্ষ্য করেছেন কবি। **শুনিেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর :** কন্যার বিষাদছবি থেকে কবি ধরনীর বিষাদচিত্রের কল্পনা করেছেন। **ক্ষুদ্রতৃণ অতি……মাতা বসুমতি :** মৃত্যুর গ্রাস থেকে মাতা সন্তানকে রক্ষা করতে পারছে না. প্রগাঢ় মমতায় বেঁধে রাখতে চাইছে।

আয়ুক্ষীণ দীপমুখে কহিতেছে শতবার : জীবনদীপ নির্বাপিত হতে চলেছে, কিন্তু তা জেনেও অন্তর তাকে মৃত্যুর মধ্যে সমর্পণ করিতে চাইছে না।

সবচেয়ে পুরাতন কথা : মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ, মানুষের কাতর প্রার্থনা ও মরণের হাত থেকে প্রিয়জনকে ধরে রাখার আকুতি। **বিশ্বতট আর্তকলরবে :** তটের ওপর তরঙ্গের আছাড় খাওয়া ও তার ধ্বনিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। **সম্মুখ ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ :** যে কাতরস্বরে ডাকে তাকেও একদিন চলে যেতে হয়। অথচ এই মৃত্যুর লীলার মধ্যে প্রেমের কি অপূর্ব প্রকাশ।

বিশ্বের অবোধ বাণী : বিশ্ববাসী সব কিছু দেখে ও বোঝে তবুও মন প্রবোধ মানে না। **দণ্ডে দণ্ডে টুটিছে গরব :** মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বার বার তার গর্ব চূর্ণ হচ্ছে। তথাপি, প্রেমের বলে সে মনে করে, প্রিয়বস্তু একান্তভাবে তারই, তাকে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। **সত্যভঙ্গ হবে না বিধির……চির অধিকারলিপি :** প্রেম মৃত্যু অপেক্ষা নিজেকে অধিকতর সত্য বলে মনে করে। প্রিয়বস্তুকে চিরন্তনরূপে পাবার অধিকার তার আছে। যে অকম্পিত প্রত্যয়বলে মানুষ উচ্চকণ্ঠে প্রেমের এতবড় অধিকার ঘোষণা করে, কবি সেই অনির্বাণ প্রত্যয়ের মূলে বিধাতার অদৃশ্য বিধানই দেখতে পেয়েছেন। নতুবা দুর্বল মানুষের মুখে এতবড়ো অধিকারের ঘোষণা উচ্চারিত হত না। **সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে, ইত্যাদি :** মৃত্যুর সম্মুখে প্রেমের বাস্তব দুর্বলতা অথচ আভ্যন্তরীণ অপরাজেয় শক্তির কথা বলা হয়েছে। **মরণ পীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম, ইত্যাদি :** মৃত্যু সত্য জেনেও প্রেমের ধারা আজও বহমান। বরং মৃত্যুর বাধাই প্রেমকে প্রবল করে তুলেছে। বিচ্ছেদের আশঙ্কা বেশী বলেই সে অধিকতর আগ্রহে প্রিয়বস্তুকে ধরে রাখতে চায়। সেই প্রেম বিষাদযুক্ত এবং 'কখন হারাই'—এই ভয়ে সদা শঙ্কিত।

চঞ্চল স্রোতের নীরে………মেঘের সে মায়া : এই অপূর্বসুন্দর উপমার সাহায্যে কবি অনিত্য সংসারে প্রেমই যে একমাত্র নিত্যবস্তু তা বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে বিশ্বের নিত্যচলমান, মৃত্যু-আকীর্ণ সৃষ্টিপ্রবাহই 'চঞ্চল স্রোতের নীর' এবং মানবহৃদয়ের চিরস্থির প্রেমই হ'ল ওই প্রবহমান স্রোতধারার উপরকার 'অশ্রুবৃষ্টিভরা মেঘ'। 'দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব'—এ কারণে প্রেম চিরকাল অশ্রুসিক্ত। মর্মান্তিক বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সমস্ত সংসারকে একটা নিদারুণ বিষাদের ঘন আস্তরণে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। **তরুর মর্মরের এই ব্যাকুলতা ইত্যাদি :** কবি প্রকৃতির মধ্যেও বিচ্ছেদ-ভীরু প্রেমের শঙ্কিত ভাব লক্ষ্য করেছেন। বিশ্বের মধ্যেও একটি ক্রন্দনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে। **শুনিয়া উদাসী :** এখানে

বসুন্ধরাকেও কবি অসহায়া বিষাদব্যাকুল রূপে লক্ষ্য করেছেন। পৃথিবীর সুন্দর বর্ণনা। তুলনীয়—"আমরা একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্য ক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তার পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিম কালের কথা ভাবছেন।"

।। প্রশ্নোত্তর ।।

১। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ছবিকে অবলম্বন করে কবি যে দার্শনিক উপলব্ধিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তা বিবৃত কর।

উত্তর ঃ 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ছবি বর্ণিত হয়েছে। পূজার ছুটির শেষে কর্মক্ষেত্রে প্রবাসে চলে যেতে হবে। সমস্তরকম বাঁধাছাঁদা সম্পূর্ণ। গৃহিণী নানা জিনিষ দিয়ে বোঝা বাড়িয়ে চলেছে। গৃহস্বামীর অনুযোগে কর্ণপাত না ক'রে বিদেশে হঠাৎ প্রয়োজন হতে পারে এমন সকল জিনিষ দিয়ে বোঝা ভারী করা হয়েছে। যখন সকলে এই কাজে ব্যস্ত তখন চার বছরের কন্যা আপন মনে বিদায়ের এই আয়োজন নির্বিকার চিত্তে অবলোকন করছিল। অন্যদিন তার স্নান ও আহার এতক্ষণে হয়ে যায়। আজ ব্যস্ততার দিনে তার কেউ যত্ন নেয়নি। তাই ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে দ্বারপ্রান্তে বসে পড়েছিল। যখন বিদায়ের মুহূর্ত এল তখন কন্যাকে বিদায় জানাতে গেলে সে কেবল দুটি কথা বলে—'যেতে নাহি দিব'। এই স্নেহ-অধিকারের সুরটি তীব্রভাবে আঘাত করে কবির চিত্তে।

কবি এইটুকু মানবিক অধিকারের ঘোষণা অবলম্বন ক'রে যে উপলব্ধি অর্জন করলেন তাতে দেখা যায় যে সমগ্র পৃথিবীতে চলেছে বিদায়ের আয়োজন। জড় প্রকৃতি ধ্বংসের মধ্যে বিদায়ের বাণী ঘোষণা করে। চিরকাল কিছুই ধরে রাখা যায় না। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে মানব ও জড়ের এই অকারণ অবারণ চলার বেগ সঞ্চারিত। মৃত্যু মানুষের জীবনে কঠিন সত্য। এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। তথাপি মানবমন চিরন্তন প্রেমের জয় ঘোষণা করে চলেছে। ধরে রাখার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেমন মানবের ক্ষেত্রে সত্য তেমনি সত্য এই বসুন্ধরার ক্ষেত্রে। পথে চলতে চলতে প্রকৃতির বিপুল ব্যাপক রূপ চোখে পড়ে। মনে হয়, সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে এক মর্মান্তিক সুর ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তৃণ ক্ষুদ্র, তথাপি তাকে বক্ষে বেঁধে মাতা বসুমতী প্রাণপণে যেন বলছেন, 'যেতে নাহি দিব'। এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে সবচেয়ে গভীর ক্রন্দন ধ্বনিত হয়ে চলেছে।

পিছনের ঢেউ সম্মুখের ঢেউকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু নিয়তির নিয়মে তা বার বার ব্যর্থ হয়। তথাপি বসুন্ধরার এই আকাঙ্ক্ষা দমিত হয় না। বিশ্ববিধানের নিয়মে যেমন ধ্বংস ঘটে চলেছে ঠিক তেমনি এই চরাচর একই নিয়মে প্রিয়জনকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কবি কন্যার কণ্ঠস্বরে যে প্রেমের অধিকার শুনেছেন তা ব্যাপ্ত হয়েছে বিশ্বচরাচরে। ব্যক্তি-বেদনা বিশ্ববেদনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষ ও প্রকৃতি যা পায় তা হারায়—তবুও প্রেমের গর্বোদ্ধতশির নত হয় না। প্রেম পরাভব মানতে জানে না। বিধাতার অঙ্গীকারেই মানুষের এই অধিকার স্বীকৃত। তাই বিশ্বচেতনা মৃত্যুকে অস্বীকার করার গর্ব দেখাতে পারে।

কবি বিয়োগবিধুর বসুন্ধরার এই ম্লান মুখখানি অবলোকন করেন। বসুন্ধরা ব্যথার অশ্রুজলে ধৌত করে সকল কালিমা। সংসারের ক্ষুদ্র একটি বিদায়ের ক্ষণ এইভাবে কবির সত্য-উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে। কবি বিশ্বের চিরন্তন বিয়োগ ব্যথার সুরটি অনুভব করেছেন। সার্বজনীন অনুভূতির স্তরে তা উন্নীত হতে পেরেছে। বিদায়ের করুণ সুর ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বসুন্ধরার সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হয়েছে। কবির এই দার্শনিক উপলব্ধি কবিতাটির প্রাণবস্তু। ভাব, ভাষা, চিত্রকল্প ও ঘটনাবিন্যাস কবিতাটিকে অপূর্ব মাধুর্য দান করেছে। বিদায়ের এই বিশ্বজনীন করুণ চিত্রটিও আমাদের হৃদয় মথিত করে।

২। কন্যার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কর্মস্থানের উদ্দেশে চলিতে চলিতে পথে' পিতার হৃদয়ে যে নিগূঢ় বেদনাময় অনুভব জেগেছিল তার পরিচয় দাও। [ক. বি. ১৯৮৩]

উত্তর ঃ—প্রবাসযাত্রী পিতা শিশুকন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রস্থান করে। গৃহজীবনের নিবিড় সুখ ও শান্তি ত্যাগ ক'রে কর্মপথে যাত্রা করতে হয় জীবনের চিরন্তন নিয়মে। স্নেহমায়া মমতার বন্ধনে আমরা পরস্পর বদ্ধ। আমরা প্রিয়জনকে কখনই ত্যাগ করতে চাই না, কিন্তু গতিশীল জগৎ সর্বতই আমাদের প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে চলেছে। পথে যেতে যেতে পিতার হৃদয়ে একটি সুনিবিড় অনুভূতির উদয় হ'ল। পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যেই কবি এই চলমানতা উপলব্ধি করলেন। মানব মানবী বৃক্ষলতা, অসংখ্য কীট ও প্রাণী সকলেই আপন প্রিয়জনকে কাছে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সকল বন্ধন ছিন্ন ক'রে তারা চলে যায়। পুরাতনের বিদায় ও নতুনের অভ্যুদয় এই বিশ্বসংসারের চিরকালীন নিয়ম। কিন্তু ব্যথাভরা ক্রন্দনগীতে বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিশ্বনিয়মের অমোঘতার বিরুদ্ধে মানবহৃদয়ের প্রেম ভালবাসার আর্তি যেন বিশ্বচরাচরে সুগভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। অন্ধকারের গর্ভ থেকে প্রদীপকে আকর্ষণ ক'রে কে যেন তার মৃত্যু রোধ করার চেষ্টা করে। সম্মুখের ঊর্মিকে পশ্চাতের ঊর্মি বারবার সম্মুখে চলা থেকে নিবৃত্ত করতে চায়; কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করে না। এই সমগ্র বিশ্বই যেন শিশুর মতো অবোধ বাণী উচ্চারিত করে বলে চলেছে 'যেতে নাহি দিব'। এই

অবোধ বাণীর গরব দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে ব্যর্থ হয়। তবু প্রেমের গর্ব ও দাবীর জোরে বিদ্রোহের ভঙ্গীতে সেই বাণী পরাভব স্বীকার করতে চায় না। বারবার পরাজয়ের পরও প্রেম প্রীতি ভালবাসা তার অধিকার রক্ষায় সযত্ন হয়। মৃত্যুকে অস্বীকার করার চির অধিকার লিপি ভালবাসার হৃদয়ে জন্মলাভ করে। ভূপতিত তরুর দিকে চেয়ে নবীন তরু বার বার মৃত্যুকে, ধ্বংসকে অস্বীকার করে। তাই কবির অন্তরে মর্তপ্রীতির সুগভীর অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। চিরজীবী প্রেম এই সবল সংসার আচ্ছন্ন করে আছে। মানবজীবনের আশাহীনতা সমগ্র জগৎসংসারে বিষাদের কুয়াশা ছড়িয়ে দিলেও কবি নিশ্চিত জানেন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাণের সজীবতার স্পন্দন কোনদিন লুপ্ত হবে না। অবোধ কন্যার উক্তির মধ্যে দিয়ে কবির এই উপলব্ধি আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমগ্র বসুন্ধরার বিষাদমূর্তি কবির অন্তরে প্রতিভাত হয়েছে। বসুন্ধরা এলোচুলে দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে হিরণ্য অঞ্চল বিছিয়ে বিষাদমগ্ন চিত্তে দূর নীলাম্বরের দিকে চেয়ে আছেন। কবিচিত্ত এই বিষাদ প্রতিমা দর্শনে বেদনাবিদ্ধ হয়েছে। তাই ধ্বংস সংকুল পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে বার বার প্রেমের পরাভবে কবির অন্তর নিগূঢ় বেদনায় বিদ্ধ হয়েছে। এই বেদনার আলম্বন বিভাব চার বৎসরের কন্যার কাতর আবেদন—'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু বিশ্বচরাচরে সবাইকে যেতে দিতে হয়। তাই কবির অন্তরে পেয়ে হারাবার তীব্র বেদনাবোধ সঞ্চারিত।

প্রশ্ন ৩। "যেতে নাহি দিব" কবিতার মূলভাবটি পৃথিবীর প্রতি গভীর আসক্তি। আবার সে আসক্তি বিজ্ঞ বয়ঃপ্রাপ্তের নহে।"—আলোচনা কর।

উত্তর: ছুটি উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট কটি দিন গৃহে কাটিয়ে গৃহকর্তা কর্মস্থলে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছেন। বিদায়লগ্নে সকলেরই মন ভারাক্রান্ত। কিন্তু কর্তা ও গিন্নী—সংসারের নিয়ম জানেন। জীবিকার তাগিদ প্রিয়সঙ্গ সুখের চেয়ে বড়ো তাঁদের কাছে। তাই মনের মধ্যে যে অস্ফুট কান্না গুমরে উঠেছে, তাকে চাপা দেবার জন্য তাঁরা বস্তুগত সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর দিয়েছেন। সংসারের অভিজ্ঞতা তাঁদের বস্তুমুখী করে তুলেছে। ভাবপ্রবণতার হাতে পুরোপুরি তাঁরা ধরা দিতে চান না। কিন্তু চার বছরের শিশুকন্যাটি জাগতিক নিয়ম কানুনের ধার ধারে না। এ যেন সেই "We are Seven" কবিতার অবুঝ গ্রাম্য বালিকা—যে জীবন ও মৃত্যুর ভিন্নতা স্বীকার করে না। এই পরিবর্তনশীল, কর্মচঞ্চল জগতে স্নেহের মূল্য কতটুকু তা সে জানে না। তাই ছোট দু'হাত দিয়ে গমনোদ্যত পিতাকে সে ধরে রাখার স্পর্ধা দেখায়।

বস্তুতঃ "সোনার তরী" পর্বে কবি অপসৃয়মান সৌন্দর্যকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন, প্রেমকে মৃত্যুর শাসনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চেয়েছেন। একালে কবি-হৃদয়ের যে বিশেষ ভাবনাটি চোখে পড়ে, তা ঐ চার বছরের শিশুকন্যার অবুঝ মনের সমধর্মী। এই প্রসঙ্গে সু-সমালোচক প্রমথনাথ বিশী বলেছেন: "এই শিশুকন্যার

ক্রন্দন আমাদের সকলের জীবনেই রহিয়াছে। পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমরা শিশু বই কি।"

আলোচ্য কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, মানুষ ধ্বংসময় বিশ্বে প্রেমের নীড় বেঁধেছে। জড়শক্তির আঘাতে বারবার বিধ্বস্ত হচ্ছে। মানুষ মৃত্যুকে বা জড়শক্তিকে সত্য বলে জানছে ; কিন্তু তাকে শেষসত্য ব'লে স্বীকার করছে না। শিশু কন্যাটির মতো ম্লানমুখে সে গমনোন্মুখ প্রিয়জনের কাছে অভিমান জানায়—"যেতে আমি দিব না তোমায়"।

মনে রাখা দরকার, মৃত্যুর ট্র্যাজেডি বা প্রেমের করুণ পরিণাম সংক্রান্ত কোন তত্ত্বালোচনা এ কবিতায় প্রাধান্য লাভ করে নি। সৃষ্টির বেদনাময় অনিত্যতার দিকটি উপলব্ধি ক'রে কবির হৃদয়টি অভিমানাহত হয়ে উঠেছে। কবিতাটির পংক্তিতে একটা অবুঝ ক্রন্দনের রেশ ধ্বনিত হয়েছে।

প্রঃ ৪। 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবি বিশেষ এক কাহিনীসূত্র অবলম্বন ক'রে এক নির্বিশেষ তত্ত্বলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি দেখিয়েছেন।'

অথবা,

"একটি ক্ষুদ্র সংসারজীবনের ব্যর্থ স্নেহ, অসহায় মানুষের একটি সাধারণ অনিবার্য হৃদয়বেদনা অপূর্ব কল্পনাশক্তির যাদুমন্ত্রে নিখিলবিশ্বের অন্তর্লীন মর্মব্যথায়, আদিমাতা ধরিত্রীর বেদনাপীড়িত সন্তানমমতায় এক সর্বব্যাপী বিষাদ-সংগীতে রূপান্তরিত হইয়াছে।"

—"যেতে নাহি দিব" কবিতাটি অবলম্বনে উপরোক্ত উক্তিটির ব্যাখা কর।

[প্র ঃ ১ দ্রষ্টব্য]

প্র ঃ-৫। "যেতে নাহি দিব" কবিতায় পূজার ছুটির শেষে স্ত্রী-কন্যার নিকট হতে গৃহস্বামীর বিদায়গ্রহণের যে করুণ ছবিটি পাওয়া যায়, নিজের ভাষায় তা পরিস্ফুট কর।

(৩নং প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)

প্র ঃ-৬। "যেতে নাহি দিব' কবিতাটি মরণপীড়িত সেই চিরজীবী প্রেম-এর অসম সংগ্রামের করুণ পরিণতির বিষাদময়তায় পূর্ণ"— আলোচনা কর।

(ভূমিকা ও ভাবসত্য দ্রষ্টব্য)

প্র ঃ-৭। 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির অন্তর্গত একটি নিসর্গচিত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[রৌদ্রদীপ্ত, শস্যশ্যামলা, প্রশান্ত শরৎ-প্রকৃতির একটি সুন্দর বর্ণনা এই কবিতায় আছে। "চলিতে চলিতে হেরি ....নীলাম্বরে শুয়ে" অংশটি অবলম্বনে এর উত্তর রচনা কর]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১। "কী গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী"

—কোন কবিতার পংক্তি? কবির নাম ও কাব্যগ্রন্থটির নাম লেখ। কোন দুঃখের কথা বলা হয়েছে?

উত্তর ঃ উদ্ধৃত অংশটি 'যেতে নাহি দিব' কবিতার পংক্তি। এটি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী' কাব্যের একটি বিশিষ্ট কবিতা।

প্রবাসী পিতা কন্যার আকুল আবেদন উপেক্ষা ক'রে চাকুরীক্ষেত্রে চলে যায়। চার বৎসরের কন্যার ব্যাকুল আবেদন পিতার হৃদয়ে বেদনার সৃষ্টি করে। কারণ পিতাকে যেতে দিতে রাজী নয় অবোধ কন্যা। তবু যেতে দিতে হয়। পিতা পথে যেতে যেতে এই বিশ্বসংসারের মধ্যে অনাদি অনন্তকালের বেদনা লক্ষ্য করলেন। চার বৎসরের কন্যার যে অধিকার সেই অধিকার বার বার লঙ্ঘিত হয়। কারণ প্রেমের ও ভালবাসার পরাভব নিত্য ঘটে চলেছে। তাই এই পৃথিবী ও আকাশ সেই বেদনাভারে অবনত হয়ে আছে। কবি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে অনুভূতি লাভ করেছেন প্রবাসী পিতার মধ্যে তার স্বতোৎসারিত প্রতিচ্ছবি আমরা লক্ষ্য করি। বিদায় জানানোর ইচ্ছা না থাকলেও আমাদের প্রিয়জনকে ছেড়ে দিতে হয় এবং দুঃখ হৃদয়ে বহন করতে হয়। পেয়ে হারানোর দুঃখই সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছে।

২। —"তবু প্রেম বলে
'সত্যভঙ্গ" হবে না বিধির'

কোন কাব্যগ্রন্থের ও কোন কবিতার পংক্তি? বিধির সত্যভঙ্গ বলতে কি বোঝ?

উত্তর—'সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা থেকে উক্তিটি উদ্ধৃত।

মানবজীবনে প্রেম অনেক উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। আমরা যাকে ভালবাসি তাকে চিরকাল রক্ষা করতে চাই সকল ধ্বংসের হাত থেকে। অথচ জীবনের চলার পথে সব কিছুই একদিন ধ্বংস হয়। ভালবাসার পাত্রকে ছেড়ে দিতে হয়। তথাপি প্রেম এমন এক মহান অধিকার অর্জন করেছে যার বলে বিধির চিরকালীন নিয়মকে সে অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাতে পারে। এখানেই প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার জয় ঘোষিত হয়েছে। যে বিধি এই বিশ্বে ধ্বংসের নিয়ম সৃজন করেছেন সেই বিধিই মানুষের অন্তরে প্রেম প্রীতির উৎস সঞ্চার করেছেন। সুতরাং সেই বিশ্বাসের বশেই মানুষ ভালবাসার অধিকারে প্রীতির অধিকারে প্রেমের চিরন্তনত্ব রক্ষায় দৃঢ়চিত্ত। কারণ বিধির সত্যভঙ্গ করার অধিকার কারও নেই। তাই ভালবাসার গর্ব চির

উন্নত ও মহান। বিশ্বের চলমানতার সঙ্গে সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে প্রেমের চিরন্তনত্ব। সুতরাং প্রেম কখনও পরাভব মানতে পারে না। আর সেই সঙ্গে বিধির সত্যভঙ্গও হবে না।

৩। শুভ্রখণ্ড মেঘ

মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত

সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত

নীলাম্বরে শুয়ে''

অংশটি কোন কবির কোন কবিতার অন্তর্গত ? সংক্ষেপে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

কবি এখানে নীল আকাশে শুভ্রমেঘের অপূর্ব সৌন্দর্য ও অবস্থান বর্ণনা করেছেন। পুঞ্জে পুঞ্জে মেঘ নীল আকাশের বুকে রৌদ্রোজ্জ্বল শুভ্রতা রচনা করেছে। এই দৃশ্য দেখে কবির মনে হয়েছে যেন মাতৃদুগ্ধপানের পর পরম পরিতৃপ্তিতে সদ্যোজাত গোবৎস নীল আকাশের বুকে সুখনিদ্রায় মগ্ন। এখানে উপমার সাহায্যে নীল আকাশের পটভূমিতে শুভ্র পুঞ্জ মেঘের যে বর্ণনাটি করেছেন এবং তার ফলে আমাদের মনে যে চিত্রকল্পটি ফুটে উঠেছে তা যেমন সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয়। প্রকৃতির এমন নিখুঁত বর্ণনা বাংলাকাব্যে কদাচিৎ মেলে। পৃথিবী ও প্রকৃতিকে গভীরভাবে ভালবাসলেই এইরূপ একটি অনবদ্য চিত্র কল্পনায় আসে।

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে শুধু ভালবাসেন না। প্রকৃতির সঙ্গে তিনি একটি সুনিবিড় আত্মীয়তা অনুভব করেন। তাঁর সমগ্র কাব্যপ্রবাহে এই ধারাটি পরিলক্ষিত হয়। এখানেও কবি-প্রকৃতির সেই বৈশিষ্টটি লক্ষ্যণীয়।

৪। "ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,

তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার

এক দণ্ড তরে।"

—উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে ? কার কাঁদবার সময় কিজন্য নাই ?

উত্তর :—পূজার ছুটির শেষে বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হয় গৃহকর্তাকে। কারণ প্রবাসে চাকুরীর জন্য যেতে হবে। গৃহিণী অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। আসন্ন বিরহের ব্যথা গৃহিণীকে কাতর করে। কারণ দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকতে হবে তার স্বামীকে।

'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঘরের গৃহিণীর চক্ষু ছল ছল রূপটি চিত্রিত করেছেন। বিদায় বেদনায় হৃদয়ে পাষাণের ভার। তবুও মনোবেদনা প্রকাশ করার সময় নেই। কারণ প্রবাসে স্বামীর কত কি প্রয়োজন তা নিঃশব্দে সাজিয়ে দিতেই তিনি ব্যস্ত। তা ছাড়া যাত্রার পূর্বমুহূর্তে

চোখের জল অশুভ। তাই হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হলেও প্রকাশ্যে ক্রন্দন চলে না। বিদায়ের আয়োজনে গৃহিণী এমনই ব্যস্ত যে কাঁদবার সময় পর্যন্ত তার নাই। বেদনায় বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেলেও মুখে তার কোন প্রকাশ নেই গৃহিণীর। কারণ কর্তব্য হৃদয়াবেগের থেকেও বড়। বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত কর্তব্যরত গৃহিণীর এতটুকু সময় নেই কাঁদবার।

৫। "যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি

ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক নিঃশব্দ নিঝুম;"

কোন কাব্যগ্রন্থের কোন কবিতা থেকে পংক্তিটি উদ্ধৃত ?

'রৌদ্রময়ী রাত্রি' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ঃ—রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের "যেতে নাহি দিব" কবিতা থেকে পংক্তিটি উদ্ধৃত।

হেমন্ত-মধ্যাহ্নে প্রবাসে চাকুরীরত গৃহকর্তা বিদায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। দূরে চলে যেতে হবে কর্তব্যের প্রয়োজনে। নীরব নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরকে কবি রৌদ্রময়ী রাত্রির সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রাত্রি কখনই রৌদ্রময়ী হতে পারে না। কিন্তু এখানে রাত্রির নির্জনতা ও নীরবতার সঙ্গে রৌদ্রতপ্ত নির্জন ও নীরব দ্বিপ্রহরের এমনই গভীর ও অন্তরঙ্গ মিল যে কবি নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরকে বলতে চান একটি রৌদ্রময়ী রাত্রি। রাত্রি যেমন নিস্তব্ধ ও নিঝুম হেমন্ত মধ্যাহ্নও তেমনি নিস্তব্ধ ও নিঝুম। সাধারণ ধর্মগত এই সাদৃশ্য কবিকে এই উপমাটি ব্যবহার করতে উদ্বোধিত করেছে।

৬। "মেঠো সুরে কাঁদে অনন্তের বাঁশী

বিশ্বের প্রান্তর মাঝে"

—উক্তিটি কোন কবিতার অংশ ? 'অনন্তের বাঁশী' বলতে কি বোঝানো হয়েছে। সেই বাঁশী কান্নার সুর তোলে কেন ?

উত্তর ঃ—রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'যেতে নাহি দিব' কবিতা থেকে পংক্তিটি উদ্ধৃত।

নশ্বর পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। মানবজীবনের প্রেম প্রীতি ভালবাসা সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। কবির অন্তরে যে অনুভূতিটি এখানে প্রবল তা হ'ল পৃথিবীতে প্রিয়জনের জন্য যত আকুলতা থাক না কেন, সেই আকুলতা ও অনুরাগ কখনই শাশ্বতকালের রূপ ধরতে পারে না। এই ধরণীর সকল কিছুর মধ্যেই একটি অনিত্যতা বর্তমান। তরুর মর্মরে, নদীর প্রবাহে, মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ুর মধ্যে কবি উদাসী পৃথিবীর মর্মব্যথা নিত্য মর্মরিত হতে শুনছেন। বসুন্ধরা সকল ঐশ্বর্য নিয়ে সৌন্দর্যের পাত্রখানি পূর্ণ রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু মহাকালের ধাবমান প্রবাহ সবকিছু ধ্বংস করে চলেছে। 'অনন্তের বাঁশি বলতে পেয়ে হারানোর বেদনায় বিবশ বসুন্ধরার অন্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ধরিত্রীর অন্তর দেশটি ব্যথাদীর্ণ। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ তার অন্তরে প্রতিনিয়ত হাহাকার সৃষ্টি করছে। বাঁশিতে কান্নার সুর ধ্বনিত হবার কারণ প্রিয়জনের জন্য অভাববোধ।

বসুন্ধরা

ভূমিকা—

যে-অভূতপূর্ব রোমান্টিক কল্পনার বলে কবি 'অহল্যার প্রতি' ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর সঙ্গে জন্মান্তরীণ আত্মীয়তা অনুভব ব্যক্ত করেছেন, আলোচ্য কবিতায় তা-ই সুচারুরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কবি তাঁর এই অনুভূতিকে সর্বানুভূতি বলেছেন ; সমালোচকগণ বিশ্বানুভূতি বা বিশ্বাত্মবোধ আখ্যা দিয়েছেন। কবিতাটির শেষের দিকে কবির স্থায়ি মর্ত্যপ্রীতির প্রকাশ লক্ষণীয়।

পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্যে উনবিংশ শতকে যে রোমান্টিক ভাবপ্রবাহ— বস্তুর অতীত সত্তাকে দেখার যে আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছিল তা-ই আরো গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়ে স্বতন্ত্র কল্পনার মধ্যে রবীন্দ্রকাব্যে সার্থক পরিণতি লাভ করেছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সকল সুখ-দুঃখকে অতিক্রম ক'রে কবি জন্মান্তরের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে বা প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন ঃ

"সেই জন্মপূর্বের স্মরণ
গর্ভস্থ পৃথিবী' পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

আমরা যে কেবল বর্তমান জগতের তা নয়, আমরা জন্মজন্মান্তর ধরে নানারূপে পৃথিবীর মধ্যে অভিব্যক্তির ধারা পথ পর্যটন করে চলেছি। তাই যখন আমরা অকারণে উৎকলিত ও ব্যথাতুর হ'য়ে উঠি তখন আমাদের অজ্ঞাতসারে পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুভূত সুখ-দুঃখই স্মৃতিপথে উদিত হয়। আমরা সকলেই জাতিস্মর। এটাই রোম্যান্টিক ব্যাকুলতার স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাকুলতা সম্বন্ধে কবি কালিদাস বহুপূর্বেই আপন অভিমত প্রকাশ করেছেন ঃ—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তৎ চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্বং
ভাব স্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি ॥"

অর্থাৎ, "রম্য বস্তু দর্শনে বা মধুর ধ্বনি শ্রবণে সুখী ব্যক্তির চিত্ত-ও যে উন্মনা হয়ে পড়ে তার কারণ তার অজ্ঞাতসারে পূর্ব পূর্ব জন্মে আস্বাদিত ভাবসমূহ তার স্মৃতিপথে উদিত হয়।" এই নিগূঢ় জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যের বলেই কবি রবীন্দ্র প্রকৃতির দুর্বোধ্য ভাষা বুঝতে পারেন।

এই কবিতাটির ভূমিকা স্বরূপ নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিগুলি অনুধাবনযোগ্যঃ-

'এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার ও অনেক জন্মকার ভালবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নূতন। আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূর ব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি' বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করেছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম-জীবনোচ্ছ্বাস গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে—তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যলোক পান করেছিলাম, নব শিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হতো··· তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্প অল্প মনে পড়ে"

(ছিন্নপত্র)

* * *

"সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্ব ধারায় বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে [অর্থাৎ জীবনদেবতাকে] অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি— সেইজন্য এতোবড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

······আমি কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই, অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল-তরুলতা-পশুপক্ষী-চন্দ্রসূর্য-দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য।"

(আত্মচরিত)

* * *

'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় কবি তাঁর 'আকার প্রকারহীন তৃপ্তিহীন এক মহাআশা' সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, বসুন্ধরা কবিতায় তারই স্বরূপটি বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন। কবিতাটি কবির রোম্যান্টিক কল্পনার এক অদ্ভুত প্রসারের পরিচয় বহন করছে। মানবের প্রাণ অনন্ত তৃষ্ণাভরা। বিশেষ করে কবিপ্রাণ। সর্বানুভূতি ও সন্ধানপরতা প্রতিভার মূল লক্ষণ। তাই, কবি অসীম সম্পৎশালিনী বসুন্ধরার ও পৃথুলা পৃথ্বীর কোলে থেকে জীবনের স্বাদ গ্রহণে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। কবি বিচিত্র

বিশ্বজীবনের স্বাদ বার বার ভোগ করে তাঁর প্রাণের অনন্ত আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে চান। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধের দ্বারাই জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু তাঁর এই দুরন্ত আশা কি মেটা সম্ভব হবে? সমালোচকের এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় না, তা সম্ভব হবে না। কারণ, এই অনন্ত তৃষ্ণা ও অকারণ বিরহ কবির স্বভাবসঞ্জাত। এই সুদূর আকাঙ্খার বশবর্তী হয়েই কবি বসুন্ধরার মর্মে প্রবেশ করতে চেয়েছেন, প্রকৃতির রূপের মধ্যে সৌন্দর্যমূর্তির প্রকাশ লক্ষ্য করে তার সঙ্গে মিলনের জন্য নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছেন। কবিচিত্তের এই অতৃপ্তিই ক্রমশ তাঁকে অধ্যাত্মব্যাকুলতার মধ্যে ও জীবনরহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে।

'বসুন্ধরা কবিতাটিতে কবির ব্যাকুল আকাঙ্খার পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করার ইতিহাস বিবৃত হয়েছে সত্য কিন্তু তার, সঙ্গে কবির আর একটি অসাধারণ কল্পনা যুক্ত রয়েছে। তা হল বসুন্ধরার মাতৃরূপ কল্পনা এবং জগতের সর্বত্র প্রাণের স্পর্শ-অনুভব। কবি যে বসুন্ধরাকে জননীরূপে কল্পনা করেছেন তা কাব্যের খাতিরে উপমা-প্রয়োগ মাত্র নয়, ওই ভাবটি তাঁর কল্পনায় অনুভূত সত্য :

যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ
শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান
শত লক্ষ সুরে উচ্ছ্বসি উঠিছে নৃত্য
অসংখ্য ভঙ্গিতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত
ভাবস্রোতে, ছিদ্রে ছিদ্রে বাজিতেছে বেণু;
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি শ্যাম কল্পধেনু—"

—এই কল্পনা ও অনুভব এটাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। এই অনুভূতি অন্যান্য কবিদের কাব্যে দৃষ্ট সাধারণ প্রকৃতিপ্রীতি থেকে ভিন্ন। য়ুরোপীয় কবিগণের কাব্যে রোমান্টিক ভাবনার বিভিন্নমুখী উত্তম পরিচয় থাকলেও, বসুন্ধরাকে প্রাণময়ী জননীরূপে দেখা ও তার সঙ্গে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্য-কল্পনা তাঁদের কাব্যে দেখা যায় না। এজন্য অনেকে মনে করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কবি বলে প্রাচীন ভারতীয় মানসের বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিকে অর্থাৎ তৃণতরুলতাকে প্রাণময় ব'লে মনে করা—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সহজেই প্রতিফলিত হয়েছে। এরূপ উক্তি অবশ্য অসমীচীন নয়। প্রাচীন চিন্তা ও কল্পনা সংস্কাররূপে কবিমানসে এইরূপ কল্পনার জন্ম দিতে পারে। অনেকে আবার কবির এরূপ অসাধারণ কল্পনার জন্য উপনিষদের [যদিং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' প্রভৃতি বাণী] এবং বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বের প্রভাব অনুমান করেছেন। কেউ কেউ উল্লিখিত প্রকৃতির প্রাণময়তার জন্য জার্মান দার্শনিক শেলিং এর প্রভাব, জন্মান্তরীণ অনুভবের জন্য নব্য প্লেটোনিক কবিদের প্রভাব প্রভৃতি কল্পনা করেছেন।

আমরা কিন্তু কবিমানসের উপর এরূপ তত্ত্বের প্রভাব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। কারণ তত্ত্বকে সম্মুখে রেখে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা সম্ভব নয়। তা ছাড়া

রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ কবিতাবলীতে যে এরূপ জড়ের প্রাণময়তত্ত্বের কল্পনা রয়েছে এমন নয়, তাঁর কবিমানসের স্বরূপ এই। জন্মান্তরীণ অনুভূতির জন্য বা প্রকৃতিকে প্রাণবান মনে করার জন্য পাশ্চত্য দর্শনের প্রভাব অনুমানের প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে এই চিন্তা নানাভাবে এত বিস্তার লাভ করেছে যে, তা আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপর বহিরাগত তত্ত্বের প্রভাব অস্বীকার করে বলা যায়ঃ 'সাহিত্যে এ যাবৎ অদৃষ্ট এই বিস্ময়কর বিশ্বাত্মবোধের উৎসমূলে কোনো দার্শনিক ধারনা প্রচ্ছন্ন নেই। ইহা কবির স্বতঃউৎসারিত সুপরিণত রোমান্টিক হৃদয়ের আত্মসর্বস্ব ভাবব্যকুলতা মাত্র।' কবি-আত্মার এই অদ্ভুত স্বতঃ প্রসারের দিকটি সম্পর্কে অবহিত না হলে অদ্বৈতবাদ প্রভৃতির প্রভাব অনুমান করা বিচিত্র নয়। কবির মানত ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি ঐ রকম অনুমানের পোষকতাও করতে পারে। বস্তুত, কবির এই নিগূঢ় বিশ্বাত্মবোধ থেকে আমরা মননের দ্বারা অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হতে পারি বটে, কিন্তু ঐ তত্ত্বকে কবির অনুভূতির পূর্বে স্থাপনের কোনো যৌক্তিকতা নেই। উপনিষদের কোনো বাণী, যেমন, 'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' এর মূলে, রয়েছে, এমন কল্পনা করলে কবির এই অপূর্ব কাব্য উপলব্ধির আন্তরিকতায় সন্দেহ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম-অনুভূতিপ্রবণ কবিমানসের বিচারে পূর্বনির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব আরোপ করা একান্তই অসমীচীন।'

এই কবিতায় কবির বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক মনোভাবের প্রকাশ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। যেমনঃ

> 'আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
> অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
> সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
> যুগযুগান্তর ধরি।'

অথবা—

> মহামেরুদেশে * * *
> যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আসে দিন
> শব্দশূন্য সংগীতহীন'—ইত্যাদি।

এটা বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব নয়। আধুনিক কালের কল্পনা আত্মপ্রকাশের জন্য অনায়াসেই আধুনিক চিন্তাকে আশ্রয় করেছে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, যুগে যুগে কবির মনোভাব যেমন অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়—তেমনি, নূতন নূতন উপকরণ গ্রহণ করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু কবি নানাস্থানে তৃণ-তরুলতার ও জীব জগতের সঙ্গে যে নিজের জন্মান্তরীণ একাত্মতা কল্পনা করেছেন তাতে কেউ কেউ পাশ্চাত্ত্য অভিব্যক্তিবাদের [Theory of Evolution এর] প্রভাব দেখেছেন। কিন্তু আমরা এরূপ মনোভাবকে কবির সর্বানুভূতির প্রকাশ বলেই মনে করি। আমরা মনে করি, অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে কোন কোনে অংশে যে মিল রয়েছে তা আপনা থেকেই ঘটেছে। 'বিজ্ঞান আশ্রয়ী যান্ত্রিকঅভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে কবির এই একাত্মক তত্ত্বের

বাইরের দিক থেকে একটা মিল দেখা গেলেও অমিল গুরুতর। কারণ, সংগ্রাম, বিরোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতামূলক জীবধর্ম ঐ অভিব্যক্তির মূলে। কিন্তু কবির অভিপ্রেত মহা-আত্মীয়তাবন্ধন-অনুভব নিশ্চয়ই সর্ববিধ জৈবসম্পর্কমুক্ত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলোপময় মিলনের বা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ—অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নয়। যাই হোক, কবির এ মনোভাব কোনো তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। এ আশ্চর্য কবিকল্পনা মাত্র।'

কবির মনোভাব অনুসারে 'বসুন্ধরা' কবিতাটিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথমাংশে কবির বিশ্বের সর্বত্র নিজের বাসনাকে প্রেরণ করার আগ্রহ। দ্বিতীয়াংশে বসুন্ধরার আশ্চর্য জননীরূপ ও বসুন্ধরার সর্বাংশে বিস্তৃত প্রাণের হিল্লোল বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয়াংশে বা উপসংহারে কবি পৃথিবীর সহিত মিলনের আগ্রহ বা তাঁহার বিখ্যাত পৃথিবীপ্রীতি প্রকাশ করেছেন। এই নিগূঢ় মর্তপ্রীতির পরিচয় কবিতাটির বহু পঙ্‌ক্তির মধ্যে বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে :

'আজ শতবর্ষ পরে
এ সুন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে
কাঁপিবে না আমার পরাণ ? ঘরে ঘরে—
কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে
পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি ?
ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি—
যুগযুগান্তের মহামৃত্তিকাবন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন
ছাড়ি লক্ষ বরষের স্নিগ্ধ ক্রোড়খানি ?'

কবির মর্তপ্রীতি ও নিগূঢ় জন্মান্তরীণ অনুভূতি অল্পবিস্তর পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নানা আকারে কবির শেষজীবন পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কবি যখন 'উৎসর্গ' কাব্যের 'প্রয়াসী' কবিতায় বলেন :

'নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে,
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম মনে আনে সে।'

* * *

'এ সাতমহলা ভবনে আমার
চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।'

* * *

'হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, যদি ফুল ফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাহি ভাবনা।'

—তখন 'বসুন্ধরা' কবিতাটি রচনার সময়কার কবিমানসের কথা স্মরণ করতে হয়। অথবা, যখন 'বলাকা' কাব্যে—কবি বিশ্বের ও নিজ জীবনের অকারণ ও অবিরাম চলার কথা স্মরণ করে নিম্নলিখিত উপলব্ধি বিবৃত করেন, তখন কবির কোন্ মর্মমূল থেকে এরূপ ভাবনার প্রকাশ তা সহজেই বোঝা যায়:

'মনে আজি পড়ে সেই কথা
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া

চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।'

'বসুন্ধরা' সত্যই একটি অপূর্ব কবিতা—নিসর্গাশ্রয়ী আশ্চর্য বিশ্বাত্মবোধই এর মূলসুর। যে সর্বাশ্রয়ী প্রকৃতিপ্রেম রবীন্দ্রকাব্যকে এমন গৌরবে সমুদ্ভাসিত করেছে সেই প্রকৃতিপ্রেমই এখানে কবিচিত্তকে বাঁধনহারা উল্লাসে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। 'কড়ি ও কোমল'-এ কবি বলেছেন: 'ধরায় প্রাণের খেলা চির-তরঙ্গিত'—এই কবিতায় সেই প্রাণতরঙ্গের উদ্বেলতাই আমরা লক্ষ্য করি। প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রকৃতির সংগীত, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ প্রকাশ ওই সর্বব্যাপ্ত প্রাণের লীলারই অভিব্যক্তি ছাড়া আর কি। নিসর্গের অন্তর্লোকে এক অফুরন্ত প্রাণধারার উৎসের সন্ধান কবি পেয়েছেন এবং তার মধ্যে আত্মনিমজ্জন করে ধন্য হতে চেয়েছেন। এই রোমান্টিক অভিলাষ থেকেই বসুন্ধরার সঙ্গে কবি একাত্মতা কামনা করেছেন,—ধরিত্রীমাতার স্নেহরসপিপাসা তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। এখানে আমরা সুদূরপরিচিতের জন্য কবিচিত্তের বিরহকাতরতাই লক্ষ্য করছি—ইংরাজিতে এরূপ বিরহভাবনাকেই বলে 'nostalgia'।

কবিতাটিতে আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে—তা হল কবি রবীন্দ্রের অগাধ সৌন্দর্যতৃষ্ণা—নিসর্গ সৌন্দর্যের পিপাসা। এই পিপাসার প্রেরণাবশে কল্পনায় তিনি সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করেছেন, মর্তের জড় ও চেতনলোকে সর্বত্র আপনাকে প্রসারিত করে দিয়ে বসুন্ধরার অতলান্ত আনন্দসমুদ্রে স্নাত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি—প্রকৃতিপ্রীতি অর্থাৎ প্রকৃতির রূপরস আস্বাদানেরই নামান্তর মাত্র। আবার, ওই প্রকৃতিপ্রীতি থেকেই তাঁর প্রচারিত আনন্দবাদের উদ্ভব। এই কবিতায় কবি আমাদের দৃষ্টিকে নিসর্গসংসারের আনন্দযজ্ঞশালার দিকে আকর্ষণ করেছেন, এবং এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়দেশে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন সর্বানুভূতির

এক অনির্বচনীয় চেতনা। বাস্তব আর কল্পনা এতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। 'বসুন্ধরা' রবীন্দ্র কবিজীবনের যৌবনমধ্যাহ্নে রচিত, তাই এর মধ্যে এমন নির্বাধ প্রাণোল্লাস, এতখানি আবেগস্পন্দন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির এরূপ সহজ উচ্ছ্বসন আমরা দেখতে পাই। পরবর্তী কালে কবি এর চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ভাবের সাধনা করেছেন কিন্তু ভাবের রূপসাধনা বলতে যা বোঝায় তা কবির প্রৌঢ় বয়সের কিংবা বার্ধক্যের রচনায় এমনটি আমরা দেখতে পাই না। 'বসুন্ধরা' কবিতায় মর্তপ্রেমিক শ্রীরবীন্দ্রের জ্যোতিষ্মান বিশুদ্ধ কবিমূর্তিটিই প্রেক্ষণীয়।

ভাবসত্য : রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনে যে প্রবল মর্ত্যপ্রীতি প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে বসুন্ধরা' কবিতায় তা ব্যাপক বিস্তৃত রূপ লাভ করেছে। বিশ্বের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ কবি বিশ্বের সকল কিছুর মধ্যেই তাঁর নিজস্ব চৈতন্য অন্বিত দেখেছেন। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি কবিমনের যে চিরকালীন আকুলতা তা 'বসুন্ধরা' কবিতার ছত্রে ছত্রে আমরা দেখতে পাই। রোমান্টিক কবি সকল সময়ই জীবনে একটি না পাওয়ার বেদনায় অবসন্ন থাকেন। মনন ও চিন্তায় কবি যখন নিজস্ব চৈতনাকে সমগ্র বিশ্বের চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত করতে পারেন তখনই কেবল সেই অবসন্নতার সাময়িক বিরতি। সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার তীব্র বাসনা আছে অথচ বাস্তবজগতে তার কোন উপায় নেই। এর ফলে কবিহৃদয়ে তীব্র বিরহের সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে। ইংরাজিতে এরই নাম Nostalgia। সমগ্র প্রকৃতির প্রতি কবি জন্মজন্মান্তরের বাঁধন অনুভব করেন। তিনি মনে করেন জড় প্রকৃতির চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে তিনি একদিন অভিন্ন ছিলেন। সেই বাঁধন খুলে কোন এক সময়ে তার পৃথক অস্তিত্ব হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে তিনি নাড়ীর যোগ অনুভব করেন। তাই বসুন্ধরার কাছে তাঁর অন্তরের তীব্র আবেদন "আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে, কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে।"

কবিতার সারসংক্ষেপ

'বসুন্ধরা' কবিতাটি একটি অপূর্ব সুন্দর মর্ত্যপ্রেমের কবিতা। বসুন্ধরার সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে কবি গভীরভাবে ভালবাসেন। ভালবাসার নিবিড়তায় কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যময় সত্তার সঙ্গে নিজের কোন পার্থক্য দেখেন না। অধুনা মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে সেই আদিম আত্মীয় সম্পর্কটি ছিন্ন হয়েছে। ফলে নিসর্গ-বিরহ তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। এই বিরহিত অবস্থায় তিনি ব্যাকুল ও অধীর হয়ে পড়েছেন। তাই কবিতার প্রারম্ভে তিনি বসুন্ধরার মাতৃসত্তার সঙ্গে পুনর্বার মিলিত হতে চেয়েছেন। বসুন্ধরার সর্বত্র শৈবালে শাদ্বলে তৃণে, শাখায় বল্কলে পত্রে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিতে চেয়েছেন।

কবির মনে বসুন্ধরার সকল দেশ ও সকল প্রাণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রবল বাসনা জাগ্রত। কবি নিজের ভূপর্যটন বাসনা কল্পনা ও গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। অতঃপর কল্পনার পাখায় ভর ক'রে তিনি বিশ্বের

সর্বদিকে পরিভ্রমণ করতে চেয়েছেন। উদার সমুদ্রতীর, নীল গিরিশ্রেণীর মধ্যবর্তী জনপদ, পঞ্চনদীতীরবর্তী লোকালয়, আশ্চর্য রজনীঘেরা হিমমরুদেশ রৌদ্রতাপদগ্ধ ধূসর মরুভূমি—বসুন্ধরার কোন স্থানই কবির কল্পনা থেকে বাদ পড়ে নি। আরবীয় তিব্বতীয় পারসিক তাতার ইত্যাদি পৃথিবীর কত বিচিত্র জাতি ও মানুষ আছে, তাদের সকলের জীবনের সঙ্গে কবি একাত্ম হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছেন। এমন কি, অরণ্যচারী হিংস্র ব্যাঘ্রের জীবনের মহিমাও কবির কল্পিত আস্বাদনের বস্তু হয়ে উঠেছে। এ বিশ্বের অসংখ্য আধারে যে জীবনের রসধারা সঞ্চিত আছে কবি তা নিঃশেষে পান করতে চান ; অপরূপ সুন্দরী বসুন্ধরাকে দেখে রূপরস-বিহ্বল কবি তাকে আলিঙ্গন করতে ব্যাকুল হয়েছেন। পৃথিবীর অরণ্যে ভূধরে, পল্লবে তৃণে সর্বত্র নিজেকে সঞ্চারিত করার বাসনা এবং বসুন্ধরার ক্রোড়ধৃত সমস্ত জীবকুলের সঙ্গে মিলিত হবার আকুল আগ্রহ কবিচিত্তে জেগে উঠেছে।

অতঃপর ধরিত্রীর সঙ্গে নিজ আত্মীয় সম্পর্ক উল্লেখ ক'রে তার জননীসত্তার মাধুর্য এবং সেই সঙ্গে নিজ রোমান্টিক বিরহ বেদনা অদ্ভুত সহানুভূতির সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। এই পৃথিবী তাকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধ'রে সূর্যপ্রদক্ষিণ ক'রে চলেছে। জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তার জন্যই কবি তৃণ-উদ্‌গমে পুলক অনুভব করেন। তরুলতাগুল্মে, বৃক্ষশাখায়, পুষ্পবৃন্তে অহরহ যে জীবনরসধারা সঞ্চারিত হচ্ছে তারও আনন্দ কবিচিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তোলে। বিস্মৃতির মধ্য থেকে কবির জন্মান্তর সম্পর্কের রূপটি জাগ্রত হয় এবং কবি মনে করেন হয়তো তিনি একদিন জলেস্থলে অরণ্যে বসুন্ধরা-দেহে সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করতেন। দূর দূরান্তের প্রকৃতি যেন তাঁকে অহরহ আহ্বান করছে। তাঁর বহুপরিচিত অতীতের আনন্দময় ক্রীড়াগৃহ থেকে পূর্বেকার সঙ্গীদের কলরব শুনতে পান। তখন মানবসংসারে নিজেকে প্রবাসী বলে মনে হয় কবির। আবার তিনি স্বস্থানে ফিরে যাবার জন্য বসুন্ধরার কাছে কাতর আবেদন করেন।

বসুন্ধরার জননীমূর্তি কবির কাছে চির আনন্দের উৎস। তিনি কল্পনা করেন বসুন্ধরার অন্তর থেকে সহস্রধারায় স্নেহস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। তাঁর চারিদিকে অসংখ্য তৃষিত প্রাণী সেই স্নেহস্রোত থেকে জীবন লাভ করেছে। কবির অভিলাষ এই প্রয়োজনের জগৎ থেকে সেই বিপুল রসলোকে উত্তীর্ণ হবেন।

কবিতাটির উপসংহারে কবির গভীর পৃথিবীপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। কবি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন যে, শতবৎসর পরে যখন তিনি থাকবেন না, তখন কি বসুন্ধরার সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে? তখন হয়তো জীবনের রঙ্গভূমিতে উৎসব চলবে। সেই উৎসবের মধ্যে কি তিনি একেবারেই থাকবেন না? যুগযুগান্তরের মৃত্তিকাবন্ধন মৃত্যুর পর ছিন্ন হয়ে যাবে এই কল্পিত বিরহে কবি বেদনা বোধ করেন। এতদিন বসুন্ধরার অফুরন্ত আনন্দ উৎসবের মধ্যে তিনি দিনযাপন করেছেন। সেই অমৃত পিপাসার নিবৃত্তি হয় নি। এখনো যেন কবি শিশুর মত বসুন্ধরা-জননীর বক্ষলগ্ন হয়ে রয়েছেন। তাই তিনি একেবারে সেই গোপন অন্তঃপুরে আশ্রয়লাভ করতে চান—যাতে কোন বিচ্ছেদের আশঙ্কা না থাকে।

শব্দার্থ ও টীকা

আমারে ফিরায়ে লহ·····বিপুল অঞ্চল তলে : কবি মনে করেন বসুন্ধরার অন্তরে যে স্নেহস্রোত যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত সেই স্নেহস্রোতে সকল প্রাণী জীবনরস শোষণ করে। তাই কবি বসুন্ধরার স্নেহচ্ছায়ায় ফিরে যেতে চেয়েছেন ; আশ্রয় চেয়েছেন বসুন্ধরার স্নেহের অঞ্চলে। এখানে 'মানসী' কাব্যের বিখ্যাত 'অহল্যার প্রতি' কবিতাটি স্মরণীয়। মানবী অহল্যা স্বামী গৌতমের অভিশাপে পাষাণীতে পরিণত হয়ে মৃন্ময়ী বসুন্ধরার কোলে নিজেকে বিলীন ক'রে দিয়েছিলেন। ঐ কবিতায় কবি কল্পনা করেছেন যে সুদীর্ঘকাল ধরিত্রীমাতার কোলে বিলীন থেকে অহল্যা 'আপনার মাঝে, মাতৃঅঙ্গে সেই 'কোটিজীবস্পর্শসুখ' পেয়েছিলেন। কবির দৃঢ় প্রত্যয়, বসুন্ধরার বক্ষদেশে এক নিগূঢ় জীবনধারার উৎস রয়েছে। **ওগো মা মৃন্ময়ী ········আনন্দের মতো :** বসুধা জীবনময়ী, চেতনাময়ী, চিরআনন্দময়ী— কবি নিজেকে এই আনন্দচঞ্চল পৃথিবীর দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে জীবন-নির্ঝরিণীতে স্নাত হবার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার পৃথক অস্তিত্ব এই প্রাণরসধারায় অবগাহনের প্রবল বাধাস্বরূপ। সেইজন্য কবিতাটির প্রথম অংশে অহং বিলুপ্তিই যেন কবির কাম্য। **বিদারিয়া এ বক্ষ পঞ্জর :** যে দেহের অভ্যন্তরে কবির প্রাণস্রোত অবরুদ্ধ রয়েছে, সেই দেহ-কারাগার বিদীর্ণ ক'রে তিনি নিজের প্রাণধারাকে সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত ক'রে দিতে চান। **সংকীর্ণ প্রাচীর :** সীমায় আবদ্ধ গৃহের অবরোধ। **আপনার নিরানন্দ অন্ধ কারাগার :** বিশ্বজীবনচাঞ্চল্য থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আপন গৃহকে কবি কারাগার মনে করেছেন। **হিল্লোলিয়া মর্মরিয়া······সচকিয়া :** হৃদয়াবেগের প্রাবল্যহেতু নামধাতুর প্রয়োগগুলি লক্ষণীয়। কথাগুলির মাধ্যমে সৌন্দর্য-পিপাসু কবিপ্রাণের দুর্বার আকাঙ্খা তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে। **আলোকে পুলকে পূরবে পশ্চিমে :** 'প্রভাতসঙ্গীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি স্মরণযোগ্য—'আমি ভাঙিব পাষাণকারা, আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া আকুল পাগল পারা' এখানেও অনুরূপভাবে কবিচিত্ত প্রকৃতিপ্রেমের রসাবেশে বিহ্বল। **শাদ্বলে :** তৃণময় ক্ষেত্রে। **শৈবালে···নিগূঢ় জীবনরসে :** নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির সকল স্থানে আপনাকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে কবি বসুন্ধরার বিপুল জীবনসমুদ্রে অবগাহন করতে চেয়েছেন। **নবপুষ্পদল······মধুবিন্দুভারে :** কবি নিজে পত্রপুষ্পকে বর্ণে গন্ধে পূর্ণ ক'রে তুলতে চান এবং তার অভ্যন্তরে মধুও সঞ্চিত করতে চান, প্রকৃতির সঙ্গে কবির আত্মীয়তাজনিত উপলব্ধি। **নীলিমায় পরিব্যাপ্ত······ অনন্ত কল্লোলগীতে :** স্বয়ং প্রকৃতির শিশু হয়ে প্রকৃতির কাজ নিজের হাতে নিয়ে সিন্ধুনীরে নীলিমা মাখিয়ে দেবেন, তরঙ্গে কলধ্বনি জাগিয়ে তুলবেন।

যে ইচ্ছা গোপন মনে ইত্যাদি : এই ইচ্ছাটি হ'ল পৃথিবীর সর্বত্র নিজেকে প্রসৃত ক'রে দিয়ে প্রকৃতি জগতের অনন্ত রূপরসধারাকে পান করা। **সিঞ্চিতে :** অভিষিক্ত করতে। **ব্যথিত সে বাসনারে :** অকারণ বিরহযুক্ত অপরিসীম তৃষ্ণার কথাই বলছেন।

বসি শুধু গৃহকোণে···কৌতুহল বশে ঃ কবির ইচ্ছা পৃথিবীর দিকে দিকে তিনি মানসভ্রমণে বের হবেন ; যাঁরা পৃথিবী পর্যটন করেছেন তাঁদের লিখিত বৃত্তান্ত তাঁর বিশ্বচারী রোমান্টিক কবিকল্পনার পথপ্রদর্শক হবে।

মহাপিপাসার রঙ্গভূমি ইত্যাদি ঃ এই কয়েক পঙক্তিতে প্রকাণ্ড মরুভূমির সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিশাল মরুদেশে জলধারা কোথায় ? তাই তাঁর অনন্ত তৃষ্ণা কোন কালে মেটবার নয়। 'জ্বরাতুর বসুন্ধরা' ইত্যাদি বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়েছে। রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবী জ্বরাতুরই বটে। **কতদিন গৃহপ্রান্তে······চাহিয়া সম্মুখে ঃ** মানসভ্রমণে বের হয়ে কবি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা দিয়েছেন। **খণ্ড মেঘগণ, ইত্যাদি ঃ** এটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় উপমা। 'যেতে নাহি দিব' কবিতার নিম্নলিখিত উপমাটির সঙ্গে তুলনীয় :—

শুভ্রখণ্ড মেঘ
মাতৃদুগ্ধ পরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মত
নীলাম্বরে শুয়ে।

যেন নিশ্চল নিষেধ··· ধূর্জটির তপোবনদ্বারে ঃ উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। কবি ধূর্জটির তপস্যা ও নিষেধের কল্পনা কালিদাসের 'কুমার সম্ভব' কাব্যের তৃতীয় সর্গ থেকে গ্রহণ করেছেন। তপস্যারণ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজায়গায় কালিদাস বলেছেন : 'তপোবনদ্বারে নন্দী একটি হেমবেত্রের উপরে বামপ্রকোষ্ঠ স্থাপন ক'রে দন্ডায়মান। সে তার দক্ষিণহস্তের একটি অঙ্গুলি মুখে স্থাপন ক'রে ইঙ্গিতে সকলকে চপলতা প্রকাশে নিষেধ করছেন। **মহামরুদেশে······অনন্ত কুমারীব্রত ঃ** একদিকে শুভ্র সঞ্চিত হিমানী, অপরদিকে সেই বিস্তৃত ভূভাগ তৃণ-তরুলতা প্রাণীশূন্য। তাই মেরুদেশকে কুমারীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। সে চিরকাল বন্ধ্যা। **ঘুমাবার কেহ নাই ঃ**—জীবজন্তু শূন্য বলে।

অনিমেষ জেগে থাকে······জননীর মতো ঃ বিপুল বিস্তৃত মেরুদেশের এই আশ্চর্য চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত কবিকল্পনার পরিচয় দেয়। মেরুর নৈশজ্যোতিসমন্বিত প্রকৃতিকে মৃতপুত্রা জননী বলে কল্পনা করা হয়েছে। **সমস্ত স্পর্শিতে চাহে ঃ** এই অংশে কবির বসুন্ধরা প্রীতির সঙ্গে মানবপ্রীতিও লক্ষণীয়। **আরবসন্তান দুর্দম স্বাধীন ইত্যাদি ঃ** তুলনীয়—

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন,
চরণতলে বিশালমরু দিগন্তে বিলীন।"

অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র···সহিয়া আঘাত অকাতরে ইত্যাদি ঃ অসভ্যজাতির উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রাও কবির একান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে। সর্বসংস্কারমুক্ত জীবনাসক্তির এরূপ কল্পনা রবীন্দ্রকাব্যে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। **বর্তমান তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় ঃ** যারা শুধু বর্তমানকেই জানে, অতীতের কথা স্মরণে রাখে না, সংস্কৃতির কোন বালাই নেই ; আর ভবিষ্যতের জন্য দুরাশা পোষণ ক'রে ক্লিষ্ট হয় না—এরূপ উচ্ছৃঙ্খল যাযাবর জীবন।

অরণ্য মেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল : অরণ্যে রৌদ্রালোকিত ব্যাঘ্রের নিঃশব্দ সঞ্চরণ যেন লুক্কায়িত অগ্নি। **বিশ্বের সকল পাত্র হতে :** এই সর্বানুভূতির জন্য হিংস্র প্রাণীর জীবনও কবির কাম্য হয়েছে। যেখানে যেখানে প্রাণের প্রকাশ ঘটেছে সেখানেই কবি আত্মীয়তা স্বীকার করেছেন। **প্রভাতরৌদ্রের মত :** এখানেও কবি পূর্বের মত বসুন্ধরার সকল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে আত্মীয়তা কামনা করেছেন।

তোমার মৃত্তিকাসনে, ইত্যাদি : রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতির অসাধারণত্বের হেতু বিবৃত হয়েছে। কবি কল্পনা করেছেন যে, তিনি যুগ যুগান্তর ধরে পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত আছেন। আর তাঁকে নিয়ে বসুন্ধরা সূর্যপ্রদক্ষিণ করতে করতে চলেছে। তাঁরই মধ্যে তৃণলতা ও তরুর বিকাশ ঘটেছে। এই যুগ-যুগ-আগত আত্মীয়তা সম্পর্কের জন্যই পৃথিবীর প্রাণের প্রকাশ তাঁকে এরূপ উতলা ক'রে তোলে। অতঃপর রবীন্দ্রনাথ আন্তরিকতার সঙ্গে বসুন্ধরার উপর তার যে নাড়ীর টান ও মিলনের ব্যাকুলতা বর্ননা করেছেন তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য কল্পনামূলক পৃথিবীপ্রীতি তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদের সঙ্গে বহিরঙ্গ সাদৃশ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এই কল্পনা স্বকীয়তায় দীপ্যমান যার ভিত্তি হচ্ছে তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি। **সুখস্বপ্ন হাস্যমুখে শিশুর মতন :** মাতৃস্তন্য পানে পরিতৃপ্ত শিশু নিদ্রিত অবস্থায় যেমন মৃদু হাস্য করে তেমনি সমস্ত প্রকৃতি বসুন্ধরা জননীর স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত হয়ে যেন অস্ফুট আনন্দ জ্ঞাপন করছে। **জাগে মহাব্যাকুলতা :** অন্তর এক অকারণ বিরহে ও পুলকে চঞ্চল হয়। এটিকে তিনি বলেছেন জন্মান্তরাগত আত্মীয়তার স্মরণ। এজন্যে মানুষ সকলসুখে সুখী হয়েও অকারণে উৎকণ্ঠিত হয়। কালিদাস 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকে এই 'জননান্তর সৌহৃদ্য' রোমান্টিক ভাবনার কথা প্রকাশ করেছেন। আবার 'মেঘদূত' কাব্যেও এই অকারণ চিত্তব্যাকুলতার উল্লেখ করেছেন। **মনে পড়ে বুঝি :** জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি কবির মনে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। **সে বিচিত্র সে বৃহৎ......পরিচিত সব :** পৃথিবী যেন জীবজগতের একটি আনন্দময় ক্রীড়াগৃহ। তৃণতরুলতা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু জননীক্রোড়ে বিপুল আনন্দে জীবন কাটায়। কবি কল্পনা করেছেন যে তিনি একদা এ সকলের মধ্যে মিলিত হয়ে আনন্দ ধারায় অবগাহন করতেন। কিন্তু অধুনা সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে। মনুষ্যরূপে জন্মাবার পর তিনি যেন পূর্বেকার সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েছেন। তাই সেই জন্মান্তরের স্মৃতি তাঁর মনে উদিত হলে তিনি বিরহে কাতর হয়ে পড়েন। তিনি নিজেকে একাকী, প্রবাসী ও নির্বাসিত মনে করেন।

সেথা হতে অহরহ অঙ্কুরিছে মুকুলিছে ইত্যাদি : বসুন্ধরার মহাপ্রাণের বিচিত্র প্রকাশ বিবৃত করেছেন কবি। **শ্যাম কল্পধেনু :** পৃথিবীর জননীরূপের অপূর্ব চিত্র। বসুন্ধরা কল্পধেনু, কারণ তিনি অহরহ অসংখ্যপ্রাণের অগণিত প্রার্থনা পূরণ করেছেন। বসুন্ধরা তরুতৃণপল্লবে শ্যামল। ছিদ্রে ছিদ্রে

বাজিতেছে বেণুঃ বাঁশের রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করলে বিচিত্র শব্দ ধ্বনিত হয়, বসুন্ধরার বক্ষদেশ থেকেও যেন সেইরূপ আনন্দের সুরলহরী উত্থিত হচ্ছে। কবি কল্পনায় এই সংগীতধ্বনি শ্রবণ করেছেন। **নিখিলের সেই …সকলের সনে**ঃ এই বাসনাটিই বর্তমান কবিতার কেন্দ্রগত ভাব। **মোর মুগ্ধ ভাবে**ঃ বসুন্ধরার সঙ্গে অন্বিত হতে পারলে কবি তাঁর মনোভাবের স্পর্শে পৃথিবীকে আরো সুন্দরী ক'রে তুলবেন, এই কাল্পনিক বাসনা প্রকাশ করেছেন। **তোমার মৃত্তিকাসনে……ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন, ইত্যাদি**ঃ তুলনীয় 'পুরস্কার' কবিতা :—

'শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে ;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভ'রে আসে আঁখিজল—

বহুমানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।'

আজ শতবর্ষ পরে……কাঁপিবে না আমার পরাণ, ইত্যাদিঃ কবি বসুন্ধরার সঙ্গে মিলন ভাবনায় বিভোর হয়ে আবার বিরহভাবনায় অধীর হয়ে পড়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের ১৪০০ সাল' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলো স্মরণীয় :—

'আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ
আজিকার কোন ফুল, বিহঙ্গের কোন গান
আজিকার কোনো রক্তরাগ
অনুরাগে সিক্ত করি পারি কি পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ পরে'

ঘরে ঘরে কত শত, ইত্যাদিঃ এই সকল উক্তি কবির সুগভীর মর্তপ্রীতির পরিচায়ক। দেখা যায় বসুন্ধরার প্রতি জন্মান্তরীণ ব্যাকুলতার অনুভব থেকে কবি একটি স্থায়ী মর্তপ্রীতির মনোভাব গঠন করেছেন। 'ছেড়ে দিবে তুমি' ইত্যাদি অংশও কবির সুগভীর পৃথিবীপ্রীতি ও মানবজীবনপ্রীতির পরিচায়ক। **ধরিত্রীর যুবক সন্তান**ঃ অর্থাৎ ধরিত্রীর স্তন্যরসে পুষ্ট মানুষ। **জগতের মহাদেশ-মাঝে**ঃ বসুন্ধরার সন্তান বলেই যেন মানবের অন্যান্য জ্যোতিষ্কলোকে পরিভ্রমণ করার অধিকার আছে। **তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের উৎস, ইত্যাদি**ঃ পৃথিবীর বিরাট বিপুল অসামান্য প্রাণশক্তির কথা বলা হয়েছে।

।। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ।।

রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতায় যে গভীর মর্ত্তপ্রীতির পরিচয় পাও তা বিবৃত কর। এ প্রসঙ্গে রোমাণ্টিক মনোভাবের ব্যাখ্যা কর।

উত্তর :—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যসাধনার মধ্যে প্রকৃতি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর কাব্যসাধনার সঙ্গে পৃথিবীর প্রকৃতিসত্তা এমনভাবে অন্বিত হয়ে আছে যে তাকে পৃথক করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে বলা যায় যে প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে তিনি জন্মজন্মান্তরের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক অনুভব করেন। সেইজন্য বর্তমানের মানবজন্মে তিনি বিরহবেদনায় কাতর। কালিদাসের কাব্যের মধ্যে এবং আমাদের প্রাচীন তপোবনে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যে গভীর প্রীতিমধুর সম্বন্ধের উল্লেখ আছে তা কবির সমগ্র চৈতন্যলোক ব্যাপ্ত করেছে। সেইজন্যই 'বসুন্ধরা'র মতো প্রকৃতিচেতনা সম্পন্ন কবিতা রচনা সম্ভবপর হয়েছে।

কবি দূরপ্রসারী কল্পনায় অনুভব করেছেন যে তিনি এই পৃথিবীর তৃণ দলে একদা অবস্থান করতেন। আজ মানবদেহ ধারণের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাই তিনি বসুন্ধরার অঞ্চলতলে আবার ফিরে যেতে চান এবং বলেন :

> "আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে
> কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে,
> বিপুল অঞ্চল তলে"

কবি তরুলতাগুল্ম পরিপূর্ণ এই শ্যাম পৃথিবীর মধ্যে আপন আত্মার মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। মানবদেহের বক্ষপঞ্জরের কারাগারে তিনি নিজেকে বন্দী মনে করেছেন। তাই তিনি এই কারাগার ভেঙে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে কল্পভ্রমণ করতে চেয়েছেন। পৃথিবীর বুকে যে নিগূঢ় জীবনরস সঞ্চিত আছে সেই সৌন্দর্যরসামৃত পানে কবি উদগ্রীব। উত্তুঙ্গ শৈলশিরে মেরুর নির্জনতায় কবি কল্পভ্রমণে ইচ্ছুক। কবির অন্তরস্থিত এই তীব্র ইচ্ছাশক্তি আজ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাস্তবজীবনে সীমায়িত দেহধারী কবি বাধা পার হতে পারেন না। তাই গৃহকোণে বসে তিনি নানা ভ্রমণকাহিনী পড়ে কল্পনার সাহায্যে দূরদেশে মানস-পরিক্রমা করেছেন। গভীর বিস্তৃত মরুদেশ, নীল সরোবর, শৈলমালা পরিবেষ্টিত স্থান, আকাশে শুভ্রখণ্ড মেঘ, দূরে তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশৃঙ্গ ও মেরুপ্রদেশ যেন ধ্যানস্তব্ধ। নির্জন মেরুপ্রদেশে বসুন্ধরা কুমারীমূর্তি ধরে অবস্থান করছেন। এই সকল কল্পনা কবিকে বসুন্ধরার প্রতি সুগভীর স্নেহপ্রীতিতে আবদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, কবি কল্পনায় এই সকল কিছুর স্পর্শসুখ আস্বাদন করতে চান। শান্ত পল্লীর অধিবাসী জেলেদের কিংবা মরুভূমি নিবাসী আরব-বেদুয়িনদের স্বজাতি হয়ে কবি তাদের বিচিত্র জীবনসুধা পান করতে ইচ্ছুক। সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ ক'রে কবি তাদের আনন্দের অংশীদার হতে চান। অসভ্য বর্বরজাতির মধ্যে তিনি সেই একই জীবনরস খুঁজে পান।

কেবল প্রকৃতি জগৎ ও মানব জগৎ নয়, বন্য ও হিংস্র পশুজগতের প্রতিও তাঁর সমান আকর্ষণ। হিংস্র ব্যাঘ্রের অপূর্ব প্রজ্জ্বলন্ত রূপ এবং সৌন্দর্যের প্রতিও কবি সমান আগ্রহী। বিশ্বের তৃণতরুলতা এবং কীটপতঙ্গ সকল কিছুর মধ্যেই কবিসত্তা একদিন বিরাজ করত। সেই আনন্দরস হতে আজ তিনি বঞ্চিত—বিচ্ছেদের বেদনায় বিধুর চিত্ত বারবার ফিরে যেতে চায় সেই জগতে যেখানে তাঁর চেতনার সঙ্গে প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্যের কোন বিচ্ছেদ নেই। বহুবৎসর হতে জন্মান্তরীণ প্রীতির রসে সঞ্জীবিত কবিসত্তা সর্বঅঙ্গে ও মনে অহর্নিশ সকল মর্তবস্তুর সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনুভব করে। পৃথিবীর বিস্তৃত পক্কশীর্ষ স্বর্ণক্ষেত্র কবির নিকট গভীর আকর্ষণের বস্তু। এ কেবল ক্ষণিকের আকর্ষণ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে বসুন্ধরার সঙ্গে কবি মিশে যেতে চান। অর্থাৎ বসুন্ধরার স্নেহাঞ্চলচ্ছায়ায় কবি জন্মজন্ম কাটিয়েছেন—তাই তিনি আর একবার ফিরে যেতে চান সেই চেতনার মধ্যে। মানবদেহধারণের ফলে কবির সঙ্গে বসুন্ধরার বিচ্ছেদ যে বিরহের বেদনা জাগিয়ে তুলেছে তার জন্য কবির সুগভীর দুঃখ। এই বিরহবেদনা কবিকে বসুন্ধরার প্রতি আরও বেশী আকৃষ্ট করেছে। সেইজন্য তিনি আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে আগামী দিনে পৃথিবীতে কবির চৈতন্যময় সত্তার অস্তিত্ব কি একেবারে শেষ হয়ে যাবে! তার কি কোন অস্তিত্বই থাকবে না! আজ থেকে শতবর্ষ পরে কি কবি এই বসুন্ধরার প্রতি পল্লবে পুষ্পে এতটুকু অবশেষ রেখে যেতে পারবেন না। এই সংশয় কবিকে আরও বিরহ বিধুর করেছে। শেষ পর্যন্ত কবি নিঃশেষে বসুন্ধরার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। জননী বসুন্ধরা যে বিচিত্র সুন্দর জীবনরস পরিবেশন ক'রে এই পৃথিবীর সকল কিছু পুষ্ট করে রেখেছেন সেই জীবনরসে অভিসিঞ্চিত করে কবিকে যেন সন্তানের মতো আশ্রয় দেন—দূরে সরিয়ে রেখে বসুন্ধরা জননী যেন কবিকে বিচ্ছেদ-ক্লিষ্ট না করেন।

রোমান্টিক ভাবনা বলতে সুদূরপ্রসারী কল্পনার অভিসার বোঝায়। তাঁর নিসর্গপ্রীতি, বসুন্ধরার সমস্ত প্রাণী ও অপ্রাণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য কল্পঅভিসার রোমান্টিক ভাবনারই প্রকাশ। এই ধ্যান ধারণা কোন দার্শনিক তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল নয়। জন্মজন্ম ধরে এই পৃথিবীর তৃণে জলে, পত্রে পুষ্পে যে চেতনার অভিব্যক্তি সেই একই চেতনা যে কবির মধ্যেও প্রবাহিত—এই দূরপ্রসারী কল্পনাই রোমান্টিক চিন্তাধারার নিয়ামক। এই চিন্তা কালিদাস বর্ণিত জন্মান্তর সৌহৃদ্যের অনুরূপ। এইরূপ আশ্চর্য, কল্পনাজাত আত্মীয়তার ফলশ্রুতি কবির স্থায়ী মর্তপ্রীতি। এই প্রীতি আশ্চর্য কবিকল্পনায় বিধৃত। যেমন সৌন্দর্যের ব্যাপারে তেমনি নিসর্গ তথা বসুন্ধরার সম্বন্ধে কবির একটি বিরহভাবনা মিশ্রিত রয়েছে। এই বিরহভাবনা—রোমান্টিক কবিকল্পনার জন্মদাত্রী। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য —অধরা অদেখা সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ—তাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা, পেয়েও না পাওয়ার বেদনা কবিকে অতৃপ্ত রেখেছে এবং সেই কারণেই কবিকল্পনার বিস্তার ও মর্তপ্রীতির প্রসার ঘটেছে। এই ভাবনা থেকে জাত যে কাব্য

তাকেই রোমান্টিক কবিতা বলে। 'বসুন্ধরা' কবিতাটি সেইরূপ একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

২। "সর্বানুভূতি বা বিশ্বানুভূতি রবীন্দ্র কবিমানসের বিশেষ প্রবণতা। 'বসুন্ধরা' কবিতায় ইহার চরম প্রকাশ"—আলোচনা কর।

উত্তর ঃ- প্রভাতসংগীতের কাল থেকে রবীন্দ্র জীবনে এই বিপুল বিচিত্র পৃথিবী যে আবেদন সৃষ্টি করেছে পরবর্তী কাব্যধারার মধ্যদিয়ে তা পরিণতি লাভ করেছে। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের বেশ কয়েকটি কবিতায় কবিহৃদয়ে সমগ্র বিশ্ব যেন বিশেষ মূর্তি ধরে আবির্ভূত হয়েছে। সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে যে চৈতন্যময় সত্তা এই বিপুল পৃথিবীতে নানা বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে বিরাজমান সেই একই সত্তা কবির চেতনায় বিন্যস্ত। সুতরাং মানবজীবনের সকল সীমা অতিক্রম করে কবি সেই অখণ্ড চৈতন্যময় সত্তার সঙ্গে মিলিত হতে চান। বসুন্ধরার তৃণপুষ্প, পত্র, কীটপতঙ্গ, প্রাণী সমুদ্র নদী নির্ঝরিনীর মধ্যে যে জীবনরসের উৎস রয়েছে কবি কেবল তাদের ভালবাসেন বললে ঠিক হয় না। সকল সৌন্দর্য প্রেমপ্রীতির মধ্যে নিজেকে একাত্ম করতে চান। এই অনুভূতি জন্মজন্মান্তরের সংস্কারের বশে কবিচিত্তে ধরা দিয়েছে—

"মনে হয় যে ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে
সেই মূক মাটি মোর পানে চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।"

এই একাত্মতার অনুভূতি কবিকে কল্পনার অভিসারে নিয়ে গেছে। সমগ্র বিশ্বকে তিনি যেন এই সাথে পেতে চান। তুষার মৌলী হিমালয়, বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি, নীল সমুদ্রধৌত বালুকাবেলায় ভ্রমণের জন্য কবি উৎসাহী। কিন্তু গৃহকোণে বসে তা সম্ভব নয়। আশ্চর্য দূরকল্পনার অভিসারে কবি সমগ্র বসুন্ধরা পর্যটন করেছেন। আদিম অসভ্য জাতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে জীবনরসের পাত্র ভরে নিতে চেয়েছেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের সমস্ত জীবনরস-সুধা পান করার আকুল উৎসাহে কবির মানসযাত্রা সুরু হয়েছে। কেবল প্রকৃতির অনাদি অনন্ত সৌন্দর্য নয়, সমগ্র মানব জগৎ কবির বিশ্বানুভূতিতে ধরা পড়েছে। যেখানে জীবনের আনন্দযজ্ঞে সুধার পাত্রটি পূর্ণ করেছে সেখানেই কবি পরমানন্দের তীব্র অনুভূতি লাভ করেছেন। জীবনকে ও জগৎকে কতখানি ভালবাসলে এই আশ্চর্য সুন্দর অনুভূতি লাভ করা যায় তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

কেবল তাই নয়, হিংস্র বন্য জন্তুর মধ্যে যে সৌন্দর্য এবং আদিম অসভ্য-জাতির মধ্যে যে মুক্ত জীবনস্রোত প্রবাহিত সেই জীবনস্রোতের সঙ্গেও কবি একাত্ম হতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর মানবপ্রীতি কবিতার ছত্রে ছত্রে ব্যাপ্ত। বিশ্বের এই সৌন্দর্যরস পানের আর্তি নিয়ে কবি বলেন ঃ

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"

জীবন ও জগতের প্রতি এই অনুরাগ কবিচেতনাকে বিশ্বমুখী করে তুলেছে। এই অনুরাগ কোন বিশেষ কালে ও দেশে সীমিত নয়। মৃত্যুর পরও তাঁর চৈতন্যময় সত্তা বসুন্ধরার সর্ববস্তুর মধ্যে কিছু না কিছু অবশেষ রেখে যাবে। আজ থেকে শতবর্ষ পরে এই পৃথিবীর বুকে কত মানুষ আসবে। তাদের কত সুখদুঃখ আশা-আনন্দ বিরহ বেদনা পুঞ্জিত হবে। আগামী দিনের মানবসমাজের সকল অনুভূতির মধ্যে তাঁর বিশ্বানুভূতি বিরাজ করবে।

কবির মানবদেহধারণের জন্য বসুন্ধরার সঙ্গে যে বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যার জন্য তিনি জননী বসুন্ধরার অঞ্চল থেকে আজ বিচ্ছিন্ন সেই মানবদেহের বক্ষপঞ্জর রূপ কারাগারে আজ তিনি বন্দী হয়ে থাকতে চান না। কারণ জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি কবির মনে এমনই দৃঢ় নিবন্ধ যে বিশ্বসৌন্দর্য ও তাঁর চেতনসত্তা ভিন্ন নয় বলেই তিনি মনে করেন। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি কবির তীব্র আকর্ষণ এবং সেই সৌন্দর্য পুরোপুরি উপভোগ না করার বেদনা কবির মনে যে তীব্র বিরহকাতরতা সৃষ্টি করেছে তারই বশবর্তী হয়ে কবি পৃথিবীর দিকে দিকে মানসভ্রমণে বের হয়েছেন।

কল্পনা-অভিসারী কবি অন্তরে এক সর্বানুভূতি সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁকে একাত্ম করেছে। অন্যান্য কবিতার মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম একটি মূল সুর হয়ে ধরা দিয়েছে সত্য কিন্তু বসুন্ধরা কবিতায় এই প্রেম কেবলমাত্র হৃদয়ের আকর্ষণের পর্যায়ে থেমে নেই। এই কবিতায় কবির এক সর্বব্যাপক অনুভূতিতে জীবজন্তু তরুলতা পত্রপুষ্প সমেত সমগ্র বসুন্ধরা ও তার মানবসমাজের হাসি কান্না, আনন্দ-বেদনা একটি অখণ্ড সত্তা হয়ে ধরা পড়েছে। তাই বসুন্ধরা কবিতায় এই সর্বানুভূতির চরমপ্রকাশ ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

অনুগ প্রশ্ন :—৩। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি 'বসুন্ধরা' কবিতায় একটি অনন্যসাধারণ রূপ গ্রহণ করেছে, বক্তব্যটি যুক্তি সহ আলোচনা কর।

৪। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'বসুন্ধরা' কবিতাটির মর্মগত ভাবসত্য তোমার নিজের ভাষায় পরিস্ফুট কর।

৫। "আমার পৃথিবী তুমি বহুবরষের" ইহা রবীন্দ্রজীবনদর্শনের অন্যতম প্রধান কথা। 'বসুন্ধরা' কবিতা অবলম্বনে বক্তব্যটি আলোচনা কর।

৬। "সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত কল্পনামূলক একাত্মতার অনুভূতিতে 'বসুন্ধরা' কবিতাটি সমুজ্জল—আলোচনা কর

৭। রবীন্দ্রনাথ কল্পনায় ও অনুমানে বিপুলা এ পৃথিবীর প্রকৃতি ও মানবের যে বৈচিত্র্যময় রূপের ছবি এঁকেছেন এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে তীব্র কামনা ব্যক্ত করেছেন, 'বসুন্ধরা' কবিতাটি অবলম্বনে সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

[উপরি লিখিত সকল প্রশ্নের উত্তরেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রীতি ও বসুন্ধরা প্রীতির তীব্র ব্যাকুলতা বর্ণনা করতে হবে—যা প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া আছে]

৮। 'বসুন্ধরা' কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবক (সুদুর্গম দূরদেশ —পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ···নব নব স্রোতে) অবলম্বনে কবির আত্মপ্রসারণের যে কামনা ব্যক্ত হয়েছে তার বিবরণ দাও।

উঃ— বসুন্ধরার রূপমূর্তি বিচিত্র। সেই রূপমূর্তি কবি কল্পনায় ধ্যান করেছেন। পৃথিবীর দিকে দিকে নিজেকে ব্যাপ্ত করাতেই কবিহৃদয় নিঃসীম তৃপ্তি খুঁজছে। সমস্ত পৃথিবীময় মানসভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন। কবি 'ভিক্ষালব্ধ ধনে' জ্ঞানের দীনতা দূর করার প্রয়াসী। অর্থাৎ চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী পাঠ করে তিনি প্রত্যক্ষদর্শনজনিত আনন্দ লাভ করতে চেয়েছেন।

'বসুন্ধরা' কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকে প্রকান্ড মরুভূমি, শৈলমালা, নির্জন মেরুদেশ, সমুদ্র ও পর্বতের নিকটস্থ একখানি গ্রাম, বেদুইন জাতির দুঃসাহসিক জীবনযাত্রা, সংস্কারহীন উন্মুক্ত জীবনস্রোতের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীর দিকে দিকে মানসভ্রমণে বের হয়ে কবির রোমান্টিক কল্পনায় এইগুলি উজ্জ্বলরেখায় ফুটে উঠেছে।

দূরের ডাক কবির অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করেছে। বহু দূরবর্তী রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি কিংবা শৈলমালাবেষ্টিত নির্মল সরোবর কবির মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবির মন মেরুদেশে কিংবা সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতসন্নিহিত গ্রামে উধাও হয়ে যায়। কখনো আরব, তাতার জাপানী বা চীনা জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে তিনি উন্মুখ হয়ে ওঠেন। দুঃসাহসিকতাপূর্ণ অরণ্যজীবন অথবা মুক্ত যাযাবরজীবনের প্রতিও কবির দুর্নিবার আকর্ষণ।

বিশ্বের চতুর্দিকে রূপের যে প্রবাহ বহমান, সেই স্রোতে অবগাহন করে কবি মুক্তির আনন্দ লাভ করতে চান।

৯। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবির যে মনোভাব প্রকাশিত তা ভারতীয় প্রাচীন চিন্তাধারার আধুনিক রূপ কী না আলোচনা কর। প্রসঙ্গত একে কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের কাব্যরূপ বলা সঙ্গত কী না বিচার কর।

উঃ সংকেত ঃ—

প্রাচ্য দর্শনাদিতে তৃণতরুলতাকে চেতনাসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমস্ত জগতে প্রাণের স্পন্দন লক্ষ্য করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয় কবি বলে তাঁর প্রতিভায় সংস্কাররূপে এই ধারণা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা দরকার 'সোনারতরী' পর্বে কবি সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণের লীলা অনুভব করেছেন সেই প্রাণ উপনিষদের "মহাচৈতন্য স্বরূপ" নয়। উপনিষদীয় অদ্বৈত তত্ত্ব আধ্যাত্মিক, রবীন্দ্রর অদ্বৈতবাদ রোমান্টিক। এই প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন… কবি যেন সাংখ্যদর্শনের সেই প্রকৃতিতত্ত্ব—সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ প্রকৃতি হইতে পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করেন না। …সকলেই সাক্ষাৎ প্রকৃতিপ্রসূত ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরই কথা, সাংখ্যদর্শন আরও সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। কবি সেই প্রকৃতির সাক্ষাৎ প্রতীক বা প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকেই বারবার বরণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতি প্রেম ও এখানে ঐ জননীরূপিণী বসুন্ধরার স্নেহরস পিপাসায় উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।…ইহা জড়কে চিন্ময়রূপে দেখা নয়—চিত্তকেই জড়ের রূপে দেখা; ঐ দুইয়ের পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম বলিয়া সহজে ধরা পড়ে না;"

কোন কোন সমালোচক 'বসুন্ধরা' কবিতাকে ডারউইনের উৎক্রান্তিবাদের (theory of evolution) কাব্যরূপ বলতে চান। কিন্তু এ ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ডঃ ক্ষুদিরাম দাসের মতে, "প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট কোন তত্ত্বের মধ্যস্থতায় কবি বিশ্বকে গ্রহণ করছেন না। কবি বসুন্ধরার বহু বিচিত্র প্রকৃতি এবং জীবনযাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে বিরহবিলাপে সমস্ত কবিতা মুখরিত করেছেন…তা যে জন্মান্তরীণ সৌহৃদ্যক্রমে আগত স্থির রোমান্টিক বাসনা ঐ সম্পর্কে আর সংশয় নেই।"

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। "ওগো মা মৃন্ময়ি
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই"

— উক্তিটি কোন কবিতার অংশ? কবির নাম উল্লেখ কর। অংশটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর ঃ— রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতা থেকে পংক্তিটি উদ্ধৃত।

কবির মনে সমগ্র পৃথিবীর বিপুল বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভূত হয়। এই বসুন্ধরা যেন আমাদের মৃন্ময়ী জননী। অসংখ্য কীট পতঙ্গ হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ পৃথিবী অনন্ত স্নেহের সঙ্গে তাদের পালন করে। বসুন্ধরার সেই অজস্র বিপুল স্নেহধারা থেকে কবিও বঞ্চিত হতে চান না। বিশ্বজননীর বিপুল অঞ্চল তলে

কবি আশ্রয় লাভ করতে চান। কারণ জন্মজন্মান্তরের স্মৃতির টানে কবি বুঝতে পেরেছেন যে এই বসুন্ধরা-জননীর কোলেই তিনি যুগ যুগ ধরে, জন্ম জন্মান্তর ধরে লালিত হয়েছেন। সুতরাং আজ যুবক সন্তান হয়ে মাতার সঙ্গে সেই বিচ্ছেদ জনিত বিরহ তাঁকে অবসন্ন করে। তাই প্রকৃতির তরুলতা তৃণগুল্ম, পত্রপুষ্পের সঙ্গে তিনি ব্যাপ্ত হয়ে থাকতে চান। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর যত আদিম সমাজ ও সভ্যতা, হিংস্র প্রাণীর সহজ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য কবির অন্তরে অসামান্য আনন্দের শিহরণ আনে। মৃত্তিকাজননী বসুন্ধরার মাঝে একাত্ম হয়ে থাকার তীব্র অনুভূতি এই অংশে প্রকাশিত।

২। 'বসি গৃহকোণে
লুব্ধ চিত্তে করিতেছি সদা অধ্যয়ন
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতুহল বশে।"

—উদ্ধৃত অংশটি কোন কবিতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে ? কারা কিসের কৌতূহলে দেশান্তরে পরিভ্রমণ করেছে ? কবি তা পাঠ করেন কেন ?

উত্তর : উদ্ধৃত অংশটি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। 'বসুন্ধরা' কবিতায় কবি সারা বিশ্বে যে মানস-পরিক্রমা করেছেন তা এই অংশে বর্ণিত।

বহুকাল ধরে বহু কৌতূহলী মানুষ ব্যাপক অন্বেষণে বিশ্বের সকল স্থান আবিষ্কারের আনন্দে পরিভ্রমণ করেছে। উত্তরের হিমবেষ্টিত অঞ্চল, পাহাড় পর্বত, নদী নির্ঝরিনী সকল স্থানে কৌতূহলী মানুষ অভিযান চালিয়ে নিখুঁত ভৌগোলিক বিবরণ রেখে গেছে। কবি গৃহকোণে বসে সেই সকল ভৌগোলিক বিবরণ পাঠের মাধ্যমে প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণরস গ্রহণ করেছেন। কল্পনার নেত্রে পৃথিবী পরিভ্রমণ ক'রে সকলবস্তুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জন্মান্তরীন সৌহৃদ্যে বিশ্বাসী, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে মৃন্ময়ী জননী বসুন্ধরা সকল বস্তু ও প্রাণীকে প্রাণরসে পুষ্ট ক'রে যুগ যুগ ধরে লালন ক'রে চলেছেন। বিশ্ব-পরিভ্রমণের ঐকান্তিক ইচ্ছা কবিকে ভূপর্যটকদের এইসকল কাহিনী পাঠ করতে উদ্‌বোধিত করে। কারণ বাস্তবে পৃথিবীর সকল দেশ ও স্থানে পরিভ্রমণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি গৃহকোণে বসে এইসব স্থানের সৌন্দর্য অনুভব করেন এবং কল্পনায় সেই সকল স্থানে ভ্রমণ ক'রে পৃথিবীর বিপুল সৌন্দর্য আস্বাদন করেন।

কৌতূহলী পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী পাঠের মাধ্যমে কবি সেইসকল স্থানে ভ্রমণের আনন্দ উপলব্ধি করেন।

৩। "রাত্রি আসে,

ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মত।"

—কোন স্থানের বর্ণনা করা হয়েছে? কাকে কেন মৃতপুত্রা জননীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?

উত্তর ঃ—এখানে কবি পৃথিবীর মহামেরুদেশের কথা বর্ণনা করেছেন। সেখানে বসুন্ধরা যেন কুমারীব্রত গ্রহণ করেছে। হিমবস্ত্রপরা পৃথিবী সেখানে নিঃসঙ্গ ও আভরণহীন। সেখানে দীর্ঘ রাত্রি অবসানের পর দিন ফিরে আসে। অর্থাৎ মেরুঅঞ্চলের ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রির কথা বলা হয়েছে। বসুন্ধরার নির্জন ও নিঃসঙ্গ মূর্তিটি আশ্চর্যসুন্দর ক'রে বর্ণনা করেছেন কবি। বসুন্ধরাজননী মেরুদেশে মৃতপুত্রের শয্যাপার্শ্বে যেন বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন। বসুন্ধরা জননীর এই বিষাদমলিন মূর্তিটি এখানে বর্ণিত। এই তুলনার তাৎপর্য এই যে মরুদেশে ধরিত্রীমাতার পালনের জন্য কেউ নেই। জীবপালয়িত্রী অনন্তস্নেহময়ী মাতার স্নেহের পাত্র এখানে শূন্য। তাই কবির মনে হয় তিনি যেন মৃতপুত্র জননী। তাঁর তন্দ্রাহত রূপটি কবির কল্পনা নেত্রে ধরা পড়েছে।

৪। —"সকলের ঘরে ঘরে

জন্মলাভ ক'রে লই হেন ইচ্ছা করে"

—কে কেন সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করতে চান? কোন কোন ঘরে তিনি জন্মলাভ করতে চেয়েছেন?

উত্তর ঃ রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যসুন্দর কাব্যভাবনায় যে সর্বানুভূতি ও বিশ্বানুভূতির প্রকাশ করেছেন 'বসুন্ধরা' কবিতায় তারই জন্য তিনি সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ ক'রে সেই সমাজ ও জীবনের প্রাণরস আস্বাদন করতে চান। কারণ সকলের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে তাঁর অনুভূতির চরম প্রকাশ ঘটবে না। তাই কবির এই প্রবল ইচ্ছা।

কবি ইচ্ছা করেন মনে মনে বিশ্ববাসীর স্বজাতি হয়ে দেশে দেশান্তরে সর্বলোকসনে বসবাস করতে। মরুতে আরব সন্তান হয়ে উষ্ট্রদুগ্ধপান করার ইচ্ছা তাঁর। তিব্বতের গিরিতটে প্রস্তর পুরীর মধ্যে বৌদ্ধমঠে বিচরণ করতে চান। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক হয়ে গোলাপকাননে বাস করতে চান। অশ্বারোহী নির্ভীক তাতার বালক হতে চান। শিষ্টাচারী সতেজ জাপানের অধিবাসী হতে চান তিনি। কর্মযোগী প্রবীণ প্রাচীন চীনা-বৈশিষ্ট্য তিনি আত্মসাৎ করতে চান। এই সকলই তাঁর কল্পনার বৈশিষ্ট্য। বিপুল বিশ্বে নিজেকে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়ে জীবনের সকল আনন্দরস পানের জন্য তাঁর মনে যে আবেগ দেখা দিয়েছে সে আবেগের বশবর্তী হয়েই তিনি 'বসুন্ধরা' কবিতাটি রচনা করেছেন। কোন বিশেষ তত্ত্ব এই কবিতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি সত্য তবুও

সমগ্র চেতনার সঙ্গে যে মানবচেতনা বিধৃত—এই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তা সুন্দর ভাবে প্রকাশিত :

৫। "দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন অনল
বজ্রের মতন।"

কার দীপ্ত দেহের কথা বলা হয়েছে ? 'প্রচ্ছন্ন অনল বজ্রের মতন' বাক্যাংশটির অন্তর্নিহিত অর্থ লেখ।

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ অসামান্য প্রকৃতিপ্রীতির জন্য হিংস্র জন্তুপূর্ণ অটবী বা অরণ্যের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। বাস্তবক্ষেত্রে এই ঘন অরণ্যের মধ্যে পরিভ্রমণ সম্ভব না হলেও কল্পনায় ভ্রমণ অসম্ভব নয়। হিংস্র ব্যাঘ্র ঘনবনের মধ্যে চলাচল করে। প্রকাণ্ড শরীর ও প্রচণ্ড তার বল। বিচিত্র বর্ণের দেহ রৌদ্রালোকে দীপ্ত ও উজ্জ্বল। অরণ্যচর বাঘের উজ্জ্বল দেহকান্তি ও মুক্ত জীবনের কথা এখানে বলা হয়েছে।

ব্যাঘ্রের দীপ্ত মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক তার দ্রুতগতি ও শিকারের ওপর নিঃশব্দে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার ক্ষমতা ব্যাখ্যা করেছেন। অকস্মাৎ বজ্র পতিত হয়ে যেমন সকলকে হতচকিত ক'রে দেয় তেমনি অরণ্যরূপ মেঘের মধ্য থেকে লুক্কায়িত অশনির মতন ব্যাঘ্র তার শিকারের ওপর পতিত হয়। এই প্রসঙ্গে William Blake রচিত 'Tiger, Tiger, burning bright' প্রভৃতি বিখ্যাত বর্ণনা স্মরণ করা যেতে পারে। ব্যাঘ্রের হিংস্রতা অপেক্ষা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাঠকের হৃদয়ে অধিক চমক সৃষ্টি করে।

৬। "ইচ্ছা করে বার বার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরা ধারা নব নব স্রোতে।"

কে কিসের স্বাদ মেটাতে চান ? আনন্দমদিরাধারা কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর :—কবির কাছে এই বিশ্বপ্রকৃতি যেভাবে ধরা দিয়েছে তাতে তিনি মনে করেন যে সারা পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তাঁর নিয়ত-অবস্থান, প্রকৃতির অসামান্য রূপলাবণ্য, হ্রদ নদ গিরিকন্দর, সমুদ্র মেখলা কবিকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। আর অন্তরের নিগূঢ় আবেগে তিনি বার বার ছুটে যেতে চান সেই সৌন্দর্যের দিকে।

বসুন্ধরার জলে স্থলে আকাশে, অরণ্যে পর্বতে মেরুদেশে যে বিচিত্র ও ব্যাপক সৌন্দর্য আছে সেই সৌন্দর্য ও সকল জীবের মধ্যে যে আনন্দ রসধারা সঞ্চিত আছে তাকেই কবি আনন্দমদিরা বলেছেন। বসুন্ধরা তার সকল সন্তানকে পালন করেন। পৃথিবীর এই আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ আছে। কবি সেই যজ্ঞ থেকে নিজেকে

দূরে সরিয়ে নিতে চান না। কবির অন্তরের এই আবেগবিহ্বল ইচ্ছা সমগ্র বসুন্ধরা কবিতায় পরিস্ফুট। প্রকৃতির সঙ্গে লীন হয়ে যেতে চান কবি। একদা যে তিনি এই প্রকৃতির বুকে তৃণ শষ্প হয়ে বিরাজ করেছেন সেই জন্মান্তরের স্মৃতি প্রকৃতিজননীর আনন্দমদিরা পানে কবিকে উদ্‌বোধিত করে।

৭। "তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র সুখের
উৎস উঠিতেছে যেথা, সে গোপনপুরে
আমারে লইয়া যাও রাখিও না দূরে"

—কোন বিপুল প্রাণ ও বিচিত্র সুখের উৎসের কথা বলা হয়েছে?

—কবি সেখানে নিজেকে নিয়ে যেতে বলেছেন কেন?

উত্তর ঃ—কোন উষালগ্ন থেকে শুরু হয়ে অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারা আজও পৃথিবীর বুকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ধাত্রী বসুন্ধরা অসীম যত্নে ও স্নেহে প্রাণরস রক্ষা ও পালন করে চলেছে। বসুন্ধরার বুকে এই প্রাণের প্রবাহ শাশ্বত কাল ধরে প্রবাহিত। কবি কল্পনার মাধ্যমে সেই প্রাণের উৎস সন্ধানে তৎপর। বসুন্ধরার এই বিপুল প্রাণের উৎসের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

'গোপনপুর' বলতে কবি রহস্যাবৃত প্রাণসৃষ্টির আদিম বৃত্তান্তকেই বলতে চেয়েছেন। পৃথিবীর প্রথম প্রাণের প্রবাহ আজকের মানবজীবনেও কাজ করে চলেছে। মানব সৃষ্টির সেই উৎস থেকে আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কবি মানবজন্ম গ্রহণ করে সৃষ্টির সেই গোপনপুর থেকে আজ নির্বাসিত। কিন্তু এই নির্বাসন কবির অভিপ্রেত নয়। অসামান্য হৃদয়াবেগের প্রাচুর্যে কবি পৃথিবীমাতার স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় পেতে চান। মৃত্তিকার অণুতে অণুতে যে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হয় কবি অন্তরে তা অনুভব করেন। তাই তিনি ব্যাকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে বসুন্ধরা যেন কোলের সন্তানকে আপন কোলে স্থান দেন।

।। নিরুদ্দেশ যাত্রা ।।

ভূমিকা : 'সোনার তরী' কবিতায় যে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ অস্ফুট ছিল 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় তা অনেক পরিমাণে স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। 'মানসী' কাব্যের পর রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' রচনা করেন। মানসী কাব্যে সৌন্দর্য-বাসনা এত প্রবল ছিল যে কবি অন্তরে এক তীব্র বিরহ অনুভব করেছেন। বাস্তবজীবনের ক্ষুদ্র খণ্ড গণ্ডীর মধ্যে অনন্ত অনির্দেশ্য সৌন্দর্যপিপাসা চরিতার্থ হয় না বলে তিনি বিরহবেদনা ভোগ করেছেন। কিন্তু সোনার তরী কাব্যের কবিতাগুলিতে এই বিরহভাব ত্যাগ করে বাস্তবজীবনের সীমার মধ্যে সৌন্দর্যের স্বর্গলোকের সন্ধান পেয়েছেন। সোনার তরীর কর্ণধাররূপিণী সুন্দরী রমনী কে—এ নিয়ে নানা সমালোচক নানা মন্তব্য করেছেন। অনেকে বলেন 'চিত্রা' কাব্যে আমরা যে জীবনদেবতার উল্লেখ পাই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার অপরিচিতা বিদেশিনী সুন্দরী তারই পূর্বাভাস। এই জীবন-দেবতা তাঁকে নিয়ে অপার ও অসীম রহস্যের সৃষ্টি করে চলেছেন। একে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

> "অন্তর মাঝে বসি অহরহ
> মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
> মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
> মিশায়ে আপন সুরে।"

এই অনির্দেশ্য শক্তি—যার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যধারা সৃষ্টি হয়ে চলেছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কবির ব্যক্তিগত ইচ্ছা পরাজিত এই জীবনদেবতার কাছে। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের নিয়ন্ত্রণকারিনী 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় রহস্যময় সুন্দরীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

আবার কোন কোন সমালোচক এঁকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী বলতে চান। এই সৌন্দর্য-দেবতা কবিকে নিয়ে সৌন্দর্যলোকের উদ্দেশ্যে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। কবি তাঁর ইচ্ছাধীন হয়ে ছুটে চলেছেন আলোআঁধার মিশ্রিত সৌন্দর্যলোকের দিকে—যার কিছুটা কবির কাছে পরিচিত আবার কিছুটা রহস্যাবৃত। কিন্তু এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আকর্ষণ থেকে কবি কখনই নিজেকে মুক্ত করতে পারেন না।

আমরা একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে পারব যে জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মী—যাই বলা হোক না কেন, এ দুই-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় কবি এই সুন্দরীকে 'বিদেশিনী' ও অপরিচিতা বলেছেন। কবির পরিচিত জগৎ ও জীবনে এঁকে কোনদিন স্পষ্টভাবে ধরা যায় নি। ইনি রহস্যময়ী—পরিচিত খণ্ড ক্ষুদ্র বস্তুতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর আভাস মেলে মাত্র, কিন্তু বস্তুতঃ ইনি পরিচিত জগতের পরপারবর্তী রহস্যলোকের অধিবাসিনী। জীবনযাত্রার নিত্য পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে ইনি অলভ্য। তাই তিনি কবির নিকট বিদেশিনী ও অপরিচিত।

কবির ভাবজীবনের নিয়ন্ত্রী এই রহস্যময়ী বিদেশিনী সোনার তরী বেয়ে যে লোকের দিকে যাত্রা করেছেন সেই লোক সৌন্দর্যলোক। এই যাত্রায় বাস্তবজীবনের সংশয় ক্লান্তি ও শঙ্কা আছে। কবি এই যাত্রাকে বলেছেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির একটি পত্রের অংশবিশেষ স্মরণীয় :—

"আমি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহ মিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দিশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল—"

কবির এই উক্তির তাৎপর্য এই যে সোনার তরী রচনার কালে কবি মনের ভাবনা দৃশ্যত দুটি পৃথক ভাব ও কল্পনায় নিয়োজিত। একদিকে তিনি পৃথিবীকে ও পৃথিবীর সুখদুঃখ মিলন বিরহকে ভালবেসেছেন অন্যদিকে সৌন্দর্য-বিহ্বল কবি কোন লৌকিক ভাবনার দ্বারা আবিষ্ট না হয়ে নির্দেশ্য সৌন্দর্যমূর্তি কল্পনা করেছেন। 'অপরিচিতা' 'বিদেশিনী' রহস্যময়ী নারী কবিকে সেই অসীম সৌন্দর্যলোকের দিকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন আর কবি নিজের মনের অজ্ঞাতে তাতে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। তাই কবি বলেন :

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি কে যাবে সাথে
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে নবীন প্রাতে।
দেখালে সম্মুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিম পারে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে।"

কবিতাটি সম্পর্কে কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয় :

[ক] আলোচ্য কবিতাটির প্রাকৃতিক পটভূমিকাতে ধূসর সন্ধ্যার ছবি ও উপসংহারে বিরহজনিত আক্ষেপ—'কহিবে না কথা দেখিতে পাব না নীরব হাসি'। 'তারিপরে ভাসে তরণী হিরণ' এবং 'সোনার তরণী কোথা চলে যায়' প্রভৃতির মধ্যে নিরুদ্দেশ্য-সৌন্দর্য কল্পনার দ্যোতক 'সোনার তরণী'র উল্লেখ।

কবিতাটির সর্বাংশ ব্যাপ্ত করে যে-ক্রন্দনের সুর রয়েছে, তার 'দৃষ্টান্তে পূর্বালোচিত সোনার তরী' কবিতাটির সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। 'মানসসুন্দরী'র কল্পনাতে 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' কবিতার পূর্বাভাস রয়েছে :

এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোন কূল আছে ? সৌন্দর্যপাথারে
যে বেদনাবায়ু-ভরে ছুটে মনোতরী

সে বাতাসে কতবার মনে শঙ্কা করি—
ছিন্ন হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল ;
অভয়-আশ্বাস ভরা নয়ন বিশাল
হেরিয়া ভরসা পাই ;

বস্তুতপক্ষে 'সোনার তরী,' 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' ও 'মানসসুন্দরী' প্রভৃতি কবিতা যে একই গোত্রের তাতে কেন সন্দেহ নেই।

ইংরাজী সাহিত্যে সৌন্দর্যের উপাসক কীট্‌স্ ও নির্বিশেষ আদর্শের ভাবুক শেলি—এই দুই কবির সৌন্দর্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারণা এদের কারো সঙ্গে মেলে না। শেলির সৌন্দর্যদৃষ্টি জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর মনঃকল্পিত একটি আদর্শ থেকে জন্মলাভ করেছে। তাঁর 'Intellectual Beauty'তে এক আদর্শপ্রেরণাজনিত সৌন্দর্য, যার দ্বারা জগৎ ও জীবন সুন্দর হবে বলে শেলি আশা পোষণ করেছেন এবং তার অভাবে শেলি আক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ এরূপ আদর্শবোধ থেকে জন্মায় নি। এ একান্তভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত এবং কবির অনির্দেশ্য বিরহভাবনামূলক। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে এই সৌন্দর্যমূর্তির কোন যোগ নেই।

কীট্‌স্ বিচিত্র রূপরসগন্ধে নিবিড় আনন্দলাভ করতেন। বিশিষ্ট বস্তুর সৌন্দর্যরস তিনি তৃপ্তির সঙ্গে পান করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো সৌন্দর্য-বিরহে ক্ষিপ্তপ্রায় হ'য়ে তিনি বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন নি। কীট্‌সের কল্পনায় যদিচ সৌন্দর্যের জগৎ ছিল, কিন্তু কাল্পনিক সৌন্দর্যের নারীমূর্তি ছিল না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ানুভূতির দিক থেকে কীট্‌স্-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য থাকলেও কাব্যকল্পনার ক্ষেত্রে উভয় কবিই পৃথক।

টেনিসনের 'The Voyage' কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করবার বিষয়। 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' রচনায় রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, এমন কেউ কেউ মনে করেন। এজন্য কবিতা দুটির সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

'The Voyage' কবিতাটিতে ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধি কবি টেনিসন মোটামুটি সমুদ্রযাত্রার বিস্ময় ও আশা প্রকাশ করেছেন। এতে ইংলণ্ডের নবজীবনের প্রতিনিধি কবির আশা ও উৎসাহ, বাধাবিঘ্নসত্ত্বেও অগ্রসর হওয়ার অভিলাষ সূচিত হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক জয়যাত্রা, উপনিবেশ সংস্থাপন প্রভৃতির প্রভাব এরূপ কবিতা রচনার পশ্চাতে লক্ষণীয়। কবিতাটিতে একটি কল্পিত স্বপ্নের বা সৌন্দর্যের নারীমূর্তির প্রতি ধাবমান হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে বটে, কিন্তু ওই সৌন্দর্য কোনো বিশুদ্ধ aesthetic আবেদন থেকে জন্মলাভ করে নি। এর মূলে রয়েছে পশ্চিমের জীবনসমৃদ্ধি ও জীবনবেগ। অথচ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য আবেদন বিশুদ্ধ ও যথার্থ। এটি অকারণসঞ্জাত, এর মূলে বিরহভাব বিদ্যমান এবং রবীন্দ্রনাথের নারীরূপ কল্পনায় তীব্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি [sensuousness] স্পষ্ট হয়ে

দেখা দিয়েছে। 'Voyage' কবিতার যে-স্থানের সহিত রবীন্দ্রনাথের 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী,' 'কহিবে না কথা দেখিতে পাব না নীরব হাসি' প্রভৃতি অংশের মিল রয়েছে তা ওই :

For One fair Vision ever fled
Down the waste waters day and night,
And still we followed where she led
In hope to gain upon her flight.
Her face was evermore unseen,
And fixed upon the far sea-line,
But each man murmur'd 'O my Queen,
I follow till I make thee mine'.

—এই অংশের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি লক্ষ্য করলেই কবির আশা ও অধ্যবসায়ের মনোভাব উপলব্ধি করা যাবে। বলা বাহুল্য 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'র হতাশা ও বিষাদময়তার স্পর্শমাত্র 'Voyage' কবিতাটিতে নেই। এই অংশ ছাড়া, সমুদ্রযাত্রার বর্ণনার কোনো কোনো অংশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংরেজ কবির ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখা যায়; যেমন, তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ কখনো রবি' ইত্যাদির সহিত 'How oft we saw the Sun retire' ইত্যাদি অংশের। মোটের উপর, ইংরেজি কবিতাটির ভাবের সঙ্গে 'নিরুদ্দেশ যাত্রার মিল নেই, বাহিরে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য রয়েছে মাত্র।

কবিতার বিষয়বস্তু :—

রবীন্দ্রনাথ পার্থিব খণ্ড ক্ষুদ্র সৌন্দর্যের মধ্যে অসীম অনন্ত সৌন্দর্যের দীপ্তি অনুভব করেছেন। কবির অন্তর্নিহিত শক্তি বার বার কবিকে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের দিকে নিয়ে যেতে চায়। নিজ কাব্যজীবন চালনাকারী এই শক্তিকে কবি বিদেশিনী সুন্দরী রমনীরূপে কল্পনা করেছেন। এই রহস্যময়ীর সোনার তরীতে তিনি ভেসে চলেছেন অনন্তের পানে। কবি জানেন না কত দূরে কোন পারে তাঁর সোনার তরী তাঁকে নিয়ে যাবে। কবির সকল প্রশ্ন নিরুত্তর থাকে। রহস্যময়ী বিদেশিনী কেবল মধুর হাসি হাসেন— এই হাসির মধ্যে এমন রহস্য আছে যা কবির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তিনি কেবল নীরবে অঙ্গুলি তুলে দেখান। দূরে সূর্য অস্তমিতপ্রায়। কবি সৌন্দর্যের কোন রহস্যের অনুসন্ধানে চলেছেন তা নিজেও স্পষ্ট ক'রে অনুভব করতে পারেন না। প্রকৃতির বিপুল সৌন্দর্য, সমুদ্রের রক্তিম জলধারা যেন সন্ধ্যায় দিনের শেষে জলের মধ্যে তরল অনলের চিতা রচনা করেছে। আর এই তরল অনল অম্বরতল থেকে গলে গলে পড়ছে। এই নিরুদ্দেশ যাত্রার শেষে কি কোন নিশ্চিন্ত নিরাপদ শান্তি আছে? এ প্রশ্নের উত্তর কবি জানেন না। প্রশ্ন করেন সেই বিদেশিনী অধরা রহস্যময়ীর কাছে। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে কেবল মধুর হাসেন।

এই যাত্রার কোন উদ্দেশ্য নেই। চারিদিকে জলের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। ঘন নীল জলের মতই কবির মনের সংশয় গভীর, কোন দিকে তীর নেই। কেবল

অকারণ অবারণ যাত্রা। এই যাত্রার মাঝে কবি শোনেন অনন্ত ক্রন্দগীতি। সন্ধ্যার কিরণে হিরন্ময় তরণী অনির্দেশ যাত্রাপথে চলেছে। প্রকৃতি ঘনঘোর তমিস্রায় আবৃত, অপরিচিতা সুন্দরী রমনী রহস্যের হাসি হাসছেন। কবির পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এই সুন্দরীর রহস্যলীলা।

কবিকে যখন এই রহস্যময়ী প্রথম ডেকেছিলেন তখন কবি তাঁর প্রথম আহ্বানেই সাড়া না দিয়ে পারেননি। কর প্রসারিত করে সম্মুখপানে চলার ইঙ্গিত করেছেন তিনি। কবি নবীন জীবন ও সোনার ফসলের জন্য এই রহস্যময়ীকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু রহস্যময়ী তাঁকে কখনই পরিপূর্ণ ধরা দেন নি। অনির্দেশ্য সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আছে কবির কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নেই।

তারপরে কবির জীবনে অনেক মেঘ ও রৌদ্রের আবির্ভাব ঘটেছে অর্থাৎ সুখদুঃখ মিলনবিরহের চক্রতলে কবি নিষ্পেষিত হয়েছেন কিন্তু বারবার সেই রহস্যময়ীর অন্বেষণ ক'রেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটিত করতে পারেননি। ক্রমে আঁধার রজনী নেমে আসবে পৃথিবীতে। জীবনে দুঃখের দিনও নামবে। শান্তি ও সুপ্তির আকাঙ্খা তীব্রতর হবে। তথাপি এই কাব্যজীবন-নিয়ন্ত্রী রহস্যময়ী সৌন্দর্যস্বরূপা অপরিচিতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাবে না। কিন্তু কবি অনুভব করেন তার উপস্থিতি প্রতিক্ষণে; কারণ তাঁর দেহসৌরভ ভেসে আসে, কখনও বায়ুভরে তার কেশের রাশি উড়ে পড়ে। তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে কবি নিঃসন্দেহ। বার বার কবি সেই অনির্দেশ্য সৌন্দর্যময়ীকে স্পর্শ করতে চান কিন্তু প্রতিবার রহস্যের অবগুণ্ঠন রচনা করে তিনি কবিকে ছলনা করেন। ফলে আকর্ষণ আরও তীব্র হয়।

॥ শব্দার্থ ও টীকা ॥

সোনার তরী : সৌন্দর্যময় কল্পনার তরী; এই তরীতেই কবি অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকে যাত্রা করেছেন। **বিদেশিনী :** কবির সমগ্র কাব্যজীবনের নিয়ন্ত্রী সোনার তরীর কর্ণধার রূপসী রহস্যময়ী রমণী। তিনি কবির নিকট সম্পূর্ণ পরিচিতা নন, তাই তিনি বিদেশিনী। এঁকে অনেকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী রূপে বর্ণনা করেছেন। তবে উভয়েই মূলতঃ এক। **অকূলসিন্ধু—উঠিছে আকুলি ইত্যাদি :** কবি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের আকাঙ্খায় অসীমে যাত্রা করেছেন, তাই অকূল সমুদ্রের কল্পনা। যাত্রার শুরুতে সমুদ্র শান্ত ছিল; কিন্তু পরে তা তরঙ্গবিক্ষুব্ধ হয়েছে অর্থাৎ সংশয় ও শঙ্কার দ্বন্দ্ব কবিমনে দেখা দিয়েছে। তাই সমুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ। **সন্ধ্যার কূলে দিনের চিতা :** সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাকাশ আগুনের মতো রক্ত বর্ণ ধারণ করে। কবি কল্পনা করেছেন সন্ধ্যারূপ নদীর কূলে সদ্যোমৃত দিনের চিতা প্রজ্বলিত। সন্ধ্যায় দিনের শেষ নদীর তীরে দিনকে চিতায় তুলে দেওয়া হয়েছে। **ঝলিতেছে জল তরল অনল :** সন্ধ্যাকালে সূর্যের রক্তবর্ণ কিরণে সমুদ্রের জলও রক্তবর্ণ ধারণ করে; তাই কবি কল্পনা করছেন যে সমুদ্রের জল তো জল নয়, যেন গলিত অগ্নিস্রোত। **গলিয়া পড়িছে অম্বরতল :** দূরে লাল

রঙের আকাশ সমুদ্রের সঙ্গে মিলে গেছে—কবির মনে হচ্ছে যে রক্তিম আকাশে লাল রং গলে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে গেছে। **দিগবধূ যেন ছল ছল আঁখি অশ্রুজলে ঃ** মানুষ ক্রন্দন করলে চক্ষু রক্তবর্ণ হয়। সূর্য অস্তমিত। সূর্যের শোকে দিকবধূরা ক্রন্দনরতা। কারণ কবি সূর্যের দিগবধূদের সূর্যের নায়িকারূপে কল্পনা করেছেন। তাদের সেই রক্তবর্ণ চোখের জল সমুদ্রে যেন গড়িয়ে প'ড়ছে। **উর্মিমুখর সাগরের পার·····চরণতলে ঃ** তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরের পারে পর্বতের উপর মেঘ আকাশ যেন মিলিত হয়েছে। সাগর পৃথিবী ও আকাশের এই মহামিলনের ক্ষেত্রকে কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মীর বাসস্থান বলে মনে করেছেন। সেখানে পেঁছেও কবি সেই রহস্যময়ীর সন্ধান পান না। সীমা ও অসীমের মিলনের এই রূপচিত্র বাস্তবিক মনোহর। রবীন্দ্র কাব্যসাধনার মূলসুর হচ্ছে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের সুর। **অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন ঃ** কবির অন্তরে একটি বিষাদের সুর নিয়ত বর্তমান। অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে না পাওয়ার বেদনা থেকে এই বিষাদের সুর ঝংকৃত। কবি সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই বিরহের ভাব লক্ষ্য করেছেন। এই রোদন ধ্বনিতে সমগ্র জগৎ প্লাবিত হয়েছে। **তরণী স্থির ঃ** সোনার তরী—যে তরী কবিকে সৌন্দর্যলোকের দিকে নিয়ে চলেছে। **চঞ্চল আলো আশার মতন কাঁপিছে জলে ঃ** দিবসের শেষে সূর্যালোক-উদ্‌ভাসিত সমুদ্রের জল যেন এক মায়াময় পরিবেশ রচনা করে। এই মায়াময় পরিবেশে কবি সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর রহস্য উন্মোচন করতে পারবেন বলে মনে করেন। **আশার স্বপন ফলে কি হোথায় সোনার ফলে ঃ** কবির অন্তরে অসীমকে উপলব্ধি করার আশা তীব্র—এই আকাঙ্ক্ষায় কবি নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের দিকে যাত্রা করেছেন। সোনার ফল বলতে সেই জীবনদেবতা বা সৌন্দর্যলক্ষ্মীর রহস্যমাধুরীকে বুঝিয়েছেন—যে রূপমাধুরীকে অবিরাম অনুসন্ধান করা কবির জীবনের ব্রত। **স্নিগ্ধমরণ আছে কি·········তিমিরতলে ঃ**—কবি চিরশান্তি ও অখণ্ড সৌন্দর্যের পূজারী। সারা জীবন ধরে তিনি এই সৌন্দর্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কবির সেই অনুসন্ধান অবিরাম চলেছে সমগ্র কাব্যধারার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু জীবনে দুঃখ দৈন্য ও দুর্দশার মধ্যেও অখণ্ড সৌন্দর্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; কিন্তু তাকে সারাজীবন ধরে পাওয়া যায় না। এইভাবে সন্ধান করতে করতে একদিন মরণ এসে হাজির হয়। কবি মনে করেন মৃত্যুর মধ্য দিয়েও তিনি অখণ্ড সৌন্দর্যের সন্ধান লাভ করবেন। কিন্তু পরিণামে তা সম্ভব হয় না। রোমান্টিক কবি কেবল আকাঙ্ক্ষা করেন ; আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি তার ভাগ্যে ঘটে ওঠে না। **আঁধার রজনী আসিবে······পড়িবে ঢাকা ঃ** কবির যাত্রাপথে দিন শেষ হয়ে আঁধার রজনী দেখা দেবে এবং গোধূলির স্বর্ণালোক অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যাবে অর্থাৎ কবিজীবনে বিষাদবেদনা তীব্র হবে। এই বিষাদ সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে না পাওয়ার নিমিত্ত বিষাদ। **বিকলহৃদয় বিবশ শরীর ঃ** রহস্যময়ী অপরিচিতার সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়ার জন্য কবির হৃদয় ব্যাকুল ও বিবশ হয়েছে। কারণ কবি তার জীবনদেবতার অস্তিত্ব অনুভব করেন অথচ তাঁকে সম্পূর্ণ ক'রে পান না। এইজন্য কবি-হৃদয়ে সুতীব্র বেদনার সঞ্চার এবং তজ্জনিত বিবশ শরীর।

।। রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর ।।

১। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় বর্ণিত 'সুন্দরী' কে? তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। কোন লোকে কবির যাত্রা? এই যাত্রাকে নিরুদ্দেশ বলা হয়েছে কেন?

উত্তর :—রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবন একটি শক্তি দ্বারা পরিচালিত। অন্তরের মাঝে বসে এই শক্তি কবির মুখে বাণী বসিয়ে নিজের কথাই বলে গেছে—

"অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশিয়ে আপনসুরে"

'চিত্রা' কাব্যে পৌঁছে কবি যেন রহস্যময়ীর কিছুটা স্পষ্ট আভাস পেয়েছেন। অনেকে এই রহস্যময়ী আশ্চর্য সুন্দরী রমণীকে জীবন দেবতা বলতে চান কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন নিয়ন্ত্রী তিনি। আবার কোন কোন সমালোচক এঁকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী বলে চিহ্নিত করতে চান। নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কবিকে বার বার এই অধরা অসীমা রহস্যময়ীর কল্পনায় উদ্‌বোধিত করেছে। সুখদুঃখ মিলনবিরহপূর্ণ পৃথিবীর খণ্ডক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে এই রসসত্তার আভাস পাওয়া গেলেও সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। এই রসসত্তার রহস্যময় রূপটি সুন্দরী রূপে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় বর্ণিত। কবি এঁর আকর্ষণে অসীম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সৌন্দর্যের রহস্যময় জগতে প্রবেশ করতে চান। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এই সুন্দরী অধরা থেকে যান। মাঝে মাঝে তাঁর দেহসৌরভ ভেসে আসে, কখনও বা কেশের পরশ পান। সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। কবিহৃদয়ে এঁকে পাবার আকর্ষণও তীব্র। কিন্তু কবি কোনদিন তাঁকে সম্পূর্ণ ক'রে পান নি। শেষ পর্যন্ত তিনি অধরা থেকেই যান। এই জীবনদেবতাকে কবি এই কবিতায় সুন্দরী অপরিচিতা' বলেছেন।

অসীম সৌন্দর্যলোকের দিকে কবির যাত্রা। এই যাত্রা কখনও থেমে থাকে নি। পৃথিবীর খণ্ডক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে এই অসীমের সুর ঝংকৃত হয়। তিনি সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধন করবার প্রয়াস পান। কবির অন্তরে এই রোমান্টিক আকাঙ্ক্ষা চিরজাগ্রত। যা পান তিনি তাতে তার মন ভরে না। সৃষ্টির উৎসমূলে যে ঐক্যের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে সেই সুরের মূর্ছনা কবির চিত্তকে ব্যাকুল করে। কল্পনার রহস্যময়ী সুন্দরী বা জীবন দেবতা কবিকে সৌন্দর্যের সিংহদুয়ারে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকেন আর কবিও তাঁর সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। তাই কাল্পনিক সোনার তরীতে ক'রে রহস্যময় জীবনদেবতা কবিকে নিয়ে চলেন দূর সমুদ্রপারে যেখানে অনন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডারী অপেক্ষা ক'রে আছেন। কবি সেই সৌন্দর্যলোকেই যাত্রা করতে চান।

কবি তাঁর এই যাত্রাকে নিরুদ্দেশ যাত্রা বলেছেন সত্য। তথাপি আমরা একটু বিশেষভাবে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি যে এই যাত্রা একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়। রোমান্টিক কবি যে কল্পলোকের অভিসারে চলেন সেই কল্পলোক তাঁর কাছে কখনই স্পষ্টত ধরা পড়ে না। তাই তিনি একে নিরুদ্দেশ যাত্রা বলেছেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কবির কল্পনা প্রসারিত হয়েছে তা চিরকাল সকল রোমান্টিক কবিকেই আকর্ষণ করেছে। ইংরেজ কবি Keats এর "Truth is beauty, beauty truth" বক্তব্যের সারবত্তা সকল রোমান্টিক কবির ক্ষেত্রে সমান সত্য। কবিকল্পনার একটি স্তরে এসে সত্য ও সৌন্দর্য মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। তাঁর কাছে যা সত্য তাই সুন্দর হয়ে ধরা পড়েছে। শুধু তাই নয়, মানবজীবনে সত্য ও সুন্দর যে মঙ্গলময় হয়ে ওঠে তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। সুতরাং সুন্দরের অভিসার ঠিক নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, বরং বলা চলে খণ্ড থেকে অখণ্ডে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, সীমা থেকে অসীমে, অসুন্দর থেকে সুন্দরের দিকে মানবজীবনের এই অভিসার শাশ্বত কাল ধরে চলেছে। জীবনের ছন্দে নতুন প্রাণরস সঞ্চার করে এই অভিযান। এই অভিযান কেবল কোন ব্যক্তি মানুষের নয়, রবীন্দ্রনাথের এই যাত্রা শাশ্বতকালের মানবেরই যাত্রা। ব্যক্তির হৃদয় অতিক্রম ক'রে তা বিশ্বজনীন হয়ে ওঠে। তাই এই যাত্রা সত্য ও সুন্দর। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে এই বিশ্বজনীনতা বিদ্যমান।

২। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা ক'রে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর :—বাস্তবজীবনের সীমা থেকে কল্পনার পাখা মেলে মন দূর সৌন্দর্যলোকের পানে ভেসে চলে এবং সেই সৌন্দর্যের বিপুলতা কবিকে আবেগমথিত করে। পরে কবির সেই আবেগ কিছু স্তিমিত হলে সেই আবেগের ব্যক্তি-মলিনতা দূর হয়ে একটি বিশ্বজনীন সত্তারূপ লাভ করে। তখনই সার্থক শ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন কাব্য রচিত হয়। অতএব কবিতা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে "Emotion recollected in tranquilitly." শান্ত অবস্থায় পূর্বতন আবেগে স্মৃতিবর্ণনাই কবিতার প্রাণবস্তু।

রবীন্দ্রনাথের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' সেইরূপ একটি আশ্চর্য সুন্দর শাশ্বত কাব্যসৃষ্টি—এ সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের অসামান্য আবেগ এ কবিতায় চিরন্তনত্ব লাভ করেছে। আর আমরা তা পাঠ করে মনে করি :—

"পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ
তদাস্বাদে বিভাবাদে
পরিচ্ছেদ ন বিদ্যতে"

কবিতাটির রসাস্বাদনের ব্যাপারে আমার ও তোমার এই ভেদ যখন বোঝা যায় না তখনই তা সকলের হয়ে ওঠে।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির বিষয়বস্তু মানসসুন্দরী বা রহস্যময়ী অপরিচিতার সোনার তরীতে কবির মানসভ্রমণ। কবির অন্তরে বারবার বিশ্বপ্রকৃতি সৌন্দর্যের একটি অপরূপ মূর্তি নিয়ে ধরা দিয়েছে। এই যাত্রায় দিনের পর দিন কবি খুঁজে ফেরেন সৌন্দর্যের সত্যস্বরূপ। এই সৌন্দর্যের রহস্যময়তাকেই কবি অপরিচিতারূপে চিত্রিত করেছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের স্বরূপ তার রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে না। বার বার কবি এই সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ জানতে চান এবং তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ভ্রমণ করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অধরা থেকে যায়। কবিতাটির মধ্যে এই ভাবনাটি নানা ভঙ্গীতে ও বিচিত্র আবেগের সঙ্গে উচ্চারিত: সমুদ্র, আকাশ, পৃথিবী সবকিছুর মধ্যে কবি নানা সৌন্দর্য সন্ধান করেছেন। সূর্যের রক্তিম বর্ণ এবং সমুদ্রের উপর তার প্রতিচ্ছায়া কবির কল্পনাকে উদ্‌বোধিত করতে সহায়তা করেছে।

গীতিকবিতা হিসাবে কবিতাটির কাব্যসৌন্দর্য অসাধারণ। রোমান্টিক কবিভাবনা থেকে জাত কবিতাটির প্রতিটি চরণের মধ্যে কবির আবেগ মথিত হৃদয়ের অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে। Romanticism বা কল্পনাবিহারের প্রাণবস্তু হ'ল "Strangeness added to beauty. এই সৌন্দর্যভাবনাই Romanticism এর স্বরূপ। এখানে কবিরও অন্তরের সৌন্দর্যপিপাসা অনবদ্য ভাষা অবলম্বন ক'রে প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়ঃ—

"ঝলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল
দিক্‌বধূ যেন ছলছল আঁখি অশ্রুজল"

অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা সমগ্র পশ্চিম আকাশকে রাঙিয়ে তুলছে আর তার প্রতিবিম্ব পড়ছে সমুদ্রের জলে—এই প্রাকৃতিক দৃশ্যটি কবিকল্পনায় এই ভবে ধরা দিয়েছে—রক্তরাঙা সূর্যের জ্যোতির প্রতিবিম্ব পড়ায় জলকে যেন তরল অনল মনে হচ্ছে আর সমস্ত রক্তিম আকাশটা যেন গলে গিয়ে যেন এই তরল অনলের সৃষ্টি করেছে। পরের পঙক্তিতেও দিক্‌বধূদের ক্রন্দনজনিত রক্তআঁখি সূর্যের বিদায় বেদনায় সজল হয়ে ওঠে।

এরূপভাবে কবিতাটির প্রত্যেক পংক্তিতে অসাধারণ স্বপ্নকল্পনার ইঙ্গিত আছে। কবিতাটির প্রাণবস্তুই হচ্ছে কল্পনাপ্রসারের অসাধারণ সৌন্দর্য। অপর একটি উদাহরণ স্মরণ করা যেতে পারেঃ—

"এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শান্তি, আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে"

কবিতাটির মধ্যে যেমন সৌন্দর্যসন্ধানী কবির ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায় ঠিক তেমনই একটি চরম শান্তির আকাঙ্ক্ষাও বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ

পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তির জন্য সকলের মনেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে। সৌন্দর্যের সন্ধান করতে করতে একদিন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং মানবজীবনে আকাঙ্ক্ষা আছে, তৃপ্তি নেই। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সেই চিত্ররূপই এখানে প্রকাশিত।

এইরূপে অনেক উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় যে কবিতাটির মধ্যে কবিহৃদয়ের আবেগ অসামান্য সুন্দর কাব্যমহিমায় প্রকাশিত। আর এখানেই কবিতাটির প্রকৃত সৌন্দর্য।

৩। কবি রবীন্দ্রনাথের কাল্পনিক নিরুদ্দেশ সৌন্দর্য বিরহের স্বরূপ নির্ণয় কর ঃ

উত্তর ঃ—'সোনারতরী' রচনাকালে কবি তাঁর মনোভাব বিশ্লেষণ ক'রে একটি পত্রে লিখেছেন—"আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলন পূর্ণ ভালবাসা প্রবল না, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল।" কবির মর্তপ্রীতি-মূলক সোনার তরীর কবিতাগুলিতে এবং 'চিত্রা'র 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় প্রথমোক্ত মনোভাব এবং 'সোনার তরী'র 'নাম কবিতায়' 'মানসসুন্দরী' 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' এবং 'চিত্রা'র 'জ্যোৎস্নারাত্রে' উর্বশী প্রভৃতি কবিতায় কবির দ্বিতীয়োক্ত মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়। একদিক থেকে এমন কথা বলা যায় যে, কবির সৌন্দর্য অভিলাষ মানসীর 'সুরদাসের প্রার্থনা ও 'মেঘদূত' কবিতা থেকে আরম্ভ ক'রে 'সোনার তরী'র নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্য দিয়ে চিত্রায় একটি স্থির সৌন্দর্য সাধনায় রূপ লাভ করেছে।

'সোনারতরী' ও নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাদুটিতে এবং চিত্রার 'মেঘদূত কবিতায় এই আর্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি ঘটেছে ঃ—

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রশয়ান—
কে দিয়াছে হেন শাপ কেন ব্যবধান ॥
কেন উর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।
সশরীরে কোন নর গেছে সেইখানে
মানসসরসীতীরে বিরহশয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।

এর ব্যাখ্যায় 'মেঘদূত' প্রবন্ধে কবি লিখেছেন ঃ—

'মনে পড়িতেছে কোন ইংরাজ কবি (ম্যাথু আর্নল্ড) বলিয়াছেন মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূরে হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম ; এখন কাহার অভিশাপে আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে।"

উপরিলিখিত মনোভাব সকল সৌন্দর্যমূলক কবিতায় সুলভ। সোনার তরীতে অপরিচিত বিদেশিনী এসে কবির সৌন্দর্যবাসনা জাগ্রত ক'রে কবিকে তীব্র বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে গেলেন। কবি তার সাক্ষাৎ পেলেন মাত্র কিন্তু সশরীরে মিলন ঘটল না। নিরুদ্দেশ যাত্রায় যদিও কবি এক তরণীতে বিদেশিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন তবুও এই চঞ্চলগামিনীর সংগে নিজ ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মিলন ঘটাতে পারলেন না; কারণ তা অসম্ভব। বিরহেই এই কল্পনার স্থিতি। প্রকৃতির কুহেলিকাময় চিত্রে কবির এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে :

'মানসসুন্দরী'তে :

> সন্ধ্যার কণক বর্ণে
> রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
> গড়িছ মেঘলা;

'নিরুদ্দেশযাত্রা'য় :

> আঁধার রজনী আসিবে এখনি মেলিয়া পাখা,
> সন্ধ্যা আকাশে স্বর্ণ আলোক পড়িবে ঢাকা।

সুতরাং নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যবিরহ অবশ্যই কবিচিত্তে একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে। প্রকৃতি চেতনা ও সৌন্দর্য অভিলায ও তজ্জনিত বিরহ যে কবিতাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' তাদের মধ্যে অন্যতম।

।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর ।।

১। গীতিকবিতা কাকে বলে? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাকে কি গীতিকবিতা বলা যায়?

উত্তর :—যে কাব্যে কবি নিজের হৃদয়ের আবেগ প্রকাশ করেন তাকেই গীতিকবিতা আখ্যা দেওয়া হয়। কবিহৃদয়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি এখানে প্রধান হয়ে দেখা দেয়। জীবনের খণ্ড ক্ষুদ্রের মধ্যেই সম্পূর্ণত্ব'র আভাস নিহিত। 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় ব্যক্তি-হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সর্বজনীনতা লাভ করেছে। এটি নিঃসন্দেহে গীতিকবিতা।

সীমার মাঝে অসীম তার সুর বাজিয়ে চলে। অনির্বচনীয়তা, অসীমতা ও অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রতি কবি হৃদয়ের ব্যাকুলতা এই কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত। অসীমকে সীমার সঙ্গে বাঁধবার অবিরাম প্রচেষ্টা শুধু এই কবিতায় নয়, কবির সমগ্র কাব্যপ্রবাহে ব্যাপ্ত। আত্মগত ভাবনা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতার প্রাণবস্তু বলে একে গীতিকবিতা আখ্যা দেওয়া যায়।

২। রোমান্টিক কবিধর্ম কি? 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় এই কবিধর্ম কি ভাবে প্রকাশিত?

উত্তর ঃ—রোমান্টিকতা ভাষান্তরে কল্পবিলাসস্পৃহা দ্বারা কবি বিশ্বের সকল খণ্ড সৌন্দর্যের অতিশায়ী এক অখণ্ড সৌন্দর্য সত্তার সান্নিধ্য উপভোগ করেন। একটি অপার রহস্যময়তার সন্ধানে কবির কল্পনা ধাবিত হয় অসীমের পানে। গীতিকবিতার মধ্যে এই রোমান্টিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসাহিত্যে বিহারীলালের কাব্য থেকেই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম সূত্রপাত ঘটে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের তন্ময় কাব্যসাধনার প্রভাব লক্ষনীয়।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় এই কবিধর্মের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ কবি সৌন্দর্যের অপার রহস্যের অনুসন্ধানে কল্পনার বিস্তার ঘটিয়েছেন। পৃথিবীর অনন্ত সৌন্দর্যের সন্ধানে কবিচিত্ত ধাবিত হয়েছে। সৌন্দর্যের সঙ্গে রহস্যের সমাহার যদি রোমান্টিকতার প্রাণবস্তু হয় তাহলে নিঃসন্দেহে নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায় সেই রোমান্টিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

৩। "আর কতদূরে মোরে নিয়ে যাবে হে সুন্দরী
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী

—কবি কাকে এই প্রশ্ন করেছেন? সোনার তরীতে করে কবি কোথায় চলেছেন? সোনার তরী' কিসের ইঙ্গিত বহন করে?

উত্তর ঃ—কবি সৌন্দর্যলক্ষ্মী বা জীবনদেবতাকে এই প্রশ্ন করেছেন। কাল্পনিক রহস্যময়ী অপরিচিতা বিদেশিনী যেন কবিকে অসীমের রহস্যরাজ্যে স্বর্ণময় তরীতে করে নিয়ে চলেছেন সমুদ্র পথে আর কবির সৌন্দর্যব্যাকুলতা এত প্রবল যে তিনি এই রহস্যময়ীর সঙ্গে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। পরিণামে এই সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণরূপে হয়ত ধরা যাবে না। তবুও কবির অবিরাম সৌন্দর্য অভিসার অব্যাহত আছে।

'সোনার তরী' সংসারাতীত এক নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের প্রতীক। কবি মনের কমনীয় স্বপ্ন দিয়ে এটি তৈরী। সোনার তরীর কল্পনায় মানুষের ভাবজীবনের মহিমা সংকেতিত হয়েছে।

৪। "এখন বারেক শুধাই তোমায়—
স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায়
আছে কি শান্তি আছে কি সুপ্তি তিমিরতলে?

—কে কাকে জিজ্ঞাসা করেন? স্নিগ্ধমরণ, শান্তি ও সুপ্তির বাসনা জাগ্রত হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ—কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানসসুন্দরীকে এই প্রশ্ন করেছেন—যে মানসসুন্দরী কবিকে 'সোনার তরী'তে ক'রে নিয়ে চলেছেন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ অভিসারে।

কবি চিরশান্তি ও অখণ্ড সৌন্দর্যের পূজারী। সারাজীবন ধরে তিনি শান্তি ও সৌন্দর্যের সাধনা করেছেন। বাস্তবজীবনে দুঃখ দৈন্যের পাশাপাশি সুখ ও সৌন্দর্য বিরাজ করে। কিন্তু জীবনে চিরন্তন শান্তি বা সৌন্দর্য বলে কিছু পাওয়া যায় না। সন্ধান করতে করতে মৃত্যু এসে জীবনকে গ্রাস করে। তথাপি কবিজীবনে এই অনুসন্ধান অবিরাম চলতে থাকে। কারণ কবি আমৃত্যু এই সৌন্দর্য অন্বেষণ করতে চান। শান্তি ও সুপ্তির সন্ধানে যাত্রা করে যদি মৃত্যুবরণ করতে হয় তাতেও কবি পশ্চাৎপদ নন। কবির আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই কবির মনে স্নিগ্ধ মরণ, শান্তি ও সুপ্তির বাসনা জাগ্রত হয়েছে।



ছন্দ

"…কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার বাঁধা সেতার।…"

প্রাক্-কথন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঐচ্ছিক বাংলা পাঠার্থীদের জন্য যে পাঠ্যতালিকা তৈরি করেছেন, শুধুমাত্র ঐটুকু শিখলে ছন্দবিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ঐ কারণেই কিছু অতিরিক্ত বিষয় সংযোজনে ছন্দ-বিষয়ে আলোচনা সম্পূর্ণ করা হলো, যদিও সংক্ষেপতঃ। যে সমস্ত বিষয় পাঠ্যতালিকাভুক্ত, সে সমস্ত বিষয় তারকা-চিহ্নিত (*) করা হলো। তবে সমগ্র আলোচনাই অধীতব্য, তারকাচিহ্নিত অংশে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে মাত্র।

বিশ্বের সৃষ্টিকাল থেকেই তাবৎ বস্তুতে একটা নিয়মনিষ্ঠ গতির আবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রাদি একটা নির্দিষ্ট কালে নির্দিষ্ট পথ ধরে চলছে, ঋতু-চক্রের আবর্তনে প্রকৃতির জগতেও একই নিয়মনিষ্ঠা অনুসৃত হচ্ছে—আদিম মানবসন্তান অবাক বিস্ময়ে তা লক্ষ্য করতো। তারপর মানুষ যখন ভূয়োদর্শিতার ফলে অনেকটা বিজ্ঞ হয়ে উঠলো, সভ্যতাসোপানের প্রথম পাদপীঠে পদস্থাপন করলো, তখনই প্রকৃতিজগতের এই নিয়মনিষ্ঠা, গতির এই আবর্তন চক্রকে স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করে নিল। তারই ফলে জন্মগ্রহণ করলো নৃত্য, শিল্পসাধনা, এবং সর্বশেষে কাব্য। এই সব কিছুর মূলেই কিন্তু জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে কাজ করে যাচ্ছে সেই প্রাকৃতিক নিয়মনিষ্ঠা, গতির আবর্তন—যাকে এক কথায় বলা চলে সৌষম্যবোধ, এই সৌষম্যবোধেরই নামান্তর 'ছন্দ'। আমাদের গতির সৌষম্যকে বলি 'চলার ছাঁদ', কথা বলায় সৌষম্যের অভাব ঘটলে বলি,—'কথা বলার ছিরিছাঁদ' (শ্রীছন্দ) নেই', চুলের খোঁপার সুষমবিন্যাস দেখে বলি 'কী ছাঁদে বেঁধেছ কবরী'। 'ছন্দ' থেকে উদ্ভূত 'ছাঁদ' কথাটি ব্যাপকতর অর্থে প্রকাশিত হলেও কাব্যক্ষেত্রে সৌষম্যযুক্ত রচনাকে 'ছন্দ'ই বলা হয়ে থাকে।

তমসানদীর তীরে ভ্রমণরত বাল্মীকি নিষ্ঠুর ব্যাধের হস্তে ক্রৌঞ্চদম্পতির একটিকে নিহত হতে দেখে অকস্মাৎ-ই উচ্চারণ করেছিলেন—

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।'

এই 'পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিত' শোকোদ্ভূত রচনাকে তিনি 'শ্লোক' নামে অভিহিত করলেন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এই রচনাটির প্রতিটি পংক্তি বা চরণে ১৬টি স্বরধ্বনিকে আশ্রয় করে ১৬টি অক্ষর (শুদ্ধব্যঞ্জনকে পূর্ববর্তী-স্বরের আশ্রিত ধরে নিয়ে) বর্তমান রয়েছে, এতে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণে বৈচিত্র্য এবং চার অক্ষর পর পর বাগ্‌যন্ত্রের সাময়িক বিরতি ঘটছে এবং এরই ফলে যে ধ্বনি-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে, তাকেই বলা হয় 'ছন্দ'। বাল্মীকিই এ জাতীয় শ্লোকের আবিষ্কর্তা বলে তাঁকে 'আদিকবি'র সম্মান দেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে তার অনেক আগেই প্রাজ্ঞ ভারতীয় ঋষিদের মনে ছন্দের দোলা লেগেছিল এবং তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জগতের অন্যতম প্রাচীনতম কাব্যসাহিত্য 'বেদসংহিতা'। বেদেও বিভিন্ন প্রকার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গেই তার ছন্দের নামও উল্লেখ করে পাঠ করতে হয়। এ থেকেই বোঝা যায়, বৈদিক ঋষিদের নিকট ছন্দ কত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো।

বৈদিক যুগে 'গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, অনুষ্টুপ' প্রভৃতি নানা জাতীয় ছন্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তারপর সংস্কৃত সাহিত্যে ছন্দে আরো বহু বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলেও প্রধান জাতি ছিল দুটি—একটিকে বলা হতো 'অক্ষরচ্ছন্দ' বা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, অপরটি ছিল 'মাত্রাচ্ছন্দ' বা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি চরণের অক্ষরসংখ্যা এবং তাদের বিন্যাস এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লঘু-গুরুভেদে মাত্রাসংখ্যা এবং তাদের বিন্যাসক্রমই ছিল প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই মূল নীতি বজায় রেখেই তার মধ্যে শতাধিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত কাব্যের শেষ দিকে এবং প্রাকৃত সাহিত্যে মাত্রাছন্দই আধিপত্য লাভ করে। প্রাকৃতে যেমন সংস্কৃত ছন্দ গৃহীত হয়েছিল, তেমনি আবার নোতুন নোতুন ছন্দও সৃষ্টি হয়েছিল। এই মাত্রা-ছন্দের মূল নীতি—দীর্ঘস্বর, যৌগিক স্বর এবং যুক্ত-ও-হসন্তবর্ণের পূর্ববর্তী স্বর গুরু বা দুই মাত্রা বিবেচিত হতো, অন্য স্বরের মূল্য ছিল এক মাত্রা—একে বলা হতো লঘু। তবে পদান্তে লঘু স্বরও প্রয়োজন-বোধে দ্বিমাত্রিক হতে পারতো।

হাজার বছর আগে যখন প্রথম বাংলা সাহিত্যের জন্ম হলো, তখন তার নিজস্ব কোন ছন্দরীতি গড়ে ওঠে নি। প্রধানতঃ প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত বাংলা ভাষা প্রাকৃত-অপভ্রংশের ছন্দরীতি গ্রহণ করেই চর্যাপদে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তাই চর্যাপদের ছন্দে আছে পূর্বানুস্মৃতি। মাত্রাবৃত্ত ছন্দই বহাল রইল, তবে বাংলা উচ্চারণে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেবার ফলে সেই ছন্দরীতি ততো কঠোরভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। চর্যাপদের পর কয়েক শো বছর আমরা বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাইনি। তবে অনুমান করা যায়, ততদিনে বাংলার নিজস্ব একটা ছন্দরীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারই সুনিপুণ নিদর্শন লাভ করি আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। এখানেই বাংলা ছন্দ তার নিজস্ব আদর্শ পেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মাত্রাবৃত্তের খোলস ছেড়ে বাংলা ছন্দ হয়ে দাঁড়ালো অক্ষর-ভিত্তিক। এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দও সংস্কৃত অক্ষরবৃত্তের মতোই, তবে হুবহু এক নয়। সংস্কৃত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদান্তস্থিত শুদ্ধ ব্যঞ্জনের কোন মাত্রা থাকতো না। বাংলায় তাদের ক্ষেত্রেও এক মাত্রা বিহিত হলো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ছন্দে রয়েছে কিছুটা অপরিপক্বতা। কিন্তু তার পর সারা মধ্যযুগ ধরে যত বাংলা কাব্য রচিত হয়েছে, তার প্রায় সবই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে—শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাথমিক জড়তা আর এদের মধ্যে ছিল না।

এই সময়ই, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সচেতন সাহিত্যপ্রচেষ্টার বাইরে, সাধারণতঃ মেয়েলি ভাষায় একধরনের ছন্দ ব্যবহৃত হতো, যার মূল সম্ভবতঃ দেশজ অনার্যসমাজে নিহিত। মধ্যযুগের সাহিত্যে কচিৎ কোন মেয়ের মুখে এজাতীয় স্বরবৃত্ত অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়। এধরনের ছন্দে স্বরসংখ্যায় সৌষম্যই ছিল ধ্বনি-তরঙ্গসৃষ্টির কারণ। তবে এজাতীয় ছন্দের ব্যবহার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত সকল কবিই প্রধানতঃ মধ্যযুগের অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বাহন করেই যাবতীয় কাব্য রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনজাতীয় ছন্দের শক্তি বিষয়ে সচেতন হয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাদের সব কটিকেই সমান মর্যাদার আসনে উন্নীত করেন। পরবর্তী কবিরাও রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণ করে তিন জাতীয় ছন্দেই কাব্য রচনা করতে থাকেন—ফলতঃ এখন আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একাধিপত্য নেই।

প্রথম অধ্যায়

পরিভাষা পরিচয়

আমরা যখন কথা বলি, তখন অর্থবোধের জন্য মাঝে মাঝে থামতে হয়—বাগ্‌যন্ত্রের এই সাময়িক বিরতির ফলে বাক্যের মধ্যে যে ছেদ পড়ে, তা' আমাদের অর্থবিভ্রাটের হাত থেকে রক্ষা করে, যেমন,—'তুমি কালই বাড়ি যেয়ো না গেলে বিপদ অনিবার্য।',—এই বাক্যে যদি 'যেয়ো' শব্দের পর ছেদ পড়ে তা হ'লে এক রকম অর্থ, যদি 'যেয়ো না'র পর ছেদ পড়ে তবে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এ থেকেই বোঝা যায়, অর্থবোধের জন্য বাক্যে সাময়িক বিরতি কত গুরুত্বপূর্ণ। কবিতা পাঠ কালে কিন্তু এজাতীয় বিরতি ছাড়াও বাগ্‌যন্ত্রের আরেক ধরনের বিরতির প্রয়োজন হয়,—এটার প্রয়োজন বাগযন্ত্রের সাময়িক ও নিয়মিত বিশ্রাম এবং শ্বাসযন্ত্রের স্বাভাবিক প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে। বাগ্‌যন্ত্রের এই বিরতিও অর্থবোধে সহায়তা করে কিন্তু এটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কবিতা পাঠ কালে নিয়মিত ব্যবধানে যদি থেমে থেমে পড়া যায়, তবে সেই পাঠ সুখশ্রাব্য হয় তো বটেই, অধিকন্তু গতি এবং বিরতি-সমন্বয়ে যে একটা ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাতে কখনও ক্লান্তি আসে না। তা ছাড়া এই ধ্বনিতরঙ্গ মনের মধ্যেও একটা দোলার সৃষ্টি ক'রে মনকে রসাপ্লুত করতে সহায়তা করে। এই ধ্বনিতরঙ্গই কবিতাকে সাধারণ গদ্য ভাষা থেকে পৃথক ক'রে রেখেছে এবং এটিকেই বলা হয় কবিতার বিশেষ লক্ষণ। ছন্দের পরিভাষায় এই ধ্বনিতরঙ্গকেই বলা হয় ছন্দস্পন্দ এবং এই ছন্দস্পন্দনই ছন্দের প্রাণ।

ছন্দ কাকে বলে, এক কথায় তা বোঝানো মুশকিল। এ বিষয়ে নানা জনে নানা ভাবে অর্থ নির্দেশ করেছেন। 'ছন্দ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, কেউ বলেছেন 'যা আনন্দ দান করে, তাই ছন্দ', কেউ বলেছেন, 'মন্ত্রের দোষ আচ্ছাদন করে বলেই এর নাম—ছন্দ।' এগুলি অবশ্য প্রাচীন কালের ব্যাখ্যা। একালের কবিমনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেন—'আমরা কথায় বলে থাকি, কথাকে ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এ কেবল বাহিরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার। কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মত লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে।' কবির এই কাব্যময় আলঙ্কারিক ভাষায় ছন্দের তাৎপর্য বোঝা গেলেও এর দ্বারা তার সংজ্ঞার্থ নির্ণীত হয় না। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—'বাক্যস্থিত পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে কালগত ও ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধি হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে।'

ছন্দ বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, তারাপদ ভট্টাচার্য, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি অনেক ছান্দসিকই বিস্তৃত আলোচনা নিবদ্ধ করে গেলেও তাঁরা কেউই ছন্দের

সংজ্ঞা-বিষয়ে একটি মাত্র সূত্রে উপনীত হননি। ঐ সমস্ত মতামত আলোচনা করে আমরা ছন্দের নিম্নোক্ত সংজ্ঞাটি গ্রহণ করতে পারি :

'যে ললিত ও সুনিয়ন্ত্রিত পদস্থাপনায় কাব্যে ধ্বনিতরঙ্গ তথা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা যায় ছন্দ।'

রবীন্দ্রনাথ ছন্দধাঁধাঁ নামে কিছু পদ রচনা করেছেন,— দৃশ্যতঃ যাদের কবিতা মনে হলেও সুমিত পদ স্থাপনা দ্বারা সেখানে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হয়নি বলে তা কখনো মনে তেমন ভাবে রসাবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। যেমন —

'সকালে অধীর বাতাস এল,
বৃথাই শুধু বনেরে বকালে।
চেয়ে দেখি দিনশেষে
মাটি ঝরা ফুলে ছেয়ে
লতারে ঠকালে কাঙাল করে।'

এ ধরনের লেখায় অর্থবোধে কোন বিপত্তি ঘটনা, কিন্তু ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি না হওয়াতে প্রাণে দোলা লাগে না। এটিকেই যদি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা যায়—

'অধীর বাতাস এল সকালে,
বৃথাই বনেরে শুধু বকালে।
দিনশেষে দেখি চেয়ে
মাটিঝরা ফুলে ছেয়ে
লতারে কাঙাল করে ঠকালে॥'

এই ললিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদস্থাপনায় যে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হলো, তার ফলে এটিকে রসাবেদনপূর্ণ কবিতা বলে মেনে নিতে কোন বাধা থাকে না অর্থাৎ ছন্দই যেন কবিতাটিতে প্রাণ সঞ্চার করলো। এ থেকে আমরা ছন্দের একটি আবশ্যিক উপাদানেরও পরিচয় পেলাম, এটি ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দের পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ছন্দস্পন্দ'।

সুনিয়ন্ত্রিত পদস্থাপনার ফলে যে উত্থানপতনময় ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ছন্দস্পন্দ (Rhythm)।

যে রচনায় কোন ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয় না, সেই রচনাই গদ্য। গদ্যের সঙ্গে কবিতার তথা পদ্যের এইটিই প্রধান পার্থক্য। 'সাগরজলে সিনান করি সজল এলো চুলে উপল উপকূলে বসিয়াছিলে'— এখানে কোন ছন্দস্পন্দ বা ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি না হবার ফলে এটিকে পদ্য আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটিতে যদি ছন্দস্পন্দ আনা যায়, তবে একে পদ্য বা কবিতা বলতে বাধা থাকে না—

'সাগর জলে সিনান করি সজল এলো চুলে / বসিয়াছিলে উপল উপকূলে।'

ছন্দ এক প্রকার বিজ্ঞান। তাই এর বিভিন্ন উপাদান বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়। এই পরিভাষা বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে ছন্দ-

বোধে অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। তাই বিভিন্ন পরিভাষা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো।

ছেদ :—আমরা আলোচনার প্রারম্ভেই দেখেছি, অর্থবোধের জন্য বাক্যের মাঝে মাঝে এবং শেষে বাগ্‌যন্ত্রের সাময়িক বিরতি প্রয়োজন। অন্যথায় অর্থবোধে বিপত্তি ঘটতে পারে। এই সাময়িক বিরতিকেই বলা হয় 'ছেদ'। ছেদের সংজ্ঞার্থ আমরা এভাবে নির্ণয় করতে পারি—

অর্থবোধের নিমিত্ত বাক্যের মাঝে অথবা অন্ত্যে বাগ্‌যন্ত্র যখন সাময়িক বিরতি গ্রহণ করে, তখন তাকে বলা হয় 'ছেদ'।

অনেকে 'ছেদ'-কে 'অর্থযতি' নামেও অভিহিত ক'রে থাকেন। অর্থের প্রয়োজনে ছেদের কাল পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। বাক্যের যেখানে সমাপ্তি ঘটে, সেখানে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে।—

'এখানে নৌকা ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ;
সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।'

উপরের উদ্ধৃতিটিতে যদিও তিনটি বাক্য রয়েছে, তবু প্রথম দুটি বাক্য সমাপ্ত হলেও যেন কিছুটা বক্তব্য অপেক্ষিত রয়ে গেছে, তাই ভাবের সমাপ্তির পরই পূর্ণচ্ছেদ পড়লো। আবার ভাবের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে কেউ কেউ 'ছেদ'কে 'ভাবযতি' নামেও অভিহিত ক'রে থাকেন। প্রচলিত বাংলায় পূর্ণচ্ছেদকে বলা হয় 'দাঁড়ি'—এর সঙ্কেত-চিহ্ন—একটা খাড়া রেখা (।), ইংরেজিতে একে বলা হয় Full Stop—এর চিহ্ন একটি বিন্দু (.)। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুটি দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে বাক্যের পূর্ণচ্ছেদ বোঝানো হ'তো। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়াও অর্থবোধের উপর নির্ভর ক'রে আরো কয়েক প্রকার ছেদচিহ্ন আমরা ইংরেজির অনুসরণে ব্যবহার করছি, এগুলো প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ছিল না।—যেমন, পাদচ্ছেদ বা কমা (,), অর্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন (;), কোলন (:), ড্যাস (—) প্রভৃতি। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তটিতে পাদচ্ছেদ ও অর্ধচ্ছেদের ব্যবহার রয়েছে।

প্রবীণ ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন 'ছেদ' শব্দটি ব্যবহারে অনিচ্ছুক। তিনি এর পরিবর্তে 'ভাবযতি' পারিভাষিক শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন।

যতি : অর্থগতভাবে ছেদ এবং যতির কোন পার্থক্য নেই, উভয়েরই অর্থ বাগ্‌যন্ত্রের বিরামস্থান। কিন্তু সাধারণ বাক্যে বা গদ্য-ব্যবহারে আমরা অর্থের সুস্পষ্টতার জন্য যে ছেদ বা যতি দিই, তার সঙ্গে কবিতাপাঠ-কালে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির নিমিত্ত নিয়মিত ব্যবধানে যে যতি দিই, তার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। কবিতার যতিকে 'ছন্দ-যতি' বললে কাজ চলে বটে, এবং কেউ কেউ এই পরিভাষিক শব্দটি ব্যবহারও ক'রে থাকেন। কিন্তু তার চেয়েও ভাল হয়—অর্থযতি-অর্থে ছেদ কথাটি যেমন বহুল প্রচারিত হ'য়ে প্রয়োগসিদ্ধি লাভ করেছে, তেমনিভাবে ছন্দের প্রয়োজনে আরোপিত যতিকে শুধু 'যতি' নামেই অভিহিত করা। বস্তুতঃ ছান্দসিকগণ অনেকেই

ছন্দের প্রয়োজনে বাগ্‌যন্ত্রের সাময়িক এবং নিয়মিত বিরতিকে 'যতি' বলেই আখ্যায়িত ক'রে থাকেন।

কবিতা পাঠকালে ছন্দস্পন্দ বা ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির প্রয়োজনে বাগ্‌যন্ত্র যে নিয়মিত ব্যবধানে বিরতি লাভ করে, তাকে বলা হয় 'যতি' বা ছন্দ-যতি।

কাব্য-পাঠে যতির গুরুত্ব অসাধারণ। যথাস্থানে যদি যতি না পড়ে, তবে ছন্দপতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—

দক্ষিণ পবন ভরে | অঞ্চল উড়িয়া পড়ে |
কখন যে নাহি পারি | লখিতে ; ||
পুলক ব্যাকুল হিয়া | অঙ্গে উঠে বিকশিয়া |
আবার চেতনা হয় | চকিতে ||

উদ্ধৃতিটির প্রতি পংক্তিতে লম্বা দাঁড়ি-চিহ্ন দিয়ে যতি বোঝানো হ'লো। কবিতাটি স্বাভাবিকভাবে পড়লে যতিস্থানে সাময়িকভাবে থামতে হচ্ছে, এতে কবিতার শ্রুতি-মাধুর্য এবং অর্থময়তা উভয়ই বজায় রইল।—এই কবিতাটিতেই যদি যথাস্থানে যতি সন্নিবিষ্ট না হয়, তবে যেমন এর ছন্দপতন ঘটে, তেমনি অর্থেও বিপত্তি দেখা দিতে পারে। যেমন—

দক্ষিণ পবন | ভরে অঞ্চল | উড়িয়া পড়ে |
কখন যে নাহি | পারি লখিতে ;
পুলক ব্যাকুল | হিয়া অঙ্গে উঠে | বিকশিয়া
আবার চেতনা | হয় চকিতে।

এখানে যথাস্থানে যতিপাত না ঘটায় ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হ'লো না, ফলে ছন্দপতন ঘটলো, শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হ'লো, এমন কি অর্থও স্পষ্ট হ'লো না।

যতির প্রকারভেদ রয়েছে। সাধারণতঃ যেখানে কবিতার চরণ শেষ হয়, তথা বাক্যের সমাপ্তি ঘটে, তথায় যেমন পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, তেমনি পূর্ণযতিও পড়ে। আর স্বল্প ব্যবধানে চরণের মাঝেমাঝেই যখন নিয়মিত ব্যবধানে জিহ্বার বিরাম ঘটে, তখন যে যতি পড়ে, তাকে বলে **'মধ্যযতি'**। ছন্দের ব্যাপারে এই মধ্যযতিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ—কারণ এই মধ্যযতির ফলেই কবিতায় ধ্বনিতরঙ্গের বা ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। উদ্ধৃত কবিতায় যে যতিচিহ্ন দেওয়া হয়েছে, এগুলিই মধ্যযতি—যাকে লম্বা দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পূর্ণযতি স্থলে পূর্ণচ্ছেদ চিহ্ন পড়ে বলে তথায় আর পূর্ণযতি চিহ্ন পৃথক্‌ভাবে অনেক সময়ই দেওয়া হয় না। পূর্ণযতির চিহ্ন লম্বা দুই দাঁড়ি (||)।

কবিতায় আর একপ্রকার অনতিস্পষ্ট যতিও অনুভব করা যায়। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আরম্ভ থেকে মধ্যযতি পর্যন্ত এবং মধ্যযতি থেকে পরবর্তী যতি পর্যন্ত একাধিক শব্দ বর্তমান। প্রতিটি শব্দের পরই বাগ্‌যন্ত্র ক্ষণিকের বিশ্রাম গ্রহণ করে, তা এত অল্প

সময়ের জন্য যে প্রায় অনুভবেই আসে না। প্রতিটি শব্দের পর যে অতি সামান্য সময়ের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের বিরাম ঘটে, তাকে বলা চলে 'লঘুযতি' বা 'উপযতি'। সাধারণতঃ নির্দেশ দেওয়া না থাকলে এই লঘুযতি চিহ্ন দেওয়া হয় না। লঘুযতির সঙ্কেত চিহ্ন—তিনটি খাড়া বিন্দু (⋮)।—

দক্ষিণ ⋮ পবন ⋮ ভরে | অঙ্কুর ⋮ উড়িয়া ⋮ পড়ে।
কখন যে ⋮ নাহি ⋮ পারি | লখিতে।
পুলকে ⋮ ব্যাকুল ⋮ হিয়া | অঙ্গে ⋮ উঠে ⋮ বিকশিয়া |
আবার ⋮ চেতনা ⋮ হয় | চকিতে। ||

কবিতা-পাঠে যতির গুরুত্বের কথা বলা হ'য়েছে, কিন্তু গদ্য পাঠকালেও ছেদচিহ্নের অতিরিক্ত যতিপাত ঘটে, যদিও তা নিয়মিত নয় এবং অনেকটা পাঠকের ইচ্ছাধীনও বটে। একটি কবিতা পাঠকালে তার ছন্দ বজায় রাখতে গেলে প্রত্যেক পাঠকই একই স্থানে যতি দিয়ে পড়েন—নতুবা ছন্দপতন ঘটে। কিন্তু গদ্যে যতিদানের ব্যাপারে এরূপ কোন নিয়মনিষ্ঠা নেই, পাঠক তার অভিরুচি অনুযায়ী যতি দিতে পারেন।—

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়—"এমন মেয়ে | দেখা যায় | যার | সহজ চলনের মধ্যেই | বিনা ছন্দের | ছন্দ আছে। | ···সে মেয়ের | চলনটাই কাব্য, | তাতে | নাচের তাল | নাইবা লাগল, | তার সঙ্গে | মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে | বিপত্তি ঘটবে।" |

উদ্ধৃতিটিতে যে সমস্ত স্থানে যতি পড়েছে, তার ব্যতিক্রমও ঘটতে পারে, কিন্তু কোন হিসেবেই কাব্যের মতো তেমন ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হবে না। সাধারণতঃ একটি থেকে চারটি পর্যন্ত গোটা শব্দ ধরেই বাগ্‌যন্ত্রের বিরতি ঘটে—তার অনেকটাই অর্থ-বোধের উপর নির্ভর করে বলেই বিরতি কখনও নিয়মিত হয় না।

অক্ষর/দল—সাধারণভাবে বাংলায় অক্ষর বলতে যেমন বর্ণকে বোঝায়, তেমনি আবার স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন বা যুক্ত ব্যঞ্জনকেও বোঝাতে পারে। 'অ, আ, ক্, খ্' প্রভৃতি বর্ণকে আমরা অক্ষর বলি, আবার 'ক, খ, ক্র, ক্ষ' প্রভৃতিকেও অক্ষর বলি। সংস্কৃত ছন্দেও অক্ষর বলতে এর এই ব্যাপক অর্থই ব্যবহৃত হ'তো। ইংরেজি শিক্ষার ফলে ইংরেজি ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বে এই দু'জাতীয় অক্ষরের জন্য দুধরনের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়। একক বর্ণ বোঝাতে letter এবং যুক্ত বর্ণ বোঝাতে syllable শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আমাদের আধুনিক ছন্দ-চিন্তা এবং ভাষাবিজ্ঞান চর্চা বহুল পরিমাণে ইংরেজি দ্বারা প্রভাবিত বলেই ইংরেজির মতই ভারতীয় ভাষাগুলিতেও আমরা letter এবং syllable-এর প্রতিশব্দের প্রয়োজন অনুভব করি। এইজন্য ছান্দসিক এবং ভাষাবিজ্ঞানীদের অনেকেই letter-এর প্রতিশব্দরূপে 'বর্ণ' এবং syllable-এর প্রতিশব্দ-রূপে 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। —'রবীন্দ্র' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই—'র্+অ+ব্+ঈ+ন্+দ্+র+অ'—মোট আটটি বর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় বিশ্লেষণ করলে অক্ষর পাই তিনটি 'র-বী-ন্দ্র'। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার

বিশ্লেষণে এখানে syllable-ও তিনটি, কিন্তু, অক্ষরের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই—'র. বীন্. দ্র'—এই তিনটি syllable। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় syllable-কে যদি 'অক্ষর' বলি, তা হ'লে 'রবীন্দ্র' শব্দের বিশ্লেষণে কোন্ তিনটিকে অক্ষর বল্‌ব—'র. বী. ন্দ্র' অথবা 'র. বীন্. দ্র'? ভারতীয় চিন্তাধারা এবং বাংলা লিপিপদ্ধতির দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য মেনে নিয়ে আমরা 'র. বী. ন্দ্র' - এই তিনটি অক্ষরকে বর্জন করতে পারিনে। তবে 'র. বীন্. দ্র' —এই বিশ্লেষণকে কী নামে অভিহিত করবো?

প্রবীণ ছান্দসিক আচার্য প্রবোধ সেন এই দ্বিধা কাটিয়ে উঠে syllable-এর জন্য একটি নোতুন পরিভাষা গ্রহণ করেছেন—তিনি syllable-কে বলছেন 'দল'। 'অক্ষর' শব্দ দ্বারা যে syllable-এর ভাব বোঝানো যায় না, তা সুদীর্ঘকাল পূর্বেই রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করে 'ধ্বন্যাঘাত' নামে একটি শব্দকে syllable-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করেছিলেন। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-ও syllable-এর উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে 'শব্দ-পাপড়ি' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। আচার্য সুকুমার সেন 'অক্ষর' শব্দের সংজ্ঞার্থ দিয়েছেন—"কোন পদ উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয় অর্থাৎ উচ্চারণ প্রবাহ যেন একটু একটু শ্লথ হয়। এক ছেদ হইতে অ. ছেদ পর্যন্ত উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই অক্ষর (syllable)। শুধু স্বরধ্বনি, অর্ধব. ধ্বনি, অগ্রে অথবা পশ্চাৎ অথবা অগ্র পশ্চাৎ ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরধ্বনি, কিংবা অগ্রে ব্যঞ্জনের স্বরধ্বনি (অথবা অর্ধ-ব্যঞ্জন-ধ্বনি) লইয়া অক্ষর।" এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভারতীয়কে এবং পাশ্চাত্ত্য মতের সমন্বয় ঘটেছে,—অর্থাৎ 'অক্ষর' বল্‌তে তিনি ভারতীয় মতেও বী. ন্দ্র' এবং পাশ্চাত্ত্য মতে 'র. বীন্. দ্র'—অক্ষর এবং syllable দুটোকেই বুঝিয়েছেন কিন্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—এ দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা মৌলিক পা.র রয়েছে। ভারতীয় মতে অক্ষর (প্রায়) সর্বদাই স্বরান্ত, পক্ষান্তরে syllable স্বরা এবং ব্যঞ্জনান্ত দু'ধরনেরই হয়ে থাকে। কাজেই, আধুনিক ছন্দ বিশ্লেষণে syllab! এর স্থান এত গুরুত্বপূর্ণ, যে-কোন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ দ্বারা এটা বোঝানো সঙ্গত নয় অতএব, প্রবোধ চন্দ্র সেন-প্রবর্তিত 'দল' শব্দটিকেই আমরা syllable-এর প্রতিশব্দ রূপে অগ্রাধিকার দান করবো, যদিও অপরাপর ছান্দসিকদের দ্বারা ব্যবহৃত 'অক্ষর'-কেও আমরা ত্যাগ করবো না।

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চার্য ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে বলা হয় 'অক্ষর' বা 'দল' (syllable)।

আমরা জানি, স্বরবর্ণের সহায়তা ছাড়া কোন ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হ'তে পারে না। কাজেই বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উচ্চারিত হয়, তাতে একটি স্বরধ্বনি অবশ্যই থাকবে। অতএব প্রতিটি দলে একটি স্বরধ্বনির অবস্থান আবশ্যিক। অবশ্য শুধু একটিমাত্র স্বরধ্বনিতেও একটি দল হতে পারে। আবার একটি দলে একটি স্বরধ্বনি এবং একটি বা একাধিক ব্যঞ্জন ধ্বনিও থাকতে পারে। স্বরধ্বনিটি দলের আদিতে বা মধ্যে এবং ব্যঞ্জনটি শেষে অথবা ব্যঞ্জনটি বা ব্যঞ্জনগুলি প্রথমে এবং শেষে

স্বরধ্বনি—মোটামুটি দলের গঠন এরূপ হয়ে থাকে। এই গঠন পার্থক্যের উপর নির্ভর ক'রে দলের দুরকম শ্রেণীবিভাগ কল্পনা করা হয়—(১) মুক্তদল ও (২) রুদ্ধদল।

যে দলে একটিমাত্র স্বরধ্বনি থাকে অথবা যে দলটি হয় স্বরান্ত অর্থাৎ যার শেষ ধ্বনি হয় স্বরধ্বনি তাকে বলা হয় "মুক্তদল"। যেমন—'মহতী' শব্দটি বিশ্লেষণে দেখি—ম্+অ+হ্. অ+ত্. ঈ—তিনটি দলেই শেষে আছে স্বরধ্বনি অতএব এর তিনটি দলই—ম. হ. তী' মুক্তদল।

যে দলের আদিতে বা মধ্যে স্বরধ্বনি থাকে এবং দলটি হয় ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ যার শেষে থাকে ব্যঞ্জনধ্বনি, তাকে বলা হয় 'রুদ্ধদল'। যেমন—'রবীন্দ্র' শব্দের বিশ্লেষণে পাই—র্. অ+ব্. ঈ. ন্+দ্. র্. অ, অর্থাৎ এখানে 'র' এবং 'দ্র'-এর শেষে আছে স্বরধ্বনি, অতএব মুক্তদল, আর 'বীন্'-এর শেষে আছে ব্যঞ্জন, অতএব এটি রুদ্ধদল।

বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে মুক্তদল, রুদ্ধদল ব্যাপারটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তাই ব্যাপারটি স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। একটি শব্দকে যখন বিভিন্ন দলে ভাগ করতে হয়, তখন নীচের নিয়মটি মেনে চলতে হবে। শব্দের মধ্যে কোথাও হসন্তবর্ণ অথবা যুক্তব্যঞ্জন থাকলে ঐ হসন্তবর্ণ ও যুক্তব্যঞ্জনের প্রথম ব্যঞ্জনটি পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে। যেমন—ছন্দ=ছন্ দ, চর্চা=চর্+চা, শাস্ত্র=শাস্. ত্র, ভাস্কর=ভাস্. কর্, পাণ্ডিত্য=পান্. ডিৎ. ত।—এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম ব্যঞ্জনটি সর্বদাই পূর্ববর্তী স্বরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, ফলে ঐ দলগুলির শেষে থাকছে ব্যঞ্জনধ্বনি, অতএব এগুলি রুদ্ধদল রূপে গণ্য হবে। এ থেকে একটা সহজ নিয়ম বের ক'রে নেওয়া যায়—হসন্ত বর্ণ এবং যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটি সর্বদাই রুদ্ধদল রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার। ছন্দের ব্যাপারটা প্রধানতঃ কানে শোনার, তাই বানান যেমনই থাক্ না কেন, এর উচ্চারণটাই শুধু গ্রহণযোগ্য। যেমন, বাংলায় বহু শব্দের শেষে হসন্তচিহ্ন দেওয়া না হ'লেও উচ্চারণে হসন্ত আসে—আকাশ্, বাতাস্, জল্, ফল্রূপে। অতএব এটিই গ্রহণযোগ্য। নিম্নে কতকগুলি দল বিশ্লেষণ করে দেখানো হল। দলের চিহ্ন—মুক্তদল '◡', রুদ্ধদল '—'.

'দুর্. দান্. ত পান্. ডিৎ. ত পুর্. ণ দুস্.সাদ্.ধ সিদ্. ধান্. ত।'—এটিকে সঙ্কেত চিহ্নের সাহায্যে এভাবে লিখতে হয়—

— —◡ — —◡ — ◡ — — ◡ — — ◡

দু র্দা ন্ত পা ণ্ডি ত্য পূ র্ণ দুঃ সা ধ্য সি দ্ধা ন্ত।

'বা. বু য.ত ব.লে পা.রি.ষদ্ দ.লে ব.লে তার শ.ত. গুণ।'—এটি হবে—

◡ ◡ ◡ ◡◡ ◡◡◡ — ◡◡ ◡ ◡ — ◡◡ —

বা বু য ত ব লে পা রি ষদ্ দ লে ব লে তার শ ত গুণ।

নীচে একটি কবিতার বিভিন্ন দল চিহ্নিত ক'রে দেখানো হ'লো।

'হো থা য় কি আ ছে আ লয় তো মা র,

উ র্মি মু খ র সা গ রে র পা র

মে ঘ চু ম্বি ত অ স্ত গি রি র চ র ণ ত লে?

তু মি হা সো শু ধু মু খ পা নে চে য়ে ক থা না ব লে।'

সব সময় খেয়াল রাখ্‌তে হ'বে—যুক্তব্যঞ্জনে রুদ্ধদল চিহ্ন দেবে না, তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিতে রুদ্ধদল চিহ্ন পড়বে। হসন্ত ধ্বনিতে (যা উচ্চারণে শোনা যায়) কোন চিহ্নই দেবে না, তার পূর্ববর্তী অক্ষরে অবশ্যই রুদ্ধদল চিহ্ন পড়্‌বে। যেমন—

স্ত্রী = স্. ত্. র্. ঈ—এটি স্বরান্ত, অতএব মুক্তদল; ইস্ত্রি = ইস্. ত্রি = ই স্ত্রি, 'স্ত্রি' মুক্তদল, পূর্বেরটি অর্থাৎ ই. রুদ্ধদল হ'লো।

সংস্কৃতে দু'টি যৌগিক স্বরধ্বনি আছে এবং তাদের জন্য দু'টি অক্ষর রয়েছে—'ঐ' এবং 'ঔ'। **দু'টি কিংবা ততোধিক স্বরধ্বনি যদি একটি মাত্র প্রচেষ্টায় উচ্চারিত হয় তবে তাকে বলে 'যৌগিক স্বর'**।—বাংলায় যৌগিক স্বরের সংখ্যা পঁচিশেরও অধিক, কিন্তু তাদের জন্য পৃথক অক্ষরের ব্যবস্থা না থাকায় প্রচলিত দুটি বা ততোধিক অক্ষরের সাহায্যে লিখে দেখানো হয়। যথা—'আই (নিমাই), আও (খাও), ইউ (মিউ), উই (রুই), এই (নেই), এও (নেও) প্রভৃতি। চোখের দেখায় এ সমস্ত ক্ষেত্র দুটি অক্ষর, অতএব দুটি দল বলে মনে হ'লেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলি 'ঐ' এবং 'ঔ'র মতোই যৌগিক স্বর বলে ছন্দের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি দল বলেই বিবেচিত হয়। —বই, বৈ কিংবা বউ, বৌ—একই উচ্চারণ, অথচ লেখার জন্যই কি ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় না? একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, যে দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থেকে উচ্চারিত হয়, তাদের প্রথমটি পূর্ণ উচ্চারিত এবং দ্বিতীয়টি যেন অর্ধ-উচ্চারিত—বই =বই্, যাও=যাও্। অতএব যৌগিক স্বরগুলিও রুদ্ধদল, কারণ এখানে প্রথমে বা মধ্যে থাকে পূর্ণোচ্চারিত স্বর এবং শেষ স্বরটি ব্যঞ্জনের মতই অর্ধোচ্চারিত।

এই যৌগিক স্বর-বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজনীয়। কারণ দুটি স্বরধ্বনি পাশাপাশি থাকলেই যে তা যৌগিক স্বর হবে, তা নয়—কখন কখন দু'টি স্বরধ্বনি বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয়ে তাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখে,—তখন দুটি স্বরধ্বনিতে দুটি মুক্তদল হয়। যেমন—'দাও' শব্দটির উচ্চারণ কালে 'আও'-এর উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট, একই প্রচেষ্টায় গোটা শব্দটা উচ্চারিত হয় ব'লে 'আও' এখানে যৌগিক স্বর এবং 'দাও' একটি রুদ্ধদল। কিন্তু 'দিও' শব্দের উচ্চারণ কালে 'ই' এবং 'ও' বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত হওয়াতে 'দি' এবং 'ও' দুটিই মুক্তদল রূপে বিচার্য। বাংলায় কখন যে এদের উচ্চারণ সংশ্লিষ্ট এবং কখন যে বিশ্লিষ্ট হবে, তার কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

ছন্দের প্রয়োজনে এদের সুবিধে-মতো ব্যবহার করা হয়, তখন কানের বিচারে এদের মূল্য নিরূপিত হয়। যেমন—

— ◡◡ — — ◡◡ —
'দু ই জ নে জুঁ ই তু ল তে য খ ন

◡ — ◡ — ◡◡
গে লে ম ব নে র ধা রে।'

এখানে 'দুই' এবং 'জুঁই' শব্দে 'উই' সংশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত হয়, অতএব রুদ্ধদল। আবার—

◡◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡◡ ◡◡ ◡ ◡ —◡
'ম নে প ড়ে দু ই জ নে জুঁ ই তু লে বা ল্যে

◡ ◡ — ◡◡ — ◡◡ ◡ ◡ — ◡
নি রা লা য় ব ন ছা য় গেঁ থে ছি নু মা ল্যে।'

এখানে 'দুই' এবং 'জুঁই' শব্দে 'উই' বিশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়াতে 'দু' এবং 'ই' দুটি মুক্তদলরূপে বিবেচিত হচ্ছে।

বাংলা উচ্চারণ এবং লেখার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি না থাকার দরুণ অনেক সময়ই যৌগিক স্বরকে পৃথক্ পৃথক্ মৌলিকস্বর বলে ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ বিভিন্ন ক্রিয়াপদের বেলাতেই এরূপ ঘটে থাকে। যেমন, আমরা বলি—'গিএ, যাওআ, খাইআ' প্রভৃতি। এখানে 'ইএ, আওআ, আইআ' স্বরধ্বনিগুলি পাশাপাশি থাকায় এরা যে প্রয়োজন মতো সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে যৌগিকস্বরে পরিণত হ'তে পারে, তা' বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু আমরা এগুলিকে লিখে থাকি—'গিয়ে, যাওয়া, খাইয়া'—এভাবে। ফলে স্বরধ্বনির পাশাপাশি অবস্থান আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু কানে বাজে। এরূপ ক্ষেত্রে কানের বিচারই গ্রাহ্য। অতএব বানানে 'য়' যুক্ত হ'লেও এর কোন উচ্চারণ না থাকায় অধিকাংশক্ষেত্রেই যৌগিকস্বর ও রুদ্ধদল রূপেই বিবেচিত হয়—এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

মাত্রা : কাব্যে ছন্দ সৃষ্টির একটি প্রধান উপাদান ধ্বনিতরঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে যে, কাব্যপাঠকালে নিয়মিত ব্যবধানে যতি পড়লেই ঈপ্সিত ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হ'তে পারে। এখন এই 'নিয়মিত ব্যবধান' বিষয়টাই গোলমেলে। এটা বুঝবো কী ক'রে? ছন্দ ব্যাপারটা যদি চোখে দেখার ব্যাপার হ'তো, তবে স্কেলের মাপে বা অক্ষরের মাপে নিয়মিত ব্যবধানটা বোঝা যেতো। কিন্তু ছন্দ তো শুধু চোখে দেখার বস্তু নয়, এটা প্রধানতঃ কানে শোনার ব্যাপার—কাজেই মাপের জন্য অপর কোন পৃথক্ মানদণ্ডের প্রয়োজন। ভিন্ন বস্তুর পরিমাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানদণ্ডের ব্যবহার তো বাস্তব জগতেও দেখতে পাওয়া যায়। জমি-জমা কাপড়-চোপড় মাপার জন্য 'মিটার', জল-দুধ প্রভৃতি তরল পদার্থের জন্য 'লিটার' এবং চোখে দেখা যায় না এমন বস্তু বা 'সময়ের পরিমাপের জন্য ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড-এর সহায়তা নিয়ে থাকি। ধ্বনিতরঙ্গের মাপও আমরা সময়ের সাহায্যেই নির্ণয় ক'রে থাকি,—তবে এর জন্য

আমরা ঘড়ি ব্যবহার করি না, আমরা যা' ব্যবহার করি তাকে বলা হয় 'মাত্রা'। আমরা যখন কোন শব্দ ব্যবহার করি, তখন তার মধ্যে এক বা একাধিক দল থাকে। একটু সতর্ক থাকলেই বোঝা যায় যে সব দলের উচ্চারণে সময় কিন্তু এক রকম থাকে না। কোন দলের উচ্চারণকালে একটু সময় দিয়ে টেনে পড়তে হয়, কোন দলের উচ্চারণের মুহূর্তটুকু বাদে আর কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন,—'জল' শব্দটি উচ্চারণ করতে গিয়ে 'জ'-এর পর একটু সময় নিতে হয়, কিন্তু 'জলা' উচ্চারণ করতে 'জ'-এর পরই 'লা' এসে যায়, বাড়তি কোন সময়ের প্রয়োজন হয় না। এই যে সময়ের মাপ একেই বলা হয় 'মাত্রা'।

কোন ধ্বনির উচ্চারণ-কালে সময়ের পরিমাপক যে একক (Unit) ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় মাত্রা (Mora)।

সাধারণ কোন হ্রস্বস্বর বা হ্রস্বস্বরযুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারণ-কালে যে আনুমানিক সময় ব্যয়িত হয়, তাকে ধরা হয় 'এক মাত্রা'। যেখানে সময়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি, তাকে ধরা হয় 'দুই মাত্রা'। সংস্কৃতে এদের বলা হয় ক্রমে লঘু ও গুরু, মাত্রার পরিমাণ ক্রমে এক ও দুই। সংস্কৃতে মাত্রা নির্ধারণের খুব সহজ পথ রয়েছে—দীর্ঘস্বর, যৌগিক স্বর এবং হসন্ত ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বস্বর সর্বদাই 'গুরু' বিবেচিত হয় এবং তার মাত্রা দুই-এছাড়া আর সবই এক মাত্রা। শুধু চরণের শেষে হ্রস্বস্বর থাকলেও ছন্দের প্রয়োজনে তাকে দুই মাত্রা ধরা যেতে পারে।

বাংলা ছন্দে মাত্রার হিসেব করা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার এবং এইটিই ছন্দের জাতি-নির্ণয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই এ বিষয়ে একটু অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর থাকলেও বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা হয় না। বস্তুতঃ উচ্চারণের ব্যাপারে বাংলায় হ্রস্ব-দীর্ঘের মধ্যে কোনই পার্থক্য বিবেচনা করা হয় না। যেমন—'দিন' এবং 'দীন' উচ্চারণে কোন পার্থক্য নেই, কাজেই হ্রস্ব হ'লেই এক মাত্রা এবং দীর্ঘস্বরে দুই মাত্রা—এরূপ কোন নিয়ম বাংলায় চলে না। তবে বাংলায়ও অপর এক প্রকার হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ হয়েছে। যার সঙ্গে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণতঃ মুক্তদলের উচ্চারণকাল থেকে রুদ্ধদলের উচ্চারণকালে সময় একটু বেশি লাগে—সেই হিসেবে বলা যায় যে, মুক্তদলের একমাত্রা এবং রুদ্ধ-দলের দুই মাত্রা হ'লে ঝামেলা চুকে যেতো। কিন্তু তা-ও সব সময় সত্যি হয় না। রুদ্ধদল বহুক্ষেত্রেই মাত্র একমাত্রার মূল্য পেয়ে থাকে।

আসলে বাংলা কবিতা পাঠে তিনটি রীতি প্রচলিত আছে, সেই-অনুযায়ী বাংলায় তিন জাতীয় ছন্দ রয়েছে। তিন জাতীয় ছন্দে দলের উচ্চারণে কাল-ঘটিত বৈষম্য থাকায় একই শব্দ তিন জাতীয় ছন্দে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয়, এবং তদনুযায়ী দলের মাত্রা নিরূপিত হয়। নীচে তিনটি কবিতার তিনটি পংক্তি উদ্ধার করা হ'লো,—প্রত্যেকটিতে একটি শব্দ আছে 'কাল'। এর যথার্থ উচ্চারণ অনুযায়ী এর মাথায় মাত্রামূল্য দেওয়া হ'লো। এই মাত্রামূল্য ধরে পড়লেই কবিতাটির যথার্থ পাঠ সম্ভব।—

১ ১ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ ২
১. ক ত কা ল প রে | ব ল ভা র তে
১ ১ ২ ১ ১ ২ | ১ ১ ২ ১ ১ ২
দু খ সা গ র সাঁ | তা রি পা র হ বে।

২. ২ ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১   ২ ০ ১ ১ ২ ০
কা ল য দি ম রি আ মি। ভ য় কি আ মা র।

৩. ১ ০ ১ ১ ১   ১ ১ ০ ১ ১   ১ ১ ০ ১ ০ ১   ১ ১
কা ল য দি না। আ সি স্ ত বে। মা থা য় মা র বো। লা ঠি।

প্রথম কবিতাটিতে 'কাল' শব্দের মোট মাত্রাসংখ্যা তিন, দ্বিতীয় কবিতায় 'দুই' এবং তৃতীয় কবিতায় মাত্র 'এক'। কবিতা-পাঠের রীতি-অনুযায়ী একই শব্দ তিন-ভাবে উচ্চারিত হওয়ায় তার মাত্রার হেরফের ঘটে গেল। রুদ্ধদল-মুক্তদলের সাহায্যেও এই সমস্যার সমাধান ঘটানো যায় না। একমাত্র যথার্থ ভাবে পাঠ ক'রে বুঝে নিতে হবে—উচ্চারণটি বিশ্লিষ্ট হচ্ছে অথবা সংশ্লিষ্ট হচ্ছে, এর উপর নির্ভর ক'রেই এতে মাত্রা দিতে হবে। বিশ্লিষ্ট হ'লে দুই মাত্রা এবং সংশ্লিষ্ট হ'লে এক মাত্রা—এইটিই সাধারণ নিয়ম। আর একটি দৃষ্টান্ত—

১. ২ ২ ০ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ২ ০ ২ ০
দ স্তু র না র প শু। গ্রা সি য়া ছে স ব দে শ।

২. ১ ২ ০ ১ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ১ ২ ০
দ স্তু র স ভ্য তা য দি। গ্রা সে স র্ব দে শ

৩. ১ ১ ০   ১ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ০ ১ ১   ১ ১
মা নু ষ য দি লো ভা র্ত হ য়। দ স্তু র ব লি তা কে।

'দস্তুর' শব্দটি প্রথম দৃষ্টান্তে ৪ মাত্রা, দ্বিতীয়ে ৩ এবং তৃতীয়ে ২ মাত্রার মূল্য পেলো। অতএব, মাত্রা-বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

কবিতার ছন্দ-বিশ্লেষণ কালে তিন ধরনের মাত্রা দান পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

১) শব্দের মুক্তদল রুদ্ধদল নির্দেশ ক'রে যদি মাত্রা দিতে হয়, তবে—

এক মাত্রার চিহ্ন ।

দুই মাত্রার চিহ্ন ॥

॥ । । ॥   । ॥ ॥ ।   । । । । ॥   । । ।
রু:দ্র তো মা র | দা রু ণ দী প্তি | এ সে ছে দু য়া র | ভে দি য়া,
॥ । । । ।   ॥ ॥ ॥   ॥ ॥ ॥   । । ।
ব ক্ষে বে জে ছে | বি দ্যু ৎ বা ণ | স্ব প্নে র জা ল | ছে দি য়া।

(২) মুক্তদল রুদ্ধদল নির্দেশ না করলে সাধারণতঃ নিম্নোক্ত মতে মাত্রা চিহ্নিত করা হয়:—

এক মাত্রার চিহ্ন |

দুই মাত্রার চিহ্ন —

— | | — | — — | | | | | — | | |
রু দ্র তো মা র | দা রু ণ দী প্তি | এ সে ছে দু য়া র | ভে দি য়া,
— | | | | — — —   — — — | | |
ব ক্ষে বে জে ছে | বি দ্যু ৎ বা ণ | স্ব প্নে র জা ল | ছে দি য়া।

(৩) অনেকে অঙ্ক সংখ্যা দ্বারা মাত্রা চিহ্নিত করেন :—

একমাত্রা ১

দুই মাত্রা ২

২ ১ ১ ২ ১ ২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ১
রু দ্র তো মার | দা রু ণ দী প্তি | এ সে ছে দু য়া র | ভে দি য়া,

২ ১ ১ ১ ১ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ১ ১ ১
ব ক্ষে বে জে ছে | বি দ্যু ৎ বা ণ | স্ব প্নে র জা ল | ছে দি য়া।

চরণ/পদ :—সাধারণ ভাবে 'চরণ' শব্দের অর্থ 'পদ' হলেও কবিতায় বিশেষ পারিভাষিক অর্থেই 'চরণ' এবং 'পদ' শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। গদ্যে যাকে আমরা সাধারণভাবে 'বাক্য' বলি, কবিতা বা পদ্যে এটি তারি অনুরূপ। ভাবের পূর্ণতায় যেমন বাক্যের সমাপ্তি তেমনি চরণেরও সমাপ্তি। গদ্যে বাক্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে, কবিতায়ও তেমনি পূর্ণচ্ছেদ পড়ে এবং তার সঙ্গে পড়ে পূর্ণযতি। আরম্ভ থেকে পূর্ণযতি পর্যন্ত এবং পূর্ণযতির পর থেকে আবার পূর্ণযতি পর্যন্তই এক একটি চরণ। অতএব চরণের সংজ্ঞার্থরূপে বলা যায়—

আরম্ভের পর পূর্ণযতি পর্যন্ত অথবা এক পূর্ণযতির পর থেকে অপর পূর্ণযতি পর্যন্ত বিস্তৃত যে অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহ তাকেই বলা হয় 'চরণ'। যেমন—

পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছ একি | সন্ন্যাসী, |
বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে, ||
ব্যাকুলতর | বেদনা তার | বাতাসে উঠে | নিশ্বাসি, |
অশ্রু তার | আকাশে পড়ে | গড়ায়ে ||

উপরের দৃষ্টান্তটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম বাক্যটির সমাপ্তি ঘটছে দ্বিতীয় পংক্তির এবং দ্বিতীয় বাক্যটির সমাপ্তি ঘটছে চতুর্থ পংক্তির শেষে। তদনুযায়ী পূর্ণচ্ছেদ এবং পূর্ণযতি চিহ্নও ব্যবহৃত হচ্ছে। অতএব উদ্ধৃতিটিতে দুটি চরণ—একটা 'পঞ্চশরে...ছড়ায়ে' এবং অপরটি 'ব্যাকুলতর ....পড়ে গড়ায়ে।'

অনেকেই প্রতিটি পংক্তিকেই এক একটি চরণ বলে মনে করেন, কিন্তু তাঁদের এই ধারণা যে অতিশয় ভ্রান্ত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিপদী চরণ, ত্রিপদী চরণ, চতুষ্পদী চরণ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থেকেই। কবিতায় বহু চরণকেই সুবিধেমতো পংক্তি-বিন্যাসে সাজানো যায়—পংক্তিকে চরণ বললে তা সম্ভবপর হবে না। যেমন—

দুদিন পরে ভাঙলে মেলা
সকল তাতেই সমান হেলা,
ইষ্টমন্ত্র জপের মালা,
কর্ম, খেলা, কান্না, হাসি।

যে কটা দিন আছিস্ বেঁচে,
ফিঙের মতো বেড়াস্ নেচে,
বিশ্বব্যাপার এঁচে, এঁচে,
মরিস্‌নে আর শূন্যে ভাসি।

এখানে প্রথম চার পংক্তিতে একটি চরণ—এটিকে ইচ্ছে করলে দু'পংক্তিতে লেখা যায়, এমন কি জায়গায় কুলোলে এক পংক্তিতে লিখলেও দোষ হবে না। যাঁরা পংক্তিকেই চরণ বলেন, তাঁরা তখন হিসেবের গোলে পড়ে যাবেন। কখনও কখনও একটি পংক্তিতেও দু'টি চরণ থাকা সম্ভব। যেমন—

'ভজনপূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে'

এই পংক্তিতে আছে দুটি চরণ—

ভজনপূজন | সাধন আরা | ধনা।
সমস্ত থাক | পড়ে।

আচার্য প্রবোধচন্দ্র 'চরণ' শব্দটি ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে 'পঙ্‌ক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেন। কিন্তু পঙক্তি শব্দ সারি (line) অর্থে এত বেশি প্রচলিত যে পারিভাষিক অর্থে এই শব্দটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে বলে আশঙ্কা হয়।

সংস্কৃতে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'পদ' শব্দের ব্যবহার ছিল অতিশয় ব্যাপক। পদ আকারে রচিত বলেই কবিতার নাম পদ্য। অতএব কথাটা ঘুরিয়ে বলা চলে যে প্রতি কবিতাই বিভিন্ন পদে বিভক্ত। মধ্যযুগের বাংলায় এই পদের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। সমস্ত কবিতারই পরিচয় দেওয়া হতো পদ শব্দের সাহায্যে, যেমন—পয়ার (পদাকার), দ্বিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি। তখন কবিতার চরণকে বিভিন্ন পদে বিভক্ত করে ছন্দেরও নামকরণ করা হতো ঐভাবে

একপদী—

প্রভু বুদ্ধ লাগি আমি ভিক্ষা মাগি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছ জাগি।

এখানে প্রতি পংক্তিতে একটি পদ এবং একটি পদেই একটি চরণ।

দ্বিপদী—

হের দ্বিজ মনসিজ | জিনিয়া মুরতি।
পদ্ম পত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি ॥

এখানে প্রতি চরণে দু'টি পদ রয়েছে।

ত্রিপদী—

নমি তোমা নরদেব—কি গর্ব গৌরবে |
দাঁড়ায়েছো তুমি |
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি | শিরে চূর্ণ মেঘ |
পদে শষ্প ভূমি ॥

এখানে এক চরণে তিনটি পদ—দুই চরণে বিন্যস্ত।

চতুষ্পদী—

কহ ভাই কহরে, | অ্যাঁকাচোরা শহরে |
বদ্যিরা কেন কেউ | আলুভাতে খায় না ? |

এখানে দু'টি পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত একটি চরণে চারটি পদ রয়েছে।

একালের ছন্দ বিশ্লেষণে 'পদ' শব্দের ব্যবহার প্রায় বর্জিত বললেই চলে। চরণের উপাদান-রূপে এখন 'পদ'-এর পরিবর্তে 'পর্ব' ব্যবহৃত হয়। দু'য়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। একালের কোন কোন জাতীয় ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪ বা ৫-ও হতে পারে, কিন্তু সেকালের কবিতায় পদের মাত্রা সংখ্যা সাধারণত: ৮ বা ১০ হতো, অন্তত: ৬-এর কম হতো না।

আধুনিক কালের ছান্দসিকদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্রই ছন্দে পদ-এর ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তিনি সাধারণতঃ দুই পর্বকে একসঙ্গে করে পদের মর্যাদা দিয়েছেন। যেমন—

'গাঁথিছ ছন্দ | দীর্ঘ হ্রস্ব ||
মাথা ও মুণ্ড | ছাই ও ভস্ম, ||
মিলিবে কি তাহে | হস্তী-অশ্ব, ||
না মিলে শস্য | কণা।'

এখানে ৬ মাত্রার দু'টি পর্ব মিলিয়ে একটি পদের গঠন কল্পনা করা হয়েছে (পদের চিহ্ন-জোড়া দাঁড়ি)। আবার—

চারিদিকে ঘিরি || স্তরে স্তরে গিরি || মিশেছে দিগন্ত কায়।
তুষারে মণ্ডিত || শুভ্র হিমশৈল || তৃণগাছি নাহি তায়।

এখানে কিন্তু ৬ মাত্রার পদ হিসেব করা হয়েছে ফলত: পর্ব ও পদ হ য়ে গেছে। অতএব বিভ্রান্তিসূচক পদের ব্যবহার বর্জন করাই সঙ্গত।

পর্ব-পর্বাঙ্গ :—আধুনিক রীতিতে বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণে পর্বের স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কবিতার আরম্ভ থেকে মধ্যযতি পর্যন্ত অথবা মধ্যযতি থেকে অপর মধ্যযতি কিংবা পূর্ণ যতি পর্যন্ত ধ্বনি প্রবাহ অখণ্ড গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যতিবিচ্ছিন্ন এই অখণ্ড ধ্বনিপ্রবাহকেই পর্ব বলা হয়। প্রতি পর্বের সমাপ্তিতেই বাগ্‌যন্ত্র একবার বিরাম গ্রহণ করে আবার পূর্ণোদ্যমে নোতুন পর্ব শুরু করে। প্রতি পর্বের আরম্ভেই সুর একটু উচ্চগ্রামে আরম্ভ হয়ে পর্বান্তে একটু স্তিমিত হয়ে পড়ে বলেই সুরের নিয়মিত ওঠানামায় ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে থাকে। চরণ এইভাবে পর্বদ্বারা খণ্ডিত না হ'লে কবিতায় ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দ সৃষ্ট হতো না। এই কারণেই কবিতায় পর্বকে এত গুরুত্ব দান করা হয়। পর্বের সংজ্ঞার্থ রূপে বলা চলে—

কবিতার প্রারম্ভ থেকে মধ্যযতি পর্যন্ত অথবা এক যতি থেকে অপর যতি পর্যন্ত শব্দসমষ্টি বা ধ্বনিপ্রবাহকে বলা হয় 'পর্ব'—

১. নন্দপুর | চন্দ্র বিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার, ||
চলে না চল | মলয়ানিল | বহিয়া ফুল | গন্ধভার। ||

২. ভদ্র মোরা | শান্ত বড়ো | পোষমানা এ | প্রাণ·
বোতাম আঁটা | জামার নীচে | শান্তিতে শ য়ান।

৩. অনুপম | তনুশ্যাম | নীলোৎপল | আভা।
মুখরুচি | কত শুচি | ধরিয়াছে | শোভা॥

উপরের দৃষ্টান্তগুলিতে যতি-চিহ্ন দ্বারা খণ্ডিত প্রতি অংশ এক একটি পর্ব।

ছন্দ-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি কথা বার বার বলা হয়েছে যে নিয়মিত ব্যবধানে যতি পড়ে বলেই ধ্বনিতরঙ্গ বা ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার অর্থ—একটি কবিতার প্রতিটি পর্বই হবে সমান, নইলে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি হবে না। কিন্তু তিনটি কবিতা থেকে যে তিনটি পৃথক পৃথক দৃষ্টান্ত উপরে উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের প্রতিটি পর্ব আপাত-দৃষ্টিতে সমান বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সব কটা সমান নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। নিয়ম হল—

প্রতি কবিতায় প্রতিটি পূর্ণ পর্ব সমান হবে—বিশুদ্ধ ছন্দ রচনার এটি একটি প্রাথমিক শর্ত।

ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় পর্বের হেরফের হতে পারে, কিন্তু যে-কোন একটি কবিতায় পূর্ণ পর্বের সমতা আবশ্যিক। কারণ **পর্ব-সমতা বাংলা ছন্দের মূলভিত্তি।**—

শিশির বাতাস | শরতে লেগে
উদাসী মেঘে | জল ভরে আসে।

উপরের পংক্তি দুটিতে পর্বের মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৬+৫ এবং ৫+৬ হওয়াতে পর্ব-সমতা বজায় রইলো না, তাই কবিতাটিতে ছন্দ-পতন অতিশয় স্পষ্ট। এটাকে নিম্নোক্তক্রমে সাজানো যাক—

শিশির বাতাস | শরতে লেগে
জল ভরে আসে | উদাসী মেঘে।

এবার পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫, ৬+৫, পূর্ণ পর্বের সমতা বজায় রইলো, ছন্দ পতনও রোধ করা গেলো।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—পংক্তি দুটির শেষ পর্ব দুটি ৫ মাত্রার আর প্রথম দুটি ৬ মাত্রার—কাজেই পর্বসমতা কোথায়?

উত্তরে বলি—পূর্ণ পর্বেরই সমতার প্রয়োজন, অপূর্ণ বা খণ্ড পর্বে এই নিয়ম প্রযুক্ত হয় না। কবিতায় তিন ধরনের পর্ব থাকতে পারে—

অ. পূর্ণ পর্ব—আরম্ভ থেকে মধ্যযতি পর্যন্ত এবং এক মধ্যযতি থেকে অপর মধ্যযতি পর্যন্ত, ও কখন কখন মধ্য যতি থেকে পূর্ণ যতি পর্যন্তও।

আ. খণ্ড পর্ব বা অপূর্ণ পর্ব—সাধারণতঃ চরণের শেষ পর্বটি অর্থাৎ মধ্য যতি থেকে পূর্ণ যতি পর্যন্ত অনেক সময়ই অপূর্ণ থাকে। এর কারণ—একটি চরণের সমাপ্তির পর অপর একটি চরণ আরম্ভ করবার জন্য বাগ্‌যন্ত্রের প্রস্তুতির জন্য বিরতি একটু

বিলম্বিত হওয়া প্রয়োজন। প্রায় অধিকাংশ কবিতাতেই তাই চরণের শেষ পর্বটি থাকে খণ্ডপর্ব।—

১. সভাজন শোন | জামাতার গুণ |
বয়সে বাপের | বড়।—
কোন গুণ নাই | যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ | দড় |

২. স্পন্দিত | নদীজল | ঝিলিমিলি | করে,
জ্যোৎস্নায় | ঝিকিমিকি | বালুকায় | পরে।

৩. জানি আমি | করকাঘাত | গ্রীষ্ম দাহ | খর
শ্রাবণ ধারার | পীড়ন সওয়া | কঠিন বটে | বড়ো।
তবু তাহার | ক্লেশেও উদার | মুক্তি প্রিয় | -তর।

উপরের দৃষ্টান্ত তিনটি তিনজাতীয় ছন্দে রচিত হ'লেও এদের প্রত্যেকটির চরণের শেষ পর্বটি খণ্ডিত। বস্তুত অনেক সময় খণ্ড পর্ব থেকেই চরণের হদিশ পাওয়া যায়।—

নীল সিন্ধুজল | ধৌত চরণ তল |
অনিল বিকম্পিত | শ্যামল অঞ্চল |
অম্বর চুম্বিত | ভাল হিমাচল—
শুভ্র তুষার কিরী | -টিনী |

এখানে কিন্তু চারটি পংক্তি নিয়ে একটি চরণ হল। চতুর্থ পংক্তির শেষে অপূর্ণ পর্ব থেকেই কিন্তু চরণটির ধারণা পাওয়া গেল।

ই. অতিপর্ব—এক জাতীয় পর্ব আছে, যাকে বলা হয় 'অতিপর্ব' আর অতিপর্ব থাকে চরণের বা পংক্তির আদিতে।—

(আমার) সকল কাঁটা | ধন্য করে |
ফুটবে গো ফুল | ফুটবে,
(আমার) সকল ব্যথা | রঙিন্ হয়ে।
গোলাপ হয়ে | উঠবে।

দৃষ্টান্তটিতে চরণের পূর্বে বন্ধনীভুক্ত শব্দই অতিপর্ব | অর্থের প্রয়োজনেই অতিপর্বের ব্যবহার হয়, ছন্দের ব্যাপারে এটি অপ্রাসঙ্গিক। খণ্ড-পর্বকে চরণের ছন্দ-বিশ্লেষণ হিসেবে আনা হয়, নতুবা ছন্দ পতন ঘটে, কিন্তু ছন্দের গঠনে অতিপর্বের কোন ভূমিকাই নেই। খণ্ডপর্ব এবং অতিপর্বের এইটিই প্রধান পার্থক্য—

১. (বুঝি) সেদিনও সজনি | এমনি রজনী | আঁধিয়ার,

২. এমন দিন কি | হবে তারা।
(যবে) তারা তারা | তারা বলে,
তারা বেয়ে | পড়বে ধারা।

৩. (আজ) প্রথম ফুলের | পাব প্রসাদ | খানি
(তাই) ভোরে উঠে | -ছি।
(আজ) শুনতে পাবো | প্রথম আলোর | বাণী |
(তাই) বাইরে ছুটে | -ছি।

পর্ব চরণের অংশ; এক বা একাধিক শব্দের যোগে এক একটি পর্ব গঠিত হয়। প্রতি পর্বে সাধারণতঃ দু'টি বা তিনটি শব্দ থাকলেও পর্বে শব্দের সংখ্যা নিয়ে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রতি পর্বে সমান সংখ্যক শব্দ থাকবারও কোন প্রয়োজন নেই—কারণ পর্বের সমতা নির্ধারিত হয় শব্দের সংখ্যা দিয়ে নয়, মাত্রাসংখ্যা দিয়ে। তাই মাত্রাসংখ্যায় যদি সমতা থাকে তবে শব্দ-সংখ্যার হেরফেরে কিছু যায় আসে না।—

(তোমরা) দেশোদ্ধারটা | করতে চাও কি | করে মুখের | বড়াই,
(তোমরা) বাক্যবাণে | শুধু ক্ষতে | করতে চাও কি | লড়াই ?

উপরের দৃষ্টান্তটিতে অতিপর্ব এবং খণ্ড পর্ব রয়েছে প্রতি চরণেই। এদের বাদ দিয়েই প্রতি চরণে আছে তিনটি করে পূর্ণ পর্ব—যার প্রত্যেকটিতেই বিভিন্ন পর্বে একটি দুটি এবং তিনটি করে শব্দ রয়েছে। অতএব পর্বে শব্দ-সংখ্যার কোন গুরুত্ব নেই। পর্বসমতা রক্ষার মূল দায়িত্ব মাত্রার—অতএব প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা সমান হওয়া চাই।

পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা কত হবে, এ বিষয়েও সাধারণতঃ কোন নিয়ম না থাকলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিধি নিষেধ বর্তমান রয়েছে। যেমন—স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪, মাত্রাবৃত্তে ৪,৫,৬,৭ এবং কখনও কখনও ৮ পর্যন্তও হতে পারে, আর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সাধারণতঃ ৬,৮,১০ এবং কখনও কখনও ২ বা ৪-ও হতে পারে। তবে পূর্ণ পর্ব রূপে ২ মাত্রার ব্যবহার নেই; অক্ষর বৃত্ত ছন্দে চরণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্যে ২ মাত্রায় পংক্তি সাজানো হয়। নিম্নে বিভিন্ন মাত্রাসংখ্যা-যুক্ত কয়েকটি পর্বের গঠন দেখানো হলো—

চতুর্মাত্রক পর্ব :

১. | | | | | | | | ° | |
কৃ ষ্ণ ক লি | আ মি তা রে ই | ব লি
| | | | | | | | ° | •
কা লো তা রে | ব লে গাঁ য়ে র | লো ক,
| ° | | | | | | | ° | |
মে ঘ লা দি নে | দে খে ছি লে ম | মা ঠে
| | | | ° | | | | • | •
কা লো মে য়ে র | কা লো হ রি ণ | চো খ।

২. | | ‖ ° | | ‖ • | | ‖ •   ‖ |
ঠু কে তা ল | আঁ খি লা ল | কি ক রা ল | মূ র্তি,
| | ‖ • | | ‖ ° | | ‖ •   ‖ |
ম হা কা য় | হ রি প্রা য় | যে ন পা য় | স্ফূ র্তি।

| | | | | | | | | | || ০ || ০

৩. সিংহগ্রীব | বন্ধুজীব | অধরের | তুল।

| | || ০ || ০ || ০ | | | | || ০

খগরাজ | পায়লাজ | নাসিকাঅ | -তুল।

পঞ্চমাত্রিক পর্ব :

|| | | | || | | | | | | | | || |

পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছ এ কি | সন্ন্যাসী

|| ০ | | | | | | | |

বিশ্বময় | দিয়েছ তারে | ছড়ায়ে।

ষণ্মাত্রিক পর্ব :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | || ০

১. চারিদিকে ঘিরি | স্তরে স্তরে সিঁড়ি | মিশেছে দিগন্ত | কায়

| | | | | | | | | | | | | | | | | | || ০

তুষারে মণ্ডিত | শুভ্র হিমশৈল | তৃণগাছি নাহি | তায়।

|| | | | | | | | || | | | || | || | ||

২. মঞ্জু বিকচ | কুসুমপুঞ্জ | মধুপ শব্দ | গুঞ্জি গুঞ্জ,

|| | | | | || | | | | || | | | | | || |

কুঞ্জরগতি | গঞ্জিগমন | মঞ্জুল কুল | নারী।

সপ্তমাত্রিক পর্ব :

| | | | | | | | | | | | | |

ভুজনে মুখোমুখি | গভীর দুখে দুখী।

| | | | | | | | | | || ০

আকাশে জল ঝরে | অনিবার।

| | | | | | | | | | || ০

জগতে কেহ যেন | নাহি আর।

অষ্টমাত্রিক পর্ব :

| | | | || ০ | | | | | | | | | |

১. হা গো এ কাদের দেশে | বিদেশী নামিনু এসে

| | | | | | | | | | |

তাহারে শুধানু এসে | যেমনি—

| | | | | | | | | | | || ০ || ০

২. বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি | সে আমার নয়

| | | | | || ০ | | | | | | || ০

অসংখ্য বন্ধন মাঝে | মহানন্দময়

| | | | | || ০ || ০

লভিব মুক্তির স্বাদ।।

দশমাত্রিক পর্ব :

| | | | | || ০ | | | | | | | | | | | ০ || | |

আনন্দময়ীর আগমনে | আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।

ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গ-সৃষ্টির জন্য শুধু পর্বসমতা থাকলেই চলে না, তার মাত্রাবিন্যাসেও কিছু রীতি মেনে চলতে হয়। নতুবা ঈপ্সিত ধ্বনি তরঙ্গিত হয়ে ওঠে না। কেন এ রকম হয় এবং কীভাবে মাত্রা বিন্যাস ঘটাতে হয়, এ বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করা হলো।

আগেই বলা হয়েছে, প্রতি পর্বে একটি বা ততোধিক গোটা শব্দ থাকে। প্রতি শব্দের শেষে সামান্যতম বিরতির প্রয়োজন, নতুবা দুটি শব্দ এক হ'য়ে গিয়ে অর্থবিপত্তি ঘটাতে পারে। এই যে সামান্যতম বিরতি, একেই বলা হয় উপযতি বা 'লঘুযতি'। লঘুযতি দ্বারা বিভক্ত ধ্বনিগুচ্ছ অথবা এক কথায় বলতে পারি, গোটা শব্দই এক একটি পর্বাঙ্গ। পর্বাঙ্গের সংজ্ঞার্থ রূপে বলা যেতে পারে—

পর্বের অন্তর্গত লঘুযতি দ্বারা বিভাজিত ধ্বনিগুচ্ছকে 'পর্বাঙ্গ' বলা হয়।

১. তারে : তার : জানা : যায় | রূপ : যোল : আনা।

২. বাজে : পূরবীর | ছন্দে : রবির | শেষ : রাগিণীর | বীণ,

৩. বসন্ত : বায়ু | মায়া : নিশ্বাসে | বিরহ : জ্বালাবে | কিয়ে ?

ঘুমন্ত : প্রায় | আকাঙ্ক্ষা : যত | পরাণে : উঠিবে | জিয়ে ?

উপরের দৃষ্টান্তগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে পর্বাঙ্গের আকার-বিষয়ে সাধারণতঃ কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। গোটা শব্দ ধরেই এক একটি পর্বাঙ্গ কল্পনা করে তদনুযায়ী লঘুযতি চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় একটি শব্দেই একটি পর্ব রচিত হয়, সেই ক্ষেত্রে ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির অনুরোধে শব্দকে তথা পর্বকে বিচ্ছিন্ন করেই তার মধ্যে লঘুযতি চিহ্ন দিয়ে পর্বাঙ্গ দেখাতে হয়।—

'ধূর্জটির। মুখের পানে | পার্বতীর হাসি' পদটিকে 'ধূর্ : -জটির | মুখের : পানে। পার্ : -বতীর হাসি' এভাবে, অথবা

'নিরাবরণ | বক্ষে তব | নিরাভরণ | দেহে' পদটিকে 'নিরা : -বরণ | বক্ষে : তব | নিরা:-ভরণ | দেহে' এভাবে দেখাতে হয়।

পর্বের আকার যদি আরও ছোট হয়, যেমন—

'কিঞ্চিৎ | বুদ্ধিও | ঘটে যদি | থাকে,

তৈলাক্ত | মস্তকে | তেল নাহি | মাখে।' পদটিকে

'কিন : -চিৎ | বুদ্ : -ধিও | ঘটে : যদি | থাকে,

তৈ : -লাক্ত | মস্ : তকে | তেল : নাহি | মাখে।'

এভাবে ব্যবচ্ছেদ করে দেখানো যায়।

পর্বে মাত্রাসমতা একান্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু পর্বাঙ্গে মাত্রাসমতার প্রশ্ন নেই বলে এই ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বাধীনতা পাওয়া গেল। কিন্তু এই স্বাধীনতাকে কোন ক্রমেই পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। কারণ বৃহৎ পর্বে পর্বাঙ্গ সন্নিবেশে একটা নিয়ম মেনে নিতে হয়, নতুবা শ্রুতিকটুত্ব দোষ এসে যায়, এমন কি ছন্দ পতনও অসম্ভব নয় যেমন—

'নিজ : সৃষ্টি : রাখিতে | সৃজিলা : ধর্ম সেতু।

তোমারে : বিধি : করিলা | পালনের : হেতু।'

এখানে প্রথম চরণের প্রথম পর্বে ও দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বে মাত্রা একই প্রকার—৮, তবু দ্বিতীয় চরণটি পড়তে গিয়ে একটু হোঁচট্ খেতে হচ্ছে না কি? যদি পর্ব একটু বদলে দিই—

নিজ সৃষ্টি রাখিতে | সৃজিলা ধর্ম সেতু।
তোমারে : করিলা : বিধি | পালনের হেতু।'

এবার কিন্তু পর্বে স্বাচ্ছন্দ্য এসে গেলো। আবার

'হাসিবার : কাঁদিবার | অবসর : নাই : আর
দুখিনী : জনম : ভূমি | মা আমার : মা আমার।'

স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত এই চরণ দুটিকে যদি নিম্নোক্ত ক্রমে বিন্যস্ত করি—

'হাসিবার : কাঁদিবার | অবসর নাই : আর,
জনম : ভূমি : দুখিনী | মা আমার মা আমার।

তা হলে কি ধ্বনিতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে না? উপরের দুটি দৃষ্টান্তেই কিন্তু পর্বের মাত্রাসমতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তবু এমন হ'লো কেন? এর কারণ—পর্বে মাত্রাসমতা থাকলেও পর্বাঙ্গের মাত্রাবিন্যাসে ত্রুটি ঘটেছে। দুটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে—পর্বাঙ্গ যখন ৩+৩+২ মাত্রায় বিন্যস্ত হয়েছে তখন ছন্দ স্বাভাবিক, কিন্তু যখনই ৩+২+৩ মাত্রাক্রমে সজ্জিত হয়েছে তখনই গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এ থেকেই আমরা পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের নিয়মটা পাচ্ছি—

পর্বাঙ্গগুলি সমান হবে অথবা ক্রমানুসারে সজ্জিত হবে। পর্বাঙ্গের মাত্রাসংখ্যা যদি একবার বাড়ে, তবে আর কমানো যাবে না অথবা একবার যদি কমে, তবে আর বাড়ানো যাবে না। নিয়মটা সংক্ষেপে বলতে পারি—যে পর্বে তিনটি পর্বাঙ্গ থাকে তাতে মাঝের পর্বটি অপর দুটি থেকে ছোট কিংবা বড় হবে না—অন্ততঃ অপর একটির সমান হওয়া চাই, অর্থাৎ ৮ মাত্রার পর্ববিন্যাস ৩+৩+২ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অথবা ৪+৪ কিংবা ২+২+৪ বা অন্য রকমও হ'তে পারে। কিন্তু ২+৩+৩ বিন্যাস তেমন উৎকৃষ্ট হয় না। যেমন—

'আঁধার পাথার তলে | কার ঘরে বসিয়া একেলা,
মাণিক মুকুতা লয়ে | করেছিলে শৈশবের খেলা।

পদটির দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বটিকে যদি 'লয়ে মাণিক মুকুতা' করা যায়, তাহ'লে ততটা শ্রুতিমাধুর্য থাকে না। আবার 'সবে কহেন রাবণ | শোন মোর কথা'—এর চেয়ে 'রাবণ কহেন সবে' কি অনেক শ্রুতিমধুর নয়? অথচ উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু পর্বের মোট মাত্রাসংখ্যা ৮-ই রয়েছে।

বাংলা ছন্দ-বিশ্লেষণ কালে যতিচিহ্নের সাহায্যে পর্বভাগ এবং মাত্রাচিহ্ন দিতে হয়। ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টির ব্যাপারে পর্বাঙ্গের ভূমিকা অসাধারণ হ'লেও সাধারণতঃ ছন্দ বিশ্লেষণ-কালে পর্বাঙ্গ-বিভাগের লঘুযতি চিহ্ন দেখাতে হয় না। পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের ত্রুটিতে যদি ছন্দ পতন ঘটে, তবে অবশ্য তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অথবা পর্বাঙ্গ-বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ থাকলে তার উল্লেখ প্রয়োজন।

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

মাত্রাবিচার

বাংলা ছন্দ বিশ্লেষণে মাত্রার গুরুত্ব অসাধারণ। যথাযথ ভাবে মাত্রা-সহ পাঠ করতে পারলেই বাংলা কবিতায় ছন্দ বজায় থাকে এবং কবিতাটি সুখশ্রাব্য হয়। কিন্তু বিপদ হ'লো—

বাংলা শব্দের মাত্রা নিয়মিত নয় অর্থাৎ একটি শব্দই ছন্দ-ভেদে একমাত্রক, দ্বিমাত্রক বা ত্রিমাত্রক অথবা আরো অধিক মাত্রাযুক্ত হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে, কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত জানতে পারলে মাত্রাপ্রয়োগের কোন্ রীতি প্রযোজ্য, তা স্থির করে শব্দে মাত্রা দান করলে যথার্থ ছন্দ রূপটি বজায় থাকতে পারে। যেক্ষেত্রে ছন্দটি জানা নেই, সেই ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে কবিতাটি পাঠ করে কোন্ শব্দে কত মাত্রা প্রয়োগ করা হ'চ্ছে তা বুঝে নিয়ে তার মাত্রা নির্ণয় করা চলে। সংস্কৃত এবং ইংরেজি ছন্দে কিন্তু এজাতীয় কোন অসুবিধের সৃষ্টি হয় না।

সংস্কৃত ছন্দে মাত্রার সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে ; সেই নিয়মটি জানা থাকলেই আর অসুবিধের কারণ থাকেনা। সেখানে দীর্ঘস্বর এবং যৌগিক স্বর দ্বিমাত্রক, হসন্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের পূর্বস্বর দীর্ঘ—এর আর কোন ব্যতিক্রম নেই। শুধু চরণের অন্ত্য ধ্বনিটি হ্রস্ব হলেও কখনও কখনও দ্বিমাত্রক হয়ে থাকে। এ ছাড়া যাবতীয় ধ্বনিই একমাত্রক। ইংরেজি ছন্দে মাত্রার ব্যাপার নেই, সেখানে ধ্বনি প্রস্বরিত (accented) বা অস্বরিত (unaccented) হয় এবং এদের বিন্যাস-অনুযায়ীই ছন্দের বিভিন্ন রূপকল্প (Pattern) গড়ে ওঠে। অতএব শব্দের কোন্ অংশ প্রস্বরিত হয়, শুধু এটা জানা থাক্লেই ইংরেজি ছন্দের প্রায় মুস্কিল-আসান ঘটে। এখানে সুবিধে এই, ইংরেজি শব্দের কোন্ অংশ প্রস্বরিত হবে তা পূর্বাপর সুনির্দিষ্ট—অতএব সেটা জানা থাকলেই প্রধান অসুবিধা দূরীভূত হয়। কিন্তু বাংলা-উচ্চারণে এ রকম কোন সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় শুধু কবিতা-পাঠ দক্ষতা অথবা কানের উপর নির্ভর করেই মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।

বাংলায় আমরা সংস্কৃত অক্ষর তথা বর্ণমালা গ্রহণ করেছি, কিন্তু সংস্কৃত উচ্চারণ থেকে কালে কালে অনেক দূরে সরে গেছি। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয় দীর্ঘস্বর এবং যৌগিক স্বরের কথা। সংস্কৃতে এগুলি সর্বদাই গুরু বা দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রক—কিন্তু বাংলা উচ্চারণে এদের দ্বিমাত্রকতা বজায় নেই। তাই 'দিন' এবং 'দীন'—বানানে পার্থক্য থাক্লেও উচ্চারণে পার্থক্য নেই, কারণ স্বাভাবিক বাংলায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ দীর্ঘ কাল বর্জিত হয়েছে। অথচ বাংলায় যে একেবারে দীর্ঘ উচ্চারণ নেই, এমন কথাও বলা যাবে না। স্বরধ্বনির পর যখনই কোন হসন্ত ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তখনই উচ্চারণটি হয় বিশ্লিষ্ট, ফলে স্বরধ্বনির সম্প্রসারণ ঘটে এবং স্বরধ্বনির উচ্চারণ হয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এমন কি স্বরধ্বনিটি যদি হ্রস্বস্বরও হয়, তবু এর উচ্চারণ কিছুটা প্রলম্বিত হয়-ই। 'ফল' এবং 'ফলা' উচ্চারণ করলেই বোঝা যাবে

যে প্রথম ক্ষেত্রে 'ফ' একটু টেনে পড়তে হচ্ছে। কাজেই সংস্কৃতের মতো না হ'য়েও বাংলায় যে একটা নিজস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেছে, এ কথা স্বীকার ক'রে নিতে হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সমস্যার সমাধান হয় না—কারণ হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরের তথা রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে, সর্বত্র নয়। কাজেই সমস্যার জটিলতা রয়েই গেল।

রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিকতাই প্রকৃত পক্ষে বাংলাছন্দের জাতিকুল নির্ধারণ করে। রুদ্ধদল কোথায় দ্বিমাত্রিক হবে আর কোথায় হবে না, তা জানবার আগেই বাংলা ছন্দের জাতি-বিষয়ে কিছুটা প্রাথমিক জ্ঞান আবশ্যক। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে অবশ্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা ছন্দ প্রধানতঃ তিন জাতীয়—

(১) অক্ষরবৃত্ত (২) মাত্রাবৃত্ত ও (৩) শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঃ—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বে অক্ষর-সমতা থাকে এবং প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা হিসেব করা হয়। এখানে অক্ষর বিষয়ে ধারণাটা স্পষ্ট থাকা আবশ্যক। অনেক ছান্দসিকই ইংরেজি syllable-এর প্রতিশব্দ-রূপে 'অক্ষর' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে **অক্ষর বলতে সর্বদাই বাংলা লিপিপদ্ধতি-অনুযায়ী একক বা যুক্তবর্ণ এমন কি হসন্তবর্ণকেও বোঝানো হয়েছে।** syllable-এর প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে 'দল' শব্দটি। এই দু'য়ের পার্থক্য—'ছান্দসিক' শব্দে অক্ষর চারটি—'ছা. ন্দ. সি. ক.' কিন্তু দল তিনটি—'ছান্‌' দ. সিক্‌'। এ তথ্যটি মনে না রাখলে কিন্তু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'তে পারে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ঃ—মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সর্বদাই রুদ্ধদল দুইমাত্রা হয়, তার ফলে পর্বে যত অক্ষর থাকে মাত্রা হয় তার চেয়ে বেশি।

শ্বাসাঘাতবৃত্ত স্বরবৃত্ত ছন্দ ঃ—শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বের আদিতে একটি শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর (accent) অনুভূত হয়। এই ছন্দে প্রতি দলে এক মাত্রা—অতএব পর্বে অক্ষরের চেয়ে মাত্রাসংখ্যা কম থাকে।

সংক্ষেপে উপরে যে তিনজাতীয় ছন্দের পরিচয় দেওয়া হ'লো তাদের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মাত্রাদানের সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। মাত্রাদানের এই রীতি কঠোরভাবে অনুসৃত না হ'লেই ছন্দ বিশ্লেষণে বিপত্তির আশঙ্কা থেকে যাবে। নিম্নে প্রত্যেক জাতীয় ছন্দে মাত্রাদান ও মাত্রাবিচার-পদ্ধতি বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা নিবদ্ধ হ'লো।—

১। **অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ঃ**—

'অক্ষরবৃত্ত' নামটি থেকেই এ জাতীয় ছন্দে অক্ষরের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। সংস্কৃতে এ জাতীয় ছন্দে অক্ষর-ই ছিল মাত্রার একক। মধ্যযুগের বাংলায়ও প্রতি চরণের অক্ষরসমতাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য। একালেও দেখা যায়, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতি পর্বের প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা পড়ে। কিন্তু একালের ছান্দসিকগণ প্রাচীন 'অক্ষরে'র অর্থ বর্জন করে অনেকেই syllable এর প্রতিশব্দ রূপে 'অক্ষর' শব্দ গ্রহণ

ক'রে থাকেন এবং ইংরেজির অনুসরণে ছন্দ-বিশ্লেষণে syllable-কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কাজেই এই রীতিতে আমরা দলের সহায়তায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করবো।

এ জাতীয় ছন্দে পদের অন্ত্যস্থিত রুদ্ধদল শুধু দ্বিমাত্রক হ'য়ে থাকে, এ ছাড়া অপর সকল দলই একমাত্রা বিশিষ্ট।—

দো হা ই ক ল্প না তো র। ছি ন্ন ক র মা য়া ডো র।
ক বি তা য় আ র মো র। না ই কো ন দা বি,
বি র হ ব কু ল আ র। বৃ ন্দা ব ন স্তূ পা কা র।
সে ও লি চা পা ই কা র। স্ক ন্ধে তা ই ভা বি।

উপরের দৃষ্টান্তটিতে পদের অন্ত্যস্থিত রুদ্ধদলেই শুধু দুই মাত্রা পড়েছে, পদের আদিতে বা মধ্যে যে সকল রুদ্ধদল আছে, তাদের মাত্রা কিন্তু এক। আর যে সকল শব্দে একটিই দল এবং সেটি রুদ্ধ দল, তাকেও অন্ত্য রুদ্ধদলের মতো দ্বিমাত্রকরূপে গণনা করতে হয়। এ ছাড়া সব মুক্তদলই এক মাত্রা। অতএব অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দলের মাত্রা বিচার করতে গিয়ে দেখা গেলো—পদান্তস্থিত রুদ্ধদল এবং একটি দল-বিশিষ্ট শব্দের রুদ্ধদল সর্বদাই দ্বিমাত্রক, এ ছাড়া অপর সকল রুদ্ধদল এবং সমস্ত মুক্তদলই একমাত্রা বিশিষ্ট।

দে খ দ্বি জ ম ন সি জ। জি নি য়া মু র তি।
প দ্ম প ত্র যু গ্ম নে ত্র। প র শ য়ে শ্রু তি॥
অ নু প ম ত নু শ্যা ম। নী লো ৎ প ল আ ভা।
মু খ রু চি ক ত শু চি। ধ রি য়া ছে শো ভা॥

কিছু কিছু তদ্ভব, দেশি এবং বিদেশি শব্দে বর্ণবিন্যাসে কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায়। সাধারণ নিয়মে বাংলা সংযুক্ত বর্ণকে সর্বদাই একটি অক্ষরে লেখা হয়, কিন্তু পূর্বোক্ত শব্দে অনেক সময় সেগুলি ভেঙে লিখতে হয়, আবার কোন কোন যুক্ত বর্ণের জন্য কোন একক অক্ষরই নেই,—কাজেই সেগুলিকে ভেঙে লেখা ছাড়া উপায়ই নেই। এরূপ ক্ষেত্রে পদমধ্যস্থিত রুদ্ধদল প্রয়োজন মতো এক মাত্রা অথবা দুই মাত্রা হ'তে পারে।—

১. 'এ ক টি ক থা র লা গি। তি ন টি র জ নী জা গি।
এ ক টু ও না হি মি লে। সা ড়া।

স খি রা য খ ন জো টে | মু খে ত ব ব স্থা ছো টে, |
গো ল মা লে তো ল পা ড় পা ড়া।'

উপরের দৃষ্টান্তটিতে পদমধ্যস্থ যুক্ত ব্যঞ্জনকে ভেঙে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষরে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে—এখানে পদমধ্যস্থ রুদ্ধদলকেও দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। অক্ষর বৃত্তে এটি ব্যতিক্রম রূপেই গণ্য হয়ে থাকে। (অক্ষরের হিসেবে গুণলে কিন্তু গণ্ডগোল থাকে না—যত অক্ষর তত মাত্রা—ঠিক মিলে যায়)।

'টো টু কা এ ই মু ষ্টি যো গ | ল টু কা নে র ছা ল,
বি
সি টু কে মু খে খা বি, জ য় | আ টু কে যা বে কা ল'

এখানে কিন্তু যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লিখলেও পদ মধ্যস্থ রুদ্ধদলের এক মাত্রাই বিহিত হয়েছে। অতএব এ বিষয়ে কবিদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাই প্রাধান্য লাভ করে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এ জাতীয় শব্দ নিয়ে যে ঘোর বিপাকে পড়তে হয়, এ তথ্যটি রবীন্দ্রনাথ, ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই দৃষ্টান্তস্বরূপ উপরের নিদর্শন দুটি রচনা করে দেখিয়েছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন—

'পা ং লা ক রি কা টো প্রি য়ে | কা ং লা মা ছ টি য়ে।'

এখানে 'পাং' এবং 'কাং'—এ দু'টি রুদ্ধদলে একমাত্রা পড়েছে। কিন্তু 'মাছটিরে' শব্দের আদি রুদ্ধদল 'মাছ' শব্দে দু' মাত্রা। অবশ্য 'মাছ'-কে পৃথক্ একদল শব্দ ধরে নিয়ে দুই মাত্রা দিলে এটিকে আর ব্যতিক্রম হিসেবে গ্রহণ না করলেও চলে। আবার—

'পা ং লা ক রি য়া কা টো | কা ং লা মা ছে রে,
উ ৎ সু ক না ং নি যে | চা হি য়া আ ছে রে।'

উপরের দৃষ্টান্তটিতে কিন্তু পদমধ্যস্থিত রুদ্ধদলে দু'মাত্রাই দিতে হ'য়েছে, নইলে ছন্দপতন হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদমধ্যস্থ যুক্তবর্ণগুলি ভেঙে লিখলে তাদের মাত্রাদান বিষয়ে কবিরা কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন।

অতএব অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মাত্রাবিচার করতে গিয়ে সংক্ষেপে নিম্নোক্ত সূত্রগুলি উদ্ধার করা চলে :—

১. অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদান্তস্থিত রুদ্ধদলে দুই মাত্রা এবং যে শব্দে একটিমাত্র দল এবং সেটি রুদ্ধদল তাতেও দুই মাত্রা পড়বে। পদের আদি ও মধ্যস্থ রুদ্ধদলে এবং সমস্ত মুক্তদলে একমাত্রা। অক্ষরের হিসেবে বলা চলে, প্রতি অক্ষরে একমাত্রা, এমন কি পদের অন্তে যদি বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসন্তবর্ণ থাকে, তাকেও এক মাত্রা দিতে হবে।

২. অনেক তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দে পদমধ্যস্থ যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে লেখা হয়—সেখানে একটি যুক্ত ব্যঞ্জন দু'টি অক্ষরে লেখা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কবিরা অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করেন। তাঁরা প্রয়োজন মতো কোথাও একমাত্রা কোথাও দুইমাত্রার মূল্যদান করেন। ছন্দ বিশ্লেষণকালে, তাই, এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন-অনুরূপ কোথাও একমাত্রা, কোথাও দুইমাত্রা ব্যবহার করতে হয়।

২। **মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :** সাধারণভাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মাত্রা বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ। এই ছন্দে সর্বপ্রকার রুদ্ধদলই (পদের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে) দুইমাত্রা-রূপ গণ্য হ'য়ে থাকে। মুক্তদল একমাত্রা বিশিষ্ট :—

১. এ ক দা। তু মি। অ ঙ্গ ধ রি। ফি রি তে ন ব। ভু ব নে
ম রি ম রি অ। -ন ঙ্গ দে ব তা।

২ ভূ তের ম ত ন। চে হা রা যে ম ন। নি র্বো ধ অ তি। ঘো র,
যা কি ছু হা রা য়। গি ন্নি ব লে ন। কে ষ্টা বে টা ই! চো র।

৩. স্প ন্দি ত। ন দী জ ল। ঝি লি মি লি। ক রে
জ্যো ৎ স্না র। ঝি কি মি কি। বা লু কা র। চ রে।

যৌগিকস্বরও রুদ্ধদল বলেই যৌগিকস্বরেও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দুই মাত্রা ব্যবহার করতে হয় :—

১. ত নু ভ রি। যৌ ব ন। তা প সী অ। -প র্ণা

২ সু ন্দ রী। তু মি শু ক তা রা,
সু দূ র শৈ ল। শি খ রা স্তে।

দৃষ্টান্ত দুটিতে 'যৌবন' এবং 'শৈল' শব্দ দুটিতে যে যৌগিক স্বর ব্যবহৃত হয়েছে 'যৌ' এবং 'শৈ'—উভয় ক্ষেত্রেই দু'মাত্রা হ'লো।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাতে একটি মাত্র অক্ষর, একটিই দল এবং সেটি মুক্তদল। এরূপ ক্ষেত্রে, শব্দটি যদি অপর শব্দের সঙ্গে সংলগ্ন হ'য়ে উচ্চারিত না হয়, তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে অনেক সময় তাতে দু'মাত্রা পড়ে—এটা একটা বিশেষ নিয়ম।—

লু ক য়ে যা ও য়া। দি ব সে র শে ষে
চা ক র কে ব লি। যা—

‖ | | | | | | | ‖ | | |
'ধাঁ ক রে গি য়ে | নি য়ে আ য় দে খি
| | ‖ ‖ ‖
তা কে এ ক কা প | চা।

এখানে 'লু', 'যা', 'ধাঁ', 'চা' প্রত্যেকটিই একদল-বিশিষ্ট একাক্ষর শব্দ এবং প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হ'চ্ছে—পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত নয়, অতএব ছন্দের প্রয়োজনে এই মুক্তদল শব্দগুলিতেও দু'মাত্রা ক'রে দিতে হ'লো।

| | | | ‖ | | | | | | | | | | |
'হা গো এ কা দে র দে শে | বি দে শী না মি নু হে সে'

এখানে 'এ' একটি একাক্ষর একদল বিশিষ্ট শব্দ হ'লেও এটিকে পূর্ববর্তী শব্দের সংযোগে উচ্চারণ করা হয় বলে এটি দ্বিমাত্রিক হ'লো না।

(২ক) **প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দঃ**—মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটা প্রাচীনতর রূপ আছে, যা মাত্রাদান পদ্ধতিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অনুসারী—একে বলা হয় প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যাবতীয় 'নয়মই এতে প্রযুক্ত হয়,—এতে রুদ্ধদল সর্বত্রই দ্বিমাত্রিক কিন্তু মুক্তদলের ব্যাপারে এতে কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। এতে দীর্ঘস্বরও দুই মাত্রাবিশিষ্ট হয়ে থাকে, যদিও ব্যতিক্রম আছে যথেষ্ট। যৌগিক স্বর রুদ্ধদল বলে দু'মাত্রার হয়ই।—

‖ | | ‖ | | ‖ | ‖ | | |
১. তা ত ল সৈ ক ত | বা রি বি ন্দু স ম
| | | | | | | | ‖ ‖
সু ত মি ত র ম ণী স | -মা জে।

| | ‖ | | ‖ | | ‖ | | ‖
২. ক ত কা ল প রে | ব ল ভা র ত রে
| | ‖ | | ‖ | | ‖ | | ‖
দু খ সা গ র সাঁ | -তা রি পা র হ'বে।

উপরের দৃষ্টান্ত দুটিতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে দীর্ঘস্বরে ('আ'-কার, 'এ'-কার) দু'মাত্রা পড়েছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে। যেমন—প্রথম দৃষ্টান্তে 'রমণী'—শব্দে 'ণী' দীর্ঘ ঈকার যুক্ত হওয়াতেও একমাত্রা হ'লো। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে—'সাঁতারি' শব্দে আ-কারান্ত 'সাঁ' দু'মাত্রা হ'লো, কিন্তু 'তা' হলো না। অপর জাতীয় ছন্দগুলি অপেক্ষা এ জাতীয় ছন্দ ব্যতিক্রমের পরিমাণ অধিক।

একাক্ষর স্বাধীন শব্দে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যেমন কখনও কখনও দু'মাত্রা পড়ে থাকে, প্রত্ন-মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও এমন হ'তে পারে।—

| | | | ‖ | | | | | | ‖ | |
ক ত চ তু রা ন ন | ম রি ম রি যা ও ত
‖ | | | | ‖ | ‖ ‖
ন তু য়া আ দি অ ব | সা না।

এখানে 'ন' একাক্ষর মুক্তদল এবং হ্রস্বস্বরেই দুই মাত্রা দিতে হ'লো

(৩) **শ্বাসাঘাতবৃত্ত / স্বরবৃত্ত ছন্দ :**—শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের একটা প্রধান লক্ষণ এই—এর প্রতিটি পর্বে সাধারণতঃ চারিটি স্বরধ্বনি, অতএব, চারিটি দল এবং চারিটি মাত্রা থাকে। এ থেকেই সোজা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে—প্রতিদলে একমাত্রা সেই দল রুদ্ধদল হ'লেও একমাত্রা, মুক্তদল হ'লেও একমাত্রা। স্বরবৃত্ত ছন্দে দুই মাত্রার ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে।—

১. বৃ ষ্টি প ড়ে | টা পু র টু পু র | ন দে য় এ লো | বা ন,
শি ব ঠা কু রে র | বি য়ে হ লো | তি ন টি ক ন্যে | দা ন।

এখানে প্রতিটি পর্বে ৪টি ক'রে দল এবং প্রায় প্রতি পর্বেই রুদ্ধদলও রয়েছে, তৎসত্ত্বেও প্রতিদলে ১ মাত্রা অর্থাৎ প্রতি পর্বে ৪ মাত্রা হয়েছে। আবার প্রত্যেক পর্বে স্বরবর্ণও ৪টিই—এইটিই সাধারণ নিয়ম।

২. মা কেঁ দে ক য় | ম ঞ্জু লি মো র ও ই তো ক চি | মে য়ে,
ও রি স ঙ্গে | বি য়ে হ বে | ব য় সে ও র | চে য়ে
পাঁ চ গু ণে যে | ব ড়ো।

প্রথম দৃষ্টান্তটি ছিল একটি ছড়া, দ্বিতীয়টি একটি আধুনিক কবিতা, কিন্তু নিয়ম একই।

স্বরবৃত্ত ছন্দে মাঝে মাঝে কোন কোন পর্বে দলের অর্থাৎ স্বরের সংখ্যার হেরফের ঘটতে পারে। যেমন—

১. 'শিব ঠাকুরের | বিয়ে হলো | তিন ক ন্যে | দান।'

২. 'বা প ব ল লে ন | কা ন্না তো মা র | রা খো।'

বড় অক্ষরের পর্ব দুটিতে তিনটি ক'রে দল আছে। অতএব ছন্দের নিয়মে ৩ মাত্রা হয়, তাতে পর্বসমতা থাকে না। এই ক্ষেত্রে উভয় স্থলেই যে একাধিক রুদ্ধদল আছে, তাদের যে কোন একটির বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে মাত্রার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থাৎ উচ্চারণ-অনুযায়ী কোন একটি রুদ্ধদলে দুই মাত্রা দিয়ে পর্বের মোট মাত্রাসংখ্যা চারে নিয়ে আসতে হয়। এই বিশেষ নিয়মটি খেয়াল রাখবে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

যে জাতীয় ছন্দে দৃষ্টিগ্রাহ্য অক্ষর-সংখ্যার গণনা দ্বারা অথবা পদান্তস্থিত রুদ্ধদলকে দ্বিমাত্রিক এবং অপর সমস্ত রুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্তদলকে একমাত্রারূপে গণনা দ্বারা পর্বের মাত্রাসংখ্যা নির্ণীত হয় তাকে বলা হয় 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দ।—

| | | | | | | | | | | | | | |

১. শা ন্তি ন দী না ই | না ই তো র স তা। ৮+৬

| | | | | | | | | | | | | | |

কা র স নে দ্ব ন্দ্ব ক রি | চ ক্ষু কৈ লি রা তা ॥ ৮+৬

অক্ষরের হিসেবে, প্রতি অক্ষরে ১ মাত্রা ধরে বিশ্লেষণ করা হ'লো।

শা ন্তি ন ন দী না ই | না ই তো র স তা। ৮+৬

কা র স নে দ্ব ন্দ্ব ক রি | চ ক্ষু কৈ লি রা তা ॥ ৮+৬

রুদ্ধদল মুক্তদল হিসেবে এখানে মাত্রা দান করা হ'লো। কিন্তু দুই রীতিতেই মাত্রা-সংখ্যার সমতা রয়ে গেছে—সবত্রই এরূপ হয় বলে অতঃপর একটি রীতিই শুধু দেখানো হ'বে।

| | | | | | | | | | | | |

২. সু খে র লা গি য়া | এ ঘ র বাঁ ধি নু ৬+৬

| | | | | | | | |

অ ন লে পু ড়ি য়া গে ল। ৮

| | | | | | | | | | | | |

অ মি য় সা গ রে | সি না ন ক রি তে ৬+৬

| | | | | | | | |

স ক লি গ র ল ভে ল। ৮

'অক্ষরবৃত্ত ছন্দ' নামটি কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত নয়, প্রায় প্রত্যেক ছান্দসিকই এই ছন্দটির স্বীয় অভিপ্রায় মতো নামকরণ করেছেন। এর বিভিন্ন প্রকার নামকরণের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'মিশ্রবৃত্ত' এবং 'তান প্রধান'।

'অক্ষরবৃত্ত' নামটির স্রষ্টা আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন। পরে তিনি একাধিকবার এর নাম পরিবর্তন করে সর্বশেষ নাম দিয়েছেন 'মিশ্র কলাবৃত্ত' বা 'মিশ্রবৃত্ত'। তিনি বাংলা ছন্দকে 'কলামাত্রিক' এবং 'দলমাত্রিক'—এই দুই রীতিতে বিভক্ত ক'রে কলামাত্রিক বা কলাবৃত্তের দু'টি শ্রেণী দেখিয়েছেন—একটি বিশুদ্ধ কলাবৃত্ত, যাকে আমরা বলেছি 'মাত্রাবৃত্ত', অপরটি মিশ্র কলাবৃত্ত অর্থাৎ আমাদের 'অক্ষরবৃত্ত'। অক্ষর গণনা দ্বারা

মাত্রা নির্ধারণের যে রীতির কথা তিনি আগে স্বীকার করেছিলেন, বর্তমানে সেই রীতিকে অস্বীকার করেই তিনি নতুন নাম প্রস্তাব করেছেন। তবে নামটি এখনও তেমন প্রচলিত হয়নি।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর একটি প্রচলিত নাম 'তানপ্রধান ছন্দ'। এই নামটির প্রস্তাবক অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। তিনি মনে করেন যে এ জাতীয় ছন্দে এমন একটা তান আছে, যাতে অনেক পরিমাণ ধ্বনি স্থান ক'রে নিতে পারে। তিনি বলেন, "স্রোতের মধ্যে ছোট বড় উপলখণ্ড ফেলিলে যেমন সহজেই তাহারা স্থান করিয়া লইতে পারে, পয়ারের এক টানা সুরের মধ্যে তদ্রূপ মৌলিক স্বরান্ত বা যৌগিক স্বরান্ত অক্ষর প্রভৃতি সহজেই স্থান করিয়া লইতে পারে।" অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই যে সুরের টানের কথা বলেছেন, তা অনেকেই স্বীকার করেন না, কেউ কেউ মনে করেন যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেই বরং সুরের টান অধিক মাত্রায় প্রকট হয়ে থাকে। প্রবোধ সেন বলেন, "···অক্ষরবৃত্ত বা দলবৃত্তের তুলনায় মাত্রাবৃত্তেই টান বা তান থাকে অনেক বেশি। সুতরাং তানপ্রধান নামটা যদি রাখতেই হয় তবে কলাবৃত্ত বা মাত্রাবৃত্তকেই বলা উচিত তানপ্রধান।"

রামায়ণ-মহাভারত কিংবা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ কালে যে সুর ক'রে টেনে টেনে পড়া হয়, তা' কিন্তু সবই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একটা বিশেষ গুণ—এর স্থিতিস্থাপকতা। এরই জন্য এজাতীয় কবিতার প্রতি দুই মাত্রা পর পর টেনে বা থেমে গেলেও ছন্দে তেমন ত্রুটি ঘটে না। বস্তুতঃ এটা এর তানের জন্যই সম্ভবপর হয়। তাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের তান ধর্মকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

তানপ্রধান ছন্দকে এক সময় সাধারণভাবে 'পয়ার' ব'লে অভিহিত করা হ'তো এবং অনেকেই এখনো একে 'পয়ারজাতীয় ছন্দ' বলে অভিহিত ক'রে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বিশেষ গুণ তান-কে লক্ষ্য ক'রেই এটিকে **'পয়ারের শোষণ-শক্তি'** ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রতি চরণে ১৪টি অক্ষর তথা মাত্রা এবং প্রথম ৮ মাত্রার পর যতি—অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিশেষ রূপ-কল্পটির নাম 'পয়ার'। মধ্যযুগের প্রায় সমগ্র কাব্যসাহিত্য এই পয়ার-রূপকল্পে অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৮+৬ যতি বিভাগে রচিত হ'য়েছিল বলেই কালক্রমে এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দই 'পয়ার' নামে অভিহিত হ'তো। পয়ারের ৮+৬ পর্বভাগে তথা ১৪ মাত্রায় স্থিতিস্থাপকতা বা শোষণশক্তি যে কত দূর যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে তা স্পষ্টীকৃত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—পয়ারের কাঠামোতে রচিত—

'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'—

এই ১৪টি মাত্রার মধ্যে আছে ৮টি মুক্তদল ও তিনটি রুদ্ধদল এবং বর্ণ আছে (প্‌+আ+ষ্‌+আ+ণ ম্‌+ই+ল্‌+আ+য়্‌+এ য্‌+আ+য়্‌ গ্‌+আ+য়্‌+এ +র্ ব্‌+আ+ত্‌+আ+স্‌+এ) ২৫টি। আবার এই ১৪ মাত্রাতেই স্থান পেতে পারে—

'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'—

যাতে মুক্তদল ৫টি ও রুদ্ধদল ৯টি এবং বর্ণ আছে (দ্+উ+র্+দ্+আ+ন্+ত প্+আ+ণ্+ড্+ই+ত্+য্+অ প্+উ+র্+ণ্+অ দ্+উ+ঃ+স্+আ+ধ্+য্+অ স্+ই+দ্+ধ্+আ+ন্+ত্+অ) ৩৭টি। অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা ও শোষণশক্তি না থাকলে মাত্র ১৪ মাত্রার মধ্যে এতগুলি বর্ণকে ঠাসাঠাসি ক'রে ঢুকিয়ে দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হ'তো না। এই ক্ষমতা একমাত্র অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই রয়েছে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই সহনশীলতার জন্যই মধ্যযুগের বাংলায় এই ছন্দে নানাবিধ রূপকল্প গঠন করা হয়েছিল। তাদের কোন কোনটি এখনও পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একাবলী, দ্বিপদী বা পয়ার, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী।

(ক ১) **একাবলী**:—একাবলী ছাঁদে প্রতি চরণে ১১টি অক্ষর, সাধারণতঃ ৬+৫ পর্বে বিভক্ত ছিল।—

| | | | | | | | | | |
আ ছ য়ে শো য়া স | না র হে জী ব।
বিলম্ব না সহে | আমার দীব ॥
চণ্ডীদাস কয় | বিরহ বাধা।
কেবল মরমে | ঔষধ রাধা ॥

(ক ২) **দীর্ঘ একাবলী**—প্রতি চরণে ১২ অক্ষর, পর্বভাগ সাধারণতঃ ৬+৬

| | | | | | | | | | | |
প্র ভু যু দ্ধ লা গি | আ মি ভি ক্ষা মা গি
ওগো পুরবাসী কে রয়েছে জাগি।

(খ) **দ্বিপদী বা পয়ার**—প্রতি চরণে ১৪ অক্ষর, পর্বভাগ সাধারণতঃ ৮+৬, তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে।

| | | | | | | | | | | | | |
১. দ য়া ক র দ য়া ম য়ী | দা ন ব দ ল নী,
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী।

২. প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাবে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা,—'লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে।

৩. | | | | | | | | | | | | | |
ধি কৃ র হু এ ছা র | ই ন্দ্রি য় মো র স ব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব ॥

শেষ দৃষ্টান্তটির প্রথম চরণে মোট মাত্রাসংখ্যা ১৪ হ'লেও পর্বভাগ কিন্তু ৮+৬ না হয়ে ৭+৭ হয়েছে। এ বিষয়ে একটা বিশেষ বক্তব্য রয়েছে।

পদটি চণ্ডীদাস-রচিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ছন্দ-বিচারে একালের মতো পর্ব-ভাগরীতি প্রচলিত ছিল না—চরণের মোট মাত্রাসংখ্যাই ছিল গণ্য। তাই ৮+৬ ভাগের দিকে কবিরা ততটা নজর দিতেন না। এ ছাড়া সেকালের কবিতা-সম্বন্ধে আরও একটা বক্তব্য রয়েছে। সেকালে একালের মতো কবিতা আবৃত্তি করা হ'তো না, গান করা হ'তো অথবা সুর-সহযোগে পাঠ করা হ'তো। আমরা পয়ারে যখন ১৪ মাত্রা দেখি তখন আসলে উচ্চারণ করি ১৬ মাত্রা—চরণের শেষে ২ মাত্রা বিরতিতে যায়। সেকালের কবিরা সুরসংযোগে পাঠ করতেন বলে চরণের অক্ষর সংখ্যা ১৪, ১৫ বা ১৬ হ'লেও ছন্দপতন হ'তো না—কারণ সুরের টানে সবই ১৬ মাত্রায় পৌঁছুতো।

সেকালে পয়ারে অন্ত্যমিল নিয়েও নানা প্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হ'তো।—

মালঝাঁপ পয়ার :

হেন) মহাবীর মারুতির শৌর্য নিরীক্ষণে।
পাই) মহাতুষ্টি পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণে ॥
তবে) এই মতে আকাশেতে চলিলা বানর।
কিবা) প্রেমভরে চিন্তা করে রামে বীরবর ॥

(খ ২) **দীর্ঘ পয়ার :**—প্রতি চরণে ১৬ অক্ষর—পর্বভাগ ৮+৮।

সবাই টাকার বশ | টাকাতেই যত রস।
টাকা যার তার যশ | ব্যাপ্ত হয় দিক্ দশ,
ধনরূপ মদ গন্ধে, | ত্রিভুবন ভরেছে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বস্বর ক্ষমতা দেখে একালের কবিরা এর উপর আরো ভার চাপিয়ে 'মহাপয়ার' সৃষ্টি করেছেন।

(খ ৩) **মহাপয়ার :**—মহাপয়ারে চরণের মোট অক্ষর সংখ্যা ১৮, মাত্রাবিভাগ ৮+১০ অথবা ১০+৮ ও হ'তে পারে।—

অতন্দ্র চন্দ্রের দূতী | কানে কত মন্ত্র যায় বলি ;
এখনো শিরীর মন | স্বপ্নাতুর সুপ্তির আশ্লেষে।
সমুদ্র সেতারে বাজে | চন্দ্রমার সুগন্ধ পদাবলী ;
শিরীর সর্পিল বাহু | ঘোর কণ্ঠে লোটে স্বপ্নাবেশে।

একালের কবিরা অক্ষরবৃত্তের কাঁধে ক্রমশ ভার চাপিয়ে চরণে ২০। ২২। ২৪ মাত্রা পর্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এদের পৃথক্ নাম নেই—৮ বা ১০ মাত্রার পর্ব ব্যবহার করা হয়েছে।

২০ মাত্রার চরণ :—

'থাক্ থাক্ চুপ কর তোরা, | ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে ৮
আবার যদি জেগে ওঠে বাছা | কান্না দেখে কান্না পাবে যে।'

২২ মাত্রার চরণ :—

'সেতারের তার ছিঁড়ে | থেমে যাওয়া কান্তমিড় | একটি পরজ—
সেই হলো দেবযানী | হৃদয়ের দৌবারিক | দেয় তাঁকে ছাড়া
সমুদ্রতীরের দেশে | ভোর হয়ে উঠবার | মতন সহজ'

২৬ মাত্রার চরণ :—

'একা-একা পথ হেঁটে | এদের গভীর শান্তি | হৃদয়ে করেছি অনুভব
তখন অনেক রাত | তখন অনেক তারা | মনুমেণ্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে | মনে হয় কোনোদিন | এর চেয়ে সহজ সম্ভব।'

(গ ১) **লঘু ত্রিপদী :** এর পদভাগ সাধারণতঃ ৬+৬+৮

রাবণ দুরন্ত কর তার অন্ত
অনন্ত যশঃ প্রকাশ।
গীত রামায়ণ করিল রচন
ভাষা কবি কৃত্তিবাস ॥

(গ ২) **দীর্ঘ ত্রিপদী :** এর পদভাগ—৮+৮+১০

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তার গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি
ধৈর্য গেল হইল চপল ॥

(ঘ) **চৌপদী :**—পর্বের মাত্রাসংখ্যা সাধারণতঃ ৬ বা ৮ হয়ে থাকে, তদনুযায়ী চরণের মাত্রাসংখ্যা নির্ণীত হয়। এর মধ্যেও বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।—

রাধা রাধা করে মোহন মন্ত্রে
নিমন্ত্রিত শ্যাম মুরলী যন্ত্রে
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে
যাইতে হইল রহিতে নারি।
কেহ লয় পড়া পঞ্জর শুয়া
কেহ লয় পান কর্পূর গুয়া
কেহ লয় গন্ধ চন্দন চুয়া
কেহ লয় পাখা জলের ঝারি ॥

একদিকে যেমন এটিকে 'একাবলী' বলা চলে (কারণ প্রতি পদের মাত্রাসংখ্যা ৬+৫=১১), তেমনি চার পদে চরণ গঠিত ব'লে এটি চৌপদীও বটে।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষর বা মাত্রা সংস্থাপনার একটা বিশেষ রীতি আছে—এর পর্বগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘাকার এবং পর্বের মাত্রা সংখ্যা সর্বদাই যুগ্মসংখ্যক—৬, ৮, ১০, কখন কখন ৪ মাত্রাও হয়, এমন কি ২ মাত্রাতেও এর খণ্ডন চলতে পারে। এর পর্বে কখনো বিজোড় সংখ্যক মাত্রা বা অক্ষর ঠাঁই পায় না।—

৪ মাত্রার পর্ব :—

দেখ দ্বিজ | মনসিজ | জিনিয়া মু | -রতি।
পদ্মপত্র | যুগ্মনেত্র | পরশয়ে | শ্রুতি ॥
অনুপম | তনু শ্যাম | নীলোৎপল | আভা।
মুখরুচি | কত শুচি | ধরিয়াছে | শোভা ॥

৬ মাত্রার পর্ব :—

আজি শচীমাতা | কেন চমকিলে—
ঘুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়া বসিলে ?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে | নিমু নিমু বলে
দ্বার খুলি মাতা | কেন বাহিরিলে ?

৮ মাত্রার পর্ব : অধিকাংশ অক্ষরবৃত্তের পূর্ণ পর্ব ৮ মাত্রায় গঠিত হয়, অপর পর্বটি সাধারণতঃ ৬ বা ১০ হ'য়ে থাকে ; তবে কোন কোন কবিতায় ৮ মাত্রার একাধিক পর্বও দেখা যায়।—

১. সাধে কি বাঙালী মোরা | চির পরাধীন ? — ৮+৬
সাধে কি বিদেশী আসি | দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন ? | করে প্রতিদিন
অপমান শত শত | চক্ষের উপরে ?

২. নলিনী-নিশ্বাস-বাহী | সুমধুর সান্ধ্য বায়, — ৮+৮
দেখিতেছে ভালবাসা | —কে যেন মরিয়া যায়।

৩. হে আদি জননী সিন্ধু, | বসুন্ধরা সন্তান তোমার — ৮+১০
একমাত্র কন্যা কোলে তব, | তাই তন্দ্রা নাহি আর — ১০+৮
চক্ষে তব। তাই বক্ষ জুড়ি | সদা সঙ্কা সদা আশা — ১০+৮
সদা আন্দোলন। তাই উঠে | বেদমন্ত্র সম ভাষা — ১০+৮
নিরন্তর প্রশান্ত অন্তরে।

উপরের পর্বটিতে ৮ মাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ১০ মাত্রার পর্বও স্থান পেয়েছে। শুধুই ১০ মাত্রার পর্বে গঠিত চরণের সংখ্যা খুবই কম পাওয়া যায়।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দ বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই ছন্দের অসাধ্য সাধন ক্ষমতার আরও কিছু পরিচয় দান আবশ্যক। বাংলা কবিতার ভাব ছিল ছন্দের নিগড়ে আবদ্ধ। সেই ছন্দের বন্ধন থেকে ভাবকে মুক্তি দেবার প্রয়োজনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করলেন 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' বা 'প্রবহমাণ ছন্দ'। এ জাতীয় রচনায় যে শুধু অন্ত্যমিল উঠে গেল, তাই নয়—চরণের মধ্যে ছেদ ও যতির বিচ্ছেদ ঘটলো অর্থাৎ প্রয়োজনের অনুরোধে চরণের প্রায় যে কোন স্থানেই বাক্যের সমাপ্তি ঘটানো হ'লো—তা' যদি যতির বাইরেও পড়ে, তাতেও ক্ষতি নেই, বরং এতেই এর বিশিষ্টতা ফুটে ওঠে। মধুসূদন ছন্দের এই বন্ধন মুক্তির জন্য গ্রহণ ক'রেছিলেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পয়ারের কাঠামো। রবীন্দ্রনাথ আরো এক পা এগিয়ে পয়ারের কাঠামোটাও ভেঙে দিয়ে রচনা

করলেন 'বলাকার ছন্দ', বা 'মুক্তক ছন্দ'। তিনিও এজন্য অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সহায়তা গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য ভিন্ন জাতীয় ছন্দেও অমিত্রাক্ষর বা মুক্তক রচনার প্রচেষ্টা দেখা গেছে, কিন্তু মূলতঃ অক্ষরবৃত্তের সঙ্গেই এদের যোগ বলে অক্ষরবৃত্তের আলোচনায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' এবং 'মুক্তক ছন্দ' প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

অমিত্রাক্ষর ছন্দ / প্রবহমাণ ছন্দ :

মাইকেল মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ বধ' এবং 'বীরাঙ্গনা কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সাধারণ দৃষ্টিতে এ জাতীয় রচনাকে পয়ার বলেই মনে হয়,—কারণ চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রায় চরণ এবং পর্বভাগও ৮+৬ ; পয়ারে যে চরণান্তে অপর চরণের সঙ্গে অন্ত্যমিল থাকে, অমিত্রাক্ষরে সেই মিলের অভাব দেখা যায়। মধুসূদনের সমকালেও অনেকের দৃষ্টিতেই অমিত্রাক্ষরের এই বৈশিষ্ট্যটুকুই ধরা পড়েছিল এবং ফলতঃ অনেকেই এর অনুসরণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হ'য়েছিলেন।

একটু সতর্ক দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় যে, প্রবহমাণতাই এই ছন্দের প্রাণ। ভাবের অনুগামী হ'য়ে শব্দ চরণ থেকে চরণে প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে ভাবের সমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত থামছে না,—তারপর যখন ভাবের সমাপ্তি ঘটলো, তখনই ছেদ পড়লো এবং সেটা সাধারণত চরণের মাঝখানে কোন এক স্থানে—যেখানে যতি পড়ে, হয়তো সেখানেও নয়। অন্য সব কবিতায় চরণের অন্তে বা মাঝে যেখানে ছেদ পড়ে, যতিপাতও ঘটে সেখানে। অমিত্রাক্ষর ছন্দেই সর্বপ্রথম এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। তার ফলে ভাবের ঘটলো মুক্তি—কোন একটি চরণে আর সে সীমাবদ্ধ রইলো না, স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাব এগিয়ে চলে। ছেদ আর যতির বিচ্ছেদ ঘটায় অর্থাৎ ছেদ ও যতি পৃথক্ স্থানে পড়ায় ছন্দের গতি সাময়িকভাবে বিরতির পরই আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার অবকাশ পায়—এর ফলে যে ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেটা অতিরিক্ত পাওনা। বস্তুতঃ এই প্রবাহমাণতাই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য—চরণান্তিক মিলের অভাবটা একটা বাইরের লক্ষণমাত্র ; এমন কি এই মিল বজায় রেখেও প্রবহমাণ ছন্দ সৃষ্টি সম্ভবপর বলে 'অমিত্রাক্ষর' নামটি স্ববিরোধী মনে হয়। এই কারণে, এখন অনেকেই 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে'র পরিবর্তে 'প্রবহমাণ ছন্দ' নামটি ব্যবহার ক'রে থাকেন।

'…লো সহচরি | এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা | জীবলীলা স্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে | যাও দৈত্য দেশে ;
কহিও পিতার পদে | এ সব বারতা,
বাসন্তি ! মায়েরে মোর' | …'

এখানে চরণের মাঝখানে যে সমস্ত স্থানে ছেদ পড়েছে, সেখানে কিন্তু যতিপাত ঘটেনি। এই ছেদ-যতি বিচ্ছেদের ব্যাপারটি ধরতে না পেরে যারা ছেদ ও যতির সন্নিপাত ঘটিয়ে মিল বর্জন ক'রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করেছেন, তাঁরা কিন্তু প্রবহমাণ ছন্দের সেই ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন নি। যেমন—

"দেবজন্ম লাভ করি | অদৃষ্টের বশ,
তবে সে দেবত্ব কোথা | হে অমর্ত্যগণ ?

দেব অস্ত্রাঘাতে নহে | দানব বিনাশ,
সে দেব বিক্রমে তবে | কিবা ফলোদয় ?

এদিকে বড় জোর মিলহীন পয়ার বলে অভিহিত করা যায়। অথচ মধুসূদন নিজেও তাঁর সনেটে মিল বজায় রেখেও প্রবহমাণতা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'অমিত্রাক্ষর ছন্দে' কবিতা লিখলেও তাঁর বহু সমিল কবিতায় প্রবহমাণতা বজায় রেখেছেন।—

'ম্লান হ'য়ে এল কণ্ঠে মন্দারমালিকা
হে মহেন্দ্র, নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টিকা
মলিন ললাটে। পুণ্যবল হল ক্ষীণ
আজি মোর স্বর্গ হ'তে বিদায়ের দিন
হে দেব, হে দেবীগণ।'

অমিত্রাক্ষর তথা প্রবহমাণ ছন্দ প্রধানতঃ ভাবের অনুগামী বলেই এতে ছেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং ফলতঃ এর গদ্যধর্মিতাও অনেকাংশে প্রকট হ'য়ে পড়ে। এই কারণেই কবিতার যাবতীয় রীতি-নিয়ম এ জাতীয় কবিতায় প্রয়োগ করা চলে না। প্রধান ব্যতিক্রম যেটি, সেটি হ'লো—প্রবহমাণ ছন্দে পর্বসমতা সব সময় বজায় থাকেনা, তবে চরণের মোট অক্ষরসমতা বা মাত্রাসমতা কিন্তু অক্ষুণ্ণ থাকে। যতি যেমন নিয়মিত ব্যবধানের নিয়ম মেনে চলে, ছেদ তা' মেনে চলে না বলেই মাঝে মাঝে এই ব্যতিক্রম দেখা যায়—

কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে	+১০
শূন্যতল। | কোন্ অন্ধ কারা মাঝে | জর্জর বন্ধনে	৪+৮+৬
অনাথিনী মাগিছে সহায়। / স্ফীতকায় অপমান	১০+৮
অক্ষমের বক্ষ হতে / শুষি রক্ত করিতেছে পান	৮+১০
লক্ষ মুখ দিয়া, | বেদনারে | করিতেছে পরিহাস	৬+৪+৮
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। | ···	৮+

কবিতাটি মহাপয়ার অর্থাৎ ১৮ মাত্রার কাঠামোতে র'চিত। এখানে ছেদের অনুগামী হয়ে যতি পড়ায় পর্বের মাত্রাসমতা বজায় নেই। পর্বগুলির মাপ ৪, ৬, ৮, ১০— লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রতিটি পর্বই যুগ্মসংখ্যা। বস্তুতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যে কোন জোড়মাত্রার পর বিরতিতে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

বলাকার ছন্দ | মুক্তক ছন্দ :

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সর্বাধিক মুক্তি সাধিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, সর্বপ্রথম তাঁর 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়—তাই ছন্দোবন্ধে রচিত এই কবিতার রূপনির্মিতিকে সাধারণভাবে 'বলাকার ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। অবশ্য কবি স্বয়ং একে অভিহিত করেছিলেন 'বেড়াভাঙা পয়ার' বলে। এর একটা যথাযথ নামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রেই আচার্য প্রবোধকুমার সেন মন্তব্য করেন, "বলাকায় যে মুক্ত ছন্দের সন্ধান পাই তাতে কৃত্রিম বন্ধনের সম্পূর্ণ অবসান ঘটেছে। সুতরাং এ ছন্দের নাম দেওয়া যেতে পারে 'মুক্তক' ছন্দ, যে ছন্দকে আমরা verse libra বা free verse নামে জানি, তাকেই মুক্তক নামে অভিহিত করলুম।" অবশ্য অনেকেই এর

মুক্তক নামে আপত্তি না করলেও এ জাতীয় রচনাকে free verse বলে স্বীকার করেন না। কেউ কেউ আবার ছন্দটিকে 'মুক্তবন্ধ' নামে অভিহিত ক'রে থাকেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভাবকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ছন্দের বন্ধন থেকে, কিন্তু আত্মা মুক্তি পেলেও দেহের বন্ধনটা অটুট ছিল। অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দে মোটামুটি পয়ার বা মহাপয়ারের একটা কাঠামো বজায় ছিল, প্রতি চরণে ১৪ বা ১৮ অক্ষর বজায় রাখতে হ'তো। রবীন্দ্রনাথ 'বলাকায়' লিখলেন :—

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি | ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল | যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ; |
দিনের ভাটার শেষে | রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা | তারাফুল নিয়ে কালোজলে ;
অন্ধকার গিরিতট তলে।
দেওদার তরু সারে সারে ; |
মনে হল সৃষ্টি যেন | স্বপ্নে চাহে কথা কহিবারে,
বলিতে না পারি স্পষ্ট | করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ | অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।'

এতকাল কবিতায় যে চরণ-সমতা চলে আসছিল, এবার আর তা বজায় রইলো না। এখানে চরণের কোথাও ১৮, কোথাও ৮, কোথাও ১০, কোথাও ১৪—এরূপ মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মূল পর্ব যে ৮ মাত্রার তা' কিন্তু বজায় রয়েছে—কিন্তু স্তবক কোন নির্দিষ্ট রূপকল্পে বা প্যাটার্নে তৈরি হয় নি। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটিতে মিলের ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অমিল মুক্তকও রচনা করেছেন :—

'কিন্তু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।'
লোনাধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।'

মুক্তক ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই—এতে চরণগুলি অসম কিন্তু পর্বগুলি একটা মোটামুটি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন বা রূপকল্প অনুসরণ ক'রে চলে। কোন খণ্ড পর্ব যখন একটা পংক্তিতে বিন্যস্ত হয়, তখন তাকে চরণের শেষ খণ্ড পর্বের মতই মেনে নিতে হয়। চরণান্তিক মিল থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। গদ্য কবিতার সঙ্গে এর মূল পার্থক্য—গদ্য কবিতায় কোন নিয়মিত পর্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু মুক্তকে পর্ব থাকে এবং তা' কোন এক ছন্দরীতির অন্তর্ভুক্ত।

মুক্তক ছন্দ প্রধানতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হ'লেও মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দেও কিছু কিছু মুক্তকের নিদর্শন পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথই মুক্তকের আবিষ্কর্তারূপে পরিচিত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় রচনা রবীন্দ্রনাথের আগেও দেখা গেছে। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টা। গিরিশবাবু তাঁর নাটকের জন্য এক ধরনের ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন যাকে সাধারণত 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত করা হয়। এই গৈরিশ ছন্দ বস্তুতঃ মুক্তকছন্দ ছাড়া কিছু নয়।—

'শান্ত !
অশান্ত হৃদয় শান্ত কিসে করি ?
পুত্রশোকাতুরা
উন্মাদিনী করালিনী আমি !
শান্ত ! শান্ত হবে পুত্রশোকাতুরা ?
ধরা যদি পশে রসাতলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা, নিভে দিনকর,
প্রলয় আঁধারে ঘেরে যদি বিশ্ব আসি'
জ্বলে যদি ক্ষীরোদ অনলে
অষ্টবজ্র চলে, বিশ্বচূর্ণ পরমাণুরূপে,
শান্ত কভু নাহি হয় পুত্রশোকাতুরা।

গৈরিশ ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই—এটি শুধু অক্ষরবৃত্ত ছন্দেই রচিত হয়। পক্ষান্তরে মুক্তক ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তেও রচিত হয়। এ ছাড়া মুক্তক ছন্দে অনেক সময় চরণান্তিক মিল থাকতে পারে, আবার না-ও থাকতে পারে, কিন্তু গৈরিশ ছন্দে কখনো অন্ত্যমিল ব্যবহৃত হয় না। যে কোন অমিত্রাক্ষর ছন্দকেই কিন্তু ছেদ-অনুযায়ী পদে বিন্যস্ত করলে তা গৈরিশ ছন্দ বা মুক্তক ছন্দে রূপান্তরিত হ'তে পারে।—মেঘনাদবধ কাব্যের 'রুষিলা বাসব ত্রাস! গম্ভীরে যেমতি' প্রভৃতি চতুর্দশাক্ষরে বিন্যস্ত কয়েকটি পদকে নিম্নোক্তক্রমে মুক্তক ছন্দ বা গৈরিশ ছন্দে রূপায়িত করা যায়—

রুষিলা বাসবত্রাস !
গম্ভীরে যেমতি নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে
জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী,—
ধর্মপথগামী, হে রাক্ষসরাজানুজ,
বিখ্যাত জগতে তুমি ;
কোন্ ধর্মমতে,
কহ দাসে শুনি,
জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি,—
এ সকলে দিলা জলাঞ্জলি।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

দীর্ঘতর পর্বযুক্ত, প্রায় গদ্যধর্মী ছন্দ অক্ষরবৃত্ত রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এতে

বৈচিত্র্য সৃষ্টিও সম্ভবপর বলেই বাংলাসাহিত্যের দীর্ঘকাল অক্ষরবৃত্ত ছন্দের একাধিপত্য চলছে। সমগ্র মধ্যযুগ এবং একালেও যতদিন সাধুভাষার প্রবলতা ছিল, ততদিনই বাংলা কবিতার রাজ্যে অক্ষরবৃত্তছন্দ সবিক্রমে পদচারণা ক'রে গেছে। অপর দু'জাতীয় ছন্দকে রবীন্দ্রনাথই জাতে তুলেছেন। তবু অক্ষরবৃত্তের প্রাধান্য অব্যাহতই রয়ে গেছে বলা চলে।

অক্ষরবৃত্তের সহজ নিয়ম—যত অক্ষর তত মাত্রা—'অক্ষর' বলতে এখানে সংযুক্ত ও বিযুক্ত যাবতীয় অক্ষরকেই বোঝাচ্ছে। এটি বর্ণ (letter) কিংবা দল (syllable) নয়—বাংলালিপি পদ্ধতির অক্ষর। প্রকারান্তরে বলা চলে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, এছাড়া যাবতীয় দলই অর্থাৎ তাদের আদি ও মধ্যস্থিত রুদ্ধদল এবং সমস্ত মুক্তদল একমাত্রক।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর বৈশিষ্ট্য—এতে পর্বের মাত্রাসংখ্যা কখনো বিজোড় হয় না, সর্বদাই যুগ্মসংখ্যক—সাধারণতঃ ৮ এবং ১০, তবে ৬ মাত্রার এবং কখন কখন ৪ মাত্রার পর্বও দুর্লভ নয়।

বা ক্য তা র ম ন র্গ ল | ম ল্ল স জ্জা শা লী, ৮+৬

ত র্ক যু দ্ধে উ গ্র তে জ, | শে ষ যু দ্ধ গা মি। ৮+৬

এখানে প্রতি অক্ষরে ১ মাত্রা দেওয়া হলো। তাতে প্রতি চরণে ৮+৬ মাত্রা বিন্যাস পাওয়া গেল।

বা ক্য তার অ ন র্গ ল | ম ল্ল স জ্জা শা লী, ৮+৬

ত র্ক যু দ্ধে উ গ্র তে জ, | শে ষ যু দ্ধ গা মি। ৮+৬

এখানে পদান্তস্থিত রুদ্ধদলে ২ মাত্রা এবং অপর সর্বত্র একমাত্রা দেওয়া হ'লো, কিন্তু ফল হলো একই, চরণের মাত্রাবিন্যাস ৮+৬।

দীর্ঘতর পর্বে গঠিত বলেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দ অপেক্ষাকৃত ধীর লয়ে পাঠ্য। মধ্যযুগে এজাতীয় ছন্দ সুরসহযোগে পাঠ বা গান করা হ'তো—এতে একটা তান বা টান থাকায় অক্ষরের হেরফের তানে পুষিয়ে নেওয়া যায়।

স্থিতিস্থাপকতা বা শোষণশক্তি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপর এক বিশেষ গুণ—কোন নির্দিষ্ট মাত্রাসংখ্যার মধ্যে যত খুশি ধ্বনি এতে ঠেসে দেওয়া যায়—যা আর অপর ছন্দে সম্ভবপর নয়। যেমন—

'পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে' এই চরণে আছে ১৪ মাত্রা,—এই মাত্রাসংখ্যার মধ্যেই ধরানো যায় 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'-জাতীয় পদ।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এ সকল বিশিষ্টতার জন্যই এতে যত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়, তেমনটি অপর কোন ছন্দে সম্ভবপর নয়। প্রাচীন রীতির দিগক্ষরা, একাবলী, দীর্ঘ একাবলী, পয়ার, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, চৌপদী'—জাতীয় রূপকল্প এবং একালের দীর্ঘ পয়ার, মহাপয়ার, অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমাণ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ প্রভৃতি সৃষ্টিতে প্রধানত এই অক্ষরবৃত্ত ছন্দই ব্যবহৃত হচ্ছে।

চতুর্থ অধ্যায়

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ :

যে জাতীয় ছন্দের প্রতিটি রুদ্ধদলই দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ হসন্তবর্ণ ও যুক্তবর্ণের পূর্বস্বর দ্বিমাত্রিক উচ্চারিত হয়, তাকে বলা হয় 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'।

এ জাতীয় ছন্দ অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যথেষ্ট আদৃত ছিল এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যে সবই ছিল মাত্রা ছন্দ। বাংলাসাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ'ও রচিত হয়েছিল মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। পরবর্তীকালে বাংলাসাহিত্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যে বিশিষ্টতা অর্জন করে, তাতে দেশকালোচিত পরিবর্তন চিহ্ন বর্তমান। মূল মাত্রাবৃত্ত তথা মাত্রাছন্দে রুদ্ধদলের দ্বিমাত্রিকতা ছাড়াও দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিকতা বজায় ছিল—সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং চর্যাপদেও সেই রীতি অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতি-অনুযায়ী যখন দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা বর্জিত হ'লো, তখন থেকে বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও আর দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিকতা রইলো না—প্রাচীনরীতির সঙ্গে এইটিই এর মূলগত পার্থক্য :—

১. নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছ শীতল। — ৮+৬
উর্ধ্বে পাষাণতট | শ্যাম শিলাতল — ৮+৬

২. কলস্বায়ে | উর্মি টুটে — ৫+৫
রশ্মি রাশি | চূর্ণি উঠে — ৫+৫
শ্রান্ত বায়ু | প্রান্ত নীর | চুম্বি যায় | কভু। — ৫+৫+৫+২

৩. ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর,
যা কিছু হারায় | গিন্নি বলেন | কেষ্টা বেটাই | চোর।
উঠিতে বসিতে | করি বাপান্ত | শুনেও শোনে না | কানে
যত পায় বেত | না পায় বেতন | তবু না চেতন | মানে।

উপরের সব কটি দৃষ্টান্তেই দেখা যায়, প্রতিটি রুদ্ধদলই দ্বিমাত্রিক, সে রুদ্ধদল পদের অন্ত্যে যেমন, পদের আদিতে বা মধ্যেও তেমনি দ্বিমাত্রিক এবং মুক্তদল সর্বত্র একমাত্রা বিশিষ্ট। অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের প্রধান পার্থক্য এখানেই—অক্ষরবৃত্তে শুধু পদের

অন্ত্যস্থিত রুদ্ধদলই দ্বিমাত্রক হয়, অপর সকল স্থলে একমাত্রাবিশিষ্ট, পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রুদ্ধদল সর্বত্রই দ্বিমাত্রক।

বাংলা ছন্দে 'মাত্রাবৃত্ত' নামটি দিয়েছিলেন আচার্য প্রবোধ সেনই—সংস্কৃত মাত্রাছন্দের সঙ্গে এর সহজ সাদৃশ্য স্বভাবতই এই নামকরণকে যথার্থতার স্বীকৃতি দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই নামটি প্রত্যাহার ক'রে এর পরিবর্তে 'কলাবৃত্ত' নামে আখ্যায়িত করলেও অপর বহু ছান্দসিকই এটি মাত্রাবৃত্ত চালিয়ে যাচ্ছেন। অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একে 'ধ্বনিপ্রধান ছন্দ' নামে অভিহিত করে থাকেন। প্রবোধ চন্দ্র এই 'ধ্বনিপ্রধান' নামটিতে আপত্তি ক'রে বলেন, 'ছন্দমাত্রই তো ধ্বনিশিল্প, ধ্বনি নিয়েই ছন্দের কারবার'—অতএব ধ্বনিপ্রধান বলে বিশেষ জাতীয় ছন্দকে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়।

অক্ষরবৃত্ত তানপ্রধান বলেই একটু ধীরগতি বা ধীরলয়ের ছন্দ, পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত একমাত্রা আর দুইমাত্রার সহযোগে এগিয়ে চলে বলে মধ্যগতি বা মধ্যলয়ের ছন্দ। এই মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটা বিশেষ গুণ আছে, যা অপর দু'জাতীয় ছন্দে নেই, সেটা হ'লো—এতে বিজোড় মাত্রার পর্বসন্নিবেশ খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।—অক্ষরবৃত্ত ছন্দে সব পর্বই যুগ্মমাত্রক বলে রূপের দিক থেকে তাতে যথেষ্ট বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভবপর হ'লেও ধ্বনির দিক থেকে তেমন বৈচিত্র্য সৃষ্টির সুযোগ কম, পক্ষান্তরে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ধ্বনিগত বৈচিত্র্য সৃষ্টির পক্ষে সর্বাধিক উপযোগী।

চার থেকে আটমাত্রা পর্যন্ত মাত্রাবৃত্তের পর্ব-বিস্তার সম্ভবপর হ'লেও এতে চার এবং আটমাত্রার পর্ব-ব্যবহার খুবই সীমিত। নিম্নে বিভিন্ন মাত্রা-সমন্বয়ে গঠিত মাত্রাবৃত্ত-পর্বের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হ'লো :—

৪ মাত্রার পর্ব :

১. ল জ্জি এ । সি ন্ধু রে । প্র ল য়ের । নৃ ত্যে   ৪+৪+৪+৩

ও গো কার । ত রী ধায় । নি র্ভীক । চি ত্তে   ঐ

২. খুব তার । বোল চাল । সাজ ফিট্ । ফাট   ৪+৪+৪+২

তক্ রার । ঢ ঙে আর । নাই মিট্ । মাট।   ঐ

৫ মাত্রার পর্ব :

১. 'প ক্ষ শ রে । দ গ্ধ ক রে । ক রে ছো এ কি । স ন্ন্যা সী   ৫+৫+৫+৪

বি শ্ব ময় । দি য়ে ছো তা রে । ছ ড়া য়ে।   ৫+৫+৩

২. প থের শে ষে | নি বি য়া আ সে | আ লো।
গা নের বে লা | আজ ফু রা ক।
কী নি য়ে ত বে | কা টি বে ত ব | স ন্ধ্যা।
রা ত্রি ন হে ব ন্ধ্যা—

৬ মাত্রার পর্ব :

১. হো থায় কি আ ছে | আ লয় তো মার | ৬+৬
ঊ র্মি মু খর | সা গ রের পার | ৬+৬
মে ঘ চু ম্বি ত | অ স্ত গি রির | চ রণ ত লে ? ৬+৬+৫
তু মি হা সো শু ধু | মু খ পা নে চে য়ে | ক থা না ব লে ? ৬+৬+৫

২. স ত্য দু খের | আ গু নে ব ন্ধু | প রান য খন | জ লে
তো মার হা তের | সু খ দু খ দান | ফি রা য়ে দি লে ও | চ লে ?

৭ মাত্রার পর্ব :

১. গা হি ছে কা শী নাথ | ন বীন যু বা ৭+৫
ধ্ব নি তে স ভা গৃ হ | ঢা কি, ৭+২
ক ণ্ঠে খে লি তে ছে | সাত টি সুর ৭+৫
সাত টি যে ন পো ষা | পা খি। ৭+২

২. সে ক থা শু নি বে না | কে হ আর, ৭+৪
নি ভৃ ত নি র্জন | চা রি ধার। ৭+৪

দু জনে মুখো মুখি | গ ভীর দুখে দু খী ৭+৭

আ কা শে জ ল ঝ রে | অ নি বার। ৭+৪

জ গ তে কে হ যে ন | না হি আর। ৭+৪

৮ মাত্রার পর্ব :

১. শূ ন্য নদীর তী রে | র হি নু প ড়ি।

যা হা কি ছু নি য়ে গে ল | সো নার ত রী।

আগে বলা হয়েছে যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে শুধু রুদ্ধদলেই দু'মাত্রা হয়, মুক্তদল মাত্রই একমাত্রা বিশিষ্ট। সাধারণভাবে কথাটা সত্য হলেও একটা বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। পর্বের মধ্যে যদি এমন একটি শব্দ থাকে যেটি একাক্ষর একদল বিশিষ্ট ও যেটি মুক্তদল এবং এই শব্দটি আগের বা পরের শব্দের সহযোগে উচ্চারিত হয় না, তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ মুক্তদলটিও দ্বি-মাত্রক হ'তে পারে। যেমন—

'খা ক রে এক বা টি | চা নি য়ে যাস্ তো।'

আরো কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এরূপ ব্যতিক্রম দেখা যায় যেখানে মুক্তদলও দ্বিমাত্রকরূপে বিবেচিত হয়। 'গূঢ়, মূঢ়, রূঢ়' প্রভৃতি 'উ' কারের পর 'ঢ়' থাকলে রবীন্দ্রনাথ 'উ'-কারের দু'মাত্রা ব্যবহার করেছেন—

রূ ঢ় ঢী পের | আ লোক লা গি ল | ক মা সুন্দর | চ ক্ষে।

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত : মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই প্রাচীনরূপকে বলা হয় প্রত্নমাত্রাবৃত্ত। বস্তুতঃ সংস্কৃত প্রাকৃত কবিতায় যে মাত্রাছন্দ ব্যবহৃত হতো তাকেই যখন বাংলা ছন্দে ব্যবহার করা হয়, তখন তাকেই প্রত্নমাত্রাবৃত্তছন্দ বলা হয়। বাংলা ভাষায় চর্যাপদেই প্রথম প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করা হয়—

কা আ | ত রু ব র | প ঞ্চ বি | ডা ল ৪+৪+৪+৩

চ ঞ্চ ল | চী এ | প ই ঠো কা ল ঐ

এখানে রুদ্ধদলে 'পঞ্চবি', 'চঞ্চল' দু মাত্রা পড়েছে মাত্রাবৃত্তের মতই, অধিকন্তু দীর্ঘস্বরেও 'কা-আ, ড', চী-এ' প্রভৃতি ক্ষেত্রে দু'মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলা প্রত্নবৃত্ত ছন্দে দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক হলেও কখন কখন ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

চর্যাপদ ছাড়া ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণব কবিতায়ও শুধু প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দই ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে। এখানেও রুদ্ধদল মাত্রই দ্বিমাত্রিক, দীর্ঘস্বরও সাধারণতঃ দ্বিমাত্রিক হ'য়ে থাকে তবে এর ব্যতিক্রমও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

| | | | | | | | | || |
ক ম্বি ল ক ন ক | রু চি র গৌ র |
| | | | | | | | | || |
অ খি ল ভু ব ন | ম র ম চো র |
| | | || | || | || |
ক র ভ শু ণ্ড | বা হু দ ণ্ড |
|| | | | | || | |
ক ল্ম ষ তা প | না শ নি ||

এখানে সব কটি রুদ্ধদল, দীর্ঘস্বর ও যৌগিক স্বর দ্বিমাত্রিক হয়েছে, ব্যতিক্রম 'তাপ'-এর 'তা' ১ মাত্রা।

|| | | || | | | | | | | | | |
ক ণ্ট ক:গা ড়ি ক ম ল স ম প দ ত ল
|| | | || | | || |
ম ঞ্জী র চী র হি ঝাঁ পি।
|| | | || | || | | | || | |
গা গ রি বা রি ঢা রি ক রি পী ছ ল
| | | | || | | || |
চ ল ত হি অ ঙ্গু লি চা পি।

এখানেও রুদ্ধদল এবং দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক। তবে আধুনিক কবিতায় আমরা যেভাবে পর্বভাগ করি, সেভাবে পর্বভাগ করতে গেলে পর্বসমতা বজায় থাকবেনা, প্রতি চরণের মাত্রা সংখ্যা দাঁড়াবে—৭+৯+৮+৩। বস্তুত প্রথম পংক্তিতে মোট ১৬ মাত্রা ঠিকই আছে, পর্বের অসমতা সুরের টানে পূর্ণতা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ভানুসিংহ ছদ্মনামে ব্রজবুলি ভাষায় যে পদাবলী রচনা করেছেন, সেখানেও তিনি বৈষ্ণব কবিতার মতই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

| | | || | | | | || | | || |
ম র ণ রে, তু হু ম ম শ্যা ম স | মা ন। ৮+৩
|| | | | | | | | || | | || | |
মে ঘ ব র ণ তু ঝ, | মে ঘ জ টা জু ট ৮+৮
|| | | | | | | | | | | | | |
র ক্ত ক ম ল ক র | র ক্ত অ ধ র পু ট, ৮+৮
|| | | || || || | | | || | | |
তা প বি মো চন | ক রু ণ কো র ত ব ৮+৮

॥ | | | | | | | ॥ |
মৃ ত্যু অ মৃ ত ক রে | দা ন ৮+৩
| | | | ॥ | | ॥ |
তুঁহু ম ম শ্যা ম স | মা ন ৮+৩

এখানে তিনি ব্যতিক্রমহীন ভাবেই রূদ্ধদল এবং দীর্ঘস্বরে দু' মাত্রা দিয়ে গেছেন।

আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে এই সব ক্ষেত্রেই যখন এই সব কবিতা গীত হয়, তখনই সুখশ্রাব্য হয়, কিন্তু শুধু পাঠের বা আবৃত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতির বিরোধী বলেই অনেক সময় শ্রুতিকটু হয়ে দাঁড়ায়—

১. ॥ | ॥ | | | ॥ | | | | | |
নী ল সি ন্ধু জ ল | ধৌ ত চ র ণ ত ল
| | | | ॥ | | ॥ | | ॥ | |
অ নি ল বি ক ম্পি ত | শ্যা ম ল অ ঞ্চ ল

॥ | ॥ | ॥ | | | | ॥ | | | | ॥ |
২. দে শ দে শ | ন ন্দি ত ক রি | ম ন্দ্রি ত ত ব | ভে রি,
॥ | | | | ॥ | ॥ | ॥ | | | | ॥ |
আ সি ল য ত | বী র বৃ ন্দ | আ স ন ত ব | ঘে রি।

ছন্দ বজায় রেখে শুধু পাঠ করতে গেলে যে শ্রুতিকটুত্ব দোষ আসে, তা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তে প্রমাণিত :—

| | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥
ক ত কা ল প রে | ব ল ভা র ত রে
| | ॥ | | ॥ | | ॥ | | ॥
দু খ সা গ র সাঁ | তা রি পা র হ বে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে কতকগুলি সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপায়িত করেছেন। সেখানে তিনি সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম অনুসরণ করেছেন বাংলা ভাষায়, ফলে একালের পরিভাষায় এগুলিকে প্রত্নমাত্রাবৃত্ত বলে অভিহিত করলেও সংস্কৃতে এই ছন্দগুলির নিজস্ব নাম ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

নিম্নে ভারতচন্দ্র-রচিত কয়েকটি সংস্কৃত ছন্দের বাংলা নিদর্শন দেওয়া হ'লো—আধুনিক পরিভাষায় অবশ্য এদের প্রত্নমাত্রাবৃত্তই বলতে হয়,—

তূণক ছন্দ :

॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥
মৈ ল দ ক্ষ ভূ ত য ক্ষ সিং হ না দ ছা ড়ি ছে।
॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ | ॥
ভা র তে র তূ ণ কে র ছ ন্দো ব ন্ধ বা ড়ি ছে॥

ভুজঙ্গপ্রয়াত :—

। ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
অ দূ রে ম হা রু দ্র ডা কে গ ভী রে ।

। ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
অ রে রে অ বে দ ক্ষ দে বে স তী রে ॥

তোটক :—

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
গু ণ সা গ র না গ র আ গ র হে ।

। । ॥ । । ॥ । । ॥ । । ॥
ন ব না ক র না ক ব না ক র হে ॥

উপরের উদ্ধৃতিগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই রুদ্ধদল দ্বিমাত্রিক, দীর্ঘস্বরও দ্বিমাত্রিক, ক্বচিৎ ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ভারতচন্দ্রের মতই একালের অনেক কবিও বিভিন্ন সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ প্রত্নমাত্রাবৃত্তের শরণ গ্রহণ করলেও কেউ কেউ আবার বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণের অনুগামী হ'য়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সহায়তাও গ্রহণ করেছেন। —এখানে শুধু প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'লো।

মহাকবি কালিদাস যে মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'মেঘদূত' রচনা করেছিলেন, সেই মন্দাক্রান্তা ছন্দকে বাংলায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন রীতিতে রূপায়িত করেছেন।—

॥ ॥ ॥ ॥ । । । । । ॥ ॥ । ॥ ॥ । ॥ ॥
ট ঙ্কা দে বী ক র য দি কৃ পা না র হে কো ন জ্বা লা।

প্রত্নমাত্রাবৃত্তরীতিতে রচিত সংস্কৃত ছন্দগুলির পর্ব বিভাগ করা হ'লো না এই কারণে যে, সংস্কৃতে পর্ব বিভাগ রীতি প্রচলিত ছিল না। প্রতি চরণে অক্ষর সংখ্যা, মাত্রা-সংখ্যা এবং মাত্রাবিন্যাস-প্রণালীতে যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তার উপর নির্ভর করেই বিভিন্ন ছন্দের নামকরণ করা হয়েছিল। এ কালের রীতিতে যদি পর্ববিভাগ করা হয়, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো পর্বসমতা বজায় থাকতে পারে, কিন্তু থাকবেই যে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন মন্দাক্রান্তা ছন্দের মাত্রাবিন্যাস রীতি—চারটি গুরু বা দীর্ঘমাত্রা তার পর চারটি লঘু বা হ্রস্ব মাত্রা, এরপর একটি লঘু ও দুটি গুরু পর্যায় ক্রমে তিনবার, অর্থাৎ—২+২+২+২+১+১+১+১+১+২+২+১+২+২+১+২+২।

২ ২ ২ ২   ১ ১ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ২ ২ ১   ২ ২
ট ঙ্কা দে বী। ক র য দি কৃ পা। না র হে কো ন। জ্বা লা

বাংলা পর্ববিভাগ রীতিতে পর্বের মাত্রাসংখ্যা হয় ৮+৭+৮+৪, এতে পর্বসমতা বজায় থাকে না।

বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত একটি উজ্জ্বল নাম। তিনি বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ প্রকৃতি বজায় রেখে সংস্কৃত এবং বিভিন্ন বিদেশি ভাষার

ছন্দকে বাংলায় রূপায়িত করেছেন—কতক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এবং কতক স্বরবৃত্ত তথা শ্বাসাঘাত বৃত্ত ছন্দে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হ'লো।

মাত্রাবৃত্তগীতির মন্দাক্রান্তা :

— — —— | | | | | —

ভ র পু র অ শ্রু র | বে দ না ভা রা তু র

— | — — |— —

মৌ ন কোন সুর | বা জায় মন,

— — — — | | | | | —

র ক্তে র প ঙ্ক র | কাঁ পি ছে ক লে ব র |

— | — — |— —

চ ক্ষে দুঃ খে র | নী লা ঞ্জ ন,

(এখানে দীর্ঘ=—অর্থাৎ ২ মাত্রা, হ্রস্ব= | অর্থাৎ মাত্রা)

মালিনী ছন্দ :

| | | | | | — — —|— —|——

উ চ্ছে চ লে গে ছে বু ল বু ল শূ ন্য ম য় স্ব র্ণ পি ঞ্জ র,

| | | | | | — —|— — |——

ফু রা য়ে এ সে ছে দি ন, যৌ ব নে র জী র্ণ নি র্ভ র |

চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত ছন্দ :

| | | | | | — |—

গ গ নে গ গ নে | নী ল নি বি ড |

— |— — | —

ভি ড়্ মে ঘে র | ভি ড় গো ভি ড় |

পঞ্চচামর ছন্দ :

|— |— |— |—

ম হ ৎ ভ য়ে র মূ র ৎ সা গ র

|— | — |—|—

ব র ণ তো মা র ত মঃ শ্যা ম ল,

|—|— |— |—

ম হে শ্ব রে র প্র ল য় পি না ক

| — | — | — |—

শো না ও আ মা য় শো না ও কে ব ল।

গায়ত্রী ছন্দ :

— | | — | — | —

সূ র্য ম হা ন্ তা হা র অ ধি ক

— | — | — | —

মু খ্য ম হা ন্ ম হা ন্ বি বে ক

| — | — | — | —

অ াদ ম্ এ দা ম্ প্র ধা ন এ থ ক্

অনুষ্টুপ ছন্দ :

— | — — | — — |

অ ন্ধ স্বা র্থে র র থে র চ ক্রে

| | — — | — | —

উ ঠে ঘ র্ঘ র নি না দ নি দা ন,

— | | | — | — — |

যু দ্ধ দু নি য়া র চ ক্র ম যু ক্তি !

| | — — | — | —

কা টে সা ত চো র বি ধি র বি ধা ন ।

এ জাতীয় সংস্কৃত ছন্দ ছাড়াও অনেক বিদেশি ছন্দকে আত্মসাৎ করে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা মাত্রাবৃত্তে তাদের সার্থকভাবে রূপদান করেছেন। কখন কখন এ জাতীয় ছন্দের এক একটা কাব্যময় নামও দিয়েছেন।

১. ‖ | | ‖ | |

পা ন বি না | ঠোঁ ট রা ঙা ৪ + ৪

‖ | | ‖ |

চো খ কা লো | ভো ম রা ৪ + ৩

| | | | | |

রূ প শা লি | ধা ন ভা না ৪ + ৪

‖ | | ‖ |

রূ প দে খ | তো ম রা। ৪ + ৩

২. | | | | ‖ ‖

নি শা সে কি | সৌ র ভ ৪ + ৪

কালো চুলে | মেঘ সব ৪ + ৪

পশলায় | পশলায় | রূপ ধর | গো। ৪ + ৪ + ৪ + ১

৩. ‖ | | | ‖ | | |

কু গ্র হ কু | দৃ ষ্টি হা নে ৫ + ৫

দুঃখ দেহে, | দুঃখ মনে,

তাই বলে কি | হস্ত জুড়ে

বসবে গ্রহ স্বস্ত্যয়নে।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য :

সংস্কৃত মাত্রা ছন্দের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে বর্তমান আছে বলেই এই জাতীয় বাংলা ছন্দের নাম 'মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ। এই ছন্দের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—এতে রুদ্ধদল মাত্রই দ্বিমাত্রক অথবা সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে বলা চলে—

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ সংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু প দান্তস্থ বিকল্পেন চ॥

অর্থাৎ সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী, অনুস্বারযুক্ত, বিসর্গযুক্ত ও দীর্ঘস্বর ও বিকল্প পদের অন্তস্বর গুরু হয়। বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দীর্ঘস্বর ও পদের অন্তস্বর গুরু বা দ্বিমাত্রক হয় না, অপর তিন ক্ষেত্রেই দ্বিমাত্রক হ'য়ে থাকে। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিভিন্ন নামান্তর বাংলায় প্রচলিত আছে, যথা—কলাবৃত্ত ছন্দ ও ধ্বনিপ্রধান ছন্দ।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বনির্মাণে যত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায়, তেমনটি অপর কোন ছন্দে সম্ভবপর নয়। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ পর্যন্ত হ'তে পারে। বস্তুতঃ একমাত্র এ জাতীয় ছন্দেই বিজোড় মাত্রার পর্ব সৃষ্টি সম্ভবপর।

| | | | | || | | |
ক ল স ঘা য়ে | উ র্মি টু টে   ৫+৫
|| | | | || | | |
র শ্মি রা শি | চু র্ণি উ ঠে,   ৫+৫
|| | | | || | || || | || | |
শা ন্ত বা য়ু | প্রা ন্ত নী র | চু ম্বি যা য় | ক ভু।   ৫+৫+৫+২

সাধারণভাবে রুদ্ধদল ছাড়া মাত্রাবৃত্তে কখনো দু'মাত্রা হয় না, তবে একটি বিশেষ ব্যতিক্রমস্থল এই—কোন একাক্ষর শব্দ যদি মুক্তদল হয় এবং সেটি অপর শব্দের সংযোগে উচ্চারিত না হয়, তবে সেই মুক্তদল একাক্ষর শব্দটি দ্বিমাত্রক হ'তে পারে। যেমন—

|| | | || | | || || || ||
বা ক বি | বেশ তু মি | বাং লা য় | দী র্ঘে র
|| | | || | | || | | || ||
ভা' বু ঝি | বাং লা দে | ছ ন্দ পে য়ে | আ জ ফে র।

এখানে 'বা' এবং 'ভা' দ্বিমাত্রক হয়েছে।

মধ্যমাকৃতির পর্বই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের গতি মধ্যলয় এবং রুদ্ধদল সর্বত্র দ্বিমাত্রক বলে এতে অক্ষরের চেয়ে মাত্রাসংখ্যা বেশি হয়।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যদি প্রাচীন রীতি আরোপ করা হয়, তবে দীর্ঘস্বরও দ্বিমাত্রক হয় তখন এই ছন্দকে 'প্রত্নমাত্রাবৃত্ত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। চর্যাপদ এবং ব্রজবুলি ভাষার যাবতীয় বৈষ্ণবপদ এই প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এতে রুদ্ধদল, যৌগিক স্বর, দীর্ঘস্বর সবই দ্বিমাত্রক। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘস্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই বলেই সাধারণ

বাংলা কবিতা প্রত্নমাত্রাবৃত্তে রচিত হয় না। কিন্তু সঙ্গীতে যেহেতু দীর্ঘ উচ্চারণ স্বাভাবিক, সেই কারণে কিছু সঙ্গীতের নিমিত্ত রচিত কবিতায় প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে।—

। । । । । । । । । ॥ । । । । ॥
জ ন গ ণ ম ন অ ধি না য় ক জ য় হে
॥ । । ॥ । । ॥ ॥
ভা র ত ভা গ্য বি ধা তা,

॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

ঃ শ্বাসাঘাতবৃত্ত / স্বরবৃত্ত ছন্দ ঃ

যে জাতীয় ছন্দের আদিতে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় অথবা প্রতি পর্বে যতগুলি স্বরধ্বনি বা দল থাকে, ততগুলিই থাকে মাত্রা, তাকে বলা হয় 'শ্বাসাঘাত / স্বরবৃত্তছন্দ।

বৃ ষ্টি প ড়ে | টা পু র টু পু র | ন দে য় এ লো | বা ন
শি ব ঠা কু রে র | বি য়ে হ লো | তি ন টি ক ন্যে | দা ন

উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পর্বে চারটি ক'রে স্বরবর্ণ এবং স্বরবর্ণকে আশ্রয় ক'রে চারটি ক'রে দল এবং প্রতি দলে একটি ক'রে মাত্র চারটি মাত্রা আছে। অধিকন্তু প্রতি পর্বের আদিতে একটি ক'রে প্রবল শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর অনুভূত হয়। অতএব পদটি শ্বাসাঘাত-যুক্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

এই ছন্দটির নাম নিয়ে একটু বক্তব্য আছে। এ জাতীয় ছন্দকে সাধারণভাবে ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দ নামে অভিহিত করা হ'তো। প্রবোধচন্দ্র সেনই সর্বপ্রথম এর বিজ্ঞান-সম্মত নামকরণ করেন 'স্বরবৃত্ত ছন্দ'। এই জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বে দলের গুরুত্বই সর্বাধিক এবং দল-অনুযায়ী মাত্রা নির্ণীত হ'য়ে থাকে। প্রবোধবাবু তখন syllable-এর প্রতিশব্দ রূপেই 'স্বর' শব্দটি ব্যবহার করতেন, 'দল' শব্দটি তখনও পর্যন্ত ব্যবহার করেন নি। এই স্বরের গুরুত্বের জন্যই তিনি 'স্বরবৃত্ত' নামকরণ করেন। সম্প্রতি তিনি syllable শব্দটির প্রতিশব্দ রূপে 'দল' শব্দটি ব্যবহার করছেন এবং এই কারণেই স্বরবৃত্তের পরিবর্তে দলবৃত্ত শব্দ ব্যবহার করছেন। 'দলবৃত্ত' নামকরণের সার্থকতা স্বীকার ক'রেও কিন্তু ছন্দটির স্বরবৃত্ত' নামকরণ অস্বীকৃত হ'তে পারে না। কারণ এ জাতীয় ছন্দের পর্ব যেমন দল সংখ্যাদ্বারা নির্ণীত হয়, তেমনি স্বর (vowel) সংখ্যার দ্বারাও নির্ণীত হয়। কারণ স্বরকে আশ্রয় ক'রেই দল গঠিত হয়—যত স্বর, তত দল। কাজেই প্রতি পর্বে যত দল, তত স্বর, তত মাত্রা। অতএব ছন্দটির 'স্বরবৃত্ত' নামকরণও সার্থক।

অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ই সর্বপ্রথম এই ছন্দের নামকরণ করেন 'শ্বাসাঘাত-প্রধান' ছন্দ। তাঁর বক্তব্য এই যে, এ জাতীয় ছন্দের প্রতি পর্বের আদিতে একটি প্রবল শ্বাসাঘাত অনুভূত হয় বলেই একে শ্বাসাঘাত-প্রধান ছন্দ বলে অভিহিত করা প্রয়োজন। পরবর্তী কালে শ্রুতিকটুত্বহেতু তিনি 'শ্বাসাঘাত' নামটি পরিত্যাগ ক'রে 'বলবৃত্ত' নামটি গ্রহণ করেছেন। আরও কোন কোন ছান্দসিকও 'শ্বাসাঘাত' শব্দের পরিবর্তে 'বল' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ছন্দটির 'বলবৃত্ত' নাম সমর্থন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে পাঠ্য তালিকা তৈরি করেছেন, তাতে এই ছন্দটির নাম দেওয়া হ'য়েছে 'শ্বাসাঘাত বৃত্ত' ছন্দ। বলা বাহুল্য, এই নামকরণটি কোন ছান্দসিক-কর্তৃক অনুমোদিত কিংবা সমর্থিত কি না, জানা যায় নি।

প্রবোধচন্দ্র কিন্তু এ জাতীয় নামকরণের মূলেই আঘাত করেছেন। তিনি, এ জাতীয় ছন্দে প্রতি পর্বের আদিতে যে শ্বাসাঘাত পড়বেই, এ কথা মানতে রাজি নন; দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা চলে—

জা ন লা দি য়ে | মে ঘে আ কা শ | পা নে
আ ন ন্দে আ জ | ক্ষ ণে ক্ষ ণে | জে গে উ ঠ ছে | প্রা ণে,—
আ মি না রী, | আ মি ম হী | য় সী
আ মা র সু রে | সু র বেঁ ধে ছে | জ্যো ৎ স্না বী ণা য় |
নি দ্রা বি হী ন | শ শী।
আ মি ন ই লে | মি থ্যা হ ত | স ন্ধ্যা তা রা | ও ঠা,
মি থ্যা হ ত | কা ন নে ফু ল | ফো টা।

রবীন্দ্রনাথ-রচিত উপরের দৃষ্টান্তটিতে প্রতি পর্বে চারটি ক'রে স্বরধ্বনি, অতএব চারটি ক'রে বল এবং চারটি ক'রে মাত্রা আছে। শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়মানুযায়ী এখানে রুদ্ধদল-মুক্তদল-নির্বিশেষে সর্বত্র একমাত্রা, অতএব সর্ববাদিসম্মত ভাবেই এটিকে শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্তের নিদর্শন-রূপে গ্রহণ করা চলে। অথচ এর প্রতিটি পর্বের আদিতে একটি ক'রে প্রবল শ্বাসাঘাত অনুভূত হয়, এমন কথা স্বীকার করা চলে না। কাজেই শ্বাসাঘাত ই এই ছন্দের প্রাণ—এ তত্ত্ব যদি অস্বীকৃত হয়, তবে এর 'শ্বাসাঘাতবৃত্ত' নামকরণেরও সার্থকতা থাকে না। আমরা তাই এর 'স্বরবৃত্ত' নামটিকেই সর্বাধিক উপযোগী বলে মনে করি। এমন কি, 'দলবৃত্ত' নামটিও ব্যবহার করা চলতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, সাধারণ বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতি-অনুসারে বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিটি শব্দের আদিস্বর প্রস্বরিত হয়; কিন্তু যখন আমরা কথা বলি, তখন প্রতি শব্দের

আদিতে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়ে না,—বাক্যকে যে কয়টি শব্দগুচ্ছে ভাগ করা হয় সেই সমস্ত শব্দগুচ্ছের প্রত্যেকটির আদিতে পড়ে ঝোঁক বা প্রস্বর। কবিতায়ও তেমনি প্রতিটি পর্বের আদিতে ধ্বনিকে একটু উচ্চে তুলে ধরা হয়,—অর্থাৎ একটা ক্ষীণ ঝোঁক যে কোন ছন্দের প্রতি পর্বের আদিতেই অনুভব করা যায়। বিশেষত যদি পর্বের আদিতে থাকে রুদ্ধদল এবং ছন্দটি হয় মাত্রাবৃত্ত, তবে সেটি দ্বিমাত্রিক হবার দরুণ এর উপর যে গুরুত্ব আরোপিত হয়, তার ফলে এটিকে প্রস্বরিত বলেই মনে হয়। নিম্নে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি অনুরূপ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'লো।—

> ন ন্দ পু র | চ ন্দ্র বি না | বৃ ন্দা ব ন | অ ন্ধ কা র
>
> ব হে না চ ল | ম ল য়া নি ল | ব হি য়া ফু ল | গ ন্ধ ভা র

এটি পঞ্চমাত্রিক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রথম চরণে প্রতি পর্বের আদিতে আছে রুদ্ধদল, অতএব সেটি দ্বিমাত্রিক—তাই পাঠকালে এটি প্রস্বরিত হয়েছে বলেই মনে হয়। প্রথম চরণের ঝোঁকে দ্বিতীয় চরণের আদিতেও অনুরূপ ঝোঁকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শুধু মাত্রাবৃত্ত নয়, চতুর্মাত্রিক বা চতুরক্ষর পর্বযুক্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও এরূপ শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।—

> ঢুকে তাল | আঁখি লাল | কি কয়াল | মূর্তি।
>
> মহাকায় | হরিপ্রায় | যেন পায় | স্ফূর্তি।

অতএব যে শ্বাসাঘাত মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও সহজপ্রাপ্য, তাকে অপর কোন ছন্দের বিশেষ লক্ষণরূপে গ্রহণ করা চলে না। অতএব 'শ্বাসাঘাতবৃত্ত' নামটি পুনর্বিবেচনা যোগ্য।

স্বরবৃত্ত ছন্দের অপর একটা বৈশিষ্ট্য—এর বৈচিত্র্যহীনতা অর্থাৎ সমস্ত কবিতাতেই এর পর্বের রূপ ও আকৃতি একই রকম থাকে। প্রতি পর্বে স্বরসংখ্যা চার, দলসংখ্যা চার এবং মাত্রাসংখ্যাও চার—একমাত্র অতিপর্ব ও খণ্ডপর্ব ছাড়া সাধারণভাবে এর আর হেরফের নেই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, ৬, ৮, ১০ হয়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ হয়, কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দ শুধুই ৪ মাত্রার পর্ব —

> ১. টু মু স্ টু মু স্ | বা দ্যি বা জে | লো কে ব লে | কী,
>
> শা মু ক রা জা | বি য়ে ক রে | ঝি নু ক রা জা র | ঝি।
>
> ২. মি ষ্টি না মে | ডা ক বে তা রে | গা নে র কা ছে | রে খে,
>
> বু কে র ম ধ্যে | রে খে দে বে | আঁ চ ল দি য়ে | ঢে কে।

৩. বা ই রে ছি ল | সা ধু র আ কা র | ম ন টা কি ন্তু | ধ র্ম ধো য়া |
| | | | | | | | | | | | | | |
পু ণ্য খা তায় | জ মা শূ ন্য, | ভ ণ্ডা মি তে | চা র'টি পো য়া |

উপরের দৃষ্টান্ত ক'টিতে স্বরবৃত্ত ছন্দের আরও একটা বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—এর প্রতি চরণেও ৪টি ক'রে পর্ব কোন কোন ক্ষেত্রে শেষ পর্বটি খণ্ড। স্বরবৃত্ত ছন্দের এটিই সাধারণ নিয়ম হ'লেও এর যথেষ্ট ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।—

১. আমি নাবব | মহাকাব্য |
সংরচনে |
ছিল মনে— |
ঠেকল এখন | তোমার কাঁকন |
কিঙ্কিনীতে, |
কল্পনাটি | গেল ফাটি |
হাজার গীতে। |

২. ছাঁটা চুলে | হয়ে এঁকো | টেরি ;
লোকে দেখে | ভাবুক আমা | -দেরই।

৩. নিশার মত | হত উষার | গতি খানি |
নিশি হত | অরুণরাগে | মাখা ;
চৈত্র নিশির | তুমি যদি | হতে রাণী |
আমি হতাম | বসন্তেরই | রাজা।

৪. যারা আমার | সাঁঝ সকালের | গানের দীপে | জ্বালিয়ে দিলে | আলো
আপন হিয়ার | পরশ দিয়ে ; | এই জীবনের | সকল সাদা | কালো
যাদের আলো | -ছায়ার লীলা : |

উপরের দৃষ্টান্তগুলির চরণ কোথাও চতুষ্পর্বিক নয়। এ ধরণের চরণ অংশ্য এখন অনেক লেখা হ'চ্ছে। কাজেই এটিকে আর ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করা চলে না।

স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি চরণে চার স্বর চার দল ও চার মাত্রার যে বিশিষ্টতার কথা আগে বলা হয়েছে, ঐটিই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ছন্দের খাতিরে পর্বের মাত্রাসংখ্যা কমিয়ে বা বাড়িয়ে চারে আনা গেলেও স্বরসংখ্যা ও দলসংখ্যার ভিন্নতা ঘটে থাকে। অনেক পর্বে সাধারণতঃ তিনটি স্বর ও তিনটি দল থাকে, কচিৎ দু'টি বা পাঁচটিও দেখা যায়।—

১. বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এলো | বান,
| | |
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হবে | তিন কন্যে | দান |
| | |

২. এ পারেতে | লঙ্কা গাছটি | লাল টুক্ টুক্ | করে |

৩. বাপ বল্লেন | কান্না তোমার | রাখো |

৪. বাইরে কেবল | জলের শব্দ | ঝুপ্ ঝুপ্ | ঝুপ্ |

উপরের দৃষ্টান্ত কটির স্থূলাক্ষর পর্বগুলির প্রত্যেকটিতেই স্বরসংখ্যা এবং দলসংখ্যার ন্যূনতা লক্ষ্য করা যায়। 'ঝুপ্ ঝুপ্' পর্বে দুটি স্বরধ্বনি, অতএব দুটি দল, অন্য সব কটিতেই তিনটি স্বরধ্বনি ও তিনটি দল। অতএব স্বরবৃত্ত ছন্দের স্বাভাবিক নিয়মে এ সমস্ত ক্ষেত্রে যথাক্রমে দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা হয়, কিন্তু তা'হলে পর্বসমতা বজায় থাকে না। কারণ অন্য সব পর্বের মাত্রাসংখ্যা চার। পর্বসমতা বাংলা ছন্দের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ, এটি বজায় না থাকলে ছন্দ পতন অনিবার্য হ'য়ে ওঠে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, উপরের পর্বগুলিতে পর্বসমতা বজায় না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ছন্দ-পতন ঘটছে না। এই আপাত-বিরোধী সমস্যার কারণ এই—যেখানে দৃশ্যতঃ স্বর ও দলের ন্যূনতা রয়েছে বলে মনে হয়, সেখানে আসলে কিন্তু মাত্রার ন্যূনতা নেই। স্বর ও দল কম রয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে সেখানে কোন একটি বা প্রয়োজনমতো দু'টি রুদ্ধদলকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পাঠ ক'রে স্বরের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পর্বের মোট মাত্রাসংখ্যা চারে নিয়ে আসা হয়। অর্থাৎ ছন্দের নিয়মে মাত্রাসংখ্যা কম হ'লেও ছন্দের প্রয়োজনে স্বরের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মাত্রাসমতা বজায় রাখা হয়। ছন্দে এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'স্বরের মাত্রাসম্প্রসারণ'।

স্বরের মাত্রা যেমন সম্প্রসারিত হয়, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্রাসঙ্কোচনেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। নিম্নে অনুরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।—

১. য মু না ব তী | স র স্ব তী | কাল য মু না র | বি য়ে,
য মু না যাবে | শ্ব শু র বা ড়ি | কাঁ জি ত লা | দি য়ে।

২. প্রকাণ্ড বন। প্রকাণ্ড গাছ,—
বে রি য়ে এ লে ই | না ই।
ভি ত রে ক ত | লক্ষ কথা, | পাতা পাতায়, | শাখা শাখায় |
সবুজ অন্ধ | -কার ;

৩. উমার গলে | মণির হার
বুড়োর গলে | হাড়ের ভার
কেমন করে | ও মা উমা
ক রি বে বু ড়ো র | ঘর লো |

৪. নোটন নোটন | পায়রাগুলি | ঝোটন বেঁধেছে |
| | | | |
বড় সাহেবের | বিবিগুলি | নাইতে নেমে | ছে |

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে স্থূলাক্ষর পদগুলির প্রত্যেকটিতে পাঁচটি স্বর, পাঁচটি দল এবং দৃশ্যতঃ পাঁচটি মাত্রা আছে। কিন্তু পাঁচ মাত্রায় পর্বসমতা নষ্ট হয়, কারণ অপর সব পর্বে চার মাত্রা রয়েছে। ছন্দের প্রয়োজনে একটু দ্রুত উচ্চারণে এখানে স্বর সঙ্কোচন ক'রে পাঁচ মাত্রাকে চার মাত্রায় নিয়ে আসতে হ'বে। উচ্চারণে—'যমুনাবতী=যুম্নাবতী, যমুনা যাবে=যুম্না যাবে, ভিতরে কত=ভিত্‌রে কত, করিবে বুড়োর=কর্‌বে বুড়োর, বড় সাহেবের=বড় সাহেবের' ক'রে নিয়েই মাত্রা সমতা আনতে হয়।

স্বরবৃত্ত ছন্দে এরূপ স্বরসম্প্রসারণ এবং স্বর-সঙ্কোচন এখন অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'ত্রিস্বর পর্ব আগেও অনেক ছিল, একালের কবিদের রচনায় পঞ্চস্বর পর্বও যথেষ্ট ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের একটা প্রচলিত নাম 'ছড়ার ছন্দ' বা 'লৌকিক ছন্দ'। প্রাচীন বাংলায় মুখে মুখে যে সকল ছড়া, আর্যা তর্জা-আদি প্রচলিত ছিল। সেগুলি এই লৌকিক ছন্দেই রচিত হ'য়েছিল বলে মনে করা হয়। প্রধানতঃ মৌখিক ভাষার উপর নির্ভরশীল বলেই সাধারণতঃ এ জাতীয় ছন্দের ভিত্তি চলিত ভাষা। মধ্যযুগের বাংলায় যখন সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য তত স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, তখন প্রধানতঃ সাধু রীতিতে রচিত কবিতায়ও মাঝে মাঝে লৌকিক তথা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত পর্ব দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন কবি সচেতন ভাবেই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বরবৃত্ত রীতি গ্রহণ করেছেন।

ব্রজবুলি ভাষায় রচিত বৈষ্ণবপদাবলীকে বাদ দিলে সমগ্র মধ্যযুগের যাবতীয় সাহিত্যই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হ'য়েছে—এই উক্তিটিকে সাধারণভাবে সত্য বলেই মেনে নেওয়া হয়। তবে ব্যতিক্রমস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কবিরা সম্ভবতঃ নিজেদের অজ্ঞাতসারেই কোন কোন পাঠে স্বরবৃত্ত রীতি অবলম্বন করেছেন।—রামায়ণের 'অঙ্গদের রায়বার' অংশটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত—

| | | | | | | | | | | |
যে ন্ বাপ তোর | জ ন্ম হৈ ল | জা ম দ গ্ন্য | তেজে।
মোর বাপ তোর | কোন্ বাপে | বেঁধেছিল | লেজে॥

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে—'বাপের সাপ | পোয়ের ময়ূর | সদা করে কেলি।'

মনসামঙ্গল কাব্যে—

'প্রেতের সনে | শ্মশানে থাকে | মাথায় ধরে | নারী।
সবে বলে | পাগল পাগল | কত সৈতে | পারি॥

বৈষ্ণব কবি লোচন দাসের 'ধামালী' নামে পরিচিত পদগুলি সবই সচেতন ভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।—

'শরম করা্যা | ভরম করা্যা | বসন দিলাম | মাথে |
সকল সঙ্গীর | মাঝে কালা | ধরে আমার | হাতে॥

মধ্যযুগের যাবতীয় লোকসঙ্গীত—বাউল, সারি, মুর্শিদা প্রভৃতি. ময়মনসিংহ গীতিকার বহু অংশ, এমন কি বহু শাক্ত পদাবলীও স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছিল।

১. 'আমার বাড়িৎ | যাইও বন্ধু | বসতে দিবাম | পিড়া |
জল পান | করতে দিবাম | শালি ধানের চিড়া |'

২. যখন আমি | বৈসা থাকি | গুরুজনার মাঝে |
(তুমি) নাম ধরিয়া | বাজাও বাঁশী | আমি মরি | লাজে |'

৩. (আমি) ময়রা ভোলা | হারুর চেলা | শ্যামবাজারে | রই |
আমি যদি | সে ভোলানাথ | হই,
তোরা সবাই | বিল্বদলে | আমায় পূজলি | কই।

৪. (মা) নিম খাওয়ালে | চিনি বলে | কথায় করে | ছলো,
(ওমা) মিঠার লোভে | তিক্ত মুখে | সারাটি দিন | গেল |

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কিন্তু সচেতনভাবেই তাঁর 'অন্নদা মঙ্গল কাব্যে'র একটি পদ স্বরবৃত্তে রচনা করেছিলেন।—

'আমার উমা | মেয়ের চূড়া।
ভাঙ্গড় পাগল | এই লো বুড়.
ভারত কহে | পাগল নহে
এই ভুবনে | ঈশ্বর লো।

এই ছড়ার ছন্দ বা লৌকিক ছন্দকে রবীন্দ্রনাথই যত্নভাবে তুললেন এবং সর্ববিধ লঘুতা থেকে মুক্ত ক'রে একে যথোচিত গুরুত্ব দান করেন। রবীন্দ্রনাথই স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করলেও রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী আধুনিক যুগের অনেক কবিই কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন. এঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেমচন্দ্র দীনবন্ধু, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রও স্বরবৃত্ত ছন্দে তাঁদের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে রাজ-ঐশ্বর্যে মণ্ডিত ক'রেছেন। এককালে শুধু চলতি ভাষায় এবং হাল্কা বিষয়েই স্বরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার ছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন সাধুভাষায় একে ব্যবহার করেছেন, তেমনি গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষয়ও স্বরবৃত্তে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।—

১. এই ভালোরে | প্রাণের রঙ্গে | এই আসঙ্গ | সকল অঙ্গ | মনে
পুণ্য ধরার | ধুলোমাটি | ফল হাওয়া জল | তৃণ তরুর | সনে।

২. চিত্ত দুয়ার | মুক্ত রাখি | সাধু বুদ্ধি | বহির্গতা.
অত্র আমি | কোনমতেই | নাই বলিলাম | সত্য কথা

বিশিষ্ট ছন্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আবার এমন কবিতা রচনা করেছেন, যেগুলিকে স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত দ্বিবিধ উপায়েই পাঠ এবং বিশ্লেষণ করা চলে। এ জাতীয় ছন্দকে **'দ্বৈতবৃত্ত ছন্দ'** নামে অভিহিত করা চলে।—

—◡◡◡ —◡◡◡ —◡◡◡ ◡—◡◡

১. সিন্ধু তু মি | ব ন্দ নী য় | বি ঘ তু মি | মা হে শ্ব রী

—◡◡◡ —◡◡◡ ◡——◡◡ ◡—◡◡

দী প্ত তু মি | মু ক্ত তু মি | তোমায় মোরা | প্র ণা ম ক রি ।

এটিতে প্রতি পর্বে আছে চারটি দল ; তিনটি মুক্ত ও একটি রুদ্ধ—অতএব প্রতি দলে এক মাত্রা দিলে এটি চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত হ'তে পারে আবার প্রতি রুদ্ধ দলে ২ মাত্রা দিয়ে এটিকে অনায়াসে পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্তে রূপান্তরিত করা যায় ।

◡— ◡— ◡— ◡—

২. ম হ ৎ ভ য়ে র | মূ র ৎ সা গ র

◡— ◡— ◡— —

ব র ণ তোমার | ত ম ঃ শ্যা ম ল

এটিকেও চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত বা ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্তরূপে বিশ্লেষণ করা চলে ।

এই স্বরবৃত্তকেই রবীন্দ্রনাথ বাংলার নিজস্ব ছন্দ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং পরবর্তী কালে এই ছন্দই সর্বাধিক প্রাধান্য লাভ করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন । তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই স্বরবৃত্ত ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনাও সম্ভবপর ছিল । এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "এই প্রাকৃত বাংলাতেই 'মেঘনাদ বধ' লিখলে যে বাঙালিকে লজ্জা দেওয়া হ'তে সে কথা স্বীকার করব না । কাব্যটা এমনভাবে আরম্ভ করা যেত—

"যুদ্ধ যখন | সাঙ্গ হল | বীরবাহু বীর | যবে
বিপুল বীর্য | দেখিয়ে হঠাৎ | গেলেন মৃত্যু | পুরে
যৌবন কাল | পার না হ'তেই | কও মা সর | -স্বতী,
অমৃতময় | বাক্য তোমার | সেনাধ্যক্ষ | পদে
কোন বীরকে | বরণ করে | পাঠিয়ে দিলেন | রণে
রঘুকুলের | পরম শত্রু | রক্ষকুলের | নিধি ।"

এর পর তিনি মন্তব্য করেছেন—'এতে গাম্ভীর্যের ত্রুটি ঘটেছে এ কথা মানব না ।'

সত্যি বটে গ্রাম্য ছড়া থেকে স্বরবৃত্ত ছন্দ রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে অনেকখানি মার্জিত স্তরে উন্নীত হয়েছে, তৎসত্ত্বেও যাবতীয় ভাব প্রকাশের সামর্থ্য এই ছন্দ অর্জন করেছে—এমন কথা ছান্দসিকগণ এখনও বিশ্বাস করতে ভরসা পান না ।

শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য ঃ

পর্বাদ্যে একটি প্রবল শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় বলেই এ জাতীয় ছন্দের নামকরণ করা হ'য়েছে 'শ্বাসাঘাতবৃত্ত' ছন্দ । অতএব এ ছন্দের প্রতি পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাত বা ঝোঁক পড়ে ;—

´বৃষ্টি পড়ে | ´টাপুর টুপুর | ´নদেয় এলো | ´বান ।
´শিব ঠাকুরের | ´বিয়ে হ'লো | ´তিনটি কন্যে | ´দান ॥

পর্বাদ্যে শ্বাসাঘাতের অস্তিত্ব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রবোধ চন্দ্র নিঃসংশয় নন । প্রবোধ চন্দ্র মনে করেন, যে কোন ছন্দেরই প্রতি পর্বে আদি স্বরে ঝোঁকের পরিমাণ

একটু বেশিই হ'য়ে থাকে এবং এটি শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দেরই শুধু বৈশিষ্ট্য নয় ; বরং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পর্বের আদিতে যদি রুদ্ধদল থাকে এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পর্ব যদি চতুর্মাত্রক হয়, তাহ'লেও এরকম প্রবল ঝোঁক অনুভব করা যায়। আবার শ্বাসাঘাত-বৃত্ত জাতীয় এমন কবিতাও আছে, যার পর্বের আদিতে ঝোঁক দিলে অতিশয় শ্রুতিকটু শোনাবে। যেমন—

আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে,
দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নবরত্নের | মালে।

এখানে পর্বের আদিতে শ্বাসাঘাতের কোন অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না।

স্বরবৃত্ত ছন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এতে স্বরবর্ণের সংখ্যা দিয়ে মাত্রা নির্ণয় করা হয়। প্রতিপর্বে যতগুলি স্বরবর্ণ থাকে, ততগুলিই দল এবং ততগুলিই থাকে মাত্রা—তাই একে বলা হয় 'স্বরবৃত্ত' বা 'দলবৃত্ত'। এখানে 'স্বর' এবং 'দল'-বিষয়ে একটু সতর্কতা গ্রহণ প্রয়োজন। 'ঐ' এবং 'ঔ'—এ দুটিকে আমরা একক স্বর-রূপে গ্রহণ করলেও আসলে এটি যৌগিক স্বর, এদের উচ্চারণ-বিশ্লেষণেই তা' ধরা পড়ে,—অ+ই অথবা 'ও+ই'=ঐ এবং 'অ+উ' অথবা 'ও+উ'=ঔ। এ দুটি যৌগিক স্বরের জন্য পৃথক বর্ণ নির্দিষ্ট থাকায় বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ দুটির বাইরেও বাংলায় অন্ততঃ ২৫টি যৌগিক স্বর রয়েছে, তাদের জন্য কোন পৃথক্ বর্ণ নির্দিষ্ট নেই। সাধারণতঃ—দুটি বা ততোধিক বর্ণ পাশাপাশি লিখে যৌগিক স্বরটি বোঝানো হয়। এখানেই হয় অসুবিধে—পাশাপাশি দুটি অক্ষর দেখে দুটি স্বর ও দুটি দল ভাবতে গেলেই বিপদ অনিবার্য হ'য়ে ওঠে।—

— ◡ ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ —

দাও যদি গো | মাছের মুড়ো | চিবিয়ে তবে | খাই'

চোখের দেখায় উপরের দৃষ্টান্তটির প্রথম পর্বে ৫টি, দ্বিতীয়ে ৪টি, তৃতীয়ে ৫টি, চতুর্থে দু'টি স্বরধ্বনি আছে। অতএব সেই-সংখ্যক দলও রয়েছে বলে ধরে নিতে হয়। কিন্তু অক্ষরগুলিকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাতে প্রথম তিনটি পর্বেই চারটি ক'রে দল, ও চতুর্থটিতে ১টি দল, অতএব সেই সংখ্যক স্বরবর্ণও রয়েছে। 'দাও'—এখানে 'আও' একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়াতে যৌগিক স্বর, অতএব রুদ্ধদল ; 'চিবিয়ে' উচ্চারণটি বিশ্লেষণ করলে 'চি+বিএ'—এখানে 'ইএ' যৌগিক স্বর, অতএব রুদ্ধদল এবং 'খাই' তে 'আই' যৌগিক স্বর ও রুদ্ধদল। এই যৌগিক স্বর বিষয়ে অবহিত না হ'লেও কিন্তু বিপদ!

◡ ◡ ◡ ◡ ◡ — ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡

'দিও তুমি | মাছের মুড়ো | চেয়ে নিয়ে | খাবো'

—এখানে কিন্তু 'দিও'=দি+ও অর্থাৎ দুটিই মুক্তদল রূপে ব্যবহৃত হ'চ্ছে। আবার 'চেয়ে' এবং 'নিয়ে' শব্দ দুটিও বিশ্লিষ্ট ভাবে উচ্চারিত বলে দুইটি মুক্তদল।

— — — —

সাত ভাই য়ের বোন্ | ভাগ্যবতী'

এখানে 'ভাইয়ের' উচ্চারণ হচ্ছে 'ভা+এর্' অথবা 'ভাই+এর্'—দুটি রুদ্ধদল।

যৌগিক স্বর লেখার সময় আমরা অনেক সময় লেখায় অকারণে 'য়'-শ্রুতির আগম ঘটিয়ে অযথা জটিলতার সৃষ্টি করে থাকি। যেমন—লিখি 'যাইয়া' অথচ পড়ি 'যাইআ' লিখি 'পাওয়া' অথচ পড়ি 'পাওআ'। লেখায় ও উচ্চারণে এই পার্থক্য থাকাতে যত বিপত্তি। ছন্দ কানে শোনার বস্তু, তাই কানের উপরই নির্ভর করতে হ'বে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য—এর প্রতি পর্বে চারটি মাত্রা-এর কম বা বেশি কখনো হয় না। কোন কোন পর্বে স্বরসংখ্যা ও দলসংখ্যা কম বা বেশি হ'তে পারে,—সেই ক্ষেত্রে মাত্রাসংখ্যার যথাক্রমে সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে ৪ মাত্রায় আনতে হয়।

ম শা য়। দে শা ন্ত রী। ক র লে আ মা য়।
কে শ ন স রে র। ম শা য়।
বা ঘ ন য়। ভা লু ক ন য়। ন য় কো আ পা। -নি
বো মা ন য়। কা মা ন ন য়। পি লে কাঁ পা। -নি।

এখানে স্থূলাক্ষর চারটি পর্বেই দলের ও স্বরের সংখ্যা কম, কোথাও দু'টি, কোথাও তিনটি—কিন্তু তাহলেও ছন্দের প্রয়োজনে কোন কোন রুদ্ধদলের সম্প্রসারিত উচ্চারণ ক'রে মাত্রা ৪-এ এনে দাঁড় করাতে হয়েছে।

'পুরুষরা সব। শুনছে বসে। মে য়ে রা আ স র। জমকাচ্ছে।'
'ব ড়ো সা হে বে র। মেয়েগুলি। নাইতে নেমে। -ছে।'

এখানে স্থূলাক্ষর পর্বগুলিতে আছে ৫টি ক'রে স্বর এবং দল। এখানে স্বরসংকোচন ক'রে পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪-এ নামিয়ে আনতে হয়েছে।

স্বরবৃত্ত ছন্দে অক্ষরের চেয়ে মাত্রাসংখ্যা কম হয়, কারণ শুদ্ধ ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসন্ত বর্ণগুলি মাত্রার হিসেবে আসে না।

স্বরবৃত্ত ছন্দের পর্বগুলি হয় রুদ্ধদল ও মুক্তদলের সন্নিবেশে গঠিত। শুধু মুক্তদলে গঠিত পর্বও থাকতে পারে, তবে বেশি নয়, চরণে একটি বা দু'টি। শুধু রুদ্ধদলে গঠিত পর্বও থাকতে পারে, তবে সেই ক্ষেত্রে দলের সংখ্যা সাধারণত ৩-এর বেশি হয় না। চারটিই রুদ্ধদল—এমন দৃষ্টান্ত খুব কমই পাওয়া যায়।

অ নে ক বা কা। হা না হা নি। ত র্জ ন গ র্জ ন। অ নে ক খা নি।

এখানে 'হানাহানি'—এখানে ৪টিই মুক্তদল, এবং 'তর্জন গর্জন'—এখানে ৪টিই রুদ্ধদল।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

ঃ ছন্দ বিশ্লেষণ ঃ

ছন্দ বিশ্লেষণে দক্ষতাই ছন্দ শিক্ষার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা। কোন একটি স্তবককে শুদ্ধ ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই বোঝা যায় যে ছন্দ-শিক্ষার্থী ছন্দের তত্ত্বগুলিকে নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছে। তাই ছন্দ-বিশ্লেষণের আগে ছন্দ বিষয়ে প্রধান তত্ত্বগুলি—অর্থাৎ অবশ্যই মনে রাখতে এমন সব জ্ঞাতব্য বিষয়—একবার মোটামুটিভাবে মনে করিয়ে দেওয়া যাক্ !—

১. বাংলা ছন্দ প্রধানতঃ তিন প্রকার—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত (ও প্রত্নমাত্রাবৃত্ত) এবং শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত।

২. কোন একটা কবিতায় যে কোন এক জাতীয় ছন্দই ব্যবহৃত হয়।

৩. পর্বসমতা অর্থাৎ প্রতিটি পূর্ণ পর্বের মাত্রা-সমতা বিশুদ্ধ ছন্দের একটি আবশ্যিক শর্ত। —চরণের আদিতে (অতি পর্ব) এবং অন্ত্যে (খণ্ড পর্ব) সাধারণতঃ আকারে পূর্ণ পর্বের চেয়ে ছোট হয়ে থাকে।

৪. (অ) অক্ষর বৃত্ত ছন্দে যত অক্ষর, ততমাত্রা ; এতে পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, অপর সকল রুদ্ধদল এবং যাবতীয় মুক্তদল একমাত্রক।

(আ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে কোন রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক এবং মুক্তদল একমাত্রক—ফলতঃ অক্ষর অপেক্ষা মাত্রাসংখ্যা বেশি। একাক্ষর শব্দ অপর কোন শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত না হ'লে তা' দ্বিমাত্রক হ'তে পারে (একাক্ষর শব্দমাত্রই মুক্তদল)।

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে যাবতীয় রুদ্ধদল এবং দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক হ'য়ে থাকে। তবে দীর্ঘস্বরে দ্বি-মাত্রকতার মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(ই) স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতি পর্বে যত স্বর, ততদল এবং মাত্রাসংখ্যাও তাই—ফলে এখানে অক্ষর অপেক্ষা মাত্রাসংখ্যা কম হয়। কখন কখন কোন পর্বে স্বর বা দল-সংখ্যা কম বা বেশি হ'লে স্বরের সম্প্রসারণ বা সংকোচন দ্বারা মাত্রাসংখ্যা চারে নিয়ে আসতে হয়।

৫. অক্ষরবৃত্ত পর্বের মাত্রা সব সময় জোড়া—সাধারণতঃ ৬, ৮, ১০ মাত্রার পর্ব, কখন কখন চার মাত্রারও হয়। মাত্রাবৃত্তছন্দে পর্বের বৈচিত্র্য সব চেয়ে বেশি, পর্বের মাত্রাসংখ্যা—৪, ৫, ৬, ৭ এবং কখন ৮ মাত্রাও হ'তে পারে। স্বরবৃত্ত ছন্দে পর্বের মাত্রাসংখ্যা সব সময় ৪—দল বা স্বরের সংখ্যা কম বেশি হ'লেও সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটিয়ে মাত্রা ৪-এ আনতে হয়।

৬. প্রবহমাণ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রধানতঃ ছেদের উপর নির্ভর করতে হয় বলে যতির ভূমিকা অপেক্ষাকৃত লঘু, তাই এতে পর্ব-সমতা না-ও থাকতে পারে।

৭. ছন্দ-বিশ্লেষণে রুদ্ধদলের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যে দলের শেষে শুদ্ধ ব্যঞ্জন বা হলন্তবর্ণ থাকে, তাকে বলা হয় রুদ্ধদল ; মুক্তদলের শেষে সর্বদাই স্বরবর্ণ

থাকে। যেমন—

'ছন্দশাস্ত্র'—ছন্. দ. শাস্. ত্র—এখানে 'ছন্' এবং 'শাস্' রুদ্ধ দল, 'দ' এবং 'ত্র' মুক্তদল। হসন্তবর্ণ না থাকলেও যদি হসন্তবর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহ'লে সেটিও রুদ্ধ দলই বিবেচিত হ'বে।—'জল'='জল্' রুদ্ধদল. 'আকাশ'=আ+কাশ্—এখানে 'আ' 'মুক্তদল, 'কাশ্' রুদ্ধদল। যৌগিক স্বর অর্থাৎ দু'টি পাশাপাশি অবস্থিত স্বরবর্ণ যদি একই প্রচেষ্টায় উচ্চারিত হয়. তবে সেটিও রুদ্ধদল হয়। যেমন—'খাই' 'যাও', প্রভৃতির উচ্চারণে প্রথম স্বরটি পূর্ণ উচ্চারিত এবং দ্বিতীয় স্বরটি অর্ধোচ্চারিত হয়—উচ্চারণটা যেন 'খাই্' 'যাও্' এরকম হয়, তাই এগুলি রুদ্ধদল। কিন্তু যদি বিশ্লিষ্ট ভাবে দু'টি স্বরধ্বনিকে পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করা হয়—তবে দুটিই মুক্তদল হ'বে। 'যেমন দিও'।

উপরের তত্ত্বগুলি মাথায় রেখে এবার ছন্দ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। প্রথমেই কবিতাটিকে যথাযথভাবে অর্থাৎ মাঝে মাঝে থেমে পড়তে হবে। এই যথার্থভাবে পড়ার উপরই নির্ভর করছে যতিপাত ও পর্বভাগ—যার উপর গোটা ছাদটা নির্ভর করছে। ঠিক জায়গায় থামতে না পারলেই গণ্ডগোল—এর জন্য নির্ভর করতে হয় কানের উপর। যথার্থভাবে পড়া হ'লে যে সমস্ত স্থানে থামতে হচ্ছে, সে সব স্থানে যতিচিহ্ন অর্থাৎ একটা লম্বা দাঁড়িচিহ্ন (।) দিতে হ'বে—সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি বিভিন্ন পর্বে বিভক্ত হ'য়ে গেল। চিহ্নগুলি যদি যথাস্থানে না পড়ে তাহ'লে পড়তে গেলেই কানে বাজবে। যেমন—

১। 'আজি শচীমাতা | কেন চমকিলে—
ঘুমাতে ঘুমাতে | উঠিয়া বসিলে।'

এটিকে যতিচিহ্ন দিয়ে বিভক্ত করবার পর যে সকল পর্ব সৃষ্টি হ'লো, সেগুলি যে সমান, তা কিন্তু কানের মাপেই ধরা পড়ে। দেখাই যাচ্ছে, এর প্রতি পর্বে আছে ৬টি অক্ষর ও ৬টি মাত্রা। এবার—

'রূপ লাগি আঁখি | ঝুরে গুণে মন | ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি | কান্দে প্রতি অঙ্গ | মোর ॥
হিয়ার পরশ | লাগি হিয়া মোর | কান্দে,
পরাণ পীরিতি | লাগি থির নাহি | বান্ধে ॥

এখানেও ৬ অক্ষর বা মাত্রার পর যতিচিহ্ন দিয়ে পর্বভাগ করা হ'লো। পড়তে গেলেই মনে হয় যেন তাল কেটে যাচ্ছে এবং অর্থবোধেও যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হ'চ্ছে। কবিতায় যথার্থ স্থানে যদি যতিচিহ্ন পড়ে, তবে অর্থবোধে এই বিপত্তি ঘটে না। এখানে তা ঘটলো, তার কারণ—এখানে যতিচিহ্ন যথাস্থানে পড়েনি। চোখের দেখায় অক্ষর গুণে যতিচিহ্ন দেওয়া হয়েছে, কানের উপর নির্ভর করা হয়নি—তাই যত গণ্ডগোল। এবার বুঝে শুনে পড়ার উপর নির্ভর ক'রে যতি দেওয়া যাক্—

রূপ লাগি : আঁখি ঝুরে | গুণে মন : ভোর।
প্রতি অঙ্গ : লাগি কান্দে | প্রতি অঙ্গ : মোর।

হিয়ার :পরশ: লাগি | হিয়া মোর : কান্দে।
পরাণ : পীরিতি : লাগি | থির নাহি বান্ধে॥

এবার কিন্তু যথাস্থানে যতিপাত ঘটায় ছন্দে কোন ত্রুটি ঘটেনি, অর্থবোধেও কোন বিপত্তি নেই—কারণ এটিই যথার্থ পাঠ। মধ্যযতি দ্বারা পর্ব এবং লঘুযতি (:) দ্বারা পর্বাঙ্গ নির্দেশ করা হ'লো।

আরেকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক্—

ঘরে যারা যাবার | তারা কখন গেছে | ঘর পানে,
পারে যারা যাবার | গেছে পারে।
ঘরেও নহে পারেও | নহে যে জন আছে | মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে | নেয় তারে।

যেভাবে যতিচিহ্ন দেওয়া হ'য়েছে, এভাবে পাঠকালে প্রথম দু'টি পংক্তিতে অসুবিধে হয় না, কিন্তু তৃতীয় পংক্তিতে এসেই থমকে দাঁড়াতে হয়—কারণ যেখানে যতিচিহ্ন পড়েছে, জিভ্ সেখানে থামতে চায়না, অর্থবোধে বিপত্তি ঘটে, তাই প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্বে যে বিরোধ রয়ে গেল, তার সংশোধনের জন্য গোটা স্তবটাকেই আবার ঢেলে সাজাতে হ'বে—

ঘরে যারা | যাবার তারা | কখন গেছে | ঘর পানে,
পারে যারা | যাবার গেছে | পারে।
ঘরেও নহে | পারেও নহে | যে জন আছে | মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা | কে ডেকে নেয় | তারে॥

এবার ঠিক হ'লো।

যতিচিহ্ন দিয়ে পর্বভাগ করা হলো প্রথম কাজ, এর পর দ্বিতীয় কাজ, এদের দলগুলিকে চিহ্নিত করা—

ঘ রে যা রা | যা বা র তা রা | ক খ ন গে ছে | ঘ র পা নে,
পা রে যা রা | যা বা র গে ছে | পা রে।
ঘ রে ও ন হে | পা রে ও ন হে | যা রা আ ছে | মা ঝ খা নে
স ন্ধ্যা বে লা | কে ডে কে নে য় | তা রে।

(আমরা জানি—সাধারণতঃ যে কোন মুক্তদলই একমাত্রা বিশিষ্ট, অতএব এখন যদি কোন পর্ব পাওয়া যায়, যার অন্ততঃ একটি পূর্ণ পর্বে সবকটিই মুক্তদল, তবে তার উপর ১টি মাত্রাচিহ্ন দেওয়া যেতে পারে এখানে শুধুই মুক্তদলবিশিষ্ট পর্ব পাওয়া যায় তিনটি—'ঘরে যারা' 'পারে যারা' এবং 'যারা আছে'—মাত্রা চিহ্ন দেওয়াতে জানা গেলো, প্রত্যেকটি পদের মাত্রাসংখ্যা ৪। আমরা জানি, একটি কবিতায় প্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা সমান হবেই—অতএব অপর পর্বগুলির মাত্রাসংখ্যাও ৪ হবে। এবার

দেখা যাচ্ছে, অন্য সব কটি পূর্ণ পর্বেই ৪টি করে স্বরধ্বনি বা দল আছে, অতএব প্রতিটিতেই ১ মাত্রা হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, সবকটি রুদ্ধদল এবং সব কটি মুক্তদলেই ১ মাত্রা এবং এটি শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ, অতএব এবার আমরা বিশ্লেষণ-জাত ফলাফল লিখবো।

স্তবকটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত, এতে চারটি চরণ—প্রথম ও তৃতীয় চরণে তিনটি পূর্ণ ও ১টি অপূর্ণ পর্ব, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে দুটি পূর্ণ ও ১টি অপূর্ণ পর্ব আছে। প্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪। কবিতাটি দ্রুতলয়ে পাঠ্য।

মাত্রাদান প্রণালী—এতে প্রতিটি রুদ্ধদল এবং প্রতিটি মুক্তদলেই ১ মাত্রা।

২. জীবন মরণের | বাজায়ে খঞ্জনী

নাচিয়া ফাল্গুন | গাহিছে।

অধীরা চঞ্চল ধরা | মাটির বন্দিনী

বাতাসে উড়ে যেতে | চাহিছে

যতি চিহ্ন দিয়ে পর্ব ভাগ করে দেখা গেল এতে দুটি পর্ব আছে শুধুই মুক্তদলে গঠিত। এ দুটি পর্বে ৭টি ক'রে মুক্তদল, প্রতি দলে একমাত্রা চিহ্ন দিলে পর্বের মাত্রা হয় ৭। এখন আমরা জানি, একমাত্র মাত্রাবৃত্ত ছন্দেরই ৭ মাত্রার পর্ব হয়; অতএব এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতি রুদ্ধদলেই দু'মাত্রা দিতে হ'বে,—ফলে দেখা গেল, এর প্রতি পর্বেই রয়েছে ৭ মাত্রা, অতএব পর্বসমতাও বজায় রইলো। অতএব বিশ্লেষণে পাওয়া যাচ্ছে—স্তবকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এর প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি ক'রে সপ্তমাত্রক পূর্ণ পর্ব ও ১ ক'রে ত্রিমাত্রক অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। আসলে এর প্রথম দুটি পংক্তিতে ১টি চরণ ও পরের দুটি পংক্তিতে অপর একটি চরণ রয়েছে। এর লয় মধ্যম। মাত্রাদান প্রণালী—এর প্রতি রুদ্ধদলে দু' মাত্রা এবং মুক্তদলে এক মাত্রা হয়েছে।

৩. এ কি জাল বোনা | চারু কল্পনা | মনে আলপনা আঁকাগো

মরি কত ছলে | স্মৃতি শত দলে | ধুয়ে আঁখিজলে | রাখাগো।

(পর্ব ভাগ ও দলচিহ্ন দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এখানে দ্বিতীয় চরণের তিনটি পূর্ণ পর্বেই রয়েছে ৬টি ক'রে মুক্তদল, অতএব এর প্রতিটি পর্বের মাত্রাসংখ্যা হ'বে ৬। অতএব এটা স্বরবৃত্ত হবে না, কারণ স্বরবৃত্তের মাত্রাসংখ্যা ৪। এটা কি অক্ষরবৃত্ত হ'তে পারে? তা-ও না, কারণ এর প্রথম চরণের বিভিন্ন পর্বে অক্ষর রয়েছে ৫টি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৬ মাত্রার জন্য ৬ অক্ষর হচ্ছে না। অতএব ধরে নিতে হ'চ্ছে এটি মাত্রাবৃত্ত। মাত্রাবৃত্তের

নিয়ম অনুযায়ী প্রতি রুদ্ধদলে দু' মাত্রা দেওয়াতে প্রতি পর্বের মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ালো ৬—সর্বসমতা যখন ঘটে গেলো, তখন এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দই বটে।)

আলোচ্য স্তবকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতি চরণে তিনটি ষণ্মাত্রক পূর্ণ পর্ব ও ত্রিমাত্রক একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

মাত্রা গণনারীতি—প্রতি রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, মুক্তদল একমাত্রাবিশিষ্ট।

৪. মা ধ বের ম র সি দ্ধ | মো হ ন মু রলী

ধ্বনি ল রা ধার দ গু | নি কু ঞ্জ মো হ নে ;—

অ ম নি রা ধা র আ ত্মা | দ্রু ত গে ল চ লি

শ্যা ম তী র্থে, শ্যা মা ঙ্গি নী | য মু না স দ নে।

(এখানে কোন পূর্ণ পর্বই শুধু মুক্তদলে গঠিত নয়, অতএব এ ছন্দ নির্ধারণের জন্য আমাদের ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করতে হ'বে। চরণের শেষ পর্বগুলি অপূর্ণ এবং মাত্রাসংখ্যা ৬, অতএব এটি স্বরবৃত্ত হ'তে পারে না। প্রতিটি পূর্ণ পর্বে আছে ৮টি অক্ষর, প্রতি অক্ষর ১ মাত্রা হ'লে পর্বসমতা বজায় থাকে এবং সেটি একমাত্র অক্ষরবৃত্তেই সম্ভব। অতএব এটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। অতএব, পদান্তের রুদ্ধদলে ২ মাত্রা, পদের আদি ও মধ্য রুদ্ধদলে ১ মাত্রা এবং মুক্তদলে ১ মাত্রা দিতে হ'বে—তাতে প্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা দাঁড়ালো—৮)

স্তবকটি অক্ষরবৃত্তে ছন্দে রচিত, প্রতি চরণে একটি অষ্টমাত্রক পূর্ণ পর্ব ও একটি ষণ্মাত্রক অপূর্ণ পর্ব আছে। মাত্রাদান পদ্ধতি—পদান্তস্থিত রুদ্ধদলে ২ মাত্রা এবং অপর সব রুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্তদলে ১ মাত্রা। অথবা বলা চলে, প্রতি অক্ষরে ১ মাত্রা।

৫. সু ন্দ রী তু মি | শুকতা রা

সু দূর শৈ ল | শি খ রান্তে

শ র্ব রী হ বে য বে সা রা

দ র্শ ন দি ও | দিক্ প্রান্তে।

(এখানে কোন মুক্তদল পর্ব না থাকাতে আমাদের ভিন্ন উপায় গ্রহণ করতে হবে। এর পূর্ণ পর্বে কোনটায় আছে ৫টি দল। অতএব এটা স্বরবৃত্ত হ'তে পারে না। এর প্রতি পর্বে আছে ৫টি ক'রে অক্ষর, অতএব অক্ষরবৃত্ত হ'লে সর্বসমতা বজায় থাকতে পারে,

কিন্তু অক্ষরবৃত্তে বিজোড় সংখ্যক অর্থাৎ ৫ মাত্রার পর্ব হয় না। অতএব এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতিটি রুদ্ধদলে দু' মাত্রা দিলেই এটি ষণ্মাত্রক পর্ব হয়ে দাঁড়াবে।)

স্তবকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এর প্রতি চরণে একটি ষণ্মাত্রক পূর্ণ পর্ব ও প্রথম ও তৃতীয় চরণে চতুর্মাত্রক এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে পঞ্চমাত্রক অপূর্ণ পর্ব আছে।

৬. ছু ট ছে ট্রেন | পে রি য়ে পথ | পেরিয়ে মাঠ | বন।
দুলছি আ মি | দুলছো তু মি | কাঁপছে তোমার | চুল।
ছো ট্ট নদী | এই পালালো | এ কোন ই ষ্টি | শন।
দুল ছি আমি | দুলছো তু মি | দুলছে তোমার | দুল।

(প্রথম চরণের প্রথম পর্বটি বাদ দিলে এর প্রতিটি পর্বেই ৪টি স্বর ও দল রয়েছে। প্রথম পর্বটিকে ব্যতিক্রম ধরে নিলে সহজেই এটিকে স্বরবৃত্ত বলে সনাক্ত করা চলে। এর প্রতি দলে এক মাত্রা, ছন্দের প্রয়োজনে শুধু প্রথম পর্বের কোন একটি রুদ্ধদলে ২ মাত্রা দিলেই একে চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত বলে বিশ্লেষণ করা চলে।)

স্তবকটি স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতি চরণে তিনটি চতুর্মাত্রক পূর্ণ পর্ব ও একমাত্রাবিশিষ্ট একটি ক'রে অপূর্ণ পর্ব আছে। ব্যতিক্রম: এর প্রথম চরণের প্রথম পর্বে ৩টি দল, অতএব ছন্দের নিয়মে এতে ৩ মাত্রা হয়, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে এর কোন একটি রুদ্ধদলকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পাঠ করে মাত্রা সম্প্রসারণ ক'রে ৪ মাত্রায় আনা হ'য়েছে।

৭. পি তার ধ র্ম | শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল | রাজপু রী হ'তে,
স ঁপিল যজ্ঞ | অনল আলোতে
বৌ দ্ধ শা স্ত্র | রা শি।

(এখানে 'মুছিয়া ফেলিল' পর্বটিতে ৬টি মুক্তদল অতএব ৬টি মাত্রা, কিন্তু অনেকগুলি পর্বে আছে ৫টি অক্ষর, কাজেই অক্ষরবৃত্ত নয় (অক্ষরবৃত্ত হ'লে ৬টি অক্ষর থাকবে)—এটি ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই স্তবকটির প্রতি পংক্তিতে দুটি ক'রে ৬ মাত্রার পূর্ণ পর্ব ও শেষ পংক্তিতে একটি পূর্ণ পর্ব ও দু' মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

৮. কি গা হিবে, কি শু না বে। ব ল মি থ্যা আ প নার সুখ
মি থ্যা আ প নার দুঃ খ। স্বা র্থ ম গ্ন যে জন বিমু খ
বৃ হৎ জ গ ৎ হ তে। সে ক খ নো শে খে নি বাঁ চ তে
ম হা বি শ্ব জী ব নের। ত র ঙ্গে তে না চ তে না চি তে।

(এর প্রথম পর্বটিই আটটি মুক্তদলে গঠিত এবং অপর সকল পূর্ণ পর্বে আটটি ক'রে অক্ষর আছে। অতএব এটি অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত)

অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত স্তবকটির প্রতি পূর্ণ পর্বে বৃহত্তর—১০টি ক'রে মাত্রা। ইচ্ছা করলে এটিকে ৮ মাত্রার একটি পূর্ণ পর্ব এবং দু' মাত্রার একটি অপূর্ণ পর্বে পর্বে বিভক্ত করা যায়। তবে সাধারণতঃ তা' না ক'রে ৮+১০ মাত্রার মহাপয়ার বলেই একে অভিহিত করা হয়। এর প্রতি অক্ষর একমাত্রাবিশিষ্ট, অথবা বলা চলে, এতে পদান্তের রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, এছাড়া অন্য সব দলই একমাত্রাবিশিষ্ট।

৯. প ত ন অ ভ্যু দ য় ব ন্ধু র প ন্থা। যু গ যু গ ধা বি ত। যা ত্রী
হে চি র সা র থি। ত ব র থ চ ক্রে। মু খ রি ত প থ দি ন। রাত্রি

(এখানে শুদ্ধ মুক্তদলে গঠিত পর্ব আছে তিনটি, কিন্তু তাতে দল-সংখ্যায় ঐক্য নেই। প্রতি মুক্তদলে ১ মাত্রা ধরা হ'লে পর্বের মাত্রাসংখ্যা হয় যথাক্রমে ৭, ৬ ও ৮ —কিন্তু তাতে পর্বসমতা থাকে না। যে সমস্ত নিয়মের সাহায্যে ছন্দের জাতি নির্ণয় করা হয়, তার কোনটাই এখানে প্রয়োজ্য হচ্ছে না, তার কারণ, এটি স্বরবৃত্ত, অক্ষরবৃত্ত কিংবা মাত্রাবৃত্ত কোনটিই নয়।—এটি প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, এইজন্যই সাধারণ নিয়ম এখানে অচল। কবিতাটি পড়বার সময়ই বোঝা যায়—দীর্ঘস্বরকে টেনে পড়তে হচ্ছে, অতএব এ থেকেই প্রত্নমাত্রাবৃত্তের স্বরূপ বুঝে নিতে হবে।)

এটি প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত—এর রুদ্ধদল এবং দীর্ঘস্বরে দু' মাত্রা পড়বে। প্রতি পূর্ণ পর্বে ৮ মাত্রা। প্রত্নমাত্রাবৃত্ত বুঝতে পারলে এতে দলচিহ্ন না দিয়ে শুধু মাত্রাচিহ্ন দেওয়াই ভালো। যেমন—১ মাত্রা = । ২ মাত্রা = —

| | | — | | | | | — | | — — | | | | | | — | | | ——
প ত ন-অ ভ্যু দ য় । ব ন্ধু র প ন্থা। যু গ যু গ ধা বি ত। যাত্রী।)

১০. স খি) পা তিস্ নে শি লা ত লে। প দ্ম পা তা,
স খি) দি স নে গো লা ব ছি টে। খা স্ লো মা থা,

যার) অন্তরে ক্রন্দন, |
করে হৃদি মন্থন
তাতে হলি চন্দন।
কমলী মালা —
সখি) দিলে না দিলে নে লো, বড় সোহাগ।

(পর্বে দলের সংখ্যা চারের বেশি, অতএব স্বরবৃত্ত নয়, পর্বে অক্ষরসমতা নেই, কাজেই অক্ষরবৃত্তও নয়,— অতএব মাত্রাবৃত্ত ছন্দ।)

স্তবকটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত—পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৮। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও শেষ চরণের গোড়াতে একটি করে দ্বিমাত্রক অতিপর্ব রয়েছে, এ ছাড়াও পাঁচ মাত্রার অপূর্ণ পর্ব আছে ১ম, ২য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণে। এখানে রুদ্ধদল মাত্রই দ্বিমাত্রক।

২ ১ ১ ১ ১   ১ ১ ১ ২ ১
১১. মঞ্জু বিকচ | কুসুম পুঞ্জ |
১ ১ ১ ২ ১   ২ ১ ২ ১
মধুপ শব্দ | গুঞ্জি গুঞ্জ |
২ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ১ ১ ১   ২ ২
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন | মঞ্জুল কুল | নারী
১ ১ ২ ১ ১   ১ ২ ১ ২ ১
ঘন গঞ্জন | চিকুর পুঞ্জ
২ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ২ ১
মালতী ফুল | মালে রঞ্জ |
২ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ১ ১ ১   ২ ১ ১ ১ ১   ২ ২
অঞ্জন যুত | কঞ্জ নয়ন | খঞ্জন গতি | -হারী।

(এখানে অক্ষর সমতা থাকলেও এটি অক্ষরবৃত্ত নয় কারণ প্রতি পর্বে ৫টি অক্ষর—অক্ষরবৃত্তে বিজোড় সংখ্যা থাকে না। অতএব ধরা যেতে পারে মাত্রাবৃত্ত—প্রতি রুদ্ধদলে ১ মাত্রা হিসাবে ৬ মাত্রার পর্ব, কিন্তু 'মালতী ফুল' পর্বে তাহ'লে ৫ মাত্রা হয়।) অতএব এটি প্রত্নমাত্রাবৃত্ত—'মালতী'—র 'মা'—দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক হ'লো; কিন্তু ব্যতিক্রম 'তী'—দীর্ঘস্বর হওয়া সত্ত্বেও একমাত্রাই রইলো।

১২. এই যে ক্ষেতে শস্য ভরা, | তোমার এ নয় | একটি ছড়া!
তোমার হ'লে | তাদের দেশে | চালান কেন | হয়?

তুমি পাও না | একটি মুঠি | মরছে তোমার | সপ্ত গোষ্ঠী |
তাদের কেবল | কান্তি পুষ্টি | কংস ভরা | জয়।

(প্রতিটি পূর্ণ পর্বেই চারটি দল, অতএব স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।) প্রথম ও তৃতীয় চরণে চতুর্মাত্রক চারটি পর্ব, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে তিনটি চতুর্মাত্রক পূর্ণ পর্ব ও একটি ক'রে একমাত্রা বিশিষ্ট একটি ক'রে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে।

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হ'লো না, দল চিহ্নও দেওয়া হ'লো না। মাত্রাচিহ্ন দিয়ে কীভাবে লিখতে হবে, কেবল তাই দেখানো হ'লো। কোন কোনক্ষেত্রে মাত্রাচিহ্নও দেওয়া হ'লো না, তবে পর্বের মাত্রাসংখ্যা দেওয়া হ'লো।

১৩. আমি এলেম, | ভাঙল তোমার | ঘুম ৪+৪+১
শূন্যে শূন্যে | ফুটল আলোর | আনন্দ কু | সুম। ১+৪+৪+১
মাথায় তুমি | ফুলে ফুলে | ৪+৪
ফুটিয়ে তুলে |
দুলিয়ে দিলে | নানা রঙের | দোলে ॥ ৪+৪+২

আলোচ্য স্তবকটিকে সাধারণ মুক্তকের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা চলে। এটি স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত, অসম এর চরণ-বিন্যাস। প্রতি পূর্ণপর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, অপূর্ণ পর্বের মাত্রা কোথাও ১, কোথাও ২।

এখানে যৌগিক স্বর, রুদ্ধদল, মুক্তদল সবই এক মাত্রাবিশিষ্ট।

১৪. শুনেছ কি বলে গেল | সীতারাম বন্দ্যো? ৮+৭
আকাশের গায়ে নাকি | টকটক গন্ধ? ৮+৭
টকটক থাকে নাকো | হলে পরে বৃষ্টি, ৮+৭
তখন দেখেছি চেটে | একেবারে মিষ্টি, ৮+৭

সমিল সমচরণ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত স্তবক। পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৮, অপূর্ণ পর্বের ৭। রুদ্ধদল সর্বত্র দ্বিমাত্রক। এটিকে ৪ মাত্রার পর্বেও রূপান্তরিত করা যায়।

১৫. স্বর্গ মর্ত্য করে যদি | স্থান বিনিময় ৮+৬
তথাপি বাঙ্গালী নাহি | হবে এক মত ৮+৬
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, | সাহসে দুর্জয়। ৮+৬
কার্যকালে খোঁজে সবে | নিজ নিজ পথ। ৮+৬

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, ৮+৬ মাত্রায় বিভক্ত প্রচলিত পয়ারের দৃষ্টান্ত। পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৮, অপূর্ণ পর্ব ৬। পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, অপর সকল রুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্তদল একমাত্রক। অথবা বলা চলে, প্রতি অক্ষরে একমাত্রা।

১৬. পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, | ৮
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম | ৮
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন | গণিবারে পারে; ৮+৬
সমুখে সাগরাম্বরা ৮
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা। ৮
কটাক্ষে কখন যেন | দেখিছে তাহারে, ৮+৬

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৮, অপূর্ণ পর্ব ষণ্মাত্রক। প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা।

১৭. কবিত কনক | রুচির গৌর | ৬+৬
অখিল ভুবন | মনমচোর | ৬+৬
কর ভূজদণ্ড | বাহু দণ্ড | ৬+৬
কম্বু তাপ | ত্রাসনি | ৬+৪

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রতিচরণে দুটি ষণ্মাত্রক পূর্ণ পর্ব, শেষ চরণে একটি পূর্ণ পর্ব, ও একটি চতুর্মাত্রক অপূর্ণ পর্ব। রুদ্ধদল, যৌগিকস্বর, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক, অপর সকল

একমাত্রাবিশিষ্ট। ব্যতিক্রম শেষ চরণে 'তাপ' শব্দের 'তা' দীর্ঘস্বরযুক্ত হওয়াতেও একমাত্রা হ'লো।

১৮. ২ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১

তা ত ল সৈ ক তে | বা রি বি ন্দু স ম ৮+৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

সু ত মি ত র ম ণী স | মা জে, ৮+৪

২ ১ ১ ১ ১ ১১ ২ ১ ১ ২ ১ ১

তো হে বি স রি ম ন | তা হে স ম র্পি লুঁ ৮+৮

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২

অ ব ম রু হ ব কো ন | কা জে। ৮+৪

প্রত্নমাত্রাবৃত্তে রচিত স্তবকটির প্রতিচরণে (দুই পংক্তিতে এক চরণ হয়েছে) তিনটি অষ্টমাত্রিক পূর্ণ পর্ব ও একটি চতুর্মাত্রিক খণ্ড পর্ব রয়েছে। এতে রুদ্ধদল সর্বত্র দ্বিমাত্রিক এবং সাধারণভাবে দীর্ঘস্বরও দ্বিমাত্রিক কিন্তু কোথাও কোথাও ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন 'রমণী'-র 'ণী' 'তোহে' এবং 'তাহে'-র 'হে', 'কোন'-এর 'কো' দীর্ঘস্বর হওয়া সত্ত্বেও দ্বিমাত্রিক হয়নি।

১৯. | | | | | | | |

রু দ্র মো দে র | হাঁ ক দি য়ে ছে।

| | | | | |

বা জি য়ে আ প ন | তূ র্য। ৪+৪+৪+২

| | | | | | | | |

মা থা রূ প রে | ডা ক দি য়ে ছে।

| | | | |

ম ধ্য দি নে র | সূর্য। ৪+৪+৪+২

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত স্তবকটির প্রতি দুই পংক্তিতে এক চরণ, প্রতি চরণে তিনটি চতুর্মাত্রিক পূর্ণ পর্ব ও একটি করে দ্বিমাত্রিক খণ্ড পর্ব আছে। এখানে 'বাজিয়ে' শব্দে 'বা' একটি মুক্তদল এবং 'জিয়ে' একটি রুদ্ধদল, কারণ 'ইএ' যৌগিক স্বর রয়েছে।

২০. — —

নী ল! নী ল! | ৪

| | — | | | | | | | |

স বু জে র | ছোঁ য়া কি না, | তা বু ঝি না ৪+৪+৪

| | | | | — | —

ফি কে গা ঢ় | হ রে ক র | ক ম ৪+৪+২

— | | —

ক ম বে শী | নী ল। ৪+২

— | | — — — | | | — | —

তা র মা ঝে | শ্যা মে র | আ ন ম না | হা সি ব সা | মি ল

৪+৪+৪+৪+২

| | — —

ক টা গা ঢ় | চি ল। ৪+২

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত এই স্তবকটিতে মুক্তকের রীতি অনুসৃত হয়েছে বলে চরণ-সমতা নেই, এমন কি একটিমাত্র পর্বেও চরণ গঠিত হ'য়েছে। এর পূর্ণ পর্ব চতুর্মাত্রক হ'লেও কোন কোন পর্বকে ৮ মাত্রার কোনটাকে ৬ মাত্রার হিসেবেও দেখানো যেতে পারে। প্রবহমানতা বর্তমান থাকায় এর পর্বসমতার উপর তত গুরুত্ব আরোপ না করলেও চলে।

২১. সিন্ধু তুমি | বন্দনীয় | বিশ্ব তুমি | মাহেশ্বরী |
দীপ্ত তুমি | মুক্ত তুমি | তোমায় মোরা | প্রণাম করি।

এখানে প্রতিটি রুদ্ধদলকে দ্বিমাত্রক ধরে গণনা করলে এর প্রতি পূর্ণপর্ব হয় পঞ্চমাত্রক, ছন্দ মাত্রাবৃত্ত। আবার, এর প্রতিদলকে এক মাত্রা হিসেব করলে পর্ব হয় চতুর্মাত্রক, ছন্দ স্বরবৃত্ত—অতএব একে 'দ্বৈতবৃত্ত' ছন্দের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা চলে :

২২. দোহাই কল্পনা তোর | ছিন্ন কর মায়াডোর |
কবিতায় আর মোর | নাই কান দাবি। ৮+৮+৮+৬
বিবহ বকুল আর | বৃন্দাবনে রূপকার
সেগুলি চাপাই কারে | স্কন্ধে তার ভাবি। ৮+৮+৮+৬

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাটির প্রতি দুই পংক্তিতে এক চরণ, প্রতি চরণে তিনটি অষ্টমাত্রক পূর্ণ পর্ব ও একটি ষণ্মাত্রক খণ্ড পর্ব আছে। এটি প্রাচীন রীতির চৌপদীর দৃষ্টান্ত।

২৩. ছিলাম যবে | মায়ের কোলে ৫+৫
বাঁশি বাজানো | শিখাবে বলে ৫+৫
চোরাই করে | এনেছ মোরে | তুমি। ৫+৫+২
বিচিত্রা হে | বিচিত্রা ৫+৪
যেখানে তব | রঙের রঙ্গ | ভূমি। ৫+৫+২

এটি পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিদর্শন হলেও শেষ চরণের 'রঙের রঙ্গ' পর্বে ছন্দোগত ত্রুটি রয়েছে। ছন্দের নিয়মে রুদ্ধদলে দুই মাত্রা দিলে পর্বের মাত্রাসংখ্যা হয় ৬, কাজেই এখানে ছন্দপতন ঘটেছে, বলা চলে :

২৪. কাক কালো | কোকিল কালো | কালো ফিঙের | বেশ,
তার চেয়ে | অধিক কালো | তোমার মাথার | কেশ।

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত, দুটি চরণেরই প্রথম পর্বে আছে তিনটি করে দল, ছন্দের নিয়মে এতে মাত্রা হয় ৩টি, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে এর রুদ্ধদলকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়ে মাত্রা সম্প্রসারণ ক'রে ৪ মাত্রা ক'রে নিতে হয়। অন্য পূর্ণ পর্বগুলিতে ৪টি দল ও ৪ মাত্রা রয়েছে।

২৫. (ওই) সিন্দুর টিপ | সিংহল দ্বীপ | কাঞ্চনময় | দেশ,
(ওই) চন্দন যার | অঙ্গের বাস | তাম্বুল বন | কেশ।

এটি যথাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক। প্রতি পর্বে আছে তিনটি ক'রে শুধুই রুদ্ধদল অতএব একে স্বরবৃত্ত বলা সঙ্গত নয়; অক্ষর সমতা থাকা সত্ত্বেও অক্ষরসংখ্যা বিজোড় বলেই এটি অক্ষরবৃত্তও হ'তে পারে না :

২৬. ফিরিয়ে নে তোর | বেদের ঝুলি — ৪ + ৪

(ওমা) মঙ্গাসনে আর | আমায় কালী — ৪ + ৪

ভবের খেলা | খেলতে ভবে — ৪ + ৪

(আমারে) একলা পাঠা | লি।

চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ২য় ও ৪র্থ চরণের আদিতে দুটি ক'রে অতিপর্ব আছে, ৪র্থ চরণের শেষ খণ্ড পর্বটি ১ মাত্রার। 'ফিরিয়ে' দুটি দল-১টি মুক্ত ও পরেরটি যৌগিক স্বরযুক্ত রুদ্ধ।

২৭. জলে কচ্ছপ | স্থলে পাগুপো | ঝিলমিল করে | হ রি

অন্তরীক্ষে | পবনপুত্র | বিশ্রাম কোথা | কার।

এটি যথাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। চরণের প্রথম পর্বটির উচ্চারণ 'জলে কচ্ছপো' —অতএব ৬ মাত্রা হ'চ্ছে, অন্যগুলি সব ঠিক আছে, চরণের অন্তে ২ মাত্রার খণ্ডপর্ব।

২৮. দুই জনে জুঁই | তুলতে যখন | প্রেম বনের | ধারে,

সন্ধ্যা আলোর | মেঘের ঝালর | চাকল অন্ধ | কারে

স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত চতুর্মাত্রক পর্ব। 'দুই' এবং 'জুঁই' সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারিত বলে যৌগিক স্বর, অতএব রুদ্ধদল ও একমাত্রা।

২৯. মনে পড়ে | দুই জনে | জুঁই তুলে | বালো

নিরালায় | বন ছায় | গেঁথেছিনু | মালো।

চতুর্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এখানে 'দুই' এবং 'জুঁই' দুটিরই বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ অতএব দুটি মৌলিক স্বর এবং দুটি মুক্তদল, অতএব ২ মাত্রা, রুদ্ধদল হিসেবে করলেও এখানে ২ মাত্রাই হ'বে।

৩০. সেই কথা মোর | ছিল নাকো মনে।

থাকে না বোধ হয় | কারো,

ভুলেছিনু, আমি | মানুষ যে শুধু।

ভেবেছিনু, বড় | আরো।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, পর্ব যথাত্রক। সাধারণ হিসেবে 'থাকে না বোধ হয়' পর্বে একটি অক্ষর তথা একটি মাত্রা বেশি মনে হয়। আসলে এখানে শব্দের আভ্যন্তর সন্ধি হওয়াতে উচ্চারণ একটু ভিন্ন রকম দাঁড়াচ্ছে, যেমন—'বোধ হয়'—এর উচ্চারণ 'বোধয়' —অতএব তিন মাত্রা, হিসেবে মিলে যাচ্ছে।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

ঃ অনুশীলনী ঃ

১। গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোথা যাস্‌নে ;
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে।

(পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্ত)

২। সজনি সজনি রাধিকা লো দেখ অবহু চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।

(ষণ্মাত্রক প্রত্নমাত্রাবৃত্ত)

৩। রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে চলে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার রঙ্গির পানে দুটি কথা উড়ে যায়।

(ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত)

৪। আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

(ষণ্মাত্রক অক্ষরবৃত্ত)

৫। আমি নাবব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন—
কিঙ্কিণীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।

(চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত)

৬। জীবন মরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীর হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।

(সপ্তমাত্রক মাত্রাবৃত্ত)

৭। দেশ দেশ নন্দিত করি মন্ত্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

(ষণ্মাত্রক প্রত্নমাত্রাবৃত্ত—দীর্ঘস্বরও দ্বিমাত্রক)

৮। বনপথে চলেছে চার্বাক
সূর্যতাপে স্পন্দিত সে বন,
ক্লান্ত আঁখি চিন্তিত নির্বাক
বিনা কাজে ফিরিছে ভুবন।
(দশমাত্রক অক্ষরবৃত্ত)

৯। ধা করে গিয়ে নিয়ে আয় দেখি
ভালো এক কাপ চা।
(ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত—একাক্ষর 'ধা' ও 'চা' দ্বিমাত্রক)

১০। এসো আমার শ্রাবণ নিশি এসো আমার শরৎলক্ষ্মী;
এসো আমার বসন্ত দিন লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী।
তুমি এসো তুমিও এসো, তুমি এসো এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জানো ধরণীর নাম মর্ত্যভূমি।
(চতুর্মাত্রক শ্বাসাঘাতবৃত্ত)

১১। কিন্তু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝেই খসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।
মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধি দাতা গণেশের
দরজার পরে আঁটা।

(অক্ষরবৃত্ত ছন্দ—মূল পর্ব অষ্টমাত্রক, তবে মুক্তক প্রবহমান ছন্দ বলে ৪ এবং ৬ মাত্রার পর্বও রয়েছে।)

১২। রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
(প্রচলিত পয়ারবন্ধ ৮+৬, অক্ষরবৃত্ত)

১৩। আনবে কট্‌কি জুতো মটকিতে ঘি এনো;
জলপাইগুড়ি থেকে এনো কই জিয়োনো।
(মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, পর্ব বিভাগ ৮+৭)

১৪। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই আর সবি গেছে ঋণে,
বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন এ জমি লইব কিনে।

(ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দ)

১৫। মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।

(অষ্টমাত্রক প্রত্নমাত্রাবৃত্ত, শেষ পর্ব সপ্তমাত্রক)

১৬। দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর
লহ যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব সভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান.
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সাম গান।

(অক্ষর বৃত্ত, মূল পর্ব অষ্ট মাত্রক ; কিন্তু প্রবহমান পয়ার বলেই ছেদের অনুরোধে কোন কোন পর্বের মাত্রা ৪ বা ৬।)

১৭। নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি।

(ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত)

১৮। বধূরা দেখো আইল ঘাটে এলনা ছায়া তবু,
কলস ঘায়ে ঊর্মি টুটে
রশ্মিরাশি চূর্ণি উঠে
শ্রান্ত বায়ু প্রান্ত নীর চুম্বি যায় কভু।

(পঞ্চমাত্রক মাত্রাবৃত্ত)

১৯। দেখলেন একটি সাদা বিড়াল শুয়ে আছে নীচে,
অমনি লাঠি নিয়ে রাজা ছুট্‌লেন তো তার পিছে।

(চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত)

২০। কেমন যেন গাল দুখানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে ফোটা কলমি ফুলে কতটা তার খোলে বাহার।

(চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত)

২১। জগতের তুমি জীবিত রূপিনী
জগতের হিতে সতত রতা
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী
বিজন কানন কুসুমলতা

(ষণ্মাত্রক অক্ষর বৃত্ত)

২২। চিম্‌নি ভেঙ্গে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুন।

(অক্ষর বৃত্ত, ৮+৬। চিম্‌নি—চিন্নি, ২ মাত্রা, কিন্তু ঠাকরুণ—৪ মাত্রা)

২৩। চিমনি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকরুণ মোর নাই কোন দোষ।

(অক্ষর বৃত্ত ৮+৬, চিমনি—৩ মাত্রা, ঠাকরুণ—৩ মাত্রা।)

২৪। অধর উঠই কাঁপিয়া
সখী করে কর আপিয়া
কুঞ্জ ভবনে পাপিয়া
কাহে গীত গাহিছে।

(প্রত্নমাত্রাবৃত্ত—৬ মাত্রার পর্ব, প্রতি চরণান্তে ৫ মাত্রার খণ্ড পর্ব)

২৫। স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে।
মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে অশরণ লাগিবে।

(প্রত্নমাত্রাবৃত্ত—সপ্তমাত্রক পর্ব, দীর্ঘস্বর কোথাও কোথাও দীর্ঘ।)

২৬। ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে,
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে।

(চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত ; এখানে দুটি চরণ এক পংক্তিতে স্থান পেয়েছে ; এটাকে নিম্নোক্তক্রমে লিখতে হবে—)

ভজনপূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।

২৭। আর জাগাসনে মা জয়া অবোধ অভয়া
কত ক'রে উমা এই ঘুমালো,
মা জাগিলে একবার ঘুম পাড়ানো ভার
মায়ের চঞ্চল স্বভাব আছে চিরকাল।

(ষণ্মাত্রক অক্ষর বৃত্ত—অতিপর্ব : 'আর', 'মা', 'মায়ের'।

২৮। সা ত ভা ই চ ম্পা | জা গো — ৮+৪
জা গো, জা গো মো র সা ত ভা ই
নি দা ঘে র ভো রে শো ন্ | ডা কি ছে পা রু ল বো ন — ৮+৮
অ র ণ্যে র মা ঝে আ র | রা ত না ই। — ৮+৩
চ ম্পা গো চ ম্পা গো | জা গো ভা ই। — ৮+৬

(উচ্চারণ-অনুযায়ী এভাবে মাত্রাদান এবং পর্ব-বিভাগ করলেও এর ভিন্ন রকম বিশ্লেষণও সম্ভবপর। কোন বিশেষ ছন্দ রীতি এখানে অনুসৃত হয়নি—এতে কোথাও দীর্ঘস্বর দুমাত্রা হয়েছে, আবার কোথাও রুদ্ধ দল একমাত্রা হয়েছে, ফলতঃ এটা একটা মিশ্ররূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এটিকে সোজাসুজি অষ্টমাত্রক অক্ষর বৃত্তেও রূপায়িত করা যায়।)

২৯। প্রাণ প্রণ | -বের দ্রষ্টা নব |
গান সে অস | -পত্ন তব |
অমৃত স | -মুদ্ভব ! জয় ! | জয়

(চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত)

৩০। বাজ্‌ছে শূন্যে অভ্র কম্বু
কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বু,
লক্ষ ঝর্ণায় উঠ্‌ছে ঝঙ্কার
ওম্‌ স্বয়ম্ভু ! ওম্‌ স্বয়ম্ভু।

(সপ্তমাত্রক মাত্রাবৃত্ত এবং চতুর্মাত্রক স্বরবৃত্ত—দুভাবেই করা যায়, অতএব বলা চলে দ্বৈতবৃত্ত।

প্রশ্নোত্তর পর্ব ঃ

১৯৮১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১। ছন্দ আলোচনায় 'অক্ষর' ও 'চরণ' শব্দ দুটির অর্থ বিশদভাবে বুঝিয়ে দাও।

উঃ—ছন্দ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, কাজেই এর পারিভাষিক শব্দগুলির সুস্পষ্ট অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছন্দশাস্ত্রে 'অক্ষর' এবং 'চরণ' দুটি পারিভাষিক শব্দই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এদের অর্থ বিষয়ে ছান্দসিকদের মধ্যে মতান্তর বর্তমান রয়েছে।

সংস্কৃতে 'অক্ষর' বল্‌তে 'বর্ণ' এবং 'স্বরাশ্রিত বর্ণ সমষ্টি' দুটিকেই বুঝিয়ে থাকে। ইংরেজি letter শব্দের প্রতিশব্দ বর্ণ, কিন্তু syllable শব্দের কোন যথাযথ প্রতিশব্দ না থাকায় অনেকেই 'অক্ষর' শব্দটি দ্বারা কাজ চালিয়ে থাকেন। কিন্তু সংস্কৃতে ও বাংলায় অক্ষর সব সময়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে। যেমন 'রবীন্দ্রনাথ' শব্দে আমরা পাঁচটি অক্ষর পাই—'র. বী. ন্দ্র. না. থ'—কিন্তু ইংরেজি কায়দায় একে syllable-এ বিশ্লেষণ করলে পাই—র. বীন্‌. দ্র. নাথ্'—চারটি syllable। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক থেকেই যখন অক্ষর ও syllable-এর পার্থক্য রয়েছে, তখন একটিকে অপরটির প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ না করাই সঙ্গত। এই বিবেচনায় আচার্য প্রবোধ চন্দ্র সেন ইংরেজি syllable-এর প্রতিশব্দরূপে বাংলায় 'দল' শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। ইংরেজি syllable-এর মতই বাংলায় দলও দ্বিবিধ—মুক্তদল ও রুদ্ধদল। অক্ষর সর্বদাই মুক্তদল হ'য়ে থাকে। অতএব অক্ষর বল্‌তে বাংলা লিপি পদ্ধতি-অনুযায়ী স্বরান্ত বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি এবং পদান্ত-স্থিত হসন্ত বর্ণকেই বোঝানো সঙ্গত।

চরণ-বিষয়েও ছান্দসিকগণ একমত নহেন। 'পদ' এবং 'চরণ' একার্থবাচক বলে প্রবোধচন্দ্র এক পংক্তিতে ধৃত রচনাকেই চরণ বলে থাকেন। কিন্তু চরণেই বাক্য ও ভাবের সমাপ্তি ঘটে বলে পংক্তিভিত্তিক চরণ নির্দেশ সমীচীন নয় বলেই বিবেচনা করি। বাক্য বা ভাবের সমাপ্তিতে যেখানে পূর্ণ যতিপাত এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ ঘটে, রচনার ততটুকু অংশকেই 'চরণ' বলা সঙ্গত। যেমন—

১. এমন পিরীতি কভু | দেখি নাহি শুনি।

২. শীতল বলিয়া | শরণ লইনু |
   ও দুটি কমল পায়।

৩. (আমি) তটিনী হইয়া | যাইব বহিয়া |
   নব নব দেশে | বারতা লইয়া |
   হৃদয়ের কথা | কহিয়া কহিয়া |
   গাহিয়া গাহিয়া | গান।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলির প্রথমটিতে এক পংক্তিতে, দ্বিতীয়টিতে দুই পংক্তিতে এবং তৃতীয়টিতে চার পংক্তিতে এক একটি চরণ গঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দৃষ্টান্তে প্রথম পংক্তির পর ভাব বা বাক্যের সমাপ্তি সূচিত হওয়ায় এক পংক্তিতে চরণ হ'লো না। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয়—সাধারণতঃ খণ্ড পর্বের দ্বারাই চরণের সমাপ্তি বোঝায়। এটা সাধারণ নিয়ম, তবে এর ব্যতিক্রমও থাকতে পারে।

২। উদাহরণ সহ 'তানপ্রধান ছন্দ' বা মিশ্র কলাবৃত্ত-সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা কর।

উঃ—(অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই নামান্তর 'তানপ্রধান ছন্দ' ও 'মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দ'। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা দ্রষ্টব্য।)

৩। নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলির যে কোন দুটির পর্ব, পর্বাঙ্গ ও মাত্রা নির্ণয় কর।

— | | — | | | | | | — | | — | | | | | | ——
(ক) রা ত্রি : প্র ভা তি ল | উ দি ল : র বি চ্ছ বি | পূ র্ব : উ দ য় গি রি | ভালে
— | | — | | — | | — | | | | — | | | | ——
গা হে : বি হ ঙ্গ ম | পু ণ্য : স মী র ণ | ন ব জী ব ন : র স ঢা লে।

সঙ্কেতচিহ্ন দীর্ঘ দাঁড়ি (|) চিহ্ন দ্বারা পর্ব, ত্রিবিন্দু (⁝) চিহ্ন দ্বারা পর্বাঙ্গ পৃথক্ করা হ'লো এবং একমাত্রা ' | ', দুই মাত্রা '—' চিহ্ন দ্বারা বোঝানো হ'লো।

প্রত্নমাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চরণ দুটির প্রতি পর্বে ৮ মাত্রা, তিনটি পূর্ণ পর্বের পর একটি চতুর্মাত্রক খণ্ড পর্ব আছে। যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ব স্বর তথা রুদ্ধ দল ও দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রক—একটি ব্যতিক্রম : 'গাহে' শব্দের 'হে' দীর্ঘস্বর যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্রক হয়েছে। অপর সব অক্ষর বা দল একমাত্রক।

| | | | | | | | ০ | | | | | |
(খ) জা নি : আ মি | ক র কা : ঘা ত, | গ্রী ষ্ম : দা হ | খ র।
| | ০ | | ০ | | ০ | ০ | | | ০ | | | |
শ্রা ব ণ : ধা রা র | পী ড় ন : স ও য়া | ক ঠি ন : ব টে | ব ড়ো।

সঙ্কেত—যথাপূর্ব।

চতুর্মাত্রক তিনটি পূর্ণ পর্ব ও দ্বিমাত্রক একটি অপূর্ণ পর্বের সাহায্যে স্বরবৃত্ত ছন্দের এই চরণগুলি রচিত হয়েছে। এতে প্রতিটি দল তথা প্রতিটি স্বর একমাত্রা-বিশিষ্ট—বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন বা হসন্ত বর্ণের কোন মূল্য নেই।

| | — — — | | — | | | | | | —
(গ) যা হা : অ ন্যা য়, | হোক্ না : প্র ব ল | ক রি য়া ছি : প্র তি | বা দ ;
| — | — | — — | | | | | | —
আ মা র : বু কে র | কো ম ল : অং শ | ব লি ল : তা রে | খা দ।

সঙ্কেত চিহ্ন—পূর্ববৎ।

ষণ্মাত্রক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চরণের শেষ পর্বটি দ্বিমাত্রক খণ্ড পর্ব। রুদ্ধ দল সর্বত্র দ্বিমাত্রক।

| |—|— | | |— |—
(ঘ) কুলপাংশুলার · গর্ভে | জনম : যাহার
| | | | | | | | | | | |— | |
সেই দাসী : পুত্র হবে | মেবারের : রাজা ?
| | | | | | | | | | | |—
খদ্যোত : হরিয়া : লবে | দ্যুতি : চন্দ্রমার ?
| | | | | | | | | | | | | |
মৃগেন্দ্র : বিক্রমে : বনে | বিচারিবে : অজা ?

সঙ্কেত চিহ্ন—যথা পূর্ব।

অক্ষর বৃত্ত ছন্দে ৮+৬ মাত্রার পয়ার বন্ধে রচিত। প্রতি অক্ষরে এক মাত্রা অথবা পদান্তস্থিত রুদ্ধ দলে দুই মাত্রা, অন্যত্র সব একমাত্রা।

| | | | | | | | | | | | | | | | |
(ঙ) মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বারে | আমরা : আরামে : শয্যা | শায়ী
| | | | | | | | | | — | | | — | |
স্তব্ধ : পৃথিবীতে : শুধু | | শোনা যায় : একাকী উৎ | সাহী
| | | | |— — | | | |—| | | —
একটি : অক্লান্ত : সুর; | নিগূঢ় : মন্ত্রের : শেষ | শ্লোক
| | | |— | | | | | | |— — —
নিঃসঙ্গ : ব্যাঙের | কণ্ঠে | উৎসারিত : ক্রোক : ক্রোক | ক্রোক।

সঙ্কেত চিহ্ন—যথাপূর্ব।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ৮+১০ (৮+২) মহাপয়ার রীতিতে রচিত। প্রতি অক্ষরে এক-মাত্রা অথবা পদান্তস্থিত রুদ্ধ দলে দুই মাত্রা অপর সকল রুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্ত দলে একমাত্রা।

১৯৮২

১। (ক) 'অক্ষর' কাকে বলে এবং কয় প্রকার ?

উঃ (পূর্বে দ্রষ্টব্য।)

বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চার্য ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে 'অক্ষর' বলে। অক্ষর দু'প্রকার—যুক্তাক্ষর, যথা—'ক্ষ, স্ত্রী' ও বিযুক্তাক্ষর, যথা—'উ, ন'।

(খ) 'যতি' কাকে বলে ? 'ছেদ' কাকে বলে ?

উঃ (পূর্বে দ্রষ্টব্য)—এদের সংজ্ঞা দেখ।

(গ) 'পঞ্চ শরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'– উদ্ধৃত পংক্তিতে পর্ব ও পর্বাঙ্গ নির্দেশ কর।

উঃ পঞ্চ : শরে | দগ্ধ : ক'রে | করেছ : একি | সন্ন্যাসী,
বিশ্ব :ময় | দিয়েছ : তাকে | ছড়ায়ে।

২। (ক) শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের পরিচয় উপযুক্ত দৃষ্টান্তসহ পরিস্ফুট কর।

উঃ ('শ্বাসাঘাতবৃত্ত' বা 'স্বরবৃত্ত ছন্দের'ই নামান্তর 'শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দ'। পূর্ববর্তী আলোচনায় 'স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য' দ্রষ্টব্য।)

অথবা—বাংলা ছন্দের তিন রীতিতে মাত্রা গণনায় পার্থক্য কোথায়, উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

উঃ— 'মাত্রাবিচার'—বিষয়ক আলোচনা দ্রষ্টব্য)

বাংলায় তিন জাতীয় ছন্দ প্রচলিত আছে—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতবৃত্ত। মাত্রা বিচারের পার্থক্য থেকেই তিন জাতীয় ছন্দের উদ্ভব ঘটেছে। কবি-ছান্দসিকদের মধ্যে মাত্রা গণনায় দু'প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে--তবে পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও ফল গিয়ে একই দাঁড়ায়। এক রীতিতে:—অক্ষর বৃত্ত ছন্দে যত অক্ষর তত মাত্রা, স্বরবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দে যত স্বর তত মাত্রা এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যুক্তবর্ণ ও হসন্ত বর্ণের পূর্ব স্বর ও যৌগিক স্বর দুই মাত্রা, অপর সব অক্ষর ১ মাত্রা।

অপর রীতিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, অপর সকল রুদ্ধদল ও যাবতীয় মুক্তদল একমাত্রক, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সমস্ত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক ও মুক্তদল একমাত্রক, স্বরবৃত্ত ছন্দে যাবতীয় দলই একমাত্রক।

দৃষ্টান্ত—

অক্ষর বৃত্ত ছন্দে—

| | | | ॥ | | | | | | ॥
মহাভারতের কথা | অমৃত সমান। ৮+৬

| | ॥ ॥ | | | | | | ॥
কাশীরাম দাস কহে | শোনে পুণ্যবান্॥ ৮+৬

অক্ষরের হিসেবে এখানে দুই চরণেরই প্রথম পর্বে ৮ অক্ষরে ৮ মাত্রা, শেষ পর্বে ৬ অক্ষর ও ৬ মাত্রা। দলের হিসেবে—পদের শেষ দল রুদ্ধ হ'লে (—তের, —মান, —রাম, —দাস, —বান্) ২ মাত্রা, অন্য সব ১ মাত্রা, তাতে চরণের প্রথম পর্বে মাত্রা-সংখ্যা ৮, দ্বিতীয় পর্বে ৬। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে—

॥ | | | ॥ | | | | | | | | ॥ | |
প ঞ্চ শ রে | দ গ্ধ ক রে | ক রে ছ, এ কি | স ন্ন্যা সী ৫+৫+৫+৪

॥ | ॥ ॥ | | | | | | |
বি শ্ব ম য় | দি য়ে ছ তা রে | ছ ড়া য়ে। ৫+৫+৩

যুক্তব্যঞ্জনের হলন্তের পূর্বস্বর সর্বদাই রুদ্ধ, অতএব উভয় রীতিতেই তাতে দু'মাত্রা, অপর সব একমাত্রা। উভয় রীতিতেই প্রতি পূর্ণ পর্বে ৫ মাত্রা।

শ্বাসাঘাতবৃত্ত / স্বরবৃত্ত ছন্দে—

| | | | | | ।।।।

বৃ ষ্টি প ড়ে | টা পু র টু পু র | ন দেয় এলো | বান। ৪+৪+৪+১

শি ব ঠা কু রের | বি য়ে হ বে | তিন টি ক ন্যা | দান। ঐ

শুধু স্বরধ্বনিতে মাত্রা দেওয়াতে পর্বের মাত্রা সংখ্যা ৪।

বৃ ষ্টি পড়ে | টাপুর টু পু র | নদেয় এলো | বান,

শিব ঠাকুরের | বিয়ে হ বে | তিনটি কন্যা | দান,

মুক্ত-রুদ্ধ-নির্বিশেষে সবদলে ১ মাত্রা, অতএব পর্বের মাত্রাসংখ্যা—৪।

(খ) যে কোন দুটি উদ্ধৃত কাব্যাংশের ছন্দোলিপি রচনা কর :

(অ) রু দ্র, তো মা র | দা রু ণ দী প্তি ৬+৬

এ সে ছে দু য়া র | ভে দি য়া। ৬+৩

ব ক্ষে বে জে ছে | বি দ্যু ৎ বা ণ। ৬+৬

স্ব প্নে র জা ল | ছে দি য়া। ৬+৩

(সংকেত চিহ্ন :—২ মাত্রা—, ১ মাত্রা।)

আলোচ্য কাব্যাংশটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রতি দুটি পংক্তিতে এক চরণ, প্রতি চরণে তিনটি ষষ্ঠমাত্রক পূর্ণ পর্ব এবং একটি ত্রিমাত্রক খণ্ডপর্ব রয়েছে। রুদ্ধদল এখানে সর্বত্র দ্বিমাত্রক, অপর সকল দল একমাত্রা বিশিষ্ট।

(আ) কো ন্ দূ র শ তা ব্দে র | কো ন্ এ ক অ খ্যা ত দি ব সে |

না হি জা নি আ জি | ৮+১০+৬

মা রা ঠা র কো ন্ শৈ লে | অ র ণ্যে র অ ন্ধ কা রে ব সে |

হে রা জা শি বা জি | ৮+১০+৬

| | | | | | | | | | | | | | | | —
তব ভাল উদ্ভাসিয়া। এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবং।
| | | | | | |
এসেছিল নামি— । ৮+১০+৬

— | | | | | | ॥ | | | | | | | | | —
'এক ধর্মরাজ্য পাশে। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত।
| | | | | |
বেঁধে দিব আমি, । ৮+১০+৬

সঙ্কেত চিহ্ন—পূর্ববৎ।

আলোচ্য স্তবকটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। প্রতি চরণে ২৪টি মাত্রা বা অক্ষর,—মূল পর্ব ৮ মাত্রার, পরবর্তী দুটি পর্ব প্রবহমানতা হেতু ১০ ও ৬ মাত্রায় বিভক্ত। পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, অপর সব দল একমাত্রক।

| | | | | | | | | | | | | | | | |
(ই) সোনার জলে। দাগ পড়ে না। খোলে না কেউ। পাতা
৪+৪+৪+২

| | | | | | | | | | | | | | |
অস্বাদিত। মধু যেমন। যুথী অনা। -ঘ্রাতা। ৪+৪+২

| | | | | | | | | | | | | |
ভৃত্য নিত্য। ধুলা ঝাড়ে। যত্ন পুরা। মাত্রা,

| | | | | | | | | | | | | | |
ওরে আমার। ছন্দোময়ী। সেথায় করবি। যাত্রা?

(সঙ্কেত চিহ্ন—পূর্ববৎ)

শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কাব্যাংশটির প্রতি পূর্ণ পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৪, অপূর্ণ পর্বে ২। প্রতি পর্বে চারিটি দল ও স্বর, প্রতি দল ও স্বরে ১ মাত্রা।

| | | | | — | —
(ঈ) সেই জন্মপূর্বের স্মরণ, । ১০

| | | | | | | | | | | | | | — | —
গর্ভস্থ পৃথিবী 'পরে। সেই নিত্য জীবন স্পন্দন ৮+১০

| | | | | | | — | | | | | | | | | |
তব মাতৃ হৃদয়ের। —অতি ক্ষীণ আভাসের মতো ৮+১০

| | | | | | | | | — | | | | | | | | | | |
জাগে যেন সমস্ত শিরায়,। শুনি যবে নেত্র করি নত ১০+১০

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
বসি জনশূন্য তীরে। ওই পুরাতন কলধ্বনি, ৮+১০

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত মহাপয়ার, পর্বে মাত্রাবিভাগ ৮+১০, শুধু প্রথম চরণ এবং চতুর্থ চরণের দুটি পর্বই ১০ মাত্রাযুক্ত। প্রবহমাণ ছন্দে, বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এরূপ নিদর্শন যথেষ্টই পাওয়া যায়।

১। 'পর্ব' বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দাও।

উঃ। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

২। 'পর্বাঙ্গ' বলতে কী বোঝায়?

উঃ। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৩। ওই যেথা জ্বলে সন্ধ্যায় কূলে দিনের চিতা'—এই চরণের মাত্রা-সংখ্যা নির্ণয় কর।

— | | | | —— | | | — | |

উঃ ও ই যে থা জ্ব লে | স ন্ধ্যা য় কূ লে | দি নে র চি তা।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চরণটির মাত্রাসংখ্যা ৬+৬+৫=১৭ মাত্রা।

৪। উপযুক্ত উদাহরণসহ মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দের পরিচয় দাও।

উঃ। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৫। দৃষ্টান্তসহযোগে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট কর।

উঃ। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৬। নিম্নোক্ত কাব্যাংশের ছন্দোলিপি রচনা কর:—

| — | | | | | | | | |

(ক) বঁ ধু র পি রী তি | আ র তি দে খি য়া |

— — | | | |

মো র ম ন হে ন | ক রে। ৬+৬+৬+২

| | — | | | | — | | |

ক ল ঙ্কে র ডা লি | মা থা য় ক রি য়া |

| — | — | |

আ ন ল ভে জা ই | ঘ রে॥ ৬+৬+৬+২

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত লঘু ত্রিপদী—মাত্রাবিন্যাস ৬+৬+৮(৬+২)। পদান্তস্থিত রুদ্ধদল দ্বিমাত্রক, আর সব দলই একমাত্রক।

| | | | | | | | | | | | | |

(খ) আ হা পিঁ প ড়ে | ছো টো পি প ড়ে | ঘু রু ক দে খু ক | থা কু ক

| | | | | | | | | | | | | | | |

কেমন যেন | চেনা লাগে | ব্যস্ত মধুর | চলা—

| | | | | | | | | | | |

স্তব্ধ শুধু | চলায় কথা | বলা—

| | | | | | | | | | | | | | | |

আলোয় গন্ধে | ছুঁয়ে তার ঐ | ভুবন ভরে | রাখুক,

| | | | | | | | | | | | | | | |

আহা পিঁপড়ে | ছোট পিঁপড়ে | ধুলোর রেণু | মাখুক,

শ্বাসাঘাতবৃত্ত ছন্দ চতুর্মাত্রক পূর্ণ পর্ব, চরণের শেষ সব কটি পর্বই অপূর্ণ দ্বিমাত্রক। এর সব দল বা স্বরই একমাত্রা বিশিষ্ট।

| | | | | | | | | | | | | | | | |— | |—

(গ) আমি) বিধির বিধান | ভাঙিয়াছি আমি | এমন ইশক্তি | মান্ |

| | | | | | | | | | | — | | | | | ! | —

মম) চরণের তলে | মরণের মার | খেয়ে মরে ভগ | বান্ |

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত, প্রতি পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৬, চরণান্তে অপূর্ণ পর্ব দ্বিমাত্রক। ছন্দের প্রয়োজনে শব্দচ্ছেদ ঘটিয়ে (ভগ | -বান্) যতিচিহ্ন দিতে হয়েছে। পদান্তস্থিত যুক্তদল দ্বিমাত্রক, এছাড়া সব দলই একমাত্রক অথবা প্রতি অক্ষর ১ মাত্রা বিশিষ্ট। উভয় চরণের আদিতে দ্বিমাত্রক অতিপর্ব রয়েছে।

— —— | | | | |— — | | | | | | — —

(ঘ) পিঙ্গল বিহ্বল | ব্যথিত নভতল | কই গো কই মেঘ | উদয় হও।

—— —— | | | | |— | —|— — | ——

সন্ধ্যার তন্দ্রার | মূরতি ধরি আজ | মন্দ্র | মন্থর | বচন কও

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত ; আসলে এটি সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের বাংলা রূপান্তর— সংস্কৃতে পর্ব বিভাগ নেই, বাংলায় করা হয়েছে, কিন্তু পর্ব সমতা নেই, পর্বের মাত্রাসংখ্যা যথাক্রমে ৮+৭+৭+৫=মোট ২৭ মাত্রার চরণ।

| | | |—| | | | | | !—

(ঙ) উঠিলা গৌতম ঋষি | ছাড়িয়া আসন ৮+৬

| | | | | | | | | | | |—

বাহু মেলি বালকেরে | করি আলিঙ্গন ৮+৬

| |— | |— | | | | | |

কহিলেন, 'অব্রাহ্মণ | নহ তুমি তাত, ৮+৬

| | | | | | | | | | | | | | |

তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি | সত্যকুলজাত। ৮+৬

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত পয়ার মাত্রাবিন্যাস ৮+৬

১৯৮৪

১। শব্দযুগ্মের পার্থক্য বুঝিয়ে দাও :—

বর্ণ ও অক্ষর—ইংরেজি letter-এর প্রতিশব্দ 'বর্ণ'। এর সংজ্ঞা—ধ্বনির লেখ্য রূপকে 'বর্ণ' বলা হয়। 'অক্ষর' এবং 'বর্ণ' অনেক সময় সমার্থক হ'লেও ছন্দ-পরিভাষায় এদের পার্থক্য আছে। অক্ষরের সংজ্ঞা—বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে 'অক্ষর' বলা হয়। একটা অক্ষরে যেমন একটি বর্ণ থাকতে পারে, দুই বা ততোধিক বর্ণও থাকতে পারে: যেমন—'অ, ক্' বর্ণ, আবার 'অ, ক, স্ত্রী' অক্ষর।

ছেদ ও যতি—অর্থের দিক্ থেকে ছেদ ও যতির কোন পার্থক্য নেই, উভয়ের অর্থই বিরাম। কিন্তু ছন্দের পরিভাষায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিধান করা হয়। অর্থবোধের জন্য যখন বাক্যের মধ্যে সাময়িক বা বাক্যান্তে স্থায়ী বিরাম ঘটে, তখন তাকে বলে 'ছেদ'। দাঁড়ি, কমা, সেমিকলন প্রভৃতি ছেদচিহ্ন। প্রধানত: কবিতা পাঠকালে ধ্বনিতরঙ্গ তথা ছন্দস্পন্দ সৃষ্টির অনুরোধে বাগ্‌যন্ত্র যখন নিয়মিত ব্যবধানে বিরাম গ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় 'যতি'। গদ্যেও যতি আছে কিন্তু তা নিয়মিত নয়, কিন্তু পদ্যে যতি অপরিহার্য। পূর্ণচ্ছেদের সঙ্গে পদ্যে পূর্ণ যতির সমাপতন ঘটে, ছন্দস্পন্দের প্রধান উপাদান মধ্য যতি, মধ্য যতির সাহায্যেই পর্ব নিরূপিত হ'য়ে থাকবে—

> মুদিলা সরসে আঁখি | বিরস বদনা
> নন্দিনী ; কূজনি পাখি | পশিলা কুলায়ে ;

পংক্তি ও চরণ—এক সারিতে যতখানি পর্যন্ত লিখিত হয়, তাকে বলা হয় পংক্তি। বাক্যের যেখানে সমাপ্তি ঘটে, ততখানি পর্যন্ত চরণ। কবিতায় অনেক সময় এক পংক্তিতেই বাক্যের সমাপ্তি ঘটে বলে অনেক সময় পংক্তি আর চরণ সমার্থক হ'য়ে দাঁড়ায় ; আবার বহুস্থলেই একাধিক পংক্তি নিয়ে চরণ গঠিত হয়। চরণের শেষে সাধারণত একটি অপূর্ণ পর্ব থাকে।

> পিতার ধর্ম | শোণিতের স্রোতে |
> মুছিয়া ফেলিল | রাজপুরী হ'তে |
> সঁপিল যজ্ঞ | অনল আলোতে |
> বৌদ্ধশাস্ত্র | রাশি।

এখানে প্রকৃতপক্ষে চারটি পংক্তি হ'লেও চরণ একটি। প্রবোধ চন্দ্র সেন চরণ শব্দটি ব্যবহার করেন না, তিনি 'চরণ' বলে 'পংক্তি' এবং প্রচলিত পংক্তি স্থলে 'ছত্র' ব্যবহার ক'রে থাকেন।

(২) উদাহরণ সহ শ্বাসঘাতপ্রধান বা স্বরবৃত্ত ছন্দের পরিচয় দাও।

(পূর্বে দ্রষ্টব্য)

(৩) 'পয়ার' ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা কর।

'পয়ার' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিষয়ে পণ্ডিতজনের মতান্তর থাকলেও 'পদাকার'

থেকেই এর সৃষ্টি—মোটামুটিভাবে অনেকেই মেনে থাকেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বহু কবিই 'পয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁদের ব্যবহার থেকে মনে হয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত চতুর্দশাক্ষর রচনারীতিকেই পয়ার বলা হ'তো। তখনকার দিনে অবশ্য প্রায় সব কবিতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হতো। তা থেকে শেষ পর্যন্ত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই পয়ার নামে অভিহিত করা হ'তো। অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন পয়ারের এই পরিচয়ে আপত্তি উত্থাপন ক'রে পয়ারকে কোন ছন্দের জাতি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত। তাঁর মতে পয়ার যে কোন জাতীয় ছন্দের একটা বিশেষ রূপকল্প বা প্যাটার্ন—এতে প্রতি চরণে মাত্রা থাকবে ১৪টি এবং ৮ মাত্রা পর যতি পড়তেই হ'বে। অক্ষরবৃত্ত ছাড়াও স্বরবৃত্তে বা মাত্রাবৃত্তে রচিত এই রূপকল্পকেই 'পয়ার' বলা হয়। নিম্নে তিন জাতীয় ছন্দেরই দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো।—

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে পয়ার—

'দেখ দ্বিজ মন নিজ | জিনিয়া মুরতি। ৮+৬
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র | পরশয়ে শ্রুতি ॥ ৮+৬

মাত্রাবৃত্ত ছন্দে পয়ার :—

স্পন্দিত | নদীজল | ঝিলিমিলি | করে ; ৪+৪+৪+২
জ্যোৎস্নার | ঝিকিমিকি | বালুকার | পরে। ৪+৪+৪+২

স্বরবৃত্ত ছন্দে পয়ার :—

হেড্ অফিসের | বড়োবাবু | লোকটি বড় | শান্ত
তার যে কখন | মাথার ব্যামো | কেউ কখনো | জানতো। ৪+৪+৪+২

(৪) **কাব্যাংশের ছন্দলিপি :—**

(ক) নী র বে দে খা ও | আ ঙু লি তু লি | ৬+৬
অ কূ ল সি ন্ধু | উ ঠি ছে আ কু লি | ৬+৬
দূ রে প শ্চি মে | ডু বি ছে ত প ন | গ গ ন কো ণে,
কী আ ছে হে থা য় | চ লে ছি কি সে র | অ ন্বে ষ ণে। ৬+৬+৫

আলোচ্য কাব্যাংশটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর প্রথম দুটি পংক্তিতে দুটি ক'রে পূর্ণ পর্ব এবং শেষে দুই পংক্তিতে দুটি পূর্ণ এবং একটি ক'রে অপূর্ণ পর্ব রয়েছে। পূর্ণ পর্বের মাত্রা সংখ্যা রুদ্ধ দলই দ্বিমাত্রক, এ ছাড়া সব দলই একমাত্রক।

(খ) ছিপ খান | তিন দাঁড় ৪+৪
তিন জন | মা ল্লা ৪+৩

— — — —
চো পর | দিন ভর ৪ + ৪
— | — |
ত্যায় দূর | পা ল্লা। ৪+৩

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ রচিত, প্রতি পংক্তিতে দুটি পর্ব; প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে দুটি পর্বই পূর্ণ, অপর দুই পংক্তিতে একটি পূর্ণ ও একটি অপূর্ণ। পূর্ণ পর্বের মাত্রাসংখ্যা ৪, অপূর্ণ পর্বের ৩। এখানে লক্ষণীয়—এর প্রায় সব কটির দলই রুদ্ধদল। রুদ্ধদলের মাত্রা সংখ্যা ২।

— | | | |
(গ) | হায় সূ র্প ণ খা ৮+৬
| | | | | | | | | | | | | | |
কি কু ক্ষ ণে দে খে ছি লি, | তু ই রে অ ভা গী ৮+৬
— | | | | | | | — | | | | | |
কাল প ঞ্চ ব টী ব নে | কা ল কু টে ভ রা ৮+৬
| | | |
এ ভু জ গে? ৪+

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত পয়ার ভিত্তিক অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান রীতিতে রচিত এই কাব্যাংশের পূর্ণ পর্ব অষ্টমাত্রক, অপূর্ণ পর্ব ষণ্মাত্রক।

(ঘ) জীবনের দুঃখসুখ | বারবার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত না করে লুব্ধ | মরণেরে বাসি আমি ভালো;
যাতনার হা হা রবে | গাই গান—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু! উগ্র ওই | সোমরস ঢালো, আরো ঢালো।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত—মহাপয়ার নামে এর পরিচয়। এর প্রতি পংক্তিতে ১৮ মাত্রা বা অক্ষর, পর্ব বিভাগ ৮+১০।

| | | | | | | | | | | | |
(ঙ) ও ই) দা রু ণ উ প | প্ল বের দি নে | আ ম রা দানি | শির
| | | | | | | | | | | | | | |
মো দের মাঝে | মু ক্তি কাঁদে | বিং শ শ তা | ব্দী র
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
মো রা) গৌ র বে রি | কা ন্না দি য়ে | ভ রে ছি মার | শ্যাম আঁ চ ল।
| | | | |
আম রা ছা ত্র | দ ল।

শ্বাসাঘাতবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত এই কাব্যাংশের প্রতি পূর্ণবৃত্তের মাত্রা ৪। প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদিতে আছে অতি পর্ব, এবং প্রতি চরণের শেষেই একটি করে খণ্ডপর্ব—তৃতীয় চরণে তিন মাত্রার, অপর সকল চরণে এক মাত্রার। এতে প্রতিটি দলই একমাত্রক